তাফসীরে
তাবারী শরীফ
তৃতীয় খণ্ড
আল্লামা আবূ জা'ফর মুহাম্মদ
ইবন জারীর তাবারী (রহ.)

তাফসীরে তাবারী শরীফ

তৃতীয় খন্ড

আল্লামা আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইবন জারীর তাবারী (রহ.)

তাফসীরে তাবারী শরীফ

(তৃতীয় খণ্ড)

আল্লামা আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর তাবারী
রহমাতুল্লাহি আলায়হি

সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে অনূদিত এবং তৎকর্তৃক সম্পাদিত

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

তাফসীরে তাবারী শরীফ
(তৃতীয় খণ্ড)
তাফসীরে তাবারী শরীফ প্রকল্প

প্রকাশকাল ঃ
শ্রাবণ ঃ ১৩৯৯
মুহর্‌রম ঃ ১৪১৩
জুলাই ঃ ১৯৯২

ইফাবা. অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা ঃ ১০৫
ইফাবা. প্রকাশনা ঃ ১৭১৪
ইফাবা. গ্রন্থাগার ঃ ২৯৭.১২২৭
আই. এস.বি. এন ঃ ৯৮৪-০৬-০০৬৪-৮

প্রকাশক ঃ
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মুকার্‌রম, ঢাকা-১০০০

মুদ্রণ ও বাঁধাইয়ে ঃ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
বায়তুল মুকার্‌রম, ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ অংকনে ঃ রফিকুল ইসলাম

মূল্য ঃ ১৮০·০০ (একশত আশি টাকা মাত্র)

TAFSIRE TABARI SHARIF (3rd part) (Commentary on the Holy Quran) Written by Allama Abu Jafar Muhammad Ibn Jarir Tabari (Rh.) in Arabic, Translated under the Supervision of the Editorial Board of Tabari Sharif and Edited by the Same Board and Published by Translation and Compilation Section, Islamic Foundation Bangladesh Baitul Mukarram Dhaka. July, 1992

Price Tk. 185·00 U.S. 8·00

আমাদের কথা

কুরআনুল করীম আল্লাহ্ তা'আলার কালাম। ইসলামের প্রাথমিক যুগেই এর তাফসীর রচনার ইতিহাস সূচিত হয়। প্রাচীন তাফসীরগুলোর মধ্যে "আল্-জামিউ'ল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন" কিতাবখানি তাফসীরে তাবারী শরীফ নামে মশহুর হয়েছে। মূল কিতাবখানি ত্রিশ খন্ডে সমাপ্ত। আরবী ভাষায় রচিত এই পবিত্র গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশনার জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। দেশের বিখ্যাত আলিম ও মুফাসসির মাসিক আল-বালাগ সম্পাদক হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম সাহেবকে সভাপতি করে দেশের কয়েকজন আলিম ও বিদ্বজ্জন নিয়ে একটি সম্পাদনা পরিষদ গঠন করা হয়। এ পরিষদের তত্ত্বাবধানে বিশিষ্ট আলিমদের দ্বারা গ্রন্থখানি তরজমা করানো হচ্ছে এবং পরিষদ তা সম্পাদনা করে যাচ্ছেন। আমরা উক্ত সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত বর্তমান খন্ডখানি কম্পিউটার প্রক্রিয়ায় অফসেট মুদ্রণে প্রকাশ করতে পারায় খুবই আনন্দিত। আমরা আশা করি একে একে সব খন্ডগুলোর বাংলা তরজমা বাংলা ভাষাভাষী মানুষের সামনে তুলে ধরতে পারবো ইনশাআল্লাহ্। আমি এর অনুবাদকবৃন্দ, সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের-এর অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দসহ এর প্রকাশনায় সামান্যতম অবদানও যাঁদের আছে, তাঁদের সকলকে মুবারকবাদ জানাই।

তাফসীরে তাবারী শরীফ আল্লামা আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.)-এর এক বিশেষ অবদান। কুরআন মজীদের ব্যাখ্যা জানা এবং উপলব্ধি করার জন্য এই কিতাবখানি অন্যতম প্রধান মৌলিক সূত্ররূপে বিবেচিত হয়ে আসছে। বাংলা ভাষায় কুরআন মজীদ চর্চায় এবং ইসলামী জীবন দর্শনের বিভিন্ন শাখায় গবেষণা কর্মে এই তাফসীর মূল্যবান অবদান রাখবে। আমরা এই অতি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় কিতাবখানির আরো একটি খন্ড প্রকাশ করতে পারায় আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের মহান দরবারে শোকরিয়া জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে কুরআনী যিন্দেগী নির্বাহের তাওফীক দিন। আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন।

১৬ই মুহররম, ১৪১৩ হিজরী
৩রা শ্রাবণ, ১৩৯৯ বাংলা

মোঃ মনসুরুল হক খান
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ্।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অশেষ রহমতে তাফসীরে তাবারী শরীফের বাংলা তরজমার তৃতীয় খন্ড প্রকাশিত হল।

কুরআন মজীদ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের কালাম। ওহীর মাধ্যমে এই কালাম আল্লাহ্র রাসূল প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট ক্রমান্বয়ে নাযিল হয়। ওহী বাহক ফিরিশতা ছিলেন হযরত জিবরাঈল আলাহিস্ সালাম। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ এ সেই কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই। মুত্তাকীদের জন্য এ কিতাব সৎপথের দিশারী। কুরআন মজীদের সূরা জাছিয়ার বিশ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ এ কুরআন মানব জাতির জন্য সুস্পষ্ট দলীল এবং দৃঢ় বিশ্বাসী কওমের জন্য হিদায়াত ও রহমত।

কুরআন মজীদের ভাষা আরবী, যে কারণে এর অর্থ, মর্ম ও ব্যাখ্যা জানার জন্য যুগে যুগে নানা ভাষায় কুরআন মজীদের অনুবাদ হয়েছে, এর ভাষ্যও রচিত হয়েছে। ভাষ্য রচনার ক্ষেত্রে যে সমস্ত তাফসীর গ্রন্থকে মৌলিক, প্রামাণ্য ও প্রাচীন হিসাবে গণ্য করা হয় তাফসীরে তাবারী শরীফ সেগুলোর মধ্যে অন্যতম প্রধান মৌলিক সূত্রগ্রন্থ। এ তাফসীরখানার রচয়িতা আল্লামা আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর তাবারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি (জন্মঃ ৮৩৯ খৃষ্টাব্দ/২২৫ হিজরী, মৃত্যুঃ ৯২৩ খৃষ্টাব্দ/৩১০ হিজরী)। কুরআন মজীদের ভাষ্য রচনা করতে গিয়ে প্রয়োজনীয় যত তথ্য ও তত্ত্ব পেয়েছেন তা তিনি এতে সন্নিবেশিত করেছেন। ফলে এই তাফসীরখানা হয়ে উঠেছে প্রামাণ্য মৌলিক তাফসীর, যা পরবর্তী মুফাসসিরগণের নিকট তাফসীর প্রণয়নের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য সহায়ক গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে। এই তাফসীরখানা তাফসীরে তাবারী শরীফ নামে সমধিক পরিচিত হলেও এর আসল নাম ঃ আল্-জামিউল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন।

পাশ্চাত্য দুনিয়ার পন্ডিত মহলে ঐতিহাসিক এবং সমালোচনামূলক গবেষণার জন্য এই তাফসীরখানা বিশেষভাবে সমাদৃত। আমরা প্রায় সাড়ে এগারো শ' বছরের প্রাচীন এই জগদ্বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থখানির বাংলা তরজমা প্রকাশ করতে পারায় আল্লাহ্ তা'আলার মহান দরবারে জ্ঞাপন করছি অগণিত শোকর।

আমরা ক্রমান্বয়ে তাফসীরে তাবারী শরীফের প্রত্যেকটি খন্ডের তরজমা প্রকাশ করবো ইনশাআল্লাহ্। বর্তমান খন্ডখানির বাংলা তরজমায় অংশ গ্রহণ করেছেন, মাওলানা খোরশেদ উদ্দীন, মাওলানা শাহ্ আলম আল মারূফ, মাওলানা ইসহাক ফরিদী ও মাওলানা গিয়াস উদ্দীন। আমরা তাঁদেরকে মুবারকবাদ জানাচ্ছি। সেই সংগে এই খন্ডখানি প্রকাশে যাঁরা আমাদের বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সবাইকে মুবারকবাদ জানাচ্ছি। আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করছি নির্ভুলভাবে এই পবিত্র গ্রন্থখানা প্রকাশ করতে, তবুও এতে যদি কোনরূপ ভুল–ভ্রান্তি কোনো পাঠকের নজরে পড়ে, তাহলে মেহেরবানী করে তা আমাদের জানালে আমরা ইনশাআল্লাহ্ পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে দেবো।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সবাইকে কুরআন মজীদের শিক্ষা গ্রহণ করার এবং সে অনুযায়ী আমল করার তাওফীক দিন। আমীন। ইয়া রাববাল আলামীন।

মুহাম্মদ মুফাজ্জল হুসাইন খান
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সম্পাদনা পরিষদ

১. মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম	সভাপতি
২. ডঃ এ,বি,এম, হাবীবুর রহমান চৌধুরী	সদস্য
৩. মাওলানা মুহাম্মদ ফরীদুদ্দীন আত্তার	,,
৪. মাওলানা মুহাম্মদ তমীযুদ্দীন	,,
৫. মাওলানা মোহাম্মদ শামসুল হক	,,
৬. মুহাম্মদ মুফাজ্জল হুসাইন খান	সদস্য সচিব

সূরা বাকারা

(অবশিষ্ট অংশ)

سَيَقُوْلُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلّٰهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِىْ كَانُــوْا عَلَيْهَا قُـلْ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ -

অর্থ ঃ নির্বোধ লোকেরা বলবে যে, তারা এ যাবৎ যে কিবলা অনুসরণ করে আসছিল তা হতে কিসে তাদেরকে ফিরিয়ে দিল? হে রাসূল বলুন, পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ্রই। তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন। (সূরা বাকারা ঃ ১৪২)

ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ سيقول السفهاء (নির্বোধ লোকেরা বলবে) অদূর ভবিষ্যতে ইয়াহুদী ও মুনাফিকরা বলবে–আর তাদেরকে আল্লাহ্ পাক السفهاء (নির্বোধ) বলে আখ্যা দিয়েছেন, কারণ তারা সত্যকে ভুলে গিয়েছে। অতএব ইয়াহূদীদের ধর্মযাজকরা নির্বুদ্ধিতায় নিমগ্ন হল, আর তাদের নির্বুদ্ধিতা চরমে গিয়ে পৌঁছল এবং তাদের মধ্য হতে একদল মূর্খলোক হযরত মুহাম্মদ (সা.)–এর অনুসরণ থেকে বিমুখ হল। তারা ছিল আরবীয়, বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ভুক্ত নয়। সুতরাং মুনাফিকরা অস্থির হয়ে গেল এবং নির্বুদ্ধিতার কাজ শুরু করল। অতএব আমরা السفهاء শব্দের ব্যাখ্যায় যা বললাম অর্থাৎ–তারা হল ইয়াহূদী সম্প্রদায়ের লোক এবং মুনাফিকের দল। তাফসীরকারগণ বলেন যে, যাঁরা السفهاء শব্দের ব্যাখ্যায় ইয়াহূদী সম্প্রদায়কে চিহ্নিত করেছেন, তাঁদের স্বপক্ষে নিম্নের হাদীস উল্লেখ করা হল :

মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি মহান আল্লাহ্র কালাম– سَيَقُوْلُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَ لّٰهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمْ – এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা হল ইয়াহূদী যখন বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে কিবলা পরিবর্তন করা হল। মুজাহিদ (র.) থেকে অন্য সূত্র আরেকটি বর্ণনা রয়েছে।

বারা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি سَيَقُوْلُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ সম্পর্কে বলেন যে, سفهاء হল ইয়াহুদী সম্প্রদায়।

বারা (রা.) থেকে অন্য সূত্রে বর্ণিত যে, سفهاء (নির্বোধেরা) হল আহলে কিতাব। অর্থাৎ ইয়াহুদী ও নাসারা (খ্রীস্ট) সম্প্রদায় ।

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, سفهاء বলতে ইয়াহুদী সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে।

কেউ কেউ বলেন, السفهاء – المنافقون নির্বোধেরা হল মুনাফিকের দল। যাঁরা এ কথা বলেন, তাঁদের স্বপক্ষে নিম্নের হাদীস উল্লেখ করা হল ঃ

সূদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, سَيَقُوْلُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ আয়াতখানি অবতীর্ণ হয়েছে মুনাফিকদের সম্পর্কে।

মহান আল্লাহ্র বাণী– مَا وَلاَّ هُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِىْ كَانُوْا عَلَيْهَا এর অর্থ তারা যে কিবলার অনুসারী ছিল। তা থেকে কোন্ জিনিস তাদেরকে ফিরিয়ে দিল? তা যেন কোন ব্যক্তির এমন বক্তব্য যে, وَلاَّنِىْ فَلاَنٌ دُبُرَهُ অমুক ব্যক্তি আমাকে তার পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল। অর্থাৎ যখন তার দিক থেকে মুখ ফিরাল এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল–তাকেই وَلاَّ বলে। সুতরাং এমনিভাবে আল্লাহ্ পাকের কালাম مَا وَ لاَّهُمْ–এর অর্থ, কোন্ বস্তু তাদের মুখমণ্ডল (প্রথম কিবলা থেকে) ফিরিয়ে দিল? অতএব, আল্লাহ্ পাকের কালাম– عَنْ قِبْلَتِهِمْ–এর মধ্যে قبله কিবলার অর্থ হল فإن قبلة كل شئ ما قابل وجهه "প্রত্যেক বস্তর কিবলা হল যা এর সামনের দিলে অবস্থিত থাকে।" قبلة শব্দটি فعلة এর ওযনে جلسة এবং قعدة শব্দেটি পরিমাপে শব্দমূল, এ যেন কোন ব্যক্তির এমন বক্তব্য যে, قابلت فلانا اذا صرت قبالته اقابله অর্থাৎ আমি অমুক ব্যক্তির সম্মুখ হলাম, যখন আমি তার মুখোমুখী হলাম তখন সে আমার জন্য قبلة কিবলা হল। আর আমি তার কিবলা। যখন তাদের উভয়ই একে অন্যের মুকাবিলা হয় তখন সেটাই তাদের قبلة কিবলা। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন–আল্লাহ্র কালামের উল্লিখিত ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে এখন এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, হে মু'মিনগণ! মানুষের মধ্যে যারা নির্বোধ তারা অচিরেই তোমাদেরকে বলবে যে, যখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডলকে ইয়াহুদীদের কিবলা থেকে প্রত্যাবর্তিত করলে যা তোমাদের জন্য আল্লাহ্র এই নির্দেশের পূর্বে কিবলা ছিল, এখন তোমরা মাসজিদুল হারামের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছ। অর্থাৎ কোন্ বস্তু তাদের মুখমণ্ডলকে ঐদিক থেকে প্রত্যাবর্তিত করল? যে দিককে তারা ইতিপূর্বে নামাযের মধ্যে কিবলা হিসেবে গ্রহণ করেছিল?

অতএব আল্লাহ্ তা'আলা নবী (সা.) ও তাঁর সাহাবিগণকে জানিয়ে দিলেন যে, শাম (সিরিয়া) থেকে মাসজিদুল হারামের (বায়তুল্লাহ্‌র) দিকে কিবলা প্রত্যাবর্তনের সময় ইয়াহুদী ও মুনাফিকরা কিরূপ কথোপকথন করেছিল, এবং এও জানিয়ে দিলেন যে, তাদের বক্তব্যের প্রতি উত্তরে কিরূপ উত্তর দেয়া উচিত। আল্লাহ্ তা'আলা নবী (সা.)–কে জানিয়ে দিলেন যে, হে মুহাম্মদ (সা.) ! যখন তারা আপনাকে ঐরূপ কথাবার্তা বলে তখন আপনি তাদেরকে বলুন,

لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاۤءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ –

"পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ্‌রই জন্য, তিনি যাকে ইচ্ছা করেন–সরল পথে পরিচালিত করেন।" এই কথার কারণ হল যে, নবী করীম (সা.) বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে কিছুদিন নামায পড়েছিলেন, এর নির্দিষ্ট সময় সীমার কথা অচিরেই আমরা ইন্‌শা আল্লাহ্ বর্ণনা করবো। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীর ঐ কিবলাকে মাসজিদুল হারামের (বায়তুল্লাহ্‌র) দিকে প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা করলেন। অতএব নবী করীম (সা.) ও তাঁর সাহাবিগণ ঐদিকে মুখ করলেন। কিবলা পরিবর্তনের সময় ইয়াহুদীরা কিরূপে কথোপকথন করেছিল আল্লাহ্ তা'আলা, তাঁর নবীকে তা জানিয়ে দিলেন। আর এও জানিয়ে দিলেন যে, তাদের কথোপকথনের প্রতি উত্তর কিরূপ হওয়া উচিত।

ذكر مدة التى صلاها رسول الله صلعم و اصحابه نحو بيت المقدس ، و ما كان سبب صلاته نحوه ، و ما الذى دعا اليهود و المنافقين الى قيل ما قالوا عند تحويل الله القبلة المؤمنين عن بيت المقدس الى الكعبة –

হযরত নবী করীম (সা.) এবং তাঁর সাহাবিগণ বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে কতদিন নামায পড়েছিলেন এবং ঐ দিকে মুখ করে তাঁর নামায পড়ার কারণ কি ছিল ? ইয়াহুদী ও মুনাফিকরা ম'মিনগণকে বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে কা'বার দিকে কিবলা পরিবর্তনের সময় কোন্ কথার প্রতি আহবান করেছিল? এর বর্ণনা–।

হিজরতের পর নবী করীম (সা.) বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে কতদিন নামায পড়েছিলেন এ সম্পর্কে জ্ঞানীগণ একাধিক অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলেনঃ

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, যখন শামের (সিরিয়ার) দিক হতে কা'বার দিকে কিবলা (قبلة) প্রত্যাবর্তন করা হল–তখন ছিল রজব মাস। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর মদীনায় আগমনের সতের মাসের শেষের দিকে কিবলা প্রত্যাবর্তিত হল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর নিকট রিফাআ ইবনে কাইস, কারদাম ইবনে আমর, কা'আব ইবনে আশরাফ, নাফি' ইবনে আবূ নাফি' বর্ণনাকারী আবূ কুরায়ব রাফি' ইবনে আবূ রাফি', হাজ্জায ইবনে আমর (যিনি কা'আব ইবনে আশরাফের বন্ধু ছিলেন) রবী' ইবনে রবী' ইবনে আবুল হুকায়ক, কেনানা ইবনে রবী' ইবনে আবুল হুকায়ক, তারা সকলেই নবী করীম (সা.)–এর নিকট এসে বলল–হে মুহাম্মাদ (সা.)! কোন্ বস্তু আপনাকে আপনার কিবলা থেকে প্রত্যাবর্তন করাল–যার উপর আপনি ইতিপূর্বে ছিলেন ? অথচ আপনি মনে করেন যে, আপনি

হযরত ইবরাহীম (আ.)–এর আদর্শ ও ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন ? আপনি আপনার পূর্ববর্তী কিবলার দিকে প্রত্যাবর্তন করুন তা'হলে আমরা আপনার অনুসরণ করবো এবং আপনাকে সত্য নবী বলে বিশ্বাস করবো। বস্তুত তারা নবী করীম (সা.)–কে তাঁর ধর্ম থেকে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছিল। অতএব আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্পর্কে এই আয়াত নাযিল করেন যে,–

سَيَقُوْلُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَاوَلّٰهُمْ عَـنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِيْ كَانُوْا عَلَيْهَا এই আয়াত থেকে **اِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ** – **يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ** এর শেষ পর্যন্ত অবতীর্ণ হয়। বারা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (সা.) বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে সতের মাস নামায পড়েছেন। আর তিনি আশাপোষণ করতেন–যেন কা'বার দিকে কিবলা প্রত্যাবর্তিত হয়। বর্ণনাকারী বলেন, ইত্যবসরে আমরা নামায পড়তে ছিলাম তখন আমাদের নিকট দিয়ে এক ব্যক্তি অতিক্রম করতে ছিলেন, তিনি বললেন সাবধান ! আপনারা কি অবগত আছেন যে, নবী (সা.)–এর কিবলা (বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে) কা'বার দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে ? বর্ণনাকারী বলেন যে, আমরা তখন সে দিকে ফিরে দু'রাকাআত এবং এদিকে (কা'বার দিকে) ফিরে দু'রাকাআত নামায পড়লাম। আবূ কুরায়ব বললেন, তাঁকে যেন কেউ বলল–এর মধ্যে কি আবূ ইসহাক ছিলেন ? তখন তিনি চুপ রইলেন।

বারা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন আমরা নবী করীম (সা.)–এর মদীনা আগমনের পর বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে সতের মাস নামায পড়েছি।

বারা ইবনে আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন যে, আমি নবী করীম (সা.)–এর সংগে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ষোল মাস, কিংবা সতের মাস নামায পড়েছি। বর্ণনাকারী সুফিয়ান (রা.) সন্দেহসূচক বর্ণনা করেছেন যে, ষোল মাস কিংবা সতের মাস। এরপর অমরা কা'বার দিকে ফিরে গেলাম।

বারা (রা.) থেকে অন্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সর্ব প্রথম মদীনায় আগমন করে তাঁর আনসারগণের মধ্যে নানা কিংবা মামাদের নিকট অবস্থান করেন। ইত্যবসরে তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ষোল মাস নামায পড়েন। বায়তুল্লাহ্র দিকে কিবলা পরিবর্তিত হওয়া তাঁর পসন্দনীয় ছিল। একবার তিনি আসরের নামায পড়লেন এবং তাঁর সঙ্গে অনেক মুসল্লী ছিল। এরপর তাঁর সঙ্গে নামায পড়েছেন এমন এক মুসল্লী বের হয়ে গেলেন। তিনি এক মসজিদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় তিনি দেখতে পেলেন যে, মুসল্লিগণ রুকূরত অবস্থায় আছে। তখন তিনি বললেন–আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর সঙ্গে মক্কার (বায়তুল্লাহ্র) দিকে ফিরে নামায পড়ে এসেছি। অতএব, তাঁরা যে দিক ফিরে নামায পড়তে ছিলেন–সে দিক থেকে বায়তুল্লাহ্র দিকে ঘুরে গেলেন। বায়তুল্লাহ্র দিকে কিবলা প্রত্যাবর্তিত হওয়া নবী করীম (সা.)–এর পসন্দনীয় ছিল। আর ইয়াহূদী এবং আহ্লে কিতাবদের নিকট বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নামায পড়ুক–তা অধিক পসন্দনীয় ছিল। সুতরাং তিনি যখন বায়তুল্লাহ্র দিকে

ফিরালেন, তখন তারা তাকে অস্বীকার করে বসল।

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মদীনা আগমনের পর বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে ষোল মাস নামায পড়েছেন। তারপর তিনি বদর যুদ্ধের দু' মাস পূর্বে কা'বার দিকে মুখ করে নামায পড়েন।

অন্যান্য মুফাস্‌সীরগণ আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, নবী করীম (সা.) বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে নয় মাস কিংবা দশ মাস নামায পড়েছেন। ইত্যবসরে তিনি জুহরের নামাযে দণ্ডায়মান ছিলেন মদীনাতে। তিনি সবে মাত্র দু'রাকাআত নামায পড়েছেন বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে, তারপর তিনি মুখ ফিরলেন কা'বার দিকে। এতে (سفهاء) নির্বোধেরা বলতে লাগল–مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوْا عَلَيْهَا "কিসে তাদেরকে তাদের সে কিবলা থেকে ফিরিয়ে দিল–যার দিকে তারা (ইতিপূর্বে) ছিল ?"

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, মা'আয ইবনে জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মদীনায় আগমন করে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে তের মাস নামায পড়েছেন।

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আনসারগণ নবী করীম (সা.)–এর মদীনা আগমনের পূর্বে প্রথম কিবলার দিকে তিনটি হজ্জের মওসুম পর্যন্ত নামায পড়েছেন। আর নবী করীম (সা.) মদীনায় আগমনের পর প্রথম কিবলার দিকে ফিরে ষোল মাস নামায পড়েছেন। অথবা অনুরূপ তিনি যা বলেছেন। উভয় হাদীসই কাতাদা (র.) সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

রাসূল (সা.) উপরে কা'বার দিকে কিবলা ফরয হওয়ার পূর্বে কি কারণে তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায পড়েছিলেন–এর বর্ণনা ঃ

তাফসীর বিশেষজ্ঞগণ এ ব্যাপারে একাধিক মত পোষণ করেছেন। কেউ কেউ বলেন যে, এরূপ করা নবী করীম (সা.)–এর ইচ্ছানুযায়ী ছিল। যাঁরা এ মত পোষণ করেন–তাঁদের স্বপক্ষে নিম্নের হাদীস উল্লেখযোগ্য।

ইকরামা ও হাসান বসরী (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তাঁরা বলেন যে, কুরআন মজীদের সর্ব প্রথম মান্‌সূখ (বাতিলকৃত) বিষয় হল কিবলা সম্পর্কে। ঘটনার বিবরণ হল–নবী করীম (সা.) বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করতেন। আর তা ছিল ইয়াহুদীদেরও কিবলা। নবী করীম (সা.) বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে সতের মাস নামায পড়েন, যাতে তারা তাঁর প্রতি ঈমান আনে এবং তাঁর আনুগত্য প্রকাশ করে। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ – اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ –

"পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ্‌রই জন্য অতএব, তোমরা যে দিকেই মুখ ফিরাও সেদিকেই আল্লাহ্ রয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ প্রশস্ত জ্ঞানের অধিকারী।"

রাবী (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ পাকের বাণী : سَيَقُوْلُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلّٰهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِىْ كَانُوْا عَلَيْهَا – সম্পর্কে তিনি বলেন তাঁরা এর অর্থ নিয়েছেন বায়তুল মুকাদ্দাস।

বর্ণনাকারী রাবী (র.) বলেন যে, আবুল আলীয়া বলেছেন, নবী করীম (সা.)–কে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছিল–তিনি যে দিকেই ইচ্ছা করেন সে দিকেই মুখ করে নামায আদায় করতে পারেন। সুতরাং তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসাকেই কিবলারূপে গ্রহণ করলেন–যেন আহলে কিতাব (ইয়াহুদী ও নাসারাগণ) তাঁর বন্ধু হয়ে যায়। অতএব, ঐদিকে ষোল মাস পর্যন্ত তাঁর কিবলা ছিল। ইত্যবসরে তিনি প্রায়ই আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখতেন। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা বায়তুল হারাম (কা'বা)–এর দিকে তাঁর কিবলা ফিরিয়ে দিলেন।

অন্যান্য মুফাস্সীরগণ বলেন যে, বরং নবী করীম (সা.) এবং তাঁর সাহাবাদের এ কাজ আল্লাহ্ পাক ফরয করে দেয়ার কারণেই হয়েছিল, যা তাদের সম্পর্কে বর্ণনা করা হল। যাঁরা এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন ঃ

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন যে, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মদীনায় হিজরত করেন তখন এর অধিবাসী ছিল ইয়াহুদী সম্প্রদায়। ইত্যবসরে আল্লাহ্ তা'আলা বায়তুল মুকাদ্দাসকে কিবলা হিসেবে গ্রহণ করার নির্দেশ দিলেন। সুতরাং ইয়াহুদিগণ এতে আনন্দিত হল। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এগারো থেকে উনিশ পর্যন্ত বেজোড় সংখ্যার কয়েক মাস পর্যন্ত বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে কিবলার উপর স্থির থাকেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত ইবরাহীম (আ.)–এর কিবলাকে পসন্দ করতেন এবং প্রায়ই আকাশের দিকে তাকিয়ে দু'আ করতেন। অতএব, আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاءِ – الاية নাযিল করেন। ("নিশ্চয়ই আমি আপনাকে (প্রায়ই) আকাশের দিকে চেয়ে থাকতে দেখি") এতে ইয়াহুদীরা মুসলমানদের বিরোধিতা করতে লাগল, এবং বলল– مَا وَلّٰهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِىْ كَانُوْا عَلَيْهَا ("কোন্ বস্তু তাদেরকে তাদের সেই কিবলা থেকে প্রত্যাবর্তিত করল, যার দিকে তারা ছিল ?") এরপর আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন– قُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ 'আপনি বলুন পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ্রই জন্য।')

ইবনে জুরায়জ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সর্ব প্রথম রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কা'বার দিকে মুখ করে নামায পড়েন। তারপর বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে প্রত্যাবর্তন করেন। আনসারগণ নবী করীম (সা.)–এর তথায় আগমনের পূর্বে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে তিনটি হজ্জের মওসুম পর্যন্ত নামায পড়েন এবং তাঁর মদীনায় আগমনের পর ষোল মাস নামায পড়েন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা কা'বার দিকে তাঁর কিব্লা পরিবর্তন করেন।

مَا وَلّٰهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِىْ كَانُوْا عَلَيْهَا – আয়াতাংশের ব্যাখ্যা ঃ তাফসীরকারগণ এ আয়তাংশের

ব্যাখ্যায় একাদিক মত পোষণ করেন। ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এ সম্পর্কে দু'টি বর্ণনা রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হল : ইবনে হুমায়দ (রা.) সূত্রে ইব্‌নে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, ইয়াহুদীদের এক দল লোক নবী করীম (সা.)–কে এ সব কথাগুলো বলেছিল। তারা নবী করীম (সা.)–কে বলল আপনি যে কিবলার দিকে ছিলেন–সে দিকে প্রত্যাবর্তন করুন, তা হলে আমরা আপনার অনুগামী হব এবং আপনাকে সত্য নবী বলে বিশ্বাস করবো। প্রকৃতপক্ষে তারা নবী (সা.)–কে তাঁর দীন থেকে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছিল। আর দ্বিতীয় ব্যক্তব্যটি হল–আলী ইবনে আবূ তালহা (রা.) থেকে যে হাদীসটি আমি উল্লেখ করেছি, যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আল্লাহ্ পাকের কালাম– سَيَقُوْلُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَاوَلّٰهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِىْ كَانُوْا عَلَيْهَا – এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে বলেন যে, আনসারগণ নবী করীম (সা.)–এর মদীনায় আগমনের পূর্বে দু'বছর বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায পড়েছিলেন। আর নবী করীম (সা.) মদীনায় মুহাজির হিসেবে আগমনের পর বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে ষোল মাস নামায পড়েন। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিবলা সম্মানিত ঘর বায়তুল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তিত করেন। সুতরাং কিছু সংখ্যক লোক বলল– مَا وَلّٰهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِىْ كَانُوْا عَلَيْهَا "কিসে তদেরকে তাদের সে কিবলা থেকে প্রত্যাবর্তিত করল–যার দিকে তারা ছিল?" এ ব্যক্তি (মুহাম্মদ (সা.)) একান্তভাবে কামনা করেন যে, তাঁর জন্মভূমির দিকে কিবলা প্রত্যাবর্তিত হোক ! সুতরাং মহান আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

قُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ – "হে রাসূল আপনি বলুন, পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ্‌রই জন্য,তিনি যাকে ইচ্ছা করেন সরল পথে পরিচালিত করেন।" কেউ বলেন যে, এ কথার বক্তা (قائل) হল মুনাফিক সম্প্রদায়। তারা এ সব কথা শুধু ইসলামের প্রতি বিদ্রূপ করে বলেছে। যাঁরা এ অভিমত ব্যক্ত করেছে–তাঁদের স্বপক্ষে নিম্নের হাদীস উল্লেখযোগ্য।

সূদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে, যখন নবী করীম (সা.) মাসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরালেন তখন কিছু সংখ্যক লোক এতে মতভেদ শুরু করল। আর তারা কয়েক দলে বিভক্ত ছিল। মুনাফিকের দল বলল–তাদের কি হলো যে, দীর্ঘ দিন এক কিবলার দিকে অবস্থান করার পর একে পরিত্যাগ করল এবং অন্যদিকে প্রত্যাবর্তিত হল ? অতএব আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। – سَيَقُوْلُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ ..... الاية كلها

আল্লাহ্ পাকের কালাম–قُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ "হে রাসূল আপনি বলুন, পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ্‌রই জন্য, তিনি যাকে ইচ্ছা করেন সরল পথের দিকে হিদায়েত করেন।" এর ব্যাখ্যায় আল্লাহ্ পাক এ সম্পর্কে বলেন যে, হে মুহাম্মদ (সা.) ! আপনি ঐ সমস্ত

লোকদের প্রতি উত্তরে বলুন, যারা আপনাকে এবং আপনার সঙ্গীদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছে যে, "কিসে তোমাদেরকে তোমাদের কিবলা বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে মাসজিদুল হারামের দিকে প্রত্যাবর্তিত করল–যে দিকে মুখ করে তোমরা নামায পড়তে ছিলে"? আল্লাহ্রই জন্য পূর্ব ও পশ্চিমের রাজত্ব। অর্থাৎ পূর্ব দিগন্ত ও পশ্চিম দিগন্ত এবং এর মধ্যবর্তী সমগ্র জগতের কর্তৃত্ব তাঁরই। তিনি তাঁরই সৃষ্টি জীবের মধ্যে থেকে যাকে ইচ্ছা করেন–সরল পথ প্রদর্শন করেন এবং এর উপর সুদৃঢ় রাখেন। সহজ ও সরল পথে চলার সামর্থ দেন। এটিই হল সিরাতে মুস্তাকীম বা সরল পথ। অর্থাৎ তা হল হযরত ইবরাহীম (আ.)–এর কিবলা। যাঁকে সমগ্র মানব জাতির ইমাম বা নেতা করা হয়েছে। আর তাদের মধ্য হতে যাকে তিনি ইচ্ছা করেন–অপমানিত করেন এবং সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত করেন। আল্লাহ্ পাকের কালাম– يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ اِلىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٌ "তিনি যাকে ইচ্ছা করেন সরল পথ প্রদর্শন করেন" এর মর্মহল–হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনি বলুন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে হযরত ইবরাহীম (আ.)–এর কিবলা–মাসজিদুল হারামের দিকে প্রত্যাবর্তিত করে সঠিক পথ দেখিয়েছেন। আর হে ইয়াহুদী, মুনাফিক ও মুশরিকের দল ! তোমাদেরকে তিনি পথ ভ্রষ্ট করেছেন। যে বিষয় দিয়ে তিনি আমাদেরকে সরল পথ দেখিয়েছেন–তা থেকেই তিনি তোমাদেরকে অপমানিত করেছেন।

وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِىْ كُنْتَ عَلَيْهَا اِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلىٰ عَقِبَيْهِ وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلاَّ عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَنَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَّحِيْمٌ –

অর্থঃ "আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী জাতিরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছি। যাতে তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ এবং রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হবেন। (হে রাসূল) ইতিপূর্বে আপনি যে কিবলার অনুসারী ছিলেন, আমি তাকে শুধু এ জন্যই কিবলা করেছিলাম যেন একথা পরীক্ষা করে (প্রকাশ্যে) জেনে নেই কে আমার রাসূলের অনুসরণ করে। আর কে পশ্চাদপসরণ করে। আর নিশ্চয় তা অত্যন্ত কঠিন কাজ। আর আল্লাহ্ পাক এরূপ নন যে তোমাদের বিশ্বাস বিনষ্ট করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক মানুষের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল অত্যন্ত দয়াময়।" (সূরা বাকারা ঃ ১৪৩)

অর্থাৎ–মহান আল্লাহ্র কালাম– كَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا এর অর্থ হলো হে মু'মিনগণ যেভাবে আমি তোমাদেরকে হিদায়েত করেছি হযরত মুহাম্মদ (সা.) দ্বারা এবং সে কিতাব দ্বারা যা তিনি আল্লাহ্র তরফ থেকে নিয়ে এসেছেন। আর তোমাদেরকে আমি ইবরাহীম (আ.)–এর কিবলা

অনুসরণের তাওফীক দিয়েছি। আর অন্যান্য জাতির উপর তোমাদেরকে মর্যাদা দান করেছি। ঠিক সেভাবে তোমাদেরকে আরও একটি বৈশিষ্ট্য দান করেছি এবং তোমাদেরকে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের উপর বিশেষ মর্যাদা দান করেছি। আর তা হলো তোমাদেরকে উত্তম উম্মত হিসেবে মনোনীত করেছি। أُمَّةً

বলা হয় মানবমন্ডলীর একটি বিশেষ অংশকে তাদের মধ্য থেকে এবং অন্যান্যদের মধ্য থেকে এক শ্রেণী-। وسط আরবীয় ভাষায় এর অর্থ উত্তম। যেমন বলা হয়-فلان وسط الحسب فى قومه অর্থাৎ সে তার স্বজাতির মধ্যে উত্তম এবং সম্মানিত وَسَطَ এবং وَسطٌ প্রায় সমার্থক। যেমন বলা হয়-شاة يابسة اللبن এবং يبسة اللبن উভয় পাঠ পদ্ধতিই প্রচলিত। আরও যেমন আল্লাহ্‌র কালামে- يبسط শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, যথা فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيْقًا فِى الْبَحْرِ يَبَسًا (সূরা তাহা : ৭৭) "তারপর তাদের জন্য সমুদ্র মধ্যে শুষ্ক পথ সন্ধান করা। কবি যুহাইর ইবনে আবি সুলামী وَسَطٌ শব্দটি তাঁর যে কবিতায় ব্যবহার করেছেন, তা নিম্নরূপ ঃ

هُمْ وَسَطٌ يَرْضَى الْأَنَامُ بِحُكْمِهِمْ + إِذَا نَزَلَتْ إِحْدَى اللَّيَالِىْ بِمُعْظَمِ -

কবিতাংশটি কবি যুহাইর রচিত মুয়াল্লাকা পুস্তক থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে, কবিতার পংতিটির প্রথমাংশে কবি তাঁর প্রশংসিত বংশের লোকদের সম্পর্কে বলতেছেন যে, "তারা উত্তম লোক, সৃষ্টিকূল তাঁদের শাসনে সন্তুষ্ট।" এখানে وَسَطَ শব্দটি 'উত্তম' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

মুফাস্‌সীর (র.) বলেন, আমি মনে করি উল্লিখিত আয়াতে وَسَط শব্দটির অর্থ হলো কোন বস্তুর দু'পাশের মধ্যবর্তী অংশ। যেমন-وَسَطُ الدَّارِ গৃহের মধ্যাংশ। وسط শব্দটির س এর মধ্যে হরকত হতে হবে। কিন্তু س কে ساكن করে পড়া অবৈধ। আমি মনে করি যে, আল্লাহ্ তা'আলা এখানে যে وسط শব্দটি উল্লেখ করেছেন, এর দ্বারা তাঁদেরকে গুণান্বিত করা হয়েছে। কেননা যেহেতু তারা ধর্মীয় কাজ কর্মে মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী, সেহেতু তাঁরা উত্তম সম্প্রদায়। সুতরাং তাঁরা ধর্মীয় কাজ কর্মে খ্রীস্টানদের ধর্মযাজকতায় বাড়াবাড়ির ন্যায় মাত্রাতিরিক্ত কাজ করেন না। যেমন হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে তারা যা বলেছে। আর তাঁরা (উম্মতে মুহাম্মদী) কোন কাজে সীমাতিরিক্ত কাট - ছাঁট (تقصير) ও করেন না। যেমন ইয়াহুদিগণ মহান আল্লাহ্‌র কিতাব পরিবর্তন করে খাট (تقصير) করেছে এবং তাদের নবীগণকে হত্যা করেছে, তাদের প্রতিপালকের উপর মিথ্যারোপ করেছে এবং তাঁকে অস্বীকার করেছে। কিন্তু উম্মতে মুহাম্মদী মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী উত্তম সম্প্রদায়। অতএব, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে এই (وسط) গুণে গুণান্বিত করেছেন। কেননা, আল্লাহ্‌র নিকট মধ্যপন্থার কাজই

সর্বোত্তম কাজ। وسط এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, وسط অর্থ العدل ন্যায় বিচার এবং এর অর্থ اَلْخِيَارُ উত্তমও হয়। কেননা মানুষের ন্যায় বিচারই তাদের জন্য কল্যাণকর। যে ব্যক্তি الوسط এর অর্থ العدلন্যায় বিচার বলেছেন, তাঁর স্বপক্ষে নিম্নের হাদীস উল্লেখযোগ্য।

সালেম ইবনে জানাদা ও ইয়াকূব ইবনে ইবরাহীম (রা.)–এর সূত্রে আবূ সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি নবী করীম (সা.) থেকে আল্লাহ্‌র বাণী– وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ اُمَّتً وَّسَطًا "এবং এরূপে আমি তোমাদেরকে উত্তম সম্প্রদায় করেছি") সম্পর্কে বলেন যে, وسطا অর্থ عدولا (ন্যায় বিচারকবৃন্দ) অথবা (ন্যায় বিচার)। হযরত মুজাহিদ (র.)–এর সূত্রে নবী করীম (সা.) থেকে উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্‌র কালাম– وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا ("এবং এইরূপে আমি তোমাদেরকে উত্তম সম্প্রদায় করেছি") সম্পর্কে বলেন যে, وسطا অর্থ عدولا (ন্যায় বিচারকবৃন্দ)।

হযরত আবূ হুরায়রা(রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম (সা.) থেকে মহান আল্লাহ্‌র কালাম جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا (তোমাদের আমি উত্তম সম্প্রদায় করেছি) সম্পর্কে বর্ণনা করে বলেন– وسطا এর অর্থ عدولاً (ন্যায় বিচারকবৃন্দ)।

হযরত সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি মহান আল্লাহ্‌র কালাম وَ كَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا ("এবং এইরূপে আমি তোমাদেরকে উত্তম সম্প্রদায় করেছি") সম্পর্কে বলেন যে, وسطا অর্থ عدولاً (ন্যায় বিচারকবৃন্দ)।

মুহাম্মদ ইবনে আমর সূত্রে হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি মহান আল্লাহ্‌র কালাম ঃ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا (" এবং এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে উত্তম সম্প্রদায় করেছি") সম্পর্কে বলেন যে, وسطا অর্থ عدولاً ন্যায় বিচারকবৃন্দ)।

মুসান্না (র.)–এর সূত্রে মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি মহান আল্লাহ্‌র কালাম امة وسطا সম্পর্কে বলেন এর অর্থ عدولاً (ন্যায় বিচারবৃন্দ)।

অন্য সূত্রে কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্‌র কালাম– امة وسط সম্পর্কে বলেন যে,

وسطا এর অর্থ عدولاً (ন্যায় বিচারকবৃন্দ)।

হযরত রবী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আল্লাহ্‌র বাণী- امة وسطا এর অর্থ عدولا (ন্যায় বিচারকবৃন্দ)।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا এর অর্থ তোমাদেরকে ন্যায় বিচারক সম্প্রদায় করা হয়েছে।

হিসবান ইবনে আবূ জাবালা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) পর্যন্ত সনদ (সূত্র) সহকারে বর্ণনা করে বলেন- وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا এর মধ্যে الوسط অর্থ العدل ন্যায়বিচার।

হযরত আতা (র.), মুজাহিদ (র.) ও আবদুল্লাহ্‌ ইবনে কাসীর (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা সকলেই امة وسطا এর অর্থ عدولا (ন্যায় বিচারকবৃন্দ) বলেছেন।

ইবনে যায়িদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি মহান আল্লাহ্‌র কালাম- وَ كَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا সম্পর্কে বলেন যে, তাঁরা (উম্মতে মুহাম্মদী) নবী করীম (সা.) এবং অন্যান্য নবীর উম্মতের মধ্যে মধ্যপন্থায় আছেন।

لِتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا-

"যেন তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষী হও এবং রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হন" এর মধ্যে شُهَدَاءَ শব্দটি شَهِيْدٌ শব্দের বহুবচন। এর অর্থ হল এমনভাবে আমি তোমাদেরকে আমার প্রেরিত নবী রাসূলগণের জন্যে তাঁদের উম্মতগণের নিকট প্রচার-কার্য সম্পাদনের সাক্ষী হিসেবে ন্যায় বিচারক ও উত্তম দলরূপে সৃষ্টি করেছি। নিশ্চয়ই আমি আমার নির্দেশাবলী আমার রাসূলগণের নিকট পৌঁছে দিয়েছি-তাঁদের সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে পৌঁছে দেবার জন্যে। আমার প্রেরিত রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি তোমাদের ঈমানের ব্যাপারে এবং আমার নিকট থেকে তোমাদের কাছে তিনি যে প্রত্যাদেশ (কিতাব) নিয়ে এসেছেন-তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের বিষয়ে তিনি (কিয়ামত দিবসে) তোমাদের সাক্ষী হবেন।

আবূ সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) ইরশাদ করেছেন, কিয়ামত দিবসে হযরত নূহ্‌ (আ.)-কে ডাকা হবে এবং তাঁকে বলা হবে-আপনি কি আপনার নিকট প্রেরিত প্রত্যাদেশসমূহ সঠিকভাবে প্রচার করেছেন? তখন তিনি বলবেন-হাঁ। তারপর তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদেরকে বলা হবে-তিনি (নূহ্‌ (আ.)) কি তোমাদের নিকট (আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশসমূহ) যথাযথভাবে প্রচার করেছেন ? তখন তারা বলবে-আমাদের নিকট কোন (نذير) ভয় প্রদর্শনকারী আগমন করেননি। তারপর হযরত নূহ্‌ (আ.)-কে বলা হবে-আপনার প্রচার কার্য সম্পর্কে কে অবগত আছেন ? তখন তিনি বলবেন, "মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর উম্মতগণ"। আর এ কথাই হলো

আয়াতের মর্মার্থ–وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدً–

অন্য সূত্রে হযরত আবূ সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম (সা.) থেকে (উল্লেখিত হাদীসের) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি তাঁর বর্ণিত হাদীসে– فيدعون و يشهدون انه قد بلغ এটুকু আতরিক্ত বর্ণনা করেছে। এর অর্থ–"এরপর তাদেরকে ডাকা হবে এবং তারা সাক্ষ্য দিবে যে, নিশ্চয়ই তিনি (আল্লাহ্‌র বাণী) প্রচার করেছেন।"

আরেক সূত্রে আবূ সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত, মহান আল্লাহ্‌র বাণী–وَ كَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا এ কথার উপর যে, রাসূলগণ নিশ্চয়ই (স্বীয় উম্মতের কাছে) পৌঁছে দিয়েছেন। وَ يَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا (এবং রাসূল তোমাদের উপর সাক্ষী হবেন) অর্থাৎ তোমাদের কার্যাবলীর সম্পর্কে।

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন, আমি এবং আমার উম্মত কিয়ামত দিবসে একটি উঁচু স্থানে অবস্থান করবো–সকল সৃষ্টি জীবের উপর সম্মানিত অবস্থায়। তখন সম্প্রদায় মাত্রই এ আকাঙক্ষা করবে যে, হায় যদি আমরা উম্মতে মুহাম্মদীর অন্তর্ভুক্ত হতাম। আর যে নবীকেই তাঁর সম্প্রদায় মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে কিয়ামতের দিন আমরাই তাঁর এই মর্মে সাক্ষী হবো যে, انه قد بلغ رسالات ربه و نصح لهم

"নিশ্চয়ই রাসূল তাঁর প্রতিপালকের বাণী পৌঁছেছেন, এবং তাঁদেরকে উপদেশ দিয়েছেন। এরপর নবী (সা.) পাঠ করলেন–وَ يَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি হযরত নবী করীম (সা.)–এর সঙ্গে কোন এক জানাযার নামাযের উদ্দেশ্যে গমন করলাম। যখন মৃত ব্যক্তির জানাযা আদায় করা হল তখন মানুষের বলাবলি করল نعم الرجل লোকটি কতই না উত্তম ! তখন নবী করীম (সা.) বললেন–(و جبت) সে বেহেশতের অধিকারী হয়ে গেছে। এরপর তাঁর সঙ্গে অন্য আর একটি জানাযার নামাযের উদ্দেশ্যে বের হলাম। যখন জনগণ মৃত ব্যক্তির জানাযার নামায আদায় করল–তখন মানুষেরা বলল–(بئس الرجل) লোকটি কতই না মন্দ ছিল। হযরত নবী করীম (সা.) বললেন–وجبت। এরপর হযরত উবায় ইবনে কা'আব (রা.) হযরতের সামনে আসলেন এবং রাসূল (সা.)–এর সমীপে আরয করলেন, আল্লাহ্‌র রসূল ! আপনার 'وجبت' শব্দের তাৎপর্য কি ? তিনি জবাবে বললেন–মহান আল্লাহ্‌র বাণী– لِتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ অর্থাৎ "যেন তোমরা মানুষের জন্য সাক্ষী হও"।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এক জানাযার নিকট আগমন করেন, তখন মানুষেরা বলল–نعم الرجل লোকটি কতই না ভাল ছিল!

এরপর ইসাম (রা.) তাঁর পিতা থেকে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন–অনুরূপ তিনি বর্ণনা করেন।

সালামা ইবনুল আকওয়া থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–আমরা একবার হযরত নবী করীম (সা.)–এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি একটি জানাযার কাছে গমন করেন, এমতাবস্থায় তার উপর সুন্দর প্রশংসা করা হল। তখন তিনি বললেন– وجبت (অত্যাবশ্যকীয় হয়ে গেছে) এরপর তিনি অন্য আর একটি জানাযায় গমন করেন। তার সম্বন্ধে পূর্বের জনের বিপরীত বলা হল। তখন তিনি বললেন–وجبت (অত্যাবশ্যকীয় হয়ে গেছে')। জনগণ বলল হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) ! ما وجبت কি অত্যাবশ্যকীয় হল। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র ফিরিশতাগণ আকাশে সাক্ষী। আর তোমরা হলে পৃথিবীতে–সাক্ষী। অতএব, তোমরা যার উপর যেমন সাক্ষ্য দিবে তদ্রূপই وجبت অত্যাবশ্যকীয় হবে। এরপর তিনি কুরআনের আয়াত– وَ قُلْ اعْـــمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ ...الاية তিলাওয়াত করেন। "আপনি বলুন, তোমরা কাজ করে যাও, অচিরেই আল্লাহ্ তোমাদের কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করবেন এবং তাঁর রাসূল ও মু'মিনগণও"।......... শেষ আয়াত পর্যন্ত তিলাওয়াত করেন।

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত যে, لِتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ "যেন তোমরা মানবমন্ডলীর উপর সাক্ষী হও"। তিনি এর অর্থ করেছেন–তোমরা মুহাম্মদ (সা.)–এর জন্যে–ইয়াহুদী, খ্রীস্টান, (নাসারা) এবং অগ্নি–উপাসক সম্প্রদায়ের উপর সাক্ষী হবে।

মুসান্না (রা.) সূত্রে মুজাহিদ (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

ইবনে আবূ নাজীহ্ (র.) থেকে বর্ণিত হযরত নবী করীম (সা.) মহান আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে কিয়ামত দিবসে একাকী অবস্থায় উপস্থিত হবেন। তখন তাঁর উম্মতগণ সাক্ষ্য দিবে যে, তিনি মহান আল্লাহ্‌র দীন সঠিকভাবে প্রচার করেছেন।

উবাইদ ইবনে উমায়র থেকে বর্ণিত, তিনি (উল্লিখিত হাদীসের) অনুরূপ শ্রবণ করেছেন।

ইবনে আবূ নাজীহ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত নবী করীম (সা.) কিয়ামত দিবসে উপস্থিত হবেন, এরপর উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন, কিন্তু উবাইদ ইবনে উমায়র অনুরূপ বর্ণনা করেছেন–একথা (তাঁর হাদীসে) উল্লেখ করেননি।

হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এই আয়াত– لِتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ সম্পর্কে বলেন–এই উম্মতে মুহাম্মদী মানব মণ্ডলীর উপর সাক্ষী হবে যে, রাসূলগণ তাঁদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিকট প্রত্যাদেশসমূহ প্রচার করেছেন। وَ يَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا এবং রাসূল ও তোমাদের উপর সাক্ষী হবেন যে, নিশ্চয়ই তিনি তাঁর প্রভুর নিকট হতে প্রাপ্ত প্রত্যাদেশসমূহ স্বীয় উম্মতের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।

যায়েদ ইবনে আসলাম (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত নূহ্ (আ.)–এর সম্প্রদায়ের

লোকেরা কিয়ামত দিবসে বলবে যে, আমাদের কাছে হযরত নূহ্ (আ.) আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী প্রচার করেননি। তখন হযরত নূহ্ (আ.)-কে ডাকা হবে এবং প্রশ্ন করা হবে যে, هَلْ بَلَّغْتَهُمْ ؟ আপনি কি তাদের নিকট (আমার নির্দেশাবলী) প্রচার করেছিলেন ? তিনি উত্তরে বলবেন, হাঁ তাঁকে (নূহ্ (আ.)-কে) তখন বলা হবে এ ব্যাপারে আপনার সাক্ষীকে ? তখন তিনি বলবেন-মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর উম্মতগণ। এরপর তাদেরকে ডাকা হবে এবং এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে। তখন তাঁরা (উম্মতে মুহাম্মদিগণ) বলবেন-হাঁ, নিশ্চয়ই তিনি (আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী) তাদের কাছে প্রচার করেছেন। এরপর হযরত নূহ্ (আ.)-এর উম্মতগণ বলবে, "তোমরা কিভাবে আমাদের উপর সাক্ষ্য দিলে ? তোমরা তো আমাদের সময়ে উপস্থিত ছিলে না ? তখন তাঁরা বলবেন-নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ্‌র নবী (মুহাম্মদ (সা.) প্রেরিত হয়ে আমাদেরকে খবর দিয়েছেন যে, তিনি (নূহ্ (আ.)) অবশ্যই (আল্লাহ্‌র বাণী) তোমাদের কাছে প্রচার করেছেন এবং তাঁর নিকট এ কথার (ওহী) প্রত্যাদেশ এসেছে যে, তিনি (নূহ্ (আ.)) আল্লাহ্‌র বাণী তোমাদের নিকট প্রচার করেছেন। সুতরাং আমরা তা বিশ্বাস করেছি। তিনি বলেন, তখন হযরত নূহ্ (আ.) সত্যবাদী বলে প্রমাণিত হবেন এবং তাদেরকে (নূহ্ (আ.))-এর উম্মতগণকে) মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হবে। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে। আল্লাহ্‌র বাণী-

لِتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا -

হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত তিনি মহান আল্লাহ্‌র কালাম- لِتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ সম্পর্কে বলেন-যেন এই উম্মত (উম্মতে মুহাম্মদী) মানবমন্ডলীর উপর সাক্ষী হয় যে, নিশ্চয়ই রাসূলগণ অবশ্যই তাঁদের উপর অর্পিত (নির্দেশাবলী) প্রত্যাদেশসমূহ স্বীয় উম্মতগণের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। আর রাসূল (সা.)-ও এই উম্মতের উপর সাক্ষ্য দিবেন যে, তাঁর উপর অর্পিত প্রত্যাদেশসমূহ তিনি স্বীয় উম্মতের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন।

যায়েদ ইবনে আসলাম (রা.) থেকে বর্ণিত সমস্ত নবী (আ.)-এর উম্মতগণ কিয়ামত দিবসে বলবেন, "আল্লাহ্‌র শপথ ! নিশ্চয়ই এই উম্মত (উম্মতে মুহাম্মদী) প্রত্যেকেই নবী হওয়ার যোগ্যতা রাখে" (একথা তখনই বলবে) যখন তাদেরকে প্রদত্ত আল্লাহ্‌র নিয়ামতসমূহ তারা প্রত্যক্ষ করবে।

হাববান ইবনে আবূ জাবালা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) পর্যন্ত মরফূ সনদ (সূত্রে)-সহ বর্ণনা করেন যে, যখন আল্লাহ্ পাক তাঁর বান্দাদেরকে কিয়ামত দিবসে সমবেত করবেন, তখন সর্ব প্রথম ইসরাফীল (আ.)-কে ডাকা হবে। এরপর তাঁর প্রতিপালক তাঁকে বলবেন-আমার সঙ্গে আনুগত্যের অঙ্গীকার সম্পর্কে তুমি কি করেছ ? তুমি কি আমার অঙ্গীকারের কথা যথাযথভাবে পৌঁছে দিয়েছ ? তখন তিনি বলবেন-হাঁ, হে আমার প্রতিপালক ! নিশ্চয়ই আমি তা হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর কাছে পৌঁছে দিয়েছি। এরপর জিবরাঈল (আ.)-কে ডাকা হবে এবং তাঁকে বলা হবে-তোমার কাছে কি ইসরাফীল আমার সঙ্গে কৃত অঙ্গীকারের বাণী যথাযথভাবে পৌঁছে দিয়েছে ? তখন তিনি উত্তরে বলবেন, হাঁ, হে আমার প্রতিপালক ! আর আমিও তা

রাসূলগণের নিকট অবশ্যই পৌঁছে দিয়েছি। তখন ইসরাফীল (আ.)-কে কর্তব্য সম্পাদনের দায়িত্ব থেকে অব্যহতি দেয়া হবে। এরপর রাসূলগণকে আহ্বান করা হবে এবং তাঁদেরকে বলা হবে- তোমাদের কাছে কি জিবরাঈল (আ.) আমার আনুগত্যের অঙ্গীকারের কথা যথাযথভাবে পৌঁছে দিয়েছে ? তখন তাঁরা বলবেন-হ্যাঁ, হে আমাদের প্রতিপালক ! এরপর জিবরাঈল (আ.)-কে কর্তব্য সম্পাদনের দায়িত্ব থেকে অব্যহতি দেয়া হবে। এরপর রাসূলগণকে বলা হবে-তোমরা আমার সঙ্গে আনুগত্যের অঙ্গীকার সম্পর্কে কি করেছ ? তখন তাঁরা বলবেন-আমরা সে দায়িত্ব ভার আমাদের উম্মতের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। তখন সমস্ত (নবীর) উম্মতকে ডাকা হবে এবং তাদেরকে বলা হবে- তোমাদের কাছে কি আমার রাসূলগণ আমার সঙ্গে কৃত অঙ্গীকারের কথা পৌঁছে দিয়েছে ? তখন তাদের মধ্য হতে কিছু সংখ্যক লোক রাসূলগণকে মিথ্যাপ্রতিপন্নকারী এবং কিছু সংখ্যক সত্যায়নকারী হবে। তখন রাসূলগণ বলবেন-নিশ্চয়ই আমাদের পক্ষে তাদের উপর এমন সাক্ষীবৃন্দ রয়েছেন-যাঁরা সাক্ষ্য দিবেন যে, অবশ্যই আমরা তাদের কাছে আমাদের (রিসালাতের) দায়িত্ব পালন করেছি। এমন সময় আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করবেন, এ ব্যাপারে তোমাদের পক্ষে কে সাক্ষ্য দিবে ? তখন তাঁরা বলবেন, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মত। তখন মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মতকে ডাকা হবে। তিনি বলবেন তোমরা কি সাক্ষ্য দিবে যে, আমার এই সমস্ত রাসূল আমার (দাসত্বের) অঙ্গীকারের বাণী তাদের উম্মতের কাছে যথাযথভাবে পৌঁছে দিয়েছেন ? তখন তাঁরা বলবেন-হ্যাঁ, হে আমাদের প্রতিপালক ! আমরা সাক্ষী যে, নিশ্চয়ই তাঁরা (প্রত্যাদেশসমূহ) তাঁদের উম্মতের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। এমতাবস্তায় ঐ সমস্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা বলবে-তাঁরা কিভাবে আমাদের উপর সাক্ষ্য দিবেন-যারা আমাদের সময়ে উপস্থিত ছিলেন না ? তখন তাঁদেরকে তাঁদের মহান প্রতিপালক প্রশ্ন করবেন-তোমরা কিভাবে ঐ সমস্ত লোকদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দাও ? যাদের সময়ে তোমরা উপস্থিত ছিলে না। জবাবে তারা বলবেন, হে আমাদের প্রতিপালক ! আপনি আমাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করেছিলেন এবং আমাদের নিকট আপনার অঙ্গীকার ও কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। আর তাদের ইতিহাসও বর্ণনা করেছিলেন যে, নিশ্চয় রাসূলগণ তাঁদের উপর অর্পিত রিসালাতের দায়িত্ব পালন করেছেন। অতএব, আমাদের নিকট আপনি যা অঙ্গীকার করেছেন-সে অনুসারে আমরা সাক্ষ্য দিলাম। তখন মহান প্রতিপালক ইরশাদ করবেন, তারা ঠিকই বলেছে আর এই অর্থেই মহান আল্লাহর বাণী- وَ كَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا এ আয়াতে الوسط শব্দের অর্থ হল العدل ন্যায় বিচার। (সার কথা হল)- لِتَكُوْنُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا "যেন তোমরা মানবমন্ডলীর উপর সাক্ষী হও এবং রাসূল ও তোমাদের উপর সাক্ষী হন''।

ইবনে আনউম (রা.) বলেন আমার নিকট খবর পৌঁছেছে যে, يشهد يومئذ امة محمد صلعم إلا من كان فى قلبه حنة على اخيه সেদিন সকল উম্মতে মুহাম্মদীই সাক্ষী দিবে, কিন্তু যার অন্তরে আপন ভ্রাতার প্রতি হিংসা আছে-সে ব্যতীত।

হযরত দাহ্হাক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি মহান আল্লাহ্র কালাম- لِتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ সম্পর্কে বলেন যে, তাঁরাই (সেদিন) সাক্ষ্য দিবেন-যাঁরা সত্য পথের উপর প্রতিষ্ঠিত। অতএব তাঁরাই (উম্মতে মুহাম্মদী) কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্র রাসূলগণকে তাঁদের উম্মত কর্তৃক মিথ্যা প্রতিপন্ন করার এবং মহান আল্লাহ্র নিদর্শন (اية) সমূহ অস্বীকার করার ব্যাপারে মানবমন্ডীর উপর সাক্ষী হবেন।

হযরত রাবী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি মহান আল্লাহ্র কালাম لِتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ সম্পর্কে বলেন যে, এর মর্ম হল-যেন তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের জন্যে সাক্ষী হও, ঐ ব্যাপারে যে বিষয় নিয়ে তাদের রাসূলগণ আগমন করেছেন এবং যে বিষয় তাদেরকে তারা অস্বীকার করেছে। কিয়ামত দিবসে তারা (পূর্ববর্তী উম্মত) আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলবে-এ উম্মত (উম্মতে মুহাম্মদী) আমাদের যামানায় ছিল না- অথচ আমাদের রাসূল যে বিষয় নিয়ে আগমন করেছেন, এর প্রতি তাঁরা বিশ্বাস স্থাপন করেছে। আর আমরা আমাদের রাসূল যে বিষয়ে নিয়ে আগমন করেছেন- তাকে অস্বীকার করেছি। অতএব, তারা গভীরভাবে আশ্চর্যান্বিত হবে ! আল্লাহ্র বাণী وَ يَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا "এবং রাসূল তোমাদর উপর সাক্ষী হবেন" অর্থাৎ-তারা যে রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে এবং তাঁর উপর অবতীর্ণ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে, সেজন্য রাসূল সাক্ষী হবেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি মহান আল্লাহ্র কালাম- لِتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ সম্পর্কে বলেন যে, তাঁরা (উম্মতে মুহাম্মদী) পূর্ববর্তী যামানার লোকদের উপর সাক্ষী হবে, যে বিষয়ের সাথে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের নাম করণ করেছেন।

হযরত ইবনে জুরায়জ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-আমি আতা-(রা.)-কে বললাম, মহান আল্লাহ্র কালাম- لِتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ এর অর্থ কি ? তিনি উত্তরে বললেন যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মাত- আমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের লোকদের উপর সাক্ষী হবেন-যাদের কাছে তাদের নবীগণ-ঈমান ও হিদায়াতের বাণী নিয়ে আসার পর তারা সত্যকে পরিত্যাগ করেছে। এ কথাই বলেছেন ইবনে কাছীর। বর্ণনাকারী বলেন যে, আতা (রা.) বলেছেন, সমস্ত মানবমন্ডলীর মধ্যে যে ব্যক্তি সত্যকে পরিত্যাগ করেছে,-তার উপরই তাঁরা সাক্ষী হবেন। এজন্যই উম্মতে মুহাম্মাদী সম্পর্কে তাঁদের কিতাবে বর্ণিত হয়েছে- وَ يَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا অর্থাৎ রাসূলগণ এই কথার উপর সাক্ষী হবেন যে, তাদের কাছে যখন সত্য এসেছে, তখন তারা তা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করেছে এবং তারা তা সত্য বলে স্বীকারও করেছে।

ইবনে যায়েদ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি আল্লাহ্ পাকের কালাম- لِتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُوْنَ

الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا সম্পর্কে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন, তিনি তাঁর উম্মতের উপর সাক্ষী হবেন। আর তাঁর উম্মাত অন্যান্য নবীর উম্মতের উপর সাক্ষী হবেন। তাঁরা ঐ সমস্ত সাক্ষিগণের একজন হবেন–যে সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক বলেছেন, وَ يَوْمَ يَقُوْمُ الاَّ شْهَادُ ("ঐদিন সাক্ষিগণ দন্ডায়মান হবে।") অর্থাৎ সেদিন চার প্রকার সাক্ষী হবে । তন্মধ্যে ঐসমস্ত ফিরিশতাগণ হবেন, যাঁরা আমাদের ভাল মন্দ কাজের হিসাব সংরক্ষণ করেছেন। এরপর তিনি আল্লাহ্র কালাম– وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَ شَهِيْدٌ পাঠ করে বলেন তা কিয়ামাত দিবসের কথা। কিয়ামত দিবসে "প্রত্যেকে একজন পরিচালক ও সাক্ষীসহ উপস্থিত হবে"। তিনি বলেন, নবীগণ তাঁদের উম্মতের উপর সাক্ষী হবেন। আর হযরত মুহাম্মদ (সা.)–এর উম্মত অন্যান্য নবীগণের উম্মতের উপর সাক্ষী হবেন। তাফসীরকার বলেন– الاطوار– শব্দের অর্থ الاجْسَاد و الجلـــود অর্থাৎ অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ এবং চামড়াসমূহ।)

وَ مَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَا اِ لاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ –

"আপনি এ যাবৎ যে কিবলা অনুসরণ করতেছিলেন তাকে আমি এ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম, যাতে জানতে পারি কে রাসূলের অনুসরণ করে আরকে ফিরে যায় ?" অর্থাৎ মহান আল্লাহ্র কালাম– وَ مَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَا এর ব্যাখ্যা হে মুহাম্মাদ (সা.) ! আপনি যে কিবলার দিকে মুখ করে নামায পড়তেন, তা থেকে আমি আপনাকে প্রত্যাবর্তিত করলাম–শুধু এই জন্যে যে, যেন আমি অবগত হতে পারি কোন্ ব্যক্তি আপনার অনুসরণ করে এবং কে আপনার অনুসরণ থেকে বিমুখ হয়। আর কে তার পদদ্বয়ে পশ্চাদবর্তিত হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যে কিবলার দিকে ছিলেন, তাকে আল্লাহ্ তাঁর এই বাণীর– وَ مَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَا দ্বারা প্রত্যবর্তন করলেন। তা হলে সেই কিবলা যেদিকে মুখ করে নামায পড়তেন, কা'বার দিকে কিবলা পত্যাবর্তন হওয়ার পুর্বে।

সূদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি আল্লাহ্ পাকের কালাম–وَ مَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَا এর ব্যাখ্যায় বলেন যে এর দ্বারা বায়তুল মুকাদ্দাসকে বুঝানো হয়েছে।

ইবনে জুরায়জ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে, আমি আতা (র.)–কে জিজ্ঞেস করলাম– আল্লাহ্র কালাম–وَ مَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَا এর ব্যাখ্যা প্রসংগে। তিনি বললেন, অত্র আয়াতাংশে বর্ণিত কিবলা হল বায়তুল মুকাদ্দাস। উলিখিত বাক্যের অর্থের উপর নির্ভর করে–কিবলা পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করা হয়নি। যেমন অন্যান্য বিষয় যা আমরা এর অতীত দৃষ্টান্ত থেকে উল্লেখ করেছি। অবশ্য উহা আমি এর অর্থের পরিপ্রেক্ষিতেই বলেছি। কেননা কিবলার ব্যাপারে রাসূলের সঙ্গীদেরকে আল্লাহ্র পরীক্ষা করাই উদ্দেশ্য ছিল, যা, বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে বায়তুল্লাহ্র দিকে কিবলা

প্রত্যাবর্তনের সময় প্রকাশিত হয়েছে। এমন কি কিবলাকে কেন্দ্র করে অনেক লোক–যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর অনুসরণ করেছিলে, ধর্মান্তরিত হল। অনেক কপট বিশ্বাসীরাও ইহার কারণে কপটতা প্রকাশ করেছে। তারা বলল, মুহাম্মদ (সা.)–এর কি হল যে, একবার এদিকে, আর একবার ওদিকে কিবলা প্রত্যাবর্তন করে ? আর মুসলমানগণও তাদের ঐ সমস্ত ভাইদের সম্পর্কে বলতে লাগল–যারা বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায পড়ে অতীত হয়েছেন, (ইন্তিকাল করেছেন) এতে তাদের এবং আমাদের আমল (কার্যসমূহ) বিনষ্ঠ হয়ে গিয়াছে। আর মুশরিকরা বলল, মুহাম্মদ (সা.) তাঁর ধর্মের ব্যাপারে অস্থির হয়ে গেছেন। সুতরাং ঐ সমস্ত কথাবার্তা সাধারণ মানুষের জন্য ছিল বিভ্রান্তিকর এবং মু'মিন বিশ্বাসিগণের জন্য ছিল ইস্পাত কঠিন এক পরীক্ষা। অতএব এই জন্যেই মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন –

وَ مَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِى كُنْتَ عَلَيْهَا اِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ –

অর্থাৎ আপনি যে কিবলার দিকে ছিলেন তা থেকে বিমুখ করা এবং আপনাকে অন্য দিকে প্রত্যাবর্তিত করার উদ্দেশ্য এ–ই ছিল। যেমন মহান আল্লাহ্ বলেছেন–

وَ مَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَ الَّتِىْ اَرَيْنَاكَ اِلاَّ فِتْنَةً لِّلنَّاسِ – "যে স্বপ্ন আমি আপনাকে দেখিয়েছি–তা শুধু মানুষকে পরীক্ষার জন্যেই"। (সূরা–ইসরাঃ ৬০) অর্থাৎ– যে স্বপ্ন আমি আপনাকে দেখিয়েছি এর খবর যদি আমি আপনার সম্প্রদায়ের লোকদেরকে না দিতাম, তাহলে কেউ পরীক্ষার সম্মুখীন হতো না। এমনিভাবে প্রথম কিবলা–যা বায়তুল মুকাদ্দাসে দিকে ছিল,–যদি তা' থেকে কা'বার দিকে প্রত্যাবর্তিত না হতো–তাহলে এতে কেউ বিভ্রান্ত হতো না এবং পরীক্ষারও সম্মুখীন হতো না।

উল্লিখিত যে ব্যাখ্যা আমি বললাম–সে সম্পর্কে যে সমস্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে–তা নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, কিবলা পরিবর্তনের মধ্যে বিপদ ও পরীক্ষা উভয়ই ছিল। নবী করীম (সা.) মদীনায় আগমনের পূর্বে আনসারগণ দু'বছর বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায পড়েন। নবী করীম (সা.) মদীনায় মুহাজির হিসেবে আগমনের পর বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে সতের মাস নামায পড়েন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা কা'বার সম্মানিত ঘরের দিকে কিবলা প্রত্যাবর্তন করেন। মানবমন্ডলীর কিছু সংখ্যক লোক এতে বলল– مَا وَلاَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِىْ كَانُوْا عَلَيْهَا ("কিসে তাদেরকে তাদের ঐ কিবলা থেকে প্রত্যাবর্তিত করল–যে দিকে তারা ছিল?") নিশ্চয়ই এই লোক (মুহাম্মদ (সা.)) তাঁর জন্মভূমির দিকে কিবলা প্রত্যাবর্তনের প্রত্যাশী। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন – قُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ("আপনি বলুন, পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ্রই জন্যে তিনি যাকে ইচ্ছা করেন–তাকে সরল পথের দিকে পথ প্রদর্শন করেন"।) যখন সম্মানিত ঘর কা'বার দিকে কিবলা প্রত্যাবর্তিত হল। তখন কিছু সংখ্যক লোক বলল– আমাদের ঐ সমস্ত আমলের কি অবস্থা হবে–যা আমরা আমাদের প্রথম কিবলার দিকে সম্পাদন

করেছি? তখন মহান আল্লাহ্ এই আয়াত- وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ নাযিল করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের যাকে ইচ্ছা করেন, এক নির্দেশের পর অন্য নির্দেশ দিয়ে পরীক্ষা করেন-কে তাঁর নির্দেশের অনুগত হয় এবং কে তাঁর নির্দেশ অমান্য করেন ? সর্ব আমলই গৃহীত হবে-যদি তা ঈমানের সাথে হয় ও তাঁর প্রতি ইখলাস থাকে এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্যে আত্মসমর্থন হয়ে থাকে।

সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত নবী করীম (সা.) বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায পড়তে ছিলেন, তারপর কা'বার দিকে কিবলা প্রত্যাবর্তিত হল। সুতরাং যখন সম্মানিত মসজিদ কা'বার দিকে কিবলা প্রত্যাবর্তিত হল-তখন এতে মানুষেরা মতভেদ শুরু করল। তারা কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। অতএব মুনাফিকরা বলল- তাদের কি হল যে, দীর্ঘ দিন যাবত তারা যে কিবলার দিকে ছিল তা থেকে তারা অন্য দিকে প্রত্যাবর্তন করল। আর মুসলমানগণ অপেক্ষা করে বলল-আমাদের ঐ সমস্ত ভাইদের কি হবে-যারা বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায পড়েছে? আমাদের এবং তাদের ইবাদাত কি আল্লাহ্‌র নিকট গৃহীত হবে, না হবে না ? ইয়াহুদীরা বলল, নিশ্চয়ই হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর পিতার শহর এবং স্বীয় জন্মভূমির দিকে কিবলা প্রত্যাবর্তনের প্রতি আগ্রহান্বিত। যদি তিনি আমাদের কিবলার উপর স্থির থাকতেন, তা' হলে নিশ্চয়ই আমরা আশা করতাম যে, তিনি হবেন আমাদের সেই নেতা, যাঁর প্রতিক্ষা আমরা করতে ছিলাম। আর মক্কার মুশরিকরা বলল, মুহাম্মদ (সা.) তাঁর ধর্মের উপর অস্থির হয়ে গেছেন, সুতারাং তিনি তোমাদের কিবলার দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছেন এবং তিনি নিশ্চিতভাবে জেনেছেন যে, তোমরাই তাঁর থেকে অধিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সম্ভবত অচিরেই তিনি তোমাদের ধর্মে প্রবেশ করবেন। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদের সম্পর্কে এই আয়াত سَيَقُوْلُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلّٰهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِىْ كَانُوْا عَلَيْهَا এখান থেকে- وَ اِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ এ আয়াত পর্যন্ত অবতরণ করেন। এর পরবর্তী অংশটুকু অন্যান্যদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়।

জুরায়জ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, আমি আতা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম-এই আয়াত اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ সম্পর্কে। তখন আতা (র.) বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা কিবলা পরিবর্তন করেছেন-শুধু তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য, যেন তিনি জানতে পারেন, কে তাঁর আদেশ বাস্তবায়িত করে ? ইবনে জুরায়জ বলেন-আমার নিকট খবর পৌঁছেছে যে, কিছু সংখ্যক লোক যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল এরপর ধর্মান্তরিত হয়ে গেছে। অতএব তারা বলাবলি করল কখনও কিবলা এদিক আবার কখনও বা ও দিকে। আমাদের কাছে যদি কেউ কোন প্রশ্ন করে আল্লাহ্ তা'আলা কি অনুসরণকারীর অনুসরণ, এবং প্রত্যাবর্তনকারীর প্রত্যাবর্তন করার পর কে রাসূলের অনুসরণ করল, আর কে পুরাপুরিভাবে পশ্চাদপসরণ করে, সে কথা জানতেন না ? এ পর্যন্ত বলল যে, কিবলা প্রত্যাবর্তনের কাজটুকু আমি কি শুধু এই জন্যে করেছি, যেন আমি রাসূলের অনুসারী এবং তাঁর থেকে পশ্চাদপসরণকারী সম্পর্কে অবগত হতে পারি ? তা' হলে প্রতি উত্তরে বলা

হবে নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ্ তা'আলা উহা সৃষ্টির পূর্ব থেকেই সমস্ত বিষয়েই অবগত আছেন, আল্লাহ্র কালাম – وَ مَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِىْ كُنْتَ عَلَيْهَا اِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعَ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ এর অর্থ এই যে, এই কাজ সংঘটিত হওয়ার পরই, তিনি তা জানতে পেরেছেন।

আর যদি কেউ বলে যে, তা'হলে ঐ কথার অর্থ কি ? তবে এর প্রতি উত্তরে বলা হবে–আমাদের নিকট এর অর্থ হল–আমি শুধু এই উদ্দেশ্যে আপনার পূর্ববর্তী কিবলা প্রত্যাবর্তন করলাম, যেন আমার রাসূল, আমার দল এবং আমার ওলীগণ অবগত হতে পারেন যে, কে রাসূলের অনুসরণ করে, আর কে পশ্চাদপসরণ করে ? আল্লাহ্র কালাম (الا لنعلم) এর অর্থ হল–যেন আমার রাসূল এবং ওলীগণ জানতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এবং ওলীগণ তাঁরই দলভুক্ত। আরবদেশের প্রথানুযায়ী দলপতির অনুসারীদের কৃতকর্মকে দলপতির দিকেই সম্পর্কযুক্ত করা হয়। আর তাদের দ্বারা যা করানো হয় তা'ও তাঁর দিকেই সম্পর্কযুক্ত হয়। যেমন তাদের প্রচলিত কথা–فَتَحَ عُمَرَبْنُ الْخَطَّبِ سَوَادُ الْعِرَاقِ ('উমার ইবনে খাত্তাব (রা.) ইরাকের নগরসমূহ জয় করেছেন'।) جبى خراجها (এবং উহার ট্যাক্স আদায় করেছেন। এই কাজ তাঁর সঙ্গীরা তাঁরই নির্দ্দেশে করেছেন বলে উহাকে তাঁর দিকেই সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে। অনুরূপভাবে এর দৃষ্টান্তরূপে নবী করীম (সা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন –মহান আল্লাহ্ (কিয়ামত দিবসে) বলবেন, "আমি রুগ্ন ছিলাম, অথচ আমার বান্দা আমার সেবা করেনি, আমি তার নিকট ঋণ চেয়েছিলাম, সে ঋণ দেয়নি। আমার বান্দা আমাকে গালি দিয়েছে, অথচ আমাকে গালি দেয়া তার উচিত হয়নি''।

আবূ কুরায়ব (র.) সূত্রে, আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন, (কিয়ামত দিবসে) আল্লাহ্ বলবেন, "আমি আমার বান্দার কাছে ঋণ চেয়েছিলাম, কিন্তু সে আমাকে ঋণ দেয়নি। সে আমাকে গালি দিয়েছে, অথচ আমাকে গালি দেয়া তার উচিত হয়নি। সে বলেছে হায় যামানা ! অথচ আমিই যামানা ! আমিই যামানা !"

ইবনে হুমায়দ (র.) সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি নবী করীম (সা.) থেকে উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। استقراض ঋণ চাওয়া' এবং 'সেবা' কে আল্লাহ্র দিকে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে, কারণ তা' আল্লাহ্র উদ্দেশ্যই হয়ে থাকে, অথচ এই সব কাজ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

আরবের একটি প্রচলিত শ্রুত কথা বর্ণিত আছে, যেমন– اجوع فى غير بطنى অর্থাৎ "আমি অন্যের পেটের কারণে ক্ষুধার্ত। و اعرى فى غير ظه –'এবং আমার পিঠ ব্যতীত অন্যের পিঠের জন্য আমি উলঙ্গ।" এর অর্থ হল–তার পরিবার–পরিজন ক্ষুধার্ত এবং তাদের পিঠ উলঙ্গ। অর্থাৎ বস্ত্রহীন। সুতরাং এমনিভাবে আল্লাহ্র কালাম– إلا لنعلم এর অর্থ–যেন আমার ওলীগণ এবং আমার

সম্প্রদায়ের লোকেরা ইহা অবগত হয়।

এ সম্পর্কে আমি যা বললাম,–এর অনুরূপ ব্যাখ্যাকারগণও বলেছেন। যাঁরা উল্লিখিত অর্থ বলেছেন– তাঁদের স্বপক্ষে নিম্নে হাদীস উল্লেখযোগ্য।

মুসান্না (রা.) সূত্রে ইবনে 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র কালাম–وَ مَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِىْ كُنْتَ عَلَيْهَا اِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ – এই আয়াত সম্পর্কে তিনি বলেন যে, এর অর্থ হল–"যেন আমরা দৃঢ় বিশ্বাসিগণকে মুশরিক এবং সন্দেহপোষণকারীদের থেকে পৃথক করে স্পষ্ট করে দেখাতে পারি–।"

তাঁদের মধ্য হতে কেউ কেউ বলেন যে, এইরূপ বলা হয়েছে আরবীদের প্রচলিত প্রথানুসারে। কেননা তাঁরা علم কে দর্শনের স্থলে ব্যবহার করেন এবং الرؤية কে علم এর স্থলে প্রয়োগ করেন। যেমন মহান আল্লাহ্‌র বাণী–اَلَمْ تَرَى كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحَابِ الْفِيْلِ "আপনি কি দেখেন নি–আপনার প্রভু হস্তী বাহিনীর সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করেছেন'' ? সুতরাং ধারণা করা হয়েছে যে, الم ترى এর অর্থ الم تعلم অতএব, ইহাও ধারণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র বাণী– الا لنعلم এর অর্থ – الا لنرى আরও ধারণা করা হয়েছে যে, যেমন কোন ব্যক্তির কথা رأيت – و علمت – و شهدت এই শব্দগুলো حروف تتعاقف (সমার্থক শব্দ)। সুতরাং একটি অন্যটির স্থলে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন জারির ইবনে আতিয়া এর একটি কবিতায় বলা হয়েছে–

كانت لم تشهد لقيطا و حاجبًا + و عمروبن عمرو اذا دعا يا لدارم –

কবিতার পঙক্তিটির প্রথমাংশে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "যেন তুমি লাকিত এবং হাজিবকে দেখনি।'' এর অর্থ–লাকিত ও হাজিবের মৃত্যুকাল এবং কবি জারিরের যামানার মধ্যে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান রয়েছে। তাদের মৃত্যু হয়েছে জাহিলিয়াতের যুগে এবং কবি জারিরের জন্ম হয়েছে ইসলামের আবির্ভাবের পরে। এই ব্যাখ্যা–সঠিক অর্থ থেকে অনেক দূরে। কেননা– رؤية কে যখন علم এর স্থলে ব্যবহার করা হয়–তা এ কারণে যে, কোন কিছু দেখা সম্ভব নয়। অতএব, তা দেখা জরুরীও নয়, যখন সে বিষয়টির সম্পর্কে এমনিভাবে অবগত হয় যেন সে তা দেখেছে। অতএব যে কারণে তার علم প্রমাণিত হয়েছে, ঠিক একই কারণে তার দেখাও প্রমাণিত হয়েছে, বৈধ হয়েছে, সেই কারণে علم কে সম্পর্ক আর এ কারণে কোন বস্তুকে জানা দেখা শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা যায়। আমরা ইতিপূর্বে যা বর্ণনা করলাম যদিও আরবী ভাষায় তার প্রচলন নেই যে, علمت শব্দকে رأيت শব্দে ব্যবহার করা হয়। তবে আল্লাহ্ পাকের কালামের ব্যাখ্যা আরবী ভাষাবিদদের ব্যবহার অনুযায়ী হওয়াই সমীচীন। যেমন رأيت শব্দটি علمت অর্থে ব্যবহার হয়, তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আর علمت

শব্দ– رأيت অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তার দৃষ্টান্ত যদিও পাওয়া যায় না, তবে এই আলোচ্য আয়াতে لا لنعلم বাক্যটি لا لنرى অর্থে ব্যবহার হওয়া অবৈধ নয়।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, মহান আল্লাহ্‌র কালামে – لا لنعلم বলা হয়েছে–মুনাফিক ইয়াহূদী এবং নাস্তিকদের জন্যে। কোন বিষয় সংঘটিত হওয়ার পূর্বে আল্লাহ্ তা জানেন, তা যারা অস্বীকার করে। যখন তাদেরকে বলা হয় প্রথম কিবলার অনুসারীদের একদল লোক অচিরেই পূর্ব মতে ফিরে এসে ধর্মান্তরিত হবে, যখন মুহাম্মদ (সা.)–এর কিবলা কা'বার দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। তখন তারা বলল–তা হতে পারে না, আর হলে ও তা অমূলক। অতএব মহান আল্লাহ্ যখন তা করলেন, এবং কিবলা পরিবর্তন করলেন, তখন যারা অস্বীকার করার তারা অস্বীকার করল। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন–আমি তা করেছি শুধু এ কথা জানার জন্যে যে, তোমাদের মধ্য থেকে–কে মুশরিক ও কাফির। যদি ও কোন বস্তু সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই সে বিষয়ে আমার জানা আছে। নিশ্চয়ই আমি অবগত আছি–যা ভবিষ্যতে সংঘটিত হবে এবং যা কোন সময় সংঘটিত হবে না। যেন আমার কথা لا لنعلم এর অর্থ لا لنبين لكم অর্থাৎ যেন আমি তোমাদের জন্য বর্ণনা করতে পারি যে, কে রাসূলের অনুসারী এবং কে পশ্চাৎ দিকে প্রত্যাবর্তনকারী, সবই আমি জানি। এছাড়া অন্য কোন ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে মূল অর্থ থেকে তা অনেক দূরে চলে যাবে।

অন্যান্য তফসীরকারগণ বলেন যে, لا لنعلم আয়াতাংশে বলা হয়েছে–তাদেরকে অবগত করানোর জন্য, যদিও তিনি ঐ বিষয়ে অবগত আছেন, তা সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই। মহান আল্লাহ্ সর্বাবস্থায় স্বীয় বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহশীল হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে তাঁর আনুগত্যের প্রতি আহবান করেছেন। যেমন আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন – قُلِ اللّٰهُ وَ اِنَّا اَوْ اِيَّاكُمْ لَعَلٰى هُدًى اَوْ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ (হে নবী !) "আপনি বলুন, আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন, আমরা না তোমরা সরল সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত, অথবা প্রকাশ্য পথ ভ্রষ্টতার মধ্যে নিপতিত !" (সূরা সাবা ঃ ২৪)

আল্লাহ্ পাক নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) সরল সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং কাফিরগণ প্রকাশ্য পথ ভ্রষ্টতার মধ্যে পতিত। কিন্তু সম্বোধনে তাদের প্রতি নমনীয়তা দেখানো হয়েছে। সুতরাং এমন বলা হয় নি যে, আমি সঠিক পথের উপর আছি, আর তোমরা আছ পথ ভ্রষ্টতার মধ্যে। এমনিভাবে তাদের নিকট মহান আল্লাহ্‌র কালাম – لا لنعلم এর অর্থ হল–"যেন তোমরা উপলব্ধি করতে পার যে, তোমরা তা সংঘটিত হওয়ার পূর্বে অজ্ঞ ছিলে।" علم (জানা)–কে নিজের দিকে সম্পর্কযুক্ত করেছেন, তাদের প্রতি সম্বোধনে উদারতা প্রদর্শন করে। এ ব্যাপারে যে কথা সর্বোত্তম ও যথার্থ তা' আমরা বর্ণনা করলাম।

মহান আল্লাহ্‌র কালাম – مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ এর অর্থ হযরত মুহাম্মদ (সা.)–কে আল্লাহ্ পাক

নির্দেশ দিয়েছেন তাতে কে তার অনুসরণ করে তা অবগত হওয়ার জন্যে। অতএব, তারা ঐ দিকে মুখ ফেরাবে যে দিকে মুহাম্মদ (সা.) মুখ করেন।

মহান আল্লাহ্র কালাম – مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ এর অর্থ কে নিজ ধর্ম থেকে ফিরে যায়, কপটতা করে, কিংবা কুফরী করে, অথবা কে ঐ বিষয়ে হযরত মুহাম্মদ (সা.)–এর বিরোধিতা করে, তা জানার জন্য, যে বিষয়ে তার অনুসরণ করা কর্তব্য ছিল।

যেমন হযরত ইবনে যায়িদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি মহান আল্লাহ্র কালাম– وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِىْ كُنْتَ عَلَيْهَا اِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ – সম্পর্কে বলেন, যখন কারো মনে সন্দেহ প্রবেশ করে, তখন সে আল্লাহ্ থেকে ফিরে যায় এবং কুফরীর দিকে ধাবিত হয়। مرتد (মুরতাদ) বলে– নিজ ধর্ম ত্যাগ করা। অর্থাৎ যে রাস্তায় সে চলতেছিল তার উল্টো দিকে প্রত্যাবর্তিত হওয়া কেউ কেউ বলেন যে, এর অর্থ– যে কোন কাজ থেকে প্রত্যাবর্তিত হওয়া, তা ধর্মীয় ব্যাপারেই হোক, কিংবা অন্য যে কোন কল্যাণমূলক কাজেই হোক। অনুরূপ অর্থেই মহান আল্লাহ্র কালাম – فَارْتَدَّا عَلَى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا অর্থাৎ তারা দু'জন যে পথে চলতেছিল–তা থেকে প্রত্যাবর্তিত হল–। (সূরা কাহাফ ঃ ৬৪)

কেউ কেউ বলেন– مرتد শব্দেকে مرتد হিসেবে ব্যবহার করার কারণ, তা নিজ ধর্ম এবং স্বজাতি থেকে প্রত্যাবর্তিত হওয়া, যে পথের উপর সে চলতেছিল আর কেউ কেউ বলেন رجع على عقبيه এর অর্থ স্বীয় পদদ্বয়ের উপর নির্ভর করে সে পশ্চাদ্বর্তিত হয়েছে। কারণ সে স্বীয় পদদ্বয়ের উপর নির্ভর করে উল্টো দিকে ফিরে গেছে। অর্থাৎ যে দিকে সে ছিল–এর উল্টো দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে। অতএব, এর দৃষ্টান্ত দেয়া যায়–প্রত্যেক নির্দেশ পরিত্যাগকারী এবং অন্যের নির্দেশ গ্রহণকারীর বেলায়ও যখন সে স্বীয় কর্ম পরিত্যাগ করে প্রত্যাবর্তিত হয়, আর যে কাজ তার জন্য বর্জনীয় ছিল, তা সে গ্রহণকারী হয়–। কেউ কেউ বলেন ارتد فلان على عقبيه এর অর্থ انقلب على عقبيه অর্থাৎ সে স্বীয় পদদ্বয়ে পশ্চাদ্বর্তিত হয়েছে।

মহান আল্লাহ্র কালাম–وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلاَّ عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ এর ব্যাখ্যাঃ– নিশ্চয় তা অত্যন্ত কঠিন কাজ, কিন্তু আল্লাহ্ পাক যাদেরকে হিদায়েত করেন (তাদের জন্য কঠিন নয়)।

আল্লাহ্ তা'আলা–كَانَتْ كَبِيْرَةً اِلاَّ عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ মুফাস্সীরগণ এব্যাপারে একাধিক মত প্রকাশ করেছেন যে, কাদের ব্যাপার আল্লাহ্ পাক এ আয়াতে উল্লেখ করেছেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন যে, بالكبيرة শব্দ দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে মাসজিদুল হারামের দিকে কিবলা পরিবর্তনের কথাই বুঝিয়েছেন।

الكبيرة শব্দটিকে **مؤنث** স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে,–**التولية** শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ **مؤنث** হওয়ার কারণে। যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আল্লাহ্ তা'আলা–**وَ اِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلاَّ عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ** এই আয়াত দ্বারা কিবলা পরিবর্তনের বিষয় বুঝিয়েছেন।

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে আল্লাহ্‌র কালাম– **وَ اِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلاَّ عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ** এর দ্বারা বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে কা'বার দিকে কিবলা পরিবর্তনের নির্দেশকেই বুঝানো হয়েছে।

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে অন্যসূত্রে **مثله** অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্‌র কালাম **لَكَبِيْرَةً اِلاَّ عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ** সম্পর্কে বলেন, যখন মাসজিদুল হারামের দিকে কিবলা পরিবর্তিত হল–তখন তা তাদের কাছে কঠিন বিষয় মনে হয়েছিল, কিন্তু আল্লাহ্ যাঁদেরকে হিদায়েত দান করেছেন, তারা ব্যতীত–।

আর অন্যান্য মুফাস্‌সীরগণ বলেন, হযরত নবী করীম (সা.) বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে কিবলা পরিবর্তনের পূর্বে যে দিকে মুখ করে নামায আদায় করতেন, সেই মূল বিষয়ই তাদের জন্য কঠোরতর বিষয় ছিল। যাঁরা এ মত পোষণ করেন, তাঁদের অভিমত ঃ

হযরত আবুল আলীয়া (রা.) থেকে বর্ণিত, **و إن كانت لكبيرة** এর অর্থ বরং কঠিন বিষয় ছিল কিবলার বিষয়টিই, অর্থাৎ বায়তুল মুকাদ্দাসের কিবলাই **اِلاَّ عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ** কিন্তু আল্লাহ্ যাদেরকে হিদায়েত দান করেছেন, তাঁরা ব্যতীত। আর কোন কোন মুফাস্‌সীর বলেন যে, প্রথম কিবলার দিকে তারা যে সব নামায আদায় করেছেন, তাই ছিল বরং তাদের জন্য কঠিন বিষয়। যারা এমত পোষণ করেছেন, তাঁদের বক্তব্য।

হযরত ইবনে যায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি **وَ اِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلاَّ عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ** এই আয়াত সম্পর্কে বলেন যে, তোমাদের নামায কঠোরতর বিষয় ছিল, যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ তা'আলা কিবলার সম্পর্কে তোমাদেরকে হিদায়েত দান করেছেন।

অন্য সূত্রে ইবনে যায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত **و ان كانت لكبيرة** তিনি এই আয়াত সম্পর্কে বলেন যে, এখানে আপনার নামায–অর্থাৎ বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ষোল মাস এবং সেখান থেকে আপনার কিবলা পরিবর্তন, তাই কঠোরতর বিষয় ছিল।

বসরার কোন কোন আরবীয় ব্যাকরণবিদ বলেন, **الكبيرة** শব্দটিকে **مؤنث** স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে **القبلة** শব্দের **مؤنث** স্ত্রীলিঙ্গ হওয়ার কারণে। বিশেষ করে মহান আল্লাহ্‌র বাণী– **و ان كانتْ لكبيرة** দ্বারা তাই বুঝানো হয়েছে। আর কূফার কোন কোন আরবীয় ব্যাকরণবিদ বলেন যে, **الكبيرة**

শব্দটিকে مؤنث স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে–التولية এবং التحويلة শব্দের مؤنث স্ত্রীলিঙ্গ হওয়ার কারণে–।

উল্লিখিত কথার পরিপ্রেক্ষিতে কালামে পাকের ব্যাখ্যা হল ঃ আপনি যে কিবলার দিকে ছিলেন, তার প্রতি আমার নির্দেশ এবং প্রত্যাবর্তন, শুধু এই জন্য যে, যেন আমি অবগত হতে পারি–কোন্ ব্যক্তি রাসূলের অনুসরণ করে এবং তা থেকে পশ্চাদ–অপসরণ করে। আমার তরফ থেকে আপনার কিবলা পরিবর্তন তাদের জন্য অত্যন্ত কঠিন ছিল, কিন্ত যাদেরকে আল্লাহ্ পাক হিদায়েত করেছেন, তাদের জন্য নয়।

উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যাসমূহের মধ্যে এই ব্যাখ্যাটিই আমার নিকট সঠিক বলে মনে হয়। কেননা, এ সম্প্রদায়ের নিকট প্রথম কিবলা থেকে দ্বিতীয় কিবলার দিকে প্রত্যবর্তন একটি অপসন্দনীয় বিষয়। প্রকৃত কিবলা বা নামায কোনটিই কঠিন অপসন্দনীয় বিষয় নয়। কেননা, প্রথম কিবলার এবং নামায যখন তারা পালন করেছিল, তখন তা তাদের নিকট অপসন্দনীয় বিষয় ছিল না। কিন্তু الكبيرة শব্দটিকে القبلة শব্দের দিকে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে, التولية এবং التحويلة শব্দদ্বয়ের উল্লিখিত অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে। যেমন আমি এ বিষয়ের দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেছি। সুতরাং তাই সঠিক ব্যাখ্যা ও সুস্পষ্ট অভিমত। الكبيرة শব্দটির অর্থ عظيمة বিরাট–।

হযরত ইবনে যায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি وَ اِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلاَّ عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ এ আয়াত সম্পর্কে বলেন যে, মুনাফিকদের অন্তঃকরণে বিষয়টি বিরাট হয়ে দেখ দেয়, যখন শয়তান মানব সন্তানের মধ্যে প্রবেশ করে। মুনাফিকরা বলল, মুসলমানদের কি হল যে, বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ষোল মাস যাবত নামায আদায় করলো, তারপর অন্যদিকে ফিরে গেলো। এ বিষয়টিই অজ্ঞ, নির্বোধ ও মুনাফিকদের অন্তরে বিরাট হয়ে দেখা দিল। তারা বলল, এ আবার কিসের ধর্ম ? আর যারা বিশ্বাসী–তাদের অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলা সত্য বিষয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিলেন। তারপর তিনি মহান আল্লাহ্র–এই কালাম পাঠ করলেন– وَ اِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلاَّ عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ অর্থাৎ তোমাদের নামাযটাই অপসন্দনীয় বিষয়, পরিশেষে তিনি তোমাদেরকে কিবলার দিকে পথ প্রদর্শন করলেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ্ পাকের কালাম– الا على الذين هدى الله এর অর্থ হল আপনি যে কিবলার দিকে ছিলেন, তা থেকে আপনাকে প্রত্যাবর্তন করাটাই তাদের জন্য কঠিন বিষয় ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা যাকে সামর্থ্য দিয়েছেন, তাকে আপনার প্রতি আনুগত্য ও বিশ্বাস স্থাপন এবং আপনাকে সত্য বলে গ্রহণ করার কারণে সরল পথ প্রদর্শন করেছেন। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা এর উল্লেখ পূর্বক আপনার নিকট এই আয়াত নাযিল করেছেন।

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি– وَ اِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلاَّ عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন যে, তা একটি কঠিন বিষয়, তবে মুত্তাকীদের জন্য কঠিন নয়। অর্থাৎ

যারা আল্লাহ্ কর্তৃক অবতীর্ণ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাসী,–তাদের জন্যে বিষয় নয়।

মহান আল্লাহ্র কালামের ব্যাখ্যা ঃ وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ "আল্লাহ্ এমন নন যে, তোমাদের ঈমান বিনষ্ট করে দেবেন''। কেউ বলেন যে, এখানে ঈমানের অর্থ করা হয়েছে الصلوٰة। নামায। উল্লিখিত কথায় যিনি অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তাঁর স্বপক্ষে নিম্নের বর্ণনা উল্লেখ করা হল–।

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর কা'বার দিকে মুখ করলেন, তখন তারা বলল, আমাদের যেসব ভাইয়েরা ইতিপূর্বে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায পড়ে ইন্তিকাল করেছেন, তাদের কি অবস্থা হবে ? তখনই আল্লাহ্ তা'আলা وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ ("আল্লাহ্ এমন নন যে, তোমাদের ঈমান বিনষ্ট করে দিবেন") এই আয়াত নাযিল করেন।

বারা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্ পাকের এই কালাম– وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ সম্পর্কে বলেন যে, এখানে ঈমান অর্থ বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে তোমাদের নামায।

বারা (রা) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

বারা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, বায়তুল্লাহ্র দিকে কিবলা প্রত্যাবর্তনের পূর্বে যে সমস্ত লোক মৃত্যুবরণ করেছেন এবং যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন, আমাদের জানা নেই, তাদের সম্পর্কে আমরা কি বলব? এরপর আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত– وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ নাযিল করেন। হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত যখন মাসজিদুল হারামের দিকে কিবলা প্রত্যাবর্তিত হল–তখন কিছু লোক বলল, আমাদের ঐ সমস্ত আমলের কি অবস্থা হবে যা আমরা পূর্বেকার কিবলার দিকে হয়ে করেছি সে সময় আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ নাযিল করেন।

হযরত সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, যখন হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মাসজিদুল হারামের দিকে মুখ করলেন, তখন মুসলমানগণ বললেন, আমাদের ঐ সমস্ত ভাইদের কি অবস্থা হবে যারা (ইতিপূর্বে) বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায আদায় করেছে। আল্লাহ্ তা'আলাকে আমাদের এবং তাঁদের ইবাদাত কবূল করবেন, না করবেন না? তখন মহান আল্লাহ্– وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ

আয়াত কারীমা নাযিল করেন। বর্ণনাকারী বলেন যে, (এ আয়াতে ঈমান অর্থ) বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে তোমাদের নামায। বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে আমল ও ইবাদত এবং বায়তুল্লাহ্র দিকের আমল ও ইবাদত। রাবী (র.) থেকে বর্ণিত, যখন মাসজিদুল হারামের দিকে কিবলা প্রত্যাবর্তন হল তখন কিছু সংখ্যক লোক বলল, আমাদের ঐ সমস্ত আমলের কি হবে–যা আমরা প্রথম কিবলার দিকে মুখ করে করেছি আল্লাহ্ তা'আলা তখন এই আয়াত وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ নাযিল করেন।

দাঊদ ইবনে আবূ আসম (রা.) থেকে বর্ণিত, যখন হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কিবলা-কাবার দিকে প্রত্যাবর্তন করা হল তখন মুসলমানগণ বললেন, আমাদের যেসমস্ত ভাই-বায়তুল্লাহ্র দিকে মুখ করে (ইতিপূর্বে)) নামায আদায় করেছেন, তাঁদের সর্বনাশ, হয়ে গেছে। তখনই وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ এই আয়াত নাযিল হয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, মহান আল্লাহ্র কালাম- وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ সম্পর্কে তিনি বলেন, মহান আল্লাহ্ এমন নন যে, তোমাদের ঐসমস্ত নামায-যা তোমারা ইতিপূর্বে প্রথম কিবলার দিকে হয়ে করছে, বিনষ্ট করে দেবেন। একথা তখনই বলা হল-যখন মু'মিনগণ ভয় করতে ছিল যে, তাদের পূর্বেকার নামায হয়ত গৃহীত হবে না।

হযরত ইবনে যায়েদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ এই আয়াতের অর্থ-আল্লাহ্ এমন নন যে, তিনি তোমাদের (ঈমান) নামায বিনষ্ট করে দেবেন।

হযরত সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ এই আয়াত সম্পর্কে বলেন যে, "আল্লাহ্ তোমাদের ঈমান বিনষ্ট করবেন না'' অর্থাৎ বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে যে নামায তোমরা আদায় করেছ, তা বিনষ্ট করবেন না। অতীত বর্ণনার উপর আমি যে সব প্রমাণাদি পেশ করলাম-এর পরিপ্রেক্ষিতে الايمان অর্থ التصديق বিশ্বাস করা।

التصديق (বিশ্বাস করা) কখনও শুধু قول (কথা), অথবা শুধু فعل (কর্ম), আবার কখনও কথা ও কর্ম উভয়ের সাথেই হয়। সুতরাং আল্লাহ্র কালাম- وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে যা' প্রকাশ পেয়েছে, তাতে বুঝা গেল যে, الايمان এর অর্থ الصلواة নামায। অতএব, মহান আল্লাহ্র নির্দেশে তাঁর রাসূল (সা.)-কে সত্য জেনে তোমারা বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে যে সব নামায আদায় করেছ, তা আল্লাহ্ পাক বিনষ্ট করবেন না। তথা তার সওয়াব বিনষ্ট হবে না। কেননা, তোমরা আমার রাসূলকে সত্য জেনে, আমার নির্দেশের অনুসরণ করে এবং আমার প্রতি আনুগত্যের কারণে করেছ। তিনি বলেন, মহান আল্লাহ্র সে ইবাদতসমূহ নষ্ট করার অর্থ হল, সাহাবায়ে-কিরামের আমলের সওয়াব না দেয়া। তথা তাঁদের আমলকে বিনষ্ট ও বাতিল করে দেয়া, যেমন কোন মানুষ তার অর্থ সম্পদ বিনষ্ট করে। আর তা এভাবেও হয়, সে অর্থের বিনিময়ে দুনিয়া ও আখিরাতে সে কিছুই পায় না। তাই আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে ইরশাদ করেছেন যে, যদি কোন ব্যক্তি কোন আমল করে থাকে, তাতে যদি আল্লাহ্ পাকের আনুগত্য প্রকাশ পায়, তবে এমন হবে না যে তাকে সওয়াব দেয়া হবে না, বরং তাকে অবশ্যই সওয়াব দেয়া হবে। যদিও সে করা আমলটি বাতিল হয়ে যায়। তবুও সওয়াব নষ্ট হবে না।

যদি কোন ব্যক্তি বলে যে, তা'হলে আল্লাহ্ তা'আলা কিভাবে–وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ ('আল্লাহ্ তাদের ঈমান বিনষ্ট করবেন না') ইরশাদ করলেন ? তদুপরি তিনি ঈমানকে জীবিত সম্বোধিত ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্ক যুক্ত করেছেন। অথচ ঐ সম্বোধিত জনগণই তাদের ঐ সমস্ত মৃত ভাইদের নামাযের সওয়াব বাতিল হওয়া সম্পর্কে ভয় করছিল, যা তারা কা'বার দিকে কিবলা প্রত্যাবর্তনের পূর্বে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে আদায় করেছিল। তাদের ঐ সমস্ত কর্মের পরিপ্রেক্ষিতেই কি এ আয়াত নাযিল হয়েছে ? জবাবে বলা হবে যদিও তারা তাদের পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের নামায সম্পর্কে ভয় করছিল, শুধু তাই নয়, তাদের নিজেদের নামাযের সওয়াব বাতিল হওয়া সম্পর্কেও তাদের ভয় ছিল, যা তারা কা'বার দিকে কিবলা প্রত্যাবর্তনের পূর্বে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে আদায় করেছিল। তারা ধারণা করেছিল যে, তাদের ঐ সমস্ত আমল বাতিল হয়েছে এবং সে সবের সওয়াব বিনষ্ট হয়ে গেছে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে কারীমা নাযিল করেন। এ আয়াতে জীবিত ব্যক্তিদেরকে সম্বোধন করলেও তাদের পূর্ববর্তীরাও তাতে শামিল আছে। কেননা, আরবদের প্রচলিত নিয়মানুসারে, যখন কোন বর্ণনায় সম্বোধিত ব্যক্তি এবং অনুপস্থিত ব্যক্তি একত্র হয়, তখন সম্বোধিত ব্যক্তির বর্ণনাই প্রাধান্য লাভ করে। অতএব তখন অনুপস্থিত ব্যক্তির খবরই উপস্থিত ব্যক্তির খবরই প্রকাশ পায়। সুতরাং তারা যে ব্যক্তিকে সম্বোধন করল, তার থেকেই খবর বলে থাকে। এমতাবস্থায় অনুপস্থিতকে পরিত্যাগ করে। যেমন–فَعَلْنَا بِكُمَا এবং صَنَعْنَا بِكُمَا এর অর্থ তোমরা দু'জন দ্বারা আমরা কর্ম সম্পাদন করলাম। এখানে যেন উভয়কে উপস্থিত ব্যক্তি হিসেবে সম্বোধন করা হয়েছে। আর فعلنا بهما তাদের দু'জন দ্বারা আমরা কর্ম সম্পাদন করালাম, এই বলে তাদের একজনকে সম্বোধন করা তারা বৈধ মনে করেন না। সুতরাং অনুপস্থিতের সংখ্যানুপাতেই তারা উপস্থিতের সংখ্যা প্রত্যাহার করেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী– اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَّحِيْمٌ এর তাফসীর ঃ "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মানুষের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল , করুণাময়–"। মহান আল্লাহ্র বাণী– اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَّحِيْمٌ এর মর্মার্থ– নিশ্চয়ই আল্লাহ্ স্বীয় বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহশীল। الرأفة শব্দের অর্থ الرحمة অনুগ্রহ। তা দুনিয়ায় সমগ্র সৃষ্টির জন্য সাধারণভাবে প্রযোজ্য। আর কিছু সংখ্যাকের জন্য তা পরকালে প্রযোজ্য الرحيم শব্দের অর্থ তিনি মু'মিনদের জন্য ইহাও পরকালে সর্বাবস্থায় অনুগ্রহশীল ও করুণাময়। এ ব্যাপারে আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি। এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা বুঝিয়েছেন যে, তিনি স্বীয় বান্দাদের আনুগত্যের প্রতিদান ও সওয়াব বাতিল না করার ব্যাপারে অধিক অনুগ্রহশীল। আর যে বিষয় তাদের উপর ফরয করা হয় নি, সে বিষয়ে তিনি তাদেরকে পাকড়াও করবেন না। অর্থাৎ তোমাদের ঐ সব মৃত ভাইদের নামাযের ব্যাপারে আক্ষেপ করো না, যারা

ইতিপূর্বে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে নামায আদায় করে ইন্তিকাল করেছেন। নিশ্চয়ই আমি তাদের আনুগত্যের বিশেষ করে তাদের ঐ সব নামাযের,–যা তারা বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে হয়ে আদায় করেছে তার সওয়াব প্রদান করবো। কেননা, তারা আমার জন্য যে সব আমল করছে, এর সওয়াব বাতিল না করার ব্যাপারে আমি অধিক অনুগ্রহশীল। সুতরাং তোমরা তাদের ব্যাপারে চিন্তিত হয়ো না। আর কা'বার দিকে হয়ে তাদের নামায আদায় না করার ব্যাপারেও আমি তাদেরকে পাকড়াও করবো না। কেননা, আমি তাদের জন্য তা ফরয করিনি। আর আমি আমার বান্দাদের যে কাজের নির্দেশ করিনি–সে কাজ পরিত্যাগ করার জন্য শাস্তি প্রদান না করতে অত্যন্ত অনুগ্রহশীল। الرؤف শব্দেটির কয়েকটি পরিভাষা আছে। তন্মধ্যে একটি হল–رَؤُفٌ শব্দটি فَعُلٌ এর ওযনে মাসদার। যেমন কবি ওয়ালীদ ইবনে উকাবার কবিতায় রয়েছে ঃ

وشر الطالبين ولاتكنه + يقاتل عمه الرؤف الرحيم

উল্লিখিত কবিতাংশটি কবি ওয়ালীদ ইবনে উকাবা ইবনে আবি মুঈত হযরত মু'আবীয়া (রা.)–কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন।

হযরত উসমান (রা.)–এর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণকারী হিসেবে হত্যাকারীদেরকে অন্বেষণ করা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি তাদের প্রতি অনুগ্রহ ও স্নেহ প্রদর্শন করে সে নিকৃষ্টতম ব্যক্তি। সুতরাং হে মু'আবীয়া ইবনে আবূ সুফিয়ান ! তুমি আপন চাচা হযরত উসমান (রা.)–এর হত্যাকারীর ব্যাপারে স্নেহশীল ও অনুগ্রহকারী হয়ো না।

الرؤف الرحيم তা কূফাবাসী সাধারণ কিরাআত বিশেষজ্ঞগণের কিরাআত। অন্য মতে رَءُوفٌ শব্দটি فَعُولٌ এর পরিমাপে মাসদার। তা মদীনার সাধারণ বিশেষজ্ঞগণের কিরাআত। رَئِفٌ গাতফান সম্প্রদায়ের কিরাআত। فعل এর অনুরূপ حذر –এর ওযনে। رؤف শব্দ فعل এর ওযনে ع এর মধ্যে জযম দিয়ে। তা বনী আসাদ এর পরিভাষা। পূর্বে উল্লিখিত দু' পদ্ধতির এ পদ্ধতিতে এ তাদের কিরাআত প্রচলিত।

মহান আল্লাহ্র বাণী–

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا ص فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ –

অর্থ ঃ "নিশ্চয় আমি আপনাকে প্রায়ই আকাশের দিকে তাকাতে দেখি। সুতরাং অবশ্যই আমি আপনাকে সেই কিবলা মুখীণ করবো যা আপনি পসন্দ করেন। আর যে যেখানে থাক মসজিদে হারামের দিকেই মুখ ফিরাও, আর নিশ্চয়ই যাদেরকে

আসমানী কিতাব প্রদান করা হয়েছে তারা একথা সুনিশ্চয়ভাবেই জানে যে তা তাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে সত্য। আর আল্লাহ্ পাক তাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে গাফিল নন। (সূরা বাকারা ঃ ১৪৪)

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক এখানে ফরমান যে, হে মুহাম্মদ (সা.) বারবার আসামানের দিকে মুখ করে তাকাতে দেখি। **التقلب** শব্দের অর্থ **التحول** ও **التصرف** বা ফিরানো, আল্লাহ্‌র বাণী – **فى السماء** এর অর্থ হল –**نحو السماء و قبلها** বা আকাশের দিকে। আমাদের কাছে যে খবর পৌঁছেছে এর পরিপ্রেক্ষিতে তা নবী করীম (সা.) সম্পর্কেই বলা হল। কেননা বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে কা'বার দিকে কিবলা প্রত্যাবর্তিত হওয়ার পূর্বে তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখতেন। তিনি কা'বার দিকে কিবলা প্রত্যাবর্তনের জন্য আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশের প্রতিক্ষা করতেন। এ সম্পর্কে কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্‌র এই বাণী– **قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاءِ** সম্পর্কে বলেন, নবী করীম (সা.) প্রায়াই আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখতেন। তিনি পসন্দ করতেন–যেন আল্লাহ্ তাঁর কিবলা পরিবর্তন করেন। পরিশেষে আল্লাহ্ তা'আলা সেই দিকেই তাঁর কিবলা প্রত্যার্বতন করলেন।

কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত আল্লাহ্‌র বাণী–**قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاءِ** এর শানে নুযূল হল নবী করীম (সা.) প্রথমত বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে নামায পড়তেন, তখন তিনি ইচ্ছা পোষণ করতেন যে, তাঁর কিবলা যদি বায়তুল হারামের দিকে প্রত্যাবর্তিত হতো ! অতএব আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পসন্দ অনুযায়ী সেই দিকেই তাঁর কিবলা প্রত্যাবর্তিত করলেন।

রাবী (র.) থেকে বর্ণিত তিনি–**قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاءِ** এই আয়াত সম্পর্কে বলেন যে, নবী করীম (সা.) বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে নামায পড়ার সময়ে প্রায়ই আকাশের দিকে চেয়ে দেখতেন। বায়তুল হারামের দিকে কিবলা প্রত্যাবর্তিত হওয়ার জন্য তিনি আগ্রহান্বিত ছিলেন। অতএব তাঁর ইচ্ছানুযায়ী আল্লাহ্ তা'আলা সেদিকেই তাঁর কিবলা প্রত্যাবর্তিত করলেন।

সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত যে, মানুষ বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে নামায পড়তেছিল। নবী করীম (সা.) যখন মদীনায় আগমন করলেন, অর্থাৎ হিজরতের আঠার মাসের শেষে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে যখন তিনি নামায পড়তেছিলেন, এমতাবস্থায় আকাশের দিকে তাকিয়ে তিনি আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশের অপেক্ষায় ছিলেন। তখনই আল্লাহ্ তা'আলা তার পূর্ববর্তী কিবলা বাতিল করে কা'বাকে কিবলা করে দেন–। নবী করীম (সা.) কা'বার দিকে ফিরে নামায পড়তে পসন্দ করতেন। অতএব আল্লাহ্ তা'আলা – **قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاءِ** এই আয়াত নাযিল করেন। যে জন্যে নবী করীম (সা.) কা'বার দিকে কিবলা প্রত্যাবর্তনের প্রত্যাশী ছিলেন।

এ কারণ সম্পর্কে মুফাসসীরগণ মতভেদ করেছেন–। তাঁদের কেউ কেউ বলেন যে, বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে কিবলা অপসন্দ করার কারণ হল–ইয়াহুদীরা বলেছিল, তিনি (মুহাম্মদ সা.)

আমাদের কিবলার অনুসরণ করেন, অথচ আমাদের ধর্মের বিরোধিতা করেন। যিনি এ কথা বলেছেন, তাঁর স্বপক্ষে নিম্নের হাদীস উল্লেখ করা হল ঃ

মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, ইয়াহূদীরা বলল, মুহাম্মাদ (সা.) আমাদের ধর্মের বিরোধিতা করেন, অথচ আমাদের কিবলার অনুসরণ করেন। তখন নবী করীম (সা.) মহান আল্লাহ্‌র কাছে কিবলা প্রত্যাবর্তনের জন্য দু'আ করেন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা–

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ –

এই আয়াত অবতীর্ণ করেন। এতে ইয়াহূদীদের কথা খণ্ডিত হ'ল–তারা বলতো যে, তিনি (মুহাম্মদ (সা.)) আমাদের বিরোধিতা করেন এবং আমাদের কিবলার অনুসরণ করেন।

কিবলা পরিবর্তিত হয়েছিল জুহুরের নামাযে, অতএব পুরুষদেরকে মহিলাদের স্থলে এবং মহিলাদেরকে পুরুষদের স্থলে দাঁড় করানো হল–।

ইবনে যায়েদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা নবী মুহাম্মদ (সা.)–এর জন্য তা উল্লেখ করে ইরশাদ করেন – فاينما تولوا فثم وجه الله "তোমরা যেদিকেই মুখ ফেরাও সে দিকেই আল্লাহ্ বিদ্যমান–"। বর্ণনাকারী বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, ইয়াহূদী সম্প্রদায় আল্লাহ্‌র ঘরসমূহের কোন এক ঘর অর্থাৎ বায়তুল মুকাদ্দাসকে কিবলা করল। সুতরাং নবী করীম (সা.) ও তাকে কিবলা করে ষোল মাস নামায পড়েন। এরপর তিনি সংবাদ পেলেন যে, ইয়াহূদীরা আল্লাহ্‌র শপথ করে বলে থাকে মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর সঙ্গীগণ অবগত নন যে, তাদের কিবলা কোন দিকে? পরিশেষে আমরা তাদেকে পথ প্রদর্শন করলাম। সুতরাং তাদের একথা নবী করীম (সা.)–এর অপসন্দ হল। তিনি আকাশের দিকে তাকায়ে দু'আ করলেন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত–

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا – فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ –الاية

শেষ আয়াত পর্যন্ত অবতীর্ণ করেন।

অন্যান্য মুফাস্‌সীরগণ বলেন যে, বরং তিনি তার দিকে আগ্রহান্বিত ছিলেন, কারণ, তা তাঁর পিতৃপুরুষ হযরত ইবরাহীম (আ.)–এর কিবলা ছিল।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, যখন হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মদীনা তয়্যিবায় হিজরত করেন, তখন সেখানকার অধিকাংশ অধিবাসী ছিল ইয়াহূদী। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিবলা বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে নির্দেশ করেন। তাতে ইয়াহূদীরা খুশী হল। অতএব হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সেই দিকে ষোল মাস নামায আদায় করলেন। কেননা হযরত রাসুলুল্লাহ্ (সা.) হযরত ইবরাহীম (আ.)–এর কিবলা পসন্দ করতেন। সুতরাং তিনি তার জন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে দু'আ করেন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা – قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاءِ এ আয়াত নাযিল করেন। মহান আল্লাহ্‌র বাণী– فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا –এর অর্থ "অতএব, আমি আপনাকে অবশ্যই বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে আপনার পসন্দনীয় ও আগ্রহান্বিত কিবলার দিকে প্রত্যাবর্তিত করবো।

فول وجهك অর্থাৎ "আপনার মুখমন্ডল ফিরিয়ে নিন شطر المسجد الحرام মাসজিদুল হারামের দিকে।"

الشطر শব্দের অর্থ النحو এবং و القصد و التلقاء দিক, ইচ্ছা, ইত্যাদি–।

যেমন কবি হাযলীর কবিতায় এর উল্লেখ রয়েছে ঃ

ان العسير بها داء مخامرها – فشطرها نظر العنين محسورا

"নিশ্চয়ই উটণীটি রুগ্ন, এর রোগ চামড়ারা অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে, তার চক্ষুদ্বয়ের এক দিক ক্ষতযুক্ত"। অর্থাৎ شطرها অর্থ–তার দিক। যেমন কবি ইবনে আহমার বলেন ঃ

تعدوبنا شطر جمع و هى عاقدة + قد كارب العقد من ايفادها الحقبا –

"তোমরা আমাদের সঙ্গে মুযদালাফা অথবা মক্কার দিকে মিলিত হবে–। এমতাবস্থয় যে, উটণী ভ্রমণের জন্য তার লাগাম ও হাউদাজের গদী বন্ধনযুক্ত অবস্থায় দ্রুত ভ্রমণের জন্য প্রস্তুত থাকে"।

الشطره এর অর্থ نحو দিক, যা আমরা বর্ণনা করলাম–। এ সম্পর্কে ব্যাখ্যাকারগণ যা বলেন, সে সম্পর্কে নিম্নের হাদীস উল্লেখ করা হল।

হযরত ইবনে আবুল আলীয়া থেকে বর্ণিত, شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ এর অর্থ "মাসজিদুল হারামের দিকে"।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ অর্থ – نحوه মাসজিদুল হারামের দিকে।

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ অর্থ – نحوه অর্থাৎ আপনার মুখমন্ডল মাসজিদুল হারামের দিকে প্রত্যাবর্তন করুন। হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে অপর সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ আয়াত সম্পর্কে তিনি বলেন, মাসজিদুল হারামের দিকে আপনার মুখমন্ডল ফিরিয়ে নিন।

হযরত রাবী (র.) থেকে বর্ণিত, فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ এর অর্থ نحو অর্থাৎ মাসজিদুল হারামের দিকে আপনার মুখমন্ডল ফিরিয়ে নিন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, شطره এর অর্থ نحوه তার দিকে। হযরত বারা (রা.) থেকে বর্ণিত, فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهُ এর অর্থ قبالة তার দিকে। অর্থাৎ তোমাদের মুখমন্ডল ঐ দিকে ফিরিয়ে নাও। হযরত ইবনে যায়েদ (রা.) থেকে বর্ণিত, شطره এর অর্থ نحيته এবং جانبه তার দিকে, তার প্রতি। বর্ণনাকারী বলেন شطوره অর্থ جوانبه তার দিকসমূহ।

এরপর মাসজিদুল হারামের যে স্থানের দিকে কিবলা করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে নির্দেশ প্রদান করেছেন, সেই ব্যাপারে মুফাস্সীরগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মধ্য থেকে কেউ কেউ বলেন, হযরত নবী করীম (সা.) যে কিবলার দিকে প্রত্যাবর্তন করলেন, এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বাণীতে উল্লেখ করেন- فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا তা হল কা'বার চতুর্দিকের চত্বর। যারা এমত পোষণ করেন ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا এ আয়াত সম্পর্কে তিনি বলেন, তা হল কা'বার চতুর্দিকের চত্বর।

ইয়াহ্ইয়া ইবনে কুমতা (র.) বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা.)-কে মাসজিদুল হারামের চত্বর বরাবরে বসা অবস্থায় দেখলাম-। তিনি তখন এ আয়াত فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا তিলাওয়াত করে বললেন যে, هذه القبلة هي هذه القبلة এটিই হল কিবলা, এটিই হল কিবলা।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা.) থেকে অনুরূপ আরেকটি বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু তিনি استقبل الميزاب এই বাক্যটি অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন যে, তিনি বলেছেন, এ হল সেই কিবলা-যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে নির্দেশ করেছেন, فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا "অতএব, অবশ্যই আমি আপনাকে সেই কিবলার দিকে প্রত্যাবর্তন করবো, যাকে আপনি পসন্দ করেন।" কেউ কেউ বলেন যে, বরং সমস্ত কা'বা ঘরই কিবলা। আর কা'বা ঘরের কিবলা হল الباب (প্রধান) দ্বার। এ অভিমতের সমর্থনে নিম্নের হাদীস উল্লেখ করা হল ঃ

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, البيت كله قبلة সমস্ত কা'বা ঘরই কিবলা-। আর এই ঘরের কিবলা হল-যেদিকে দরজা অবস্থিত-।

উল্লিখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ পাকের কালাম-فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ এই আয়াত সম্পর্কে আমার কাছে সঠিক মন্তব্য হল-মাসজিদুল হারামের দিকে মুখমন্ডল প্রত্যাবর্তনকারী হল সঠিক কিবলার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। مصيب القبلة যে ব্যক্তি মনে মনে নিয়াত করল এবং কিবলার দিকে প্রত্যাবর্তন করল, যদিও বা সে স্ব-শরীরে কা'বার বরাবর না হয়। যদি কোন মুসল্লী নামাযের সারির এক পার্শ্বে হয় এবং ইমাম তার ডানে অথবা বামের অন্য পার্শ্বে হন, এমতাবস্থায় যদি সে ব্যক্তি ইমামের পিছনে থেকে নামায সমাপ্ত করে থাকে,- তাহলে ইমামের কিবলাই তার জন্য যথেষ্ট, যদিও প্রত্যেক মুসল্লী স্ব-শরীরে কা'বার বরাবর নাও হয়-। যদি কোন মুসল্লী কা'বার ডানে অথবা বামে থেকে কা'বার বরাবর হয় তা'হলে সে কা'বার দিকেই কিবলা করল। কিংবা যদি কা'বার ডানদিকের অথবা বামদিকের নিকটবর্তী হয় এবং কা'বাকে স্বীয় মুখমন্ডল ও শরীর দ্বারা পিছনে না ফেলে থাকে, অথবা তা থেকে প্রত্যবর্তিত না হয়ে থাকে, তা'হলে-সে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে

যেন কা'বার দিকেই মুখ করল।

হযরত আলী (রা.) থেকে আল্লাহ্ পাকের কালাম- فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, شطره এর অর্থ-আমাদের নিকট কিবলা। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন কা'বা ঘরের কিবলা হল তার দরজা-। যেমন উসামা ইবনে যায়েদ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে দেখেছি, যখন তিনি কা'বা ঘর থেকে বের হলেন, তখন তিনি দরজার দিকে তাকিয়ে বললেন, هذه قبلة - هذه قبلة "এ হল কিবলা, এ হল কিবলা।"

হযরত ইবনে যায়েদ (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন যে, হযরত নবী করীম (সা.) আপন ঘর থেকে বের হলেন, এরপর কা'বার দিকে মুখ করে দ'ুরাকাআত নামায আদায় করলেন, তারপর বললেন,-هذه قبلة مرتين এ হল কিবলা, একথা তিনি দু'বার বলেন।

হযরত ইবনে যায়েদ (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি নবী করীম (সা.) থেকে (উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা مثله করেছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন তোমরা 'তাওয়াফ' এর জন্য নির্দেশ প্রাপ্ত হয়েছ, তাতে প্রবেশের জন্য আদেশপ্রাপ্ত হওনি। তিনি বলেন, তাতে (কা'বাঘরে) প্রবেশের জন্য নিষেধও করা হয়নি। কিন্তু আমি তাঁকে একথা বলতে শুনেছি, উসামা ইবনে যায়েদ আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন কা'বা ঘরে প্রবেশ করলেন,-তখন তিনি তার প্রত্যেক প্রান্ত থেকেই দু'আ করলেন এবং সেখানে থেকে বের হওয়া পর্যন্ত নামায আদায় করলেন না। অতএব, তিনি যখন বের হলেন-তখন কিবলার দিকে মুখ করে দু'রাকাআত নামায আদায় করলেন এবং বললেন, এ হল কিবলা।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, হযরত নবী কীরম (সা.) ঘোষণা করে দিলেন যে, নিশ্চয়ই ঘরটিই কিবলা। আর কা'বা ঘরের কিবলা হল তার দরজা।

মহান আল্লাহ্র কালাম- وَ حَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ এর ব্যাখ্যা ঃ "এবং তোমরা যেখানে থাক, সেদিকেই তোমাদের মুখ কর।" অর্থাৎ মহান আল্লাহ্র একথার মর্ম হল-হে মু'মিনগণ ! তোমরা পৃথিবীর যে স্থানেই থাক না কেন-তোমরা নামাযের মধ্যে তোমাদের মুখমন্ডল মাসজিদুল হারামের দিকে ফিরাও।

شطره শব্দের সর্বনামটি মাসজিদুল হারামের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। অতএব, আল্লাহ্ তা'আলা-এ আয়াত দ্বারা মু'মিনদের জন্য তাঁদের নামাযে মাসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরানো ফরয করেছেন। মহান আল্লাহ্র যমীনে তারা যেখানেই অবস্থান করুক না কেন। আল্লাহ্র কালাম فولوا এর মধ্যে فاء এসেছে جزاء এর جواب হিসেবে। حيثما كنتم হল তার جزاء অতএব এর অর্থ হল- তোমরা যেখানেই

থাক, (কা'বার দিকেই) তোমাদের মুখ ফিরাও।

মহান আল্লাহ্‌র কালাম- وَ اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ অর্থ ঃ "যাদেরকে। কিতাব দেয়া হয়েছে, তারা নিশ্চতভাবে জানে, যে তা তাদের প্রতিপালকের প্রেরিত সত্য।"

'আহলে কিতাব' - اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْكِتَابَ ব্যাখ্যাঃ আল্লাহ্ পাকের এ বাণীর দ্বারা ইয়াহুদী ধর্মযাজক ও খ্রীস্টানদের-শিক্ষিত ব্যক্তিদেরকে বুঝানো হয়েছে। আর কেউ শিক্ষিত বলেছেন যে, তার দ্বারা শুধু ইয়াহুদীদেরকে বুঝানো হয়েছে । এমতের সমর্থনে বর্ণনা।

সূদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, وَ اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْكِتَابَ এ আয়াতাংশই ইয়াহুদীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। আর আল্লাহ্‌র বাণী-لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ এর মর্মার্থ হল ইয়াহুদী ও খ্রীস্টান ধর্মযাজক ও শিক্ষিত ব্যক্তি অবশ্যই জানে যে, মাসজিদুল হারামকে কিবলা করা সত্য বিষয়, যা আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ.) এবং তাঁর বংশধর ও তাঁর পরবর্তী সকল বান্দাদের জন্য ফরয করে দিয়েছেন। আর মহান আল্লাহ্‌র কালাম –مِنْ رَّبِّهِمْ এর মর্মার্থ হল–উল্লিখিত কিবলা তাদের উপর ফরয বা অবশ্য কর্তব্য, তা আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে তাদের উপর ফরয করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ্‌র কালাম-وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ("এবং তারা যা করতেছে, তদ্বিষয়ে আল্লাহ্ অসতর্ক নন")। এর মর্মার্থ হল-হে মু'মিনগণ ! মহান আল্লাহ্‌র আদেশ ও নিষেধ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে তোমাদের নামাযের যে বিষয় তিনি তোমাদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় করেছেন, এরপর মাসজিদুল হারামের দিকে তোমাদের নামাযের বিষয়ে তোমরা যা করেছ, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ বে-খবর নন। বরং আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের ঐসমস্ত কার্যাবলী গণনা করবেন এবং তাঁর নিকট তা তোমাদের জন্য সংরক্ষণ করে রাখবেন। পরিশেষে তিনি তা দ্বারা তোমাদেরকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করবেন। আর এর বিনিময়ে তিনি তোমাদেরকে প্রদান করবেন উত্তম সওয়াব।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী-

وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ اٰيَةٍ مَّا تَبِعُوْا قِبْلَتَكَ وَمَا اَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَاجَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اِنَّكَ اِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِيْنَ -

অর্থ ঃ-''যদি আপনি আহ্‌লে কিতাবের নিকট সমূদয় নিদর্শন আনয়ন করেন, তবুও তারা আপনার কিবলার অনুসরণ করবে না এবং আপনিও তাদের কিবলার অনুসারী নন। আর তারাও কেউ কারো কিবলার অনুসারী হবে না। আপনার নিকট যে জ্ঞান এসেছে, তারপরও যদি আপনি তাদের ইচ্ছার অনুসরণ করেন, তা হলে

আপনি অবশ্যই অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। (সূরা বাকারা : ১৪৫)

এর ব্যাখ্যা : অর্থাৎ–মহান আল্লাহ্‌র ঐ বাণীর অর্থ করা হয়েছে যে, হে মুহাম্মদ (সা.) আপনি যদি ইয়াহুদী ও খ্রীস্টানদের কাছে সমূদয় দলীল প্রমাণও উপস্থাপন করে বলেন যে, বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে মাসজিদুল হারামের দিকে নামাযের কিবলা প্রত্যাবর্তন করা ফরয করা হয়েছে এবং তা সত্য নিদর্শন, তথাপি তারা তা বিশ্বাস করবে না। আর তাদের কাছে আপনার ঐ কিবলা যে দিকে আপনাকে যে কিবলার অনুসরণের আদেশ দেয়া হয়েছে, সে সম্পর্কে তাদের কাছে দলীল–প্রমাণ উপস্থাপন করা সত্ত্বেও তারা আপনার অনুসরণ করবে না। আর তা হল মাসজিদুল হারামের দিকে মুখ করা।

অতএব আয়াতের অর্থ হবে এমন, হে রাসূল ! যদি আপনি আহ্‌লে কিতাবের কাছে সমূদয় নিদর্শন উপস্থাপন করেন, তবুও তারা আপনার কিবলার অনুসরণ করবে না। মহান আল্লাহ্‌র কালাম– وَ مَا اَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ এর অর্থ–হে মুহাম্মদ (সা.) ! আপনিও তাদের কিবলার অনুসারী নন। কেননা, ইয়াহুদীরা বায়তুল মুকাদ্দাসকেই তাদের নামাযে কিবলা করবে। আর নাসারা (খ্রীস্টানরা) কিবলা করবে পূর্ব দিকে। সুতরাং তাদের বিভিন্ন দিকের কিবলার অনুসরণ করার আপনার সুযোগ কোথায় ? অতএব আমি আপনার জন্য যে কিবলা নির্ধারণ করলাম, তাতেই আপনি স্থির থাকুন। আর ইয়াহুদী ও নাসারারা (খ্রীস্টান) আপনাকে যা বলে তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবেন না। তারা আপনাকে তাদের কিবলার দিকে মুখ করার আহবান জানায়। মহান আল্লাহ্‌র কালাম–وَ مَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ এর অর্থ হল তারাও পরস্পর পরস্পরের কিবলার অনুসারী নয়। সুতরাং তারা নিজ নিজ কিবলার দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী।

সূদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, وَ مَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ এই আয়াত সম্পর্কে তিনি বলেন, ইয়াহুদীরা ও নাসারাদের কিবলার অনুসারী নয়। আর নাসারারা ও ইয়াহুদীদের কিবলার অনুসারী নয়। এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার কারণ হল––যখন নবী করীম (সা.) কা'বার দিকে মুখ ফিরালে, তখন ইয়াহুদীরা বলল, মুহাম্মদ (সা.) স্বীয় জন্মভূমি ও তাঁর পিতার শহরের দিকে কিবলা প্রত্যাবর্তনে আগ্রহান্বিত। যদি তিনি আমাদের কিবলার উপর স্থির থাকতেন, তা হলে আমরা মনে করতাম যে, তিনিই আমাদের সেই প্রতিক্ষিত নবী। অতএব আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্পর্কে–

وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوْالْكِتَابَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ – الى قوله لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ –

এই আয়াতের শেষ পর্যন্ত নাযিল করেন।

ইবনে যায়েদ (রা.) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। মহান আল্লাহ্‌র কালামের মর্ম হল–নিশ্চয়ই ইয়াহুদী ও খ্রীস্টানরা একই কিবলার উপর একমত হবে না। কেননা, তারা প্রত্যেকেই নিজ ধর্মে অটল। অতএব আল্লাহ্ তা'আলা প্রীয় নবী (সা.)–কে এ কথা উল্লেখপূর্বক বলেন যে, হে মুহাম্মদ (সা.) আপনি এই সব ইয়াহুদী ও খ্রীস্টানদের সন্তুষ্টির চিন্তা করবেন না। কেননা, তাদের ধর্মের

বিভেদের কারণে আপনার জন্য প্রত্যেককে সন্তুষ্ট করার কোন উপায় নেই। যদি আপনি ইয়াহুদীদের কিবলার অনুসরণ করেন, তবে খ্রীস্টানরা এতে অসন্তুষ্ট হবে। আর যদি খ্রীষ্টানদের কিবলার অনুসরণ করেন, তবে ইয়াহুদীরা অসন্তুষ্ট হবে। সুতরাং আপনি ঐ বিষয় পরিহার করুন, যার কোন সম্ভাবনা নেই। আপনার খাঁটি ইসলাম ধর্মের উপর তাদের সকলের একত্রিত হওয়ার যখন কোন সম্ভাবনা নেই, তখন আপনি তাদেরকে তাদের হালে ছেড়ে দিন। আর আপনার কিবলা হল হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কিবলা, যা তাঁর পরবর্তী নবীগণেরও কিবলা ছিল।

মহান আল্লাহ্‌র কালাম – وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاۤءَهُمْ مِنْۢ بَعْدِ مَاجَاۤءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اِنَّكَ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ

এর ব্যাখ্যা ঃ-(হে রাসূল !) "আপনার নিকট যে ওহী এসেছে, তারপরও যদি আপনি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করেন, তবে নিশ্চয়ই আপনি অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।''

আল্লাহ্ পাকের কালাম-وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاۤءَهُمْ এর মর্ম হল-হে মুহাম্মদ (সা.), আপনি যদি এই সব ইয়াহূদী ও নাসাদের সন্তুষ্টির আশা করেন, যারা আপনাকে এবং আপনার সাথীদেরকে বলেছে, "তোমরা ইয়াহুদী অথবা নাসারা (খ্রীস্টান) হয়ে যাও, তা হলে হেদায়েত প্রাপ্ত হবে''। তারপরও যদি আপনি তাদের কিবলার অনুসরণ করেন, অর্থাৎ যদি তাদের কিবলার দিকে মুখ করেন, আপনার নিকট সত্য حق আগমনের পর-অর্থাৎ আমার কথা ঘোষণা দেয়ার পর যে, তারা বাতিলের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তারা সত্য থেকে বিমুখ, আর এ কথা জানার পর যে, আমি আপনাকে যে কিবলার দিকে প্রত্যাবর্তিত করলাম, তা আপনার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর বংশধরদের এবং অন্যান্য নবীগণেরও কিবলারূপে ফরয ছিল, তবে নিশ্চয়ই আপনি তখন অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। অর্থাৎ আমার বান্দাদের মধ্যে যারা নিজেদের উপর অত্যাচার করেছে ও আমার নির্দেশের বিরোধিতা করেছে এবং আমার আনুগত্য পরিত্যাগ করেছে, আপনিও তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন''।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী-

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَاۤءَهُمْ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ –

এর ব্যাখ্যা ঃ "আমি যাদেরকে কিতাব প্রদান করেছি, তারা তাকে এরূপ চিনে, যেরূপ আপন সন্তানদেরকে চিনে, তাদের একদল লোক জেনেশুনে সত্যকে গোপন করে থাকে।"

মহান আল্লাহ্‌র কালাম- اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ এর মর্ম হল-আমি যাদেরকে কিতাব প্রদান করেছি, অর্থাৎ- ইয়াহুদী ও নাসারাদের ধর্মযাজকরা খুব ভাল করেই জানে যে, বায়তুল হারাম, তাদের এবং ইবরাহীম (আ.) ও আপনার পূর্ববর্তী নবীগণের সকলেরই কিবলা। এ কথাটি তারা এমনভাবে জানে যেমন আপন সন্তানদেরকে চিনে।

হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি–اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَاءَهُمْ এই আয়াতাংশ সম্পর্কে বলেন যে, তারা বায়তুল হারামের কিবলাকে নিজ সন্তানদের মতই চেনে।

রাবী (র.) থেকে বর্ণিত, – اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَاءَهُمْ এই আয়াতাংশের মর্মার্থ হল–আহলে কিতাবগণ তাকে নিজ সন্তানদের মতই চেনে। অর্থাৎ কিবলাকে।

হযরত রাবী (র.) থেকে বর্ণিত,– اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَاءَهُمْ এর মর্মার্থ– আহলে কিতাবগণ ভাল করেই চেনে যে, বায়তুল হারামের কিবলাই হল সেই কিবলা, যার প্রতি তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাকে তারা এমন চেনে যেমন আপন সন্তানদেরকে চেনে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত,– اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَاءَهُمْ এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে বায়তুল হারামের কিবলাকে।

হযরত সূদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত,– اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَاءَهُمْ এই আয়াতাংশের মর্ম হল–কা'বা যে নবীগণের কিবলা, একথা তারা ভাল করেই চেনে, যেমন তারা আপন সন্তানদেরকে চেনে।

হযরত ইবনে যায়েদ (রা.) থেকে বর্ণিত,– اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَاءَهُمْ এই আয়াতাংশ সম্পর্কে তিনি বলেন, ইয়াহুদীরা ভাল করেই জানে যে, কিবলা হল মক্কা।

হযরত ইবনে জুরায়জ (র.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্‌র বাণী– اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَاءَهُمْ সম্পর্কে বলেন যে, কিবলা হল কা'বা ঘর।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী – وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ এর ব্যাখ্যাঃ– "আর নিশ্চয়ই তাদের একটি সম্প্রদায় জেনে শুনেই সত্যকে গোপন করে''। মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন যে, আহলে কিতাবের একদল লোক, তারা হল ইয়াহুদী ও নাসারা (খ্রীস্টান) সম্প্রদায়। হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন যে, তারা হল আহলে কিতাব। অপর একটি সূত্রে হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। হযরত ইবনে জুরায়জ (র.) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে হযরত ইব্‌নে আবূ নাজীহ্ (র.) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম– ليكتمون الحق এর মধ্যে حق সত্য হল ঐ কিবলা যেদিকে মহান আল্লাহ্ তাঁর নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)–কে প্রত্যাবর্তিত করলেন। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন– فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ "অতএব, আপনার মুখমন্ডল ঐ মাসজিদুল হারামের দিকে করুন।'' যেদিকে হযরত মুহাম্মদ (সা.)–এর পূর্ববর্তী নবীগণ মুখ

করতেন। কিন্তু ইয়াহূদী ও নাসারা তাকে গোপন করলো। অতএব তাদের কেউ পূর্ব দিকে এবং কেউ বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করল। আর এ সম্পর্কে তারা মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশ প্রত্যাখান করল। তারা তাদের কিতাব তাওরাত ও ইনজীলের মধ্যে এ কথা লিপিবদ্ধ অবস্থায় পাওয়া সত্ত্বেও এ সম্পর্কে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নির্দেশ গোপন করল। এ কারণেই, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর উম্মতগণকে সে নির্দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা এবং তাকে গোপন করার ব্যাপারে অবহতি করলেন। আর এ সম্পর্কে তিনি তাদের কৃতকর্মেরও খবর দিয়ে দিলেন যে, তাদের কাজ সত্যের পরিপন্থী। মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে তাদের কৃতকর্মের প্রতিবাদ করা অত্যাবশ্যক। তাই, তিনি বললেন, তারা সত্যকে গোপন করেছে, অথচ তারা জানে যে, তা গোপন করা তাদের জন্য উচিত হয়নি। সুতরাং তারা মহান আল্লাহ্‌র অবাধ্যতার মনস্থ করল।

হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, – اِنَّ فَرِيْقًامِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ এ আয়াতাংশের মর্ম হল–হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নবূওয়াতের বিষয়কে গোপন করল।

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত মহান আল্লাহ্‌র বাণী – لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ সম্পর্কে তিনি বলেন, তারা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কথা গোপন করল, অথচ তাঁর সম্পর্কে তাঁরা তাদের কিতাব তাওরাত ও ইনজীলের মধ্যে লিপিবদ্ধ অবস্থায় পেয়েছিল।

হযরত রাবী (র.) থেকে বর্ণিত, اِنَّ فَرِيْقًامِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ এই আয়াতাংশ দ্বারা কিবলাকে বুঝানো হয়েছে।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী–

اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ –

অর্থ ঃ–"হে নবী ! এ বাস্তব সত্যটি আপনার প্রতিপালকের নিকট থেকে এসেছে, অতএব আপনি সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না''।

(সূরা বাকারাঃ ১৪৭)

এর ব্যাখ্যা ঃ মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মদ (সা.) ! আপনি জেনে রাখুন, আপনার, প্রতিপালক আপনাকে যা জানিয়েছেন এবং তাঁর নিকট হতে আপনাকে তিনি যা প্রদান করেছেন, তাই (حق) সত্য। ইয়াহূদী ও নাসারারা যা বলে তা সত্য নয়। তাই মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে তাঁর নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্যে সংবাদরূপে উল্লেখ করা হল যে, আপনার মুখমন্ডল যে কিবলার দিকে প্রত্যাবর্তন করানো হল, তাই হল সত্য কিবলা, যার উপর ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্ (আ.) এবং তাঁর পরবর্তী নবীগণ ছিলেন। তার উল্লেখপূর্বক আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে জ্ঞাত করালেন, হে মুহাম্মদ (সা.) আপনার প্রভু আপনাকে যা প্রদান করেছেন, তা সত্য জেনে কাজ করুন এবং আপনি সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। মহান আল্লাহ্‌র কালাম– فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ এর মর্ম

হল হে মুহাম্মদ (সা.), যে কিবলার দিকে আপনাকে প্রত্যাবর্তন করানো হলো তা ছিল ইবরাহীম (আ.) এবং অন্যান্য নবীগণেরও কিবলা।

হযরত রাবী (র.) থেকে বর্ণিত আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীর জন্য তা উল্লেখ করে ইরশাদ করেন, اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ অর্থাৎ আপান কিবলা সম্পর্কে সন্দেহ করবেন না কেননা, নিশ্চয় তা কাবা আপনার পূর্ববর্তী নবীগণেরও কিবলা।

ইবনে যায়েদ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি আল্লাহ্র কালাম- فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ সম্পর্কে বলেন যে, আপনি সংশয়কারীদের অন্তর্গত হবেন না (অর্থাৎ ঐ ব্যাপারে সন্দেহ করবেন না। والممترى শব্দটি مفتعل এর পরিমাপে مرية শব্দ থেকে উদ্ভূত مرية শব্দের অর্থ হল الشك সন্দেহ।

এ সম্পর্কে কবি আ'শা এর একটি কবিতাংশ উল্লেখ করা হল ঃ

تدر على أسوق الممترين ركضا + اذا ما السراب ارحجن -

অর্থাৎ "তখনও তুমি সন্দেহ পোষণকারীদের সাথে তালে তালে পরিভ্রমণ করতেছিলে, যখন তাদের বন্ধুত্বের মরীচিকা (আসারতা) প্রাধান্য বিস্তার করেছিল।''

যদি কেউ আমাদের কাছে বলে যে, হযরত নবী করীম (সা.) তার প্রতিপালকের নিকট হতে সত্যের আগমন সম্পর্কে কি সন্দিহান ছিলেন ? কিংবা যে কিবলার দিকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে ফিরিয়ে আনলেন, তা মহান আল্লাহ্র পক্ষ হতে সত্য হওয়ার ব্যাপরেও কি তাঁর সন্দেহ ছিল? পরিশেষে কি তাকে ঐ ব্যাপারে সন্দেহ করতে নিষেধ করা হল ?

অতএব বলা হল যে, فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ "আপনি সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না"। কেউ কেউ বলেন যে, তা এমন বাক্য যা আরবগণ সম্বোধনকারীর জন্য আদেশ ও নিষেধের স্থলে ব্যবহার করে থাকেন। অথচ তার উদ্দেশ্য অন্যটি। যেমন আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন-

يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِيْنَ وَالْمُنَافِقِيْنَ - "হে নবী ! আপনি আল্লাহ্কে ভয় করুন এবং নাস্তিক ও কপটদের অনুসরণ করবেন না।'' তারপর ইরশাদ করেছেন- وَاتَّبِعْ مَا يُوْحٰى اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا "আপনার প্রতি যা ওহী করা হয়েছে, তা অনুসরণ করুন। নিশ্চয়ই তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ অবগত আছেন"। (সূরা আহযাব ঃ ১-২)।

তাই এই আয়াতখানা নবীয়ে পাকের জন্য আদেশের স্থলে ব্যবহৃত হয়েছে এবং তাঁর জন্য তা নিষেধরূপেও ব্যবহৃত হয়েছে। আর এর দ্বারা এবিষয়ে বিশ্বাসী সাহাবাগণকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছে, যা' পূনরুলেখ করা অপ্রয়োজনীয়।

মহান আল্লাহ্র বাণী-

وَ لِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا فَاسْتَبِقُوْا الْخَيْرَاتِ اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يَأْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -

অর্থ ঃ–প্রত্যেকের জন্যই এক একটি দিক (কিবলা) রয়েছে, যে দিকে সে মুখ করে থাকে। তাই তোমরা সৎকাজের সাধনায় দ্রুতগামী হও, তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, আল্লাহ্ পাক তোমাদের সকলকে সমবেত করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক সবকিছুর উপর সর্ব শক্তিমান। (সূরা বাকারা ঃ ১৪৮)

অর্থাৎ–মহান আল্লাহ্র এ বাণীর অর্থ হল (لكل اهل ملة قبلة) প্রত্যেক ধর্ম বিশ্বাসীদের জন্য কিবলা রয়েছে। তাই এখানে اهل ملة কথাটি উহ্য আছে।

বাক্যের বর্ণনাভঙ্গী একথা প্রমাণ করে। যেমন এ সম্পর্কে হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে আল্লাহ্র বাণী– و لكل وجهة সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, এর অর্থ হল– لِكُلِّ صَاحِبِ مِلَّةٍ প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীদের জন্য (নির্দিষ্ট) কিবলা রয়েছে।

রাবী (র.) থেকে বর্ণিত, প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীদের সুনির্দিষ্ট কিবলা রয়েছে, যেদিকে তারা মুখ করে। তাই ইয়াহূদীদের জন্য নির্দিষ্ট কিবলা আছে, আর নাসারা–দের জন্যও কিবলা রয়েছে। হে উম্মতে মুহাম্মদী ! মহান আল্লাহ্ তোমাদেরকে হিদায়েত করেছেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.)–এর কিবলার দিকে।

হযরত ইবনে জুরাইজ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আমি আতা (রা.)–কে মহান আল্লাহ্র কালাম– وَ لِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি উত্তরে বললেন যে, প্রত্যেক ধর্মাবম্বী, তথা ইয়াহূদী এবং নাসারাদের জন্য সুনির্দিষ্ট কিবলা রয়েছে। হযরত মুজাহিদ (র.) বলেছেন– لِكُلِّ صَاحِبِ مِلَّةٍ প্রত্যেক ধর্মালম্বীদের জন্য কিবলা রয়েছে।

হযরত ইবনে যায়েদ (রা.) থেকে বর্ণিত মহান আল্লাহ্র কালাম– وَ لِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا এ আয়াত সম্পর্কে তিনি বলেন যে, ইয়াহূদীদের জন্য কিবলা আছে এবং নাসারাদের জন্যও কিবলা আছে। হে মুসলমানগণ ! তোমাদের জন্যও রয়েছে সুনির্দিষ্ট কিবলা।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) মহান আল্লাহ্র কালাম– وَ لِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا সম্পর্কে বলেন যে, এর মর্ম হল–প্রত্যেক ধর্মের অনুসারিগণ নিজ নিজ কিবলাতে সন্তুষ্ট। আর মু'মিনগণ মহান আল্লাহ্র নামে যেদিকে মুখ ফেরায় (কিবলা করে), সেদিকেই আল্লাহ্ আছেন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্র বাণী হল– فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ কাজেই, তোমরা যেদিকেই মুখ ফেরাও সেদিকেই আল্লাহ্ আছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞ।

হযরত সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, وَ لِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا এ আয়াত সম্পর্কে তিনি বলেন, প্রত্যেক জাতির জন্যই কিবলা রয়েছে, যেদিকে তারা মুখ করে। তাই এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক ধর্মাবম্বীর জন্যই কিবলা রয়েছে, যেদিকে সে মুখ করে। অন্যান্য তাফসীরকারগণ হাসান ইবনে ইয়াহ্ইয়া সূত্রে হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত হাদীস অনুসারে বলেন যে, وَ لِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا এর মর্ম হল–এর দ্বারা বায়তুল মুকাদ্দাসের এবং কা'বার দিকে তাদের দিকে তাদের নামায পড়াকে বুঝানো হয়েছে। এরূপ বক্তব্যের প্রবক্তাদের কথার ব্যাখ্যা হল যে,–হে মুহাম্মাদ (সা.) ! যেদিকেই আপনার প্রতিপালক আপনাকে মুখ ফেরাতে নির্দেশ করেছেন, তাই আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত কিবলা। আর অন্যান্য বান্দাদের প্রতিও সেদিকে কিবলা করার নির্দেশ রয়েছে। اَلْوِجْهَةُ শব্দটি العقدة এর পরিমাপে–مصدر সুতরাং وِجْهَةٌ শব্দটির উদ্দেশ্য এবং ব্যাখ্যা হল তার দ্বারা নামাযের মধ্যে (কিবলার দিকে) মুখ করাকে বুঝায়–। যেমন হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে وجهة হলো শব্দের অর্থ قبلة বর্ণিত হয়েছে।

হযরত হযরত মুজাহিদ (র.) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

রাবী (র.) থেকে বর্ণিত, لِكُلٍّ وِّجْهَةٌ এর অর্থ হল– وِّجْهَةٌ মুখ বা চেহারা। হযরত ইবনে যায়েদ (রা.) থেকে বর্ণিত, وِجْهَةٌ অর্থ قِبْلَة কিবলা।

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। রাবী থেকে বর্ণিত, لِكُلٍّ وِّجْهَةٌ এর মর্মার্থ হল وِّجْهَةٌ মুখ বা চেহারা।

হযরত ইবনে যায়েদ (রা.) থেকে বর্ণিত, وِجْهَةٌ এর মর্মার্থ হল قِبْلَةٌ কিবলা। হযরত জাবীর (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মানসূরকে وَ لِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا এই আয়াতের মর্মার্থ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম–। তিনি জবাবে বললেন, نَحْنُ نَقْرَءُهَا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا قِبْلَةً يَّرْضَوْنَهَا আমরা তা এমনভাবে পাঠ করি "এবং প্রত্যেকের জন্যই (নির্দিষ্ট) কিবলা রয়েছে, যা সে পছন্দ করে। মহান আল্লাহ্র বাণী– مُوَلِّيْهِ এর মর্ম হল নিজের মুখকে সম্মুখে যা আছে তার দিকে ফিরিয়ে নেয়া।

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, هُوَ مُوَلِّيْهَا এর অর্থ هو مستقبلها অর্থাৎ–সে তার নিজের চেহারাকে কিবলার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী–।

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত, এখানে التولية শব্দের অর্থ الإقبال বা কিবলার দিকে প্রত্যাবর্তন করা–। যেমন কেউ অন্যকে বলল, أنصرف الىّ (সে আমার দিকে ফিরেছে), অর্থাৎ أقبل الىّ (সে আমার দিকে আগমন করেছে)। الانصراف শব্দটি ব্যবহৃত হয় الانصراف عن الشئ (কোন

বস্তু থেকে প্রত্যাবর্তন করা) অর্থে–। এরপর বলা হয়– انصرف الى الشئ এর অর্থ–أقبل اليه منصرفًا عن غيره সে অন্যের কাছে হতে প্রত্যাবর্তিত হয়ে তার দিকে আগমন করল)। অনুরূপভাবে বলা হয়– وَلَّيْتُ عَنْهُ(তার নিকট হতে আমি প্রত্যাবর্তন করলাম), اذا أدبرت عنه (অর্থাৎ–যখন আমি তার নিকট হতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলাম)। এরপর বলা হয়–وَلَّيْتُ اِلَيْهِ অর্থাৎ أقبلت اليها موليا عن غيره (অর্থাৎ অন্যের নিকট হতে পৃষ্ঠ প্রদর্শনপূর্বক আমি তার নিকট প্রত্যাবর্তন করলাম)। أقبلتُ ক্রিয়াটির অর্থ– التوليةবা প্রত্যাবর্তন করা। আল্লাহ্ পাকের বাণী– هُوَ مُوَلِّيْهِ (সে তার দিকে মুখ করল) আর তা সকলের জন্যই প্রযোজ্য–। مُوَلِّيْهَا শব্দটি واحد একবচন হিসেবে ব্যবহৃত হলেও এর অর্থ হবে لِكُلٍّ অর্থাৎ সবার জন্যই। এর অর্থ হবে, و لكل اهل ملة وجهة (অর্থাৎ প্রত্যেক ধর্মালম্বীর জন্যই কিবলা রয়েছে, যেদিকে তাদের মুখ ফিরায়।

ইবনে আব্বাস (রা.) এবং অন্যান্য তাফসীরকারগণ থেকে বর্ণিত, তাঁরা শব্দটিকে مُوَلَّيْهَا পাঠ করেছেন। এর অর্থ হল– موجه نحوها (উহার দিকে মুখ করল)।

কিরাআত বিশেষজ্ঞগণের কয়েকজন পাঠ করেছেন, و لكل وجهة তানবীন বাদ দিয়ে। তাও একটি পদ্ধতি। তবে এইরূপে পড়া বৈধ নয়। কেননা যখন ঐরূপে পড়া হয়, তখনخبر অসমাপ্ত থাকবে। এমতাবস্থায় বাক্যের কোন অর্থই হবে না।

আমাদের মতে উল্লেখিত আয়াতের সঠিক পাঠরীতি হল– وَ لِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا এর অর্থ প্রতেকের জন্য কিবলা রয়েছে। যে দিকে সে মুখ ফিরায়। উল্লিখিত পাঠরীতির জন্য সুস্পষ্ঠ প্রমাণ রয়েছে।

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য পাঠরীতির ব্যবহার নগণ্য। আর যে পাঠরীতি প্রসিদ্ধি লাভ করে তাই দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হয়।

মহান আল্লাহ্র বাণী– فَاسْتَبِقُوْا الْخَيْرَاتِ (অতএব, তোমরা সৎকার্যের সাধনায় দ্রুতগামী হও)। আল্লাহ্ পাকের বাণী– فَاسْتَبِقُوْا–এর অর্থ তোমরা দ্রুতগামী হও।

রাবী (র.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্ পাকের কালাম– فَاسْتَبِقُوْا الْخَيْرَاتِ "তোমরা কল্যাণকর কাজে দ্রুত ধাবিত হও।" এর মর্মার্থ হে মু'মিনগণ, আমি তোমাদের জন্য সত্য বর্ণনা করেছি এবং কিবলার সম্পর্কে তোমাদেরকে হিদায়াত করেছি। যে ব্যাপারে ইয়াহুদী, খ্রীস্টান এবং তোমাদের ব্যতীত অন্যান্য ধর্মালম্বীরা পথভ্রষ্ট হয়েছে। অতএব, তোমরা নেক আমলের ব্যাপারে দ্রুতগামী হও– তোমাদের–প্রতিপালকের শোকর আদায় কর। তোমরা ইহ্জগতেই আর তোমাদের পরকালীন

চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্যে দুনিয়া থেকে সম্বল সংগ্রহ কর। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্যে নাজাতের পথ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি। অতএব, সীমা লঙ্ঘণে তোমাদের কোন ওযর আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না। আর তোমরা তোমাদের কিবলার হিফাজত কর। তাকে বিনষ্ট করোনা ; যেমনটি করেছে তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহ। অন্যথায় যেভাবে তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে ঠিক তেমনিভাবে তোমরাও পথ ভ্রষ্ট হবে।

কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ-এর মর্মার্থ হল তোমরা কখনও তোমাদের কিবলার ব্যাপারে ধোঁকা খেয়ো না। ইব্‌নে যায়েদ (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্‌র কালাম- فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ সম্পর্কে তিনি বলেন, এর মর্মার্থ হল কল্যাণকর কাজসমূহ الاعمال الصالحة।

মহান আল্লাহ্‌র কালাম- اَيْنَ مَا تَكُوْنُــوْا يَاْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْـــرٌ (অর্থ ঃ "তোমরা যেখানেই থাক না কেন, আল্লাহ্ তোমাদের সকলকেই একত্রিত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাশীল"।) আল্লাহ্ পাকের কালাম- اَيْنَ مَا تَكُوْنُوا يَاْتِ بِكُمُ اللّٰهُ-এর মর্মার্থ হলঃ তোমরা পৃথিবীর যে কোন স্থানে ধ্বংস প্রাপ্ত হওনা কেন, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ পাক তোমাদের সকলকেই একত্রিত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান"।

হযরত রাবী (র.) থেকে বর্ণিত, মহান আল্লাহ্‌র কালাম- اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يَاْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا এর মর্মার্থ হল তোমরা যেখানেই থাক না কেন, আল্লাহ্ তোমাদেরকে কিয়ামতের দিনে একত্র করবেন।

হযরত সূদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, أَيْنَمَا تَكُوْنُوْا يَاْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا এর মর্মার্থ,-তোমরা যেখানেই থাক না কেন আল্লাহ্ তোমাদেরকে কিয়ামতের দিনে একত্র করবেন। আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত দ্বারা তাঁর আনুগত্য করার এবং এ জগতেই পরকালের উদ্দেশ্যে পাথেয় সংগ্রহ করার ব্যাপারে মু'মিনগণকে বুঝিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উদ্দেশ্যে বলেন যে, হে ম'মিনগণ ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের আনুগত্যের মাধ্যমে এবং তাঁর বন্ধু ইবরাহীম (আ.)-এর কিবলা ও তাঁর শরীয়ত গ্রহণ পূর্বক তোমাদের হিদায়েতের পথ সুগম করার জন্যে কল্যাণকর কাজের দিকে দ্রুত ধাবিত হও। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই তোমাদেরকে এবং তোমাদের কিবলা, ধর্ম ও শরীয়তের বিরোধী সকলকেই কিয়ামত দিবসে উপস্থিত করবেন, তোমরা পৃথিবীর যে কোন প্রান্তেই থাক না কেন-। যাতে করে, যারা তোমাদের মধ্যে নেককার তাদের পূর্ণ সওয়াব প্রদান করা হয় এবং যারা তোমাদের মধ্যে বদকার তাদেরকে শাস্তি দেয়া হয়। মহান আল্লাহ্‌র কালাম- اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ এর মর্মার্থ-নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের মৃত্যুর পর তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তোমাদেরকে কবর থেকে উঠিয়ে একত্রিত করার এ ছাড়া আর যা ইচ্ছা করেন, সর্ব বিষয়েই সম্পূর্ণ সক্ষম। তাই তোমরা তোমাদের মৃত্যুর পূর্বে কিয়ামত ও হাশর দিবসের জন্যে নিজেদেরকে

নেক আমলের দিকে মনোযোগী হও।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী–

وَ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ اِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ وَ مَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ –

অর্থ ঃ আর (হে রাসূল) "আপনি যে স্থান থেকেই বের হন, আপনার মুখ মাসজিদুল হারামের দিকে ফিরাবেন; এবং নিশ্চয় তাই আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে বাস্তব সত্য। বস্তুত তোমরা যা করতেছ তদ্বিষয়ে আল্লাহ্ বে-খবর নন"। (সূরা বাকারা ঃ ১৪৯)

এর ব্যাখ্যা ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী– وَ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ–এর মর্মার্থ–হে রাসূল (সা.) ! যে স্থান থেকেই আপনি বের হোন এবং যে স্থানের দিকেই মুখ করুন না কেন,–(নামাযের সময়) মাসজিদুল হারামের দিকে আপনার মুখ করুন। এখানে التولية প্রত্যাবর্তন করার মর্ম হল–মাসজিদুল হারামের দিকে মুখমন্ডল করা। الشطر –শব্দের অর্থ ইতিপূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি। মহান আল্লাহ্‌র বাণী–وَ اِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ এর মর্মার্থ হল– মাসজিদুল হারামের দিকে মুখ করা অবশ্যই সত্য, তা আপনার প্রতিপালকের নিকট হতে নির্ধারিত হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই–। তাই তোমরা তাকে সংরক্ষণ কর (অর্থাৎ তার উপর স্থির থাক) এবং সে দিকে কিবলা করার ব্যাপারে মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশের অনুগত থাকো–। মহান আল্লাহ্‌র বাণী – وَ مَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ এর মর্মার্থ হল–আল্লাহ্ তোমাদের কার্যাবলী ভুলে যাননি এবং তা থেকে বে–খবর ও নন। বরং তিনি তা তোমাদের জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছেন। পরিশেষে তিনি তোমাদেরকে কিয়ামতের দিনে তার প্রতিদান দেবেন।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلاَّ يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ اِلاَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِى وَ لِاُتِمَّ نِعْمَتِىْ عَلَيْكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ –

অর্থ ঃ "এবং আপনি যে স্থান থেকেই বের হোন আপনার মুখ পবিত্রতম মাসজিদের দিকে ফিরান এবং তোমরাও যে যেখানে আছ, তোমাদের মুখ সেদিকেই ফিরাবে তা হলে অত্যাচারী লোকেরা ব্যতীত অন্য কারোও সাথে কলহ হবে না। অতএব, তোমরা তাদেরকে ভয় করো না এবং শুধু আমাকেই ভয় করো। আর যেন আমি তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামতকে সম্পূর্ণ করি এবং তোমরাও

যেন সুপথ লাভ করতে পার। (সূরা বাকারা ঃ ১৫০)

মহান আল্লাহ্র কালাম- وَ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ এর মর্মার্থ হল-হে রাসূল (সা.) ! আপনি পৃথিবীর যে কোন স্থান বা প্রান্ত থেকেই বের হোন, আপনার মুখ মাসজিদুল হারামের দিকে ফিরান। মহান আল্লাহ্র বাণী-وَ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوْهَكُمْ এর মর্মার্থ হে মু'মিনগণ, তোমরা পৃথিবীর যে কোন স্থানেই অবস্থান কর না কেন, নামাযের মধ্যে তোমাদের মুখ মাসজিদুল হারামের দিকে ফিরাও।

মহান আল্লাহ্র কালাম - لِئَلاَّ يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ اِلاَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِىْ এর ব্যাখ্যা ঃ তাফসীরকারগণের একদল বলেছেন যে, মহান আল্লাহ্র কালাম- لِئَلاَّ يَكُوْنَ لِلنَّاسِ এর মধ্যকার الناس শব্দের দ্বারা আহ্লে কিতাবকে বুঝানো হয়েছে। যিনি এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তাঁর স্বপক্ষে নিম্নের হাদীস উল্লেখ করা হল।

হযরত কাতাদা (র.) থেকে মহান আল্লাহ্র বাণী- لِئَلاَّ يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ সম্পর্কে বর্ণিত, এ আয়াত দ্বারা আহলে কিতাবকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, হযরত নবী করীম (সা.) যখন পবিত্রতম মসজিদ কা'বার দিকে মুখ ফেরালেন, তখন তারা বলল, এ ব্যক্তি হযরত মুহাম্মদ (সা.)) আপন পিতৃ পুরুষের কা'বা ঘর এবং স্বজাতির ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট রয়েছে।

এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এবং তাঁর সাহাবাগণের বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে নামায আদায়ের বিষয়ে আহলে কিতাবের সঙ্গে কিসের ঝগড়া ছিল ? জবাবে বলা হবে এ বিষয়ে ইতিপূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি। আর তা হল-তারা বলতো যে, হযরত মুহামদ (সা.) এবং তাঁর সঙ্গীগণ অবগত নন যে, তাদের কিবলা কোথায় ? পরিশেষে আমরাই তাদেরকে এ বিষয়ে সঠিক পথ প্রদর্শন করলাম। তাদের বক্তব্য হল হযরত মুহাম্মদ (সা.) আমাদের ধর্মের ব্যাপারে বিরোধিতা করেন অথচ, আমাদের কিবলার অনুসরণ করেন। তাই ছিল হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর সঙ্গীদের সাথে তাদের বিবাদের বিষয়। এ ব্যাপারে তাদের সঙ্গে মুশরিকদের একদল নির্বোধ ও শত্রুভাবাপন্ন লোক ও অংশগ্রহণ করে। তাঁর সাথে কলহপ্রিয় সম্প্রদায়ের কথা ইতিপূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি, যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবে বর্ণনা করেছেন। এ ছিল শুধুমাত্র একটি নিরর্থক ঝগড়া। অতএব, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এই ঝগড়ার আবসান করে দিলেন এবং হযরত নবী করীম (সা.) ও মু'মিনদেকে ইয়াহুদীদের কিবলা থেকে হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্ আলায়হিস সালামের কিবলার দিকে প্রত্যাবর্তিত করে কলহের চির অবসান করে দেন। এ সম্পর্কেই আল্লাহ্র বাণী- لِئَلاَّ يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ বর্ণিত হয়েছে। উল্লিখিত আয়াতে لناس। শব্দের দ্বারা ঐসমস্ত লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা উল্লিখিত বিষয়ে তাদের সাথে বিবাদ করতো। আল্লাহ্র বাণী- اِلاَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ এর

উদ্দেশ্য হল আরবের কুরায়শ বংশের মুশরিরক। এ সম্পর্কে তাফসীরকারগণ যা ব্যাখ্যা করেছেন–তা নিম্নে উল্লেখ করা হল–।

মুহাম্মদ ইবনে আমর সূত্রে মুজাহিদ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, إِلاَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ এর উদ্দেশ্য হল মুহাম্মদ (সা.)–এর বংশের লোক। মূসা ইবনে হারূন সূত্রে সাদী থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা হল–মক্কার মুশরিকবৃন্দ।

রাবী থেকে বর্ণিত–তিনি إِلاَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ এরা হল কুরায়শ বংশের মুশরিক–।

মুজাহিদ থেকে বর্ণিত হয়েছে তিনি– إِلاَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ এই আয়াত সম্পর্কে বলেন যে, তারা হল আরবের মুশরিকের দল।

হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, إِلاَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ এরা হল কুরায়শ বংশের অত্যাচারী মুশরিকের দল। আতা (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা হল কুরায়শ বংশের মুশরিক। ইবনে জুরাইজ বলেন, আমাকে ইবনে কাছীর খবর দিয়েছেন যে, তিনি মুজাহিদকে আতা (র.)–এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করতে শুনেছেন। যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এবং তার সাহাবিগণের সাথে নামাযের মধ্যে ক'াবার দিকে তাদের মুখ ফেরানো নিয়ে কিসের বিবাদ ছিল ? তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা যেসব বিষয়ে আদেশে অথবা নিষেধ করেছেন, তদ্বিষয়ে কি মুসলমানদের সাথে মুশরিকদের বিবাদ করা বৈধ ছিল ? জবাবে বলা হবে যে, তা তাদের ধারণার পরিপন্থী ছিল। কেননা এখানে তাদের ঝগড়াটা অনর্থক এবং বিতর্কমূলক ছিল। এ আয়াতের মর্মার্থ হল যেন কুরায়শের মুশরিক ব্যতীত অন্য কোন মানুষের সাথে এ ব্যাপারে তোমাদের বিবাদ না হয়। কেননা, তোমাদের উপর তাদের দাবীটা কেবল মিথ্যা এবং অনর্থক ঝগড়া মাত্র। কিবলার ব্যাপারে তাদের কথা হল–হযরত মুহাম্মদ (সা.) আমাদের কিবলার দিকে প্রত্যাবর্তন করেছেন, অতি সত্বরই তিনি আমাদের ধর্মে ফিরে আসবেন। এ বাপারে তাদের ঐ ভ্রান্ত চিন্তাটি ছিল হযরত রাসুলুল্লাহ্ (সা.) এবং তাঁর সঙ্গীদের সাথে কুরাশয়দের বিবাদের বিষয়। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা উল্লিখিত বাণীতে মানবমন্ডলী থেকে কুরায়শের অত্যাচারীদেরকে পৃথক করেছেন। সুতরাং তারা যে দিকে কিবলা করে তাতে প্রত্যেকের জন্য ঝগড়া করা নিষিদ্ধ করেছেন। অনুরূপ আমরা যা বর্ণনা করলাম–সে বিষয়ে তাফসীরকারগণ যা বলেছেন, তা নিম্নে উল্লেখ করা হল।

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে উল্লিখিত আল্লাহ্র কালাম– لِئَلاَّ يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلاَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ সম্পর্কে বর্ণিত যে, তারা হল হযরত মুহাম্মদ (সা.)–এর সম্প্রদায়ের লোক। হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন যে, তাদের বিতর্কের বিষয়টি হল যে, তারা সবাই আমাদের কিবলার দিকে প্রত্যাবর্তন করেছেন। হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে অন্য একটি সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু

তিনি তাদের কথা – رجعت قبلتنا বাক্যটির উল্লেখ করেন নি। কাতাদা (র.) ও হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে যখন আল্লাহ্র কালাম – لِئَلاَّ يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ اِلاَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ সম্পর্কে তাঁরা উভয়ই বর্ণনা করেন যে, তারা হল আরবের মুশরিক।

যখন কা'বার দিকে কিবলা প্রত্যাবর্তিত হল, তখন তারা বলল,–তিনি তোমাদের কিবলার দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছেন। সম্ভবত অচিরেই তিনি তোমাদের মাঝে ফিরে আসবেন। মহান আল্লাহ্ বলেন–"তোমরা তাদেরকে ভয় করো না ; বরং আমাকে ভয় কর"।

কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্র কালাম– اِلاَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ এর মধ্যে যে সব অত্যাচারীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তারা হল কুরায়শ বংশের মুশরিকবৃন্দ। তাঁরা বর্ণনা করেন যে, মুশরিকগণ অচিরেই ঐ ব্যাপারে তোমাদের সাথে ঝগড়া করবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর বায়তুল হারামের দিকে কিবলা প্রত্যাবর্তনটাই ছিল তাঁর সঙ্গে তাদের ঝগড়ার বিষয়–। তারা বলল, (মুহাম্মাদ (সা.)) অচিরেই আমাদের ধর্মে ফিরে আসবেন, যেমন করে তিনি আমাদের কিবলার দিকে প্রত্যাবর্তন করেছেন। অতএব, আল্লাহ্ তা'আলা তখন উল্লিখিত আয়াতের শেষ পর্যন্ত সবটুকু অবতীর্ণ করেন। রাবী থেকে (উল্লেখিত হাদীসের) অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। ইবনে আব্বাস (রা.) রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর কয়েকজন সাহাবা থেকে বর্ণনা করেন যে, যখন নবী করীম (সা.) বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে (কিছু দিন) নামায পড়ার পর কা'বার দিকে মুখ করবেন তখন মক্কার মুশরিকগণ বলল, মুহাম্মদ (সা.) তাঁর ধর্মের ব্যাপারে অস্থির হয়ে গেছেন। অতএব তিনি তাঁর কিবলা তোমাদের কিবলার দিকে করলেন। তিনি জ্ঞাত যে, তোমারাই তার থেকে অধিক হিদায়েত প্রাপ্ত। সম্ভবত অচিরেই তিনি তোমাদের ধর্মে দীক্ষিত হবেন। অতএব, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে উদ্দেশ্য করেই – لِئَلاَّ يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ اِلاَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِىْ

এই আয়াত অবতীর্ণ করেন। ইবনে জুরাইজ থেকে হয়েছে, তিনি বলেন যে, আমি 'আতা' (র.)–কে আল্লাহ্র কালাম– لِئَلاَّ يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ اِلاَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। রাবী বলেন, যখন কা'বার কিবলার দিকে কিবলা ফিরানো হল এবং তার প্রতি নির্দেশ প্রদান করা হল–যা আমাদের থেকে অপ্রত্যাশিত মনে করা হচ্ছিল, তখন কুরায়শগণ বলল–"তিনি আমাদের কিবলা গ্রহণ করেছেন"। এই ছিল তাদের ঝগড়ার বিষয়। আর তারা হল অত্যাচারী সম্প্রদায়। ইবন জুরাইজ বলেন, 'আব্দুল্লাহ্ ইবন কাছীর আমাকে খবর দিয়েছেন যে, তিনি মুজাহিদকে 'আতা' (র.)–এর বর্ণনার অনুরূপ কথা বলতে শুনেছেন। মুজাহিদ বলেন যে, তাদের ঝগড়ার বিষয়টা হল رجعت الى قبلتنا তিনি (মুহাম্মদ (সা.)) আমাদের কিবলার দিকে মুখ করেছেন" এই–বক্তব্যটা। মুফাসসীরগণ اِلاَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, আমাদের উল্লিখিত বর্ণনা

থেকেও তা স্পষ্ট হয়েছে এবং তাদের ব্যাখ্যায় আমাদের বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। সাধারণত হরফে استثناء দ্বারা এর পূর্ববর্তী বক্তব্য নিষিদ্ধ প্রমাণিত হয়, যেমন কোন ব্যক্তির বক্তব্য مَا سَارَ مِنَ النَّاسِ اَحَدٌ اِلاَّ اَخُوْكَ (তোমার ভাই ব্যতীত কোন মানুষই ভ্রমণ করে নি)। এখানে ভাই এর ভ্রমণটাই শুধু প্রমাণিত হয়েছে এবং অন্যান্য সকল লোকের ভ্রমণ অস্বীকার করা হয়েছে। অতএব, আল্লাহ্র কালাম– لِئَلاَّ يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ اِلاَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর পক্ষ হতে কারো সাথে ঝগড়া ফাসাদ করাকে অস্বীকার করা হয়েছে এবং নবী করীম (সা.) ও তাঁর সঙ্গীদের উপর নামাযের মধ্যে কা'বার দিকে তাদের মুখ করার বিষয়ে তাদের মিথ্যা দাবীর ও অস্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু কুরায়শদের মধ্যে থেকে যারা অত্যাচারী–তাদের পক্ষ হতে ঝগড়া করা–ও মিথ্যা দাবী করার বিষয় সাব্যস্থ হয়েছে–। কেননা তারা বলে যে, (হে মুসলমানগণ !) আমাদের দিকে এবং আমাদের কিবলার দিকে তোমাদের মনে করাটাই প্রমাণ করে যে, তোমাদের থেকে আমরা অধিক হিদায়াত প্রাপ্ত। অথচ তোমরা ইতিপূর্বে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে তোমাদের মুখ করাকে পথ ভ্রষ্টতা এবং মিথ্যা বলে মনে করতে। মুফাসসীরগণের পক্ষ হতে যখন সার্বিক প্রমাণসহ আয়াতের উল্লিখিত ব্যাখ্যা করা হল, তখন ঐ ব্যক্তির ব্যাখ্যা ভুল যে মনে করে যে, আল্লাহ্ পাকের কালাম–اَلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ এর অর্থ وَ لاَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ হবে। তখন اِلاَّ এর। অর্থ হবে واو এর সুতরাং যদি এই অর্থ নেয়া হয়, তবে النفى الاول দ্বার রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এবং তাঁর সাথীদের উপর কা'বার দিকে তাদের মুখমন্ডল প্রত্যাবর্তন করার ব্যাপারে মানব মন্ডলীর সকলের ঝগড়া–বিবাদকেই অস্বীকার করা বুঝাবে–। আর তা সঠিক অর্থের পরিপন্থী। আর তার পরবর্তী বাক্য الَّذِيْنَ – اِلاَّ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ এর মধ্যে এর উল্লেখ হবে না। তখন اِلاَّ এর অর্থ হবে التلبيس (সংমিশ্রণ)। যা পূর্ববর্তী বাক্যের দিকে اضافت (সংযোগ করা) কিংবা وصف বিশেষণ করা থেকে পবিত্র হবে, অর্থাৎ পৃথক হবে। এতে বাক্যের সঠিক অর্থ প্রকাশ পাবে না। যখন اِلاَّ কে الواو এর অর্থে ব্যবহার করা হয়, তখন তা হবে অপ্রচলিত বাক্য اِلاَّ এর অর্থ استثناء (পৃথক করণ) যেমন পূর্বে উল্লেখ হয়েছে। যথা কোন ব্যক্তির উক্তি سار القوم الاعمرا الا أخاك এর অর্থ হবে– الاعمراو اخاك অর্থাৎ সম্প্রদায়ের সকল লোকই ভ্রমণ করেছে, কিন্তু উমার তোমার ভাই ব্যতীত। যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করলাম। যদি এর প্রয়োগ এইরূপ হয়, তবে তা অবৈধ হবে। কারণ কিছু লোকের দাবী হল এখানে اِلاَّ এর ব্যবহার হবে واو এর অর্থে, যা عطف (সংযুক্তি) এর অর্থ প্রদান করবে। তখন ঐ ব্যক্তির বক্তব্য বাতিল বলে গণ্য হবে–যে ব্যক্তি মনে করে যে, اِلاَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ اِلاَّ فَاِنَّهُمْ لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ

অর্থাৎ তাদের মধ্য হতে অত্যাচারিগণ ব্যতীত, কেননা তাদের দাবীর কোন দলীল বা প্রমাণ নেই। অতএব তোমরা তাদেরকে ভয় করো না। যেমন কোন ব্যক্তির উক্তি–**الناس كلهم حامدون لك الا الظالم المعتدى عليك** 'সমস্ত লোকই তোমার প্রশংসাকারী, কিন্তু তোমার শত্রুতাকারী অত্যাচারী ব্যক্তি ব্যতীত।' কেননা, সে তার শত্রুতার কারণ ব্যতীত শত্রুতা করে না এবং তোমার প্রশংসা ও পরিত্যাগ করে না। **ظالم** (অত্যাচারী) এ ব্যপারে কোন দলীল নেই। কালামে পাকে তাদেরকে (আহলে কিতাবদেরকে) **ظالم** অত্যাচারী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কারণ, তারা (আহলে কিতাবগণ) যে ব্যাখ্যা দাবী করেছে, তা ভ্রান্ত হওয়ার উপর মুফাসসীরগণ একমত হয়েছেন। আর তাদের বক্তব্য ভ্রান্ত হওয়ার ব্যাপারে এ কথার সাক্ষ্যই যথেষ্ট যে, তা ভ্রান্ত হওয়া সম্পর্কে সকল মুফাসসীরই একমত। প্রকাশ থাকে যে, ঐ ব্যক্তির বক্তব্য বাতিল বলে গণ্য হবে, যে ব্যক্তি মনে করে যে, কালামে পাকে উল্লিখিত আয়াত **اَلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا** এর অর্থ–এখানে আরবের সাধারণ লোক। প্রকৃতপক্ষে তারা ছিল ইয়াহূদী ও নাসারা (খ্রীস্টান) সম্প্রদায়। কেননা, তারা নবী করীম (সা.)–এর সঙ্গে ঝগড়ায় লিপ্ত হতো। কিন্তু আরবের সাধারণ লোকের এ ব্যাপারে কোন ঝগড়া ছিল না। যারা তাঁর সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ করতো,–তাদের ঝগড়াটা ছিল খন্ডনীয়। যেন তোমার বক্তব্য ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে এমন যে, যার যুক্তি তুমি খন্ডণ করতে চাও **ان لك على حجة و لكنها منكرة** "আমার উপর তোমার দলীল প্রমাণ আছে বটে, কিন্তু তা খন্ডনীয়''। কাজেই তুমি ঝগড়া করছ প্রমাণহীনভাবে। অতএব তোমার প্রমাণ দুর্বল। আল্লাহ্ পাকের বাণী– **اِلاَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ** এর মর্মার্থ হল– আহলে কিতাব। কেননা তোমাদের উপর তাদের ঝগড়াটা হল মনগড়া, কিংবা দলীল প্রমাণ হল দুর্বল। কেউ কেউ বলন, এখানে **اِلاَّ** এর অর্থ হবে **لكنَّ** এর ন্যায়। আর ঐ ব্যক্তির বক্তব্য হবে দুর্বল–যিনি মনে করেন যে, তা **ابتـــداء** (প্রারম্ভিক) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তখন এর অর্থ হবে–**اِلاَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ** তাদের মধ্যে থেকে যারা **ظلم** (অত্যাচার) করেছে, তাদেরকে তোমরা ভয় করো না। কেননা মুফাসসীরগণের পক্ষ হতে এ ব্যাপারে ব্যাখ্যা এসেছে যে, মহান আল্লাহ্র পক্ষ হতে তা তখন **اَلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ** থেকে **خبر** খবর হবে যে, তারা নবী করীম (সা.) এবং তাঁর সঙ্গীদের সাথে বিবাদ করতো, যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করলাম। এমতাবস্থায় তাদের দলীল দুর্বল, না শক্তিশালী–এর গুণাগুণ বর্ণনা করা খবরের উদ্দেশ্য নয়। যদি এর দলীল দুর্বল হয়, তবে নিশ্চয়ই তা বাতিল বলে গণ্য হবে। আর এতে শুধু **اَلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ** এর **اثبات** (হাঁ) প্রমাণ করাই উদ্দেশ্য, যা **الذين** থেকে **نفى** হয়েছে, যার পূর্বে **صفة** হতে **حرف استثناء** রয়েছে।

হযরত রাবী (র.) থেকে বর্ণিত, এক ইয়াহুদী আবুল আলীয়া (র.)–এর সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হল। অতএব, সে বলল যে, হযরত মূসা (আ.) বায়তুল মুকাদ্দাসের সাখরার দিকে ফিরে নামায আদায় করতেন। তখন আবুল আলীয়া (র.) বললেন যে, তিনি বায়তুল হারামের 'সাখরার' দিকে ফিরে নামায আদায় করতেন। রাবী বর্ণনা করেন যে, সে তখন বলল, আমার এবং তোমার মাঝখানে পাহাড়ের প্রান্তে একটি "মসজিদে সালেহ" (হযরত সালেহ (আ.)–এর মসজিদ) রয়েছে। আবুল আলীয়া (র.) তখন বলেন, আমি সেখানে নামায আদায় করেছি এবং নামাযে মাসজিদুল হারামের দিকে মুখ করেছি। হযরত রাবী (র.) বলেন, আমাকে আবুল আলীয়া (র.) সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি "মসজিদে যূল কারনাঈন" এর পার্শ্বে দিয়ে অতিক্রম করেছেন এবং প্রত্যক্ষ করেছেন যে, তার কিবলা ছিল কা'বার দিকে।

মহান আল্লাহ্‌র কালাম– فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِيْ এর মর্মার্থ হল–তোমরা ঐ সমস্ত লোককে ভয় করো না যাদের সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দিলাম। তাদের কলহ দ্বন্দ্ব এবং অত্যাচার সম্পর্কে, তাদের আপত্তিকর মন্তব্য যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) আমাদের কিবলার দিকে ফিরে এসেছেন, অচিরেই তিনি আমাদের ধর্মে ফিরে আসবেন কিংবা তারা সক্ষম হলে তোমাদের ধর্মের ক্ষতি সাধন করবে। অথবা আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে যে হিদায়েত দিয়েছেন তা থেকে তোমাদেরকে প্রতিরোধ করবে। অর্থাৎ তোমরা আমাকে ভয় কর এবং আমার আদেশের বিরোধিতার কারণে তোমাদের উপর আমার শাস্তি নাযিল হওয়ার ভয় কর। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাগণকে বিশেষভাবে এ কিবলার দিকে ফিরে নামায আদায়ের আদেশ দিয়েছেন এবং অন্য দিকে ফিরতে নিষেধ করেছেন।

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ "হে মু'মিনগণ ! আমি তোমাদেরকে নামাযের মধ্যে মাসজিদুল হারামের দিকে কিবলা করার বিষয়ে যে নির্দেশ প্রদান করেছি তা অমান্য করার পরিণাম সম্পর্কে আমাকে ভয় করো।" এ ব্যাপারে হযরত সুদ্দী (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

হযরত সুদ্দী (র.) থেকে فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِيْ সম্পর্কে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, এর মর্মার্থ হল–তোমরা ভয় করো না যে, আমি তোমাদেরকে তাদের ধর্মে ফিরিয়ে দেব।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী– وَ لِاُتِمَّ نِعْمَتِيْ عَلَيْكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ "এবং যাতে আমি তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহ পূর্ণ করি এবং যেন তোমরা সুপথ প্রাপ্ত হও"। অর্থাৎ মহান আল্লাহ্‌র বাণীর মর্মার্থ হল–যেন আমি তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহসমূহ পরিপূর্ণ করে দেই। আর তোমারা পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত এবং নগর থেকেই বের হও না কেন (নামাযে) তোমাদের মুখ মাসজিদুল হারামের দিকে ফিরাও। হে মুহাম্মদ (সা.) এবং মু'মিনগণ, তোমরা যেখানেই অবস্থান কর না কেন, তোমাদের নামাযে তোমাদের মুখ ঐ দিকেই ফিরাও। আর তাকে তোমাদের কিবলা বলে স্থির করে নাও। যেন কুরায়শের মুশরিকগণ ব্যতীত কোন মানুষের জন্যে তা ঝগড়ার কারণ না হয়। আর তার দ্বারা আমি

যেন আমার বন্ধু ইবরাহীম (আ.), যাকে মানবমন্ডলীর ইমাম করেছি, তাঁর কিবলার দিকে তোমাদেরকে ফিরায়ে আমি আমার অনুগ্রহ তোমাদের প্রতি পূর্ণ করে দিতে পারি। আর তার দ্বারা আমি শরীয়ত তথা তোমাদের মিল্লাতে হানাফীয়াকে (খাঁটি ধর্মকে) পরিপূর্ণ করে দেব, যে ধর্মের অনুসরণ করার জন্য আমি ইতিপূর্বে নূহ্ (আ.), ইবরাহীম (আ.), মূসা (আ.), ঈসা (আ.) এবং অন্যান্য সকল নবীকেই নির্দেশ দিয়ে ছিলাম। তা হল, মহান আল্লাহ্‌র সেই নিয়ামত বা দান, যা হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর মু'মিন সঙ্গীদের উপর পরিপূর্ণ করার কথা মহান আল্লাহ্ সংবাদ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ্‌র বাণী- وَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ এর অর্থ হল-যেন তোমরা কিবলার ব্যাপারে সঠিক পথে পরিচালিত হও। وَ لَعَلَّكُمْ শব্দটি আল্লাহ্‌র পূর্ববর্তী বাণী-ولأتم نعمتى عليكم এর সঙ্গে عطف (সংযুক্ত) হয়েছে এবং ولأتم نعمتى عليكم বাক্যটি আল্লাহ্‌র বাণী- لِئَلاَّ يَكُوْنَ এর সঙ্গে عطف (সংযুক্ত) হয়েছে।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী-

كَمَا اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلاً مِّنْكُمْ يَتْلُوْ عَلَيْكُمْ اٰيَاتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَ يُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ-

অর্থ ঃ যেমন আমি তোমাদের মধ্যে থেকেই তোমাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করেছি, যিনি তোমাদের নিকট আমার বাণীসমূহ তিলাওয়াত করেন এবং তোমাদেরকে পবিত্র করেন, আর তোমাদেরকে শিক্ষা দেন কিতাব (কুরআন) ও হিকমত এবং এমন সব বিষয় ও শিক্ষা দেন যা তোমারা জানতে না।

-সূরা বাকারা ঃ ১৫১

এর ব্যাখ্যা ঃ-যেমন আমি তোমাদের মধ্যে থেকেই তোমাদের জন্য একজন রাসূল প্রেরণ করেছি, যেন আমি আমার নিয়ামতসমূহ তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ করে দেই। আর তা হলো তোমাদের 'মিল্লাতের হানাফীয়ার' বিধানসমূহের বর্ণনার মাধ্যমে। আর আমার বন্ধু ইবরাহীম (আ.)-এর জীবন বিধানের প্রতি যেন আমি তোমাদের হিদায়েত দেই। অতএব, তাঁর প্রার্থনার বিষয়, যা তিনি আমার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন এবং তাঁর চাওয়ার বিষয়, যা তিনি আমার কাছে চেয়েছেন, তা আমি তোমাদের জন্য ও দু'আর বিষয় হিসেবে মনোনীত করলাম। তিনি প্রার্থনা করেছিলেন-

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَ اَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ-

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উভয়কে তোমার অনুগত কর এবং আমাদের বংশধর হতে একদলকে তোমার অনুগত করিও ; এবং আমাদেরকে ইবাদতের নিয়ম পদ্ধতি দেখিয়ে দাও

এবং আমাদের তওবা (অনুশোচনা) তুমি গ্রহণ কর ; নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল করুণাময়।" (সূরা বাকারা ঃ ১২৮)

যেমন আমি তোমাদের জন্য অনুসরণীয় করে দিয়েছি তার ঐ প্রার্থনা, যা তিনি আমার নিকট প্রার্থনা করেছিলেন এবং ঐ চাওয়ার বিষয় যা তিনি আমার নিকট চেয়ে ছিলেন। অতএব তিনি বলেছিলেন, হে আমাদের প্রতিপালক ! তুমি তাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল তাদের মাঝে প্রেরণ কর, যিনি তাদের কাছে তোমার বাণীসমূহে পাঠ করে শুনাবেন এবং তাদেরকে তিনি কিতাব (কুরআন) ও হিকমত শিক্ষা দেবেন, এবং তাদেরকে তিনি পবিত্র করবেন। নিশ্চই আপনি মহা পরাক্রমশালী বিজ্ঞানময়। (সূরা বাকারা ঃ ১২৯) অতএব আমি তোমাদের মধ্য থেকেই আমার সেই (আকাংক্ষিত) রাসূল প্রেরণ করমলাম,যার জন্য আমার বন্ধু ইবরাহীম (আ.) এবং তার পুত্র ইসমাঈল (আ.) তাদের বংশধরদের মধ্য হতে নবী পাঠানোর প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। যখন উল্লিখিত বাক্যের অর্থ এরূপ হয় তখন উল্লিখিত "كَمَا" মহান আল্লাহ্র বাণী– وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِيْ عَلَيْكُمْ এর كَمَا اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلاً مِّنْكُمْ (সংযোগ) হবে। আর তখন আল্লাহ্র বাণী– فَاذْكُرُوْنِيْ اَذْكُرْكُمْ তার পরবর্তী বাক্য এর সাথে متعلق (সম্পর্কযুক্ত) হবে না।

তাফসীরকারগণ বলেন যে, এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ হবে, অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ কর, যেমন আমি তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের মাঝে রাসূল প্রেরণ করেছি, তাহলে আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করবো। আর তাঁরা মনে করেন যে, مقدم (পূর্বে উল্লেখ) হয়েছে, যার (معناه تأخير) মর্মার্থ শেষে এসেছে। অতএব তাঁরা বিতর্কে নিপতিত হলেন। ইহাতে তাঁরা বাক্যের অপ্রচলিত অর্থ ও মর্ম গ্রহণ করেছেন। বাক্যের এরূপ অর্থ করা আরবী ভাষায় তাদের পারস্পরিক সম্ভাষণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যখন তাদের একজন অন্যজনকে বলে যে, كما احسنت اليك يا فلان فاحسن "ওহে ! আমি যেমন তোমাকে অনুগ্রহ করলাম, তুমিও অনুরূপ অনুগ্রহ কর"। কেননা كما এর মধ্যে ك অক্ষরটি شرط এর অর্থ ব্যবহৃত হয়েছে। তখন এর অর্থ হবে افعل كما فعلت তুমি কর, যেমন আমি করেছি। অতএব اَذْكُرُوْنِيْ (আমাকে তোমারা স্মরণ কর) এর جواب উহার পরে এসেছে। অর্থাৎ তা হল اذكركم (আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করবো) তাই كَمَا اَرْسَلْنَا বাক্যের صلة الفعل হওয়ার উপর প্রকাশ্য দলীল, যা এর পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। আর তা হল–আল্লাহ্ পাকের বাণী– فَاذْكُرُوْنِيْ اَذْكُرْكُمْ বাক্যটি خبر (বিধেয়) হয়েছে, পূর্ববর্তী বাক্য مبتداء منقطع থেকে।

আর কোন কোন ব্যাকরণবিদ মনে করেন যে, আল্লাহ্র কালাম –فَاذْكُرُ نِيْ কে যখন كَمَا اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ এর جواب মনে করা হয়, اذكركم শব্দটি উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও, তখন একই جزاء এর দু'টি

جواب হওয়ার দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়। যেমন কোন ব্যক্তির উক্তি–اذا اتاك فلان فاته ترضه (যখন সে তোমার কাছে আগমন করে তখন তাকে এমন কিছু দাও, যাতে সে খুশী হয়।) সুতরাং এই বাক্যে فاته ترضه দু'টি جواب রয়েছে, اذا اتاك বাক্যের জন্য। অনুরূপ আর একটি উক্তি ان تأتنى احسن اليك أكرمك (তুমি আমার নিকট আসলে আমি তোমার প্রতি অনুগ্রহ ও সম্মান প্রদর্শন করবো।) এইরূপ বাক্য আরবী) ভাষায় খুব শুদ্ধ নয়।

আর কিতাবুল্লাহ্‌র সাথে যে বিষয়টির সংযোগ উত্তম হয়েছে, তা আরবী ভাষায় অধিক প্রসিদ্ধ ও শুদ্ধ। তা অস্বীকারযোগ্য অপ্রচলিত বাক্যের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং অবোধগম্যও নয়। যিনি বলেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী–كَمَا اَرْسَلْنَا বাক্যটি فَاذْكُرُوْنِىْ শব্দের جواب হয়েছে, তাঁর স্বপক্ষে নিম্নের হাদীস উল্লেখ করা হল।

ইবনে আবূ নাজীহ্ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি মাহান আল্লাহ্‌র বাণী–كَمَا اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلاً مِّنْكُمْ ("যেমন আমি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের মাঝে রাসূল প্রেরণ করেছি") আয়াতাংশের ব্যাখ্যা সম্পর্কে বলেন যে, كما فعلت فاذكرونى আমি যেমন করেছি, (তেমনিভাবে) তোমাদের আমাকে স্মরণ কর।

মুজাহিদ (র.) থেকে ও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী– كَمَا اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلاً مِّنْكُمْ এর দ্বারা আরববাসীকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।তাদেরকে মহান আল্লাহ্ তা'আলা উদ্দেশ্য করে বলেন যে, হে আরববাসী ! তোমরা আমার আনুগত্যেকে অত্যাবশ্যক মনে কর এবং ঐ কিবলার দিকে প্রত্যাবর্তিত হও, যে দিকে প্রত্যাবর্তনের জন্য আমি তোমাদেরকে নির্দেশ প্রদান করেছি। যেন তোমাদের থেকে ইয়াহুদীদের দলীল খন্ডিত হয়। অতএব তোমাদের উপর তাদের আর কোন ঝগড়া থাকবে না। আর আমি যেন তোমাদের উপর আমার নিয়ামতসমূহ পরিপূর্ণ করে দিতে পারি। সুতরাং তোমরা হিদায়েত গ্রহণ কর, যেমন আমি আমার নিয়ামতের মাধ্যমে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ শুরু করেছি। অতএব আমি তোমাদের মাঝে তোমাদের মধ্য থেকেই রাসূল প্রেরণ করেছি। আর ঐ রাসূল, যাঁকে তাদের মাঝে তাদের মধ্য থেকে প্রেরণ করা হল –তিনি হলেন মুহাম্মদ (সা.)।

রাবী (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ পাকের বাণী–كَمَا اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلاً مِّنْكُمْ দ্বারা মুহাম্মদ (সা.)-কে বুঝানো হয়েছে। يتلو عليكم أياتنا এর অর্থ آيات القرآن আর্থাৎ তিনি তোমাদের কাছে আমার কুরআনের বাণী পড়ে শুনাবেন। و يزكيكم এর অর্থ و يطهركم من الذنوب পাপসমূহ থেকে তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করবেন। ويعلمكم الكتاب এর অর্থ و هو الفرقان অর্থাৎ তিনি তোমাদেরকে– সত্য–মিথ্যার পার্থক্যকারী গ্রন্থ শিক্ষা দেবেন। এর মর্মার্থ হল–তিনি তাদেরকে বিধি–বিধান শিক্ষা

দেবেন। অর্থাৎ শরীয়তের তথ্যবহুল জ্ঞান, ফিকাহ্ (ধর্মীয় গভীর জ্ঞান), ইত্যাদি শিক্ষা দেবেন। এ সব যাবতীয় বিষয় দলীল প্রমাণসহ আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী- وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ এর মর্মার্থ হল-তিনি তোমাদেরকে পূর্ববর্তী নবীগণের সংবাদ, অতীত জাতিসমূহের ইতিহাস এবং বিভিন্ন ঘটনাবলীর তথ্যবহুল সংবাদ শিক্ষা দেবেন, যা আরবগণ ইতিপূর্বে জানতো না। অতএব তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট হতে এইসব শিক্ষা গ্রহণ করল। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে জানিয়ে দিলেন যে, এই সব যাবতীয় বিষয়ের সংবাদ তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মাধ্যমে অবগত হয়েছে।

মহান আল্লাহ্র বাণী-

فَاذْكُرُونِىْ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْلِىْ وَلاَ تَكْفُرُوْنِ -

অর্থ ঃ "অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করবো। তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অকৃতজ্ঞ হয়ো না। (সূরা বাকারা ঃ ১৫২)

এর মমার্থ হল-'হে মু'মিনগণ ! তোমরা আমার আনুগত্যের মাধ্যমে আমাকে স্মরণ কর, যে বিষয়ে আমি তোমাদেরকে নির্দেশ প্রদান করেছি এবং যে বিষয়ে আমি তোমাদেরকে নিষেধ করেছি। তাহলে-আমি তোমাদেরকে আমার অনুগ্রহ ও ক্ষমার মাধ্যমে স্মরণ করবো।

যেমন সাঈদ ইবনে জুবায়র থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, اذكرونى أذكركم এর অর্থ হল-তোমরা আমার আনুগত্যের মাধ্যমে আমাকে স্মরণ কর, তাহলে আমি তোমাদেরকে স্মরণ করবো। কোন কোন তাফসীরকার উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, الذكر। এর অর্থ মহান আল্লাহ্র প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করা। যিনি একথা বলেছেন-তাঁর সমর্থনে নিম্নের হাদীস বর্ণিত হল।

হযরত রাবী (র.) থেকে মহান আল্লাহ্র বাণী-فَاذْكُرُنِىْ اَذْكُرْكُمْ وَ اشْكُرُوْلِىْ وَ لاَ تَكْفُرُوْنِ এর মর্মার্থ-নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা ঐ ব্যক্তিকে স্মরণ করেন, যে তাঁকে স্মরণ করে। আর তিনি ঐ ব্যক্তিকে অধিক দান করেন, যে ব্যক্তি তাঁর দানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। আর যে ব্যক্তি তাঁর দানকে অস্বীকার করে তাঁকে শাস্তি প্রদান করেন।

হযরত সুদ্দী (র.) থেকে-اَذْكُرُوْنِىْ اَذْكُرْكُمْ মর্মার্থ বর্ণিত, যে কোন বান্দা মহান আল্লাহ্কে স্মরণ করেন, আল্লাহ্ পাক তাকে স্মরণ করেন। যে কোন মু'মিন তাঁকে স্মরণ করলে-আল্লাহ্ তাকে স্মরণ করেন অনুগ্রহের মাধ্যমে। আর কোন কাফির (অবিশ্বাসী) তাঁকে স্মরণ করলে তিনি তাকে স্মরণ করেন শাস্তির মাধ্যমে।

মহান আল্লাহ্র বাণী-وَ اشْكُرُوْلِىْ وَ لاَ تَكْفُرُوْنِ "এবং তোমরা আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, কুফরী করো না" এর মর্মার্থ হল-হে মু'মিনগণ ! আমি সমস্ত নবীগণ ও সূফীগণের প্রতি যে ইসলামী বিধান

জারী করেছিলাম, সে দীন ইসলামের হিদায়েত দ্বারা তোমাদেরকে অনুগৃহীত করেছি, কাজেই তোমরা আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। ولاتكفرون–এর অর্থ তোমাদের উপর প্রদত্ত আমার অনুগ্রহকে অস্বীকার কর না। তাহলে তোমাদের উপর আমি যে নিয়ামত প্রদান করেছি, তা ছিনিয়ে নেব। অতএব, তোমরা আমার প্রদত্ত নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তাহলে আমি তোমাদেরকে অধিক পরিমাণে দান করবো এবং সুপথ প্রদর্শন করবো । আমার বান্দাদের মধ্য হতে যার প্রতি আমি সন্তুষ্ট হব এবং যে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে, তাকে অধিক পরিমাণে দান করার জন্য আমি অঙ্গীকার করলাম। আর যে ব্যক্তি আমার প্রতি অকৃতজ্ঞ হবে, তার জন্য আমার দান অবৈধ করে দেব, আর যা আমি তাকে প্রদান করেছি, তা' তার নিকট হতে ছিনিয়ে নেব ।

আরববাসীরা বলে نصحت لك و شكرت لك অর্থাৎ نصح এবং شكر একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আবার অনেক সময় বলে شكرتك و نصحتك অনুরূপ অর্থে কোন এক কবির কবিতায় ও বর্ণিত হয়েছেঃ

যথা, هم جمعوا بؤسى و نعمى عليكم + فهلا شكرت القوم ان لم تقاتل

অর্থ ঃ "তারা আমার ক্ষতি সাধনে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, অথচ আমার অনুদানসমূহ তোমাদের উপর বিদ্যমান আছে । কেন তুমি ঐ সম্প্রদায়ের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না, যারা তোমার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় না ।"

কবি নাবেগার কবিতায় نصحتك সম্পর্কে বর্ণিত, হয়েছে ।

যথা ঃ نصحت بنى عوف فلم يتقبلوا + رسولى و لم تنجح لديهم و سائلى

অর্থ–"বনী আউফকে আমি সদুপদেশ দিয়েছি, কিন্তু তারা আমার দূতকে (আন্তরিকতার সাথে) গ্রহণ করেনি। অতএব, আমার বন্ধুত্বে স্থাপনের যোগসূত্রসমূহ (চেষ্টা তদবীর) তাদেরকে কোন উপকার প্রদান করেনি।"

ইহাতে আমরা দলীল পেশ করলাম যে, شكر শব্দের অর্থ হল–কোন মানুষের প্রশংসনীয় কাজের প্রশংসা করা। كفر শব্দের অর্থ تغطية الشئ (কোন বস্তুকে ঢেকে রাখা), যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। অতএব এখানে এর পুনরুল্লেখ করা অপ্রয়োজনীয় মনে করি।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰوةِ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ –

অর্থ ঃ "হে ঈমানদারগণ তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে (আল্লাহ্‌র নিকট) সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধৈর্যশীলগণের সাথে আছেন।" (সূরা বাকারা ঃ ১৫৩)

আয়াতের মর্মার্থ হল আল্লাহ্র আনুগত্যের উপর অটল থাকার উৎসাহ প্রদান এবং শারীরিক ও আর্থিক কষ্টের ভার বহন করার ক্ষমতা অর্জন। অতএব তিনি ইরশাদ করেন, হে মু'মিনগণ ! তোমরা আমার আনুগত্য এবং আমার তরফ থেকে অর্পিত কর্তব্য ও দায়িত্বসমূহ সম্পাদনের ব্যাপারে ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে আমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর। আমার তরফ থেকে অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ পালন এবং আমার যাবতীয় বিধি-নিষেধ মেনে নেয়ার ব্যাপারে আমাদেরকে সাহায্য করুন। কিবলা পরিবর্তনের যে নির্দেশ দিয়েছি, তারপর যদি তোমাদের শত্রু কাফিরদের কথায় এবং তোমাদের উপর তাদের মিথ্যারোপ করার কারণে তোমাদের নিকট অপসন্দনীয় হয় কিংবা তা বাস্তবায়নে তোমাদের কোন শারীরিক কষ্ট হয়, কিংবা তোমাদের সম্পদের ক্ষতিসাধন হয়, অথবা যদি তোমাদের শত্রুদের সাথে জিহাদ করতে হয় এবং আমার রাস্তায় তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা যদি তোমাদের কষ্টকর হয়, তখন এসব অবস্থায় তোমরা নামায ও ধৈর্যের সাথে আমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর। কেননা, বিপদে ধৈর্য ধারণ করলে তোমরা আমার সন্তুষ্টি লাভ করতে পারবে। নামাযের মাধ্যমে আমার কাছে তোমরা তোমাদের নাজাত চাও, তাহলে তোমাদের প্রয়োজনীয় বিষয় আমার কাছে পাবে। নিশ্চয়ই আমি সবর অবলম্বনকারিগণের সাথে আছি, যারা আমার তরফ থেকে অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ আদায় করে। আর যারা আমার নাফরমানী করে না, আমি তাদেরকে সাহায্য করবো এবং তাদেরকে আপদ-বিপদ থেকে হিফাজত করবো। পরিশেষে, তারা তাদের কাংক্ষিত বিষয়ে সফলকাম হবে। صبر (ধৈর্য) এবং صلوة নামাযের ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি। অতএব, এখানে পুনরায় এর উল্লেখ করা অনাবশ্যক মনে করি ।

হযরত আবুল আলীয়া (র.) থেকে আল্লাহ্র কালাম- اِسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰوةِ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন যে, তোমরা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর। আর তোমরা জেনে রেখো যে, ধৈর্যধারণ এবং নামায উভয় কার্যই আল্লাহ্র ইবাদতের অন্তর্গত।

হযরত রাবী (র.) থেকে মহান আল্লাহ্র বাণী- يَااَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰوةِ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তোমরা জেনে রাখ নামায ও সবর উভয়কার্যই মহান আল্লাহ্র আনুগত্যে সাহায্য করে-اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ এর মর্মার্থ হল-নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা-নামাযী এবং ধৈর্যশীলকে সাহায্য করেন, পৃষ্ঠপোষকতা করেন এবং তার কার্যে সন্তুষ্ট থাকেন। যেমন কোন ব্যক্তি বলে-اِفْعَلْ يَا فُلَانُ كَذَا وَ اَنَا مَعَكَ অর্থাৎ তুমি এ কাজ কর, আমি তোমার সাথে আছি। এর অর্থ হল- আমি তোমার কাজে সাহায্যকারী এবং সহযোগী।

মহান আল্লাহ্র বাণী-

وَ لاَ تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ بَلْ اَحْيَاءٌ وَّ لٰكِنْ لاَّ تَشْعُرُوْنَ -

অর্থ ঃ "আর যারা আল্লাহ্‌র পথে মৃত্যুবরণ করে, তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না, বরং তারা জীবিত। কিন্তু তোমরা তা অবগত নও"। (সূরা বাকারা ঃ ১৫৪)

আল্লাহ্ পাকের এই কথার মর্ম হল–হে বিশ্বাসিগণ ! তোমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমার আনুগত্যের মাধ্যমে এবং আমার অবাধ্যতা পরিত্যাগপূর্বক ও তোমাদের উপর অর্পিত আমার যাবতীয় কর্তব্য কাজ (فرائض) সম্পাদন করে ধৈর্যের সাথে সাহায্য প্রার্থনা কর। আর যারা আল্লাহ্‌র পথে শহীদ হয়েছেন তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না। কেননা আমার সৃষ্টির মধ্যে ঐ ব্যক্তি মৃত বলে গণ্য–যার জীবনী শক্তি আমি ছিনিয়ে নিয়েছি এবং যার অনুভূতিকে নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছি। অতএব, সে তখন নিয়ামতের স্বাদ গ্রহণ করতে পারে না। সুতরাং তোমাদের মধ্য থেকে এবং আমার অন্যান্য সৃষ্টি জীবের মধ্যে যারা আমার পথে নিহত হয়, তারা আমার কাজে জীবিত অবস্থায় বিভিন্ন নিয়ামত ও আনন্দ ঘন জীবন এবং উত্তম খাদ্যসামগ্রী প্রাপ্ত হয়ে আনন্দ–উল্লাসে জীবন–যাপন করবে। তাদেরকে আমি নিজ অনুগ্রহে ও অলৌকিক ক্ষমতায় এইরূপ সুখ প্রদান করেছি–।

মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহ্ পাকের বাণী–بَلْ اَحْيَاءٌ সম্পর্কে বলেন যে, বরং তারা তাদের প্রভুর নিকট জীবিত অবস্থায় অবস্থান করবে, তাদেরকে বেহেশতের ফলমূল দ্বারা জীবিকা প্রদান করা হবে এবং তারা এমতাবস্তায় বেহেশতে প্রবেশ না করেও এর সুগন্ধ পাবে।

মুজাহিদ (র.) থেকে (উল্লিখিত হাদীসের) অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

কাতাদা (র.) থেকে আল্লাহ্ পাকের বাণী–وَ لاَ تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ بَلْ اَحْيَاءٌ وَّ لٰكِنْ لاَّ تَشْعُرُوْنَ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, শহীদদের আত্মাসমূহ সাদা রঙের পাখীর মধ্যে অবস্থান করবে এবং বেহেশতের ফলমূল ভক্ষণ করবে। আর তাদের বাসস্থান হবে 'সিদরাতুল মুনতাহা' নামক স্থানে। আল্লাহ্‌র পথে মুজাহিদদের জন্য তিনটি উত্তম বৈশিষ্ট রয়েছে। (১) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে শহীদ হবেন, তিনি জীবন্ত অবস্থায় উপজীবিকা প্রাপ্ত হবেন। (২) আর যে ব্যক্তি যুদ্ধ করে বিজয়ী হবেন, তাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা মহাপুরস্কারে ভূষিত করবেন। আর যে ব্যক্তি নিহত (শহীদ) হবেন, তাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা উত্তম উপ–জীবিকা প্রদান করবেন।

কাতাদা (র.) থেকে আল্লাহ্‌র বাণী–وَ لاَ تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ بَلْ اَحْيَاءٌ وَّ لٰكِنْ لاَّ تَشْعُرُوْنَ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, শহীদদের আত্মাসমূহ সাদা রঙের পাখীর আকৃতি ধারণ করবে।

রাবী (র.) থেকে আল্লাহ্‌র বাণী– وَ لاَ تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ بَلْ اَحْيَاءٌ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা (শহীদগণ) সবুজ রঙের পাখীর আকৃতিতে জীবন্ত অবস্থায় বেহেশতের যেখানে ইচ্ছা সেখানেই বিচরণ করবে এবং যা ইচ্ছা তা ভক্ষণ করবে।

উসমান ইবনে গিয়াস (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইকরাম (র.)-কে বলতে শুনেছি উল্লিখিত আয়াত- وَ لاَ تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ اَمْوَاتٌ بَلْ اَحْيَاءٌ وَّ لٰكِنْ لاَّ تَشْعُرُوْنَ সম্পর্কে বলেন যে, শহীদের আত্মাসমূহ বেহেশতের সবুজ রঙের পাখীর মধ্যে অবস্থান করবে।

যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, আল্লাহ্ পাকের বাণী- وَ لاَ تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ اَمْوَاتٌ بَلْ اَحْيَاءٌ এর খবরের মধ্যে এমন কি বৈশিষ্ট্য আছে যা আল্লাহ্র পথে শহীদ ব্যক্তি ব্যতীত অন্যদের মাঝে তা পাওয়া যাবে না ? অথচ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অনেক হাদীস থেকে জানা যায় যে, তিনি মু'মিন এবং কাফিরদের মৃত্যুর পরের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। সুতরাং তিনি মু'মিনদের মৃত্যুর পরের অবস্থা সম্পর্কে সুসংবাদ দিয়েছেন যে, তাদের কবর থেকে জান্নাত পর্যন্ত একটি পথ খুলে দেয়া হবে। যার ফলে তারা জান্নাতের খুশবু পাবে। আর তারা আল্লাহ্ পাকের দরবারে অতিসত্তর কিয়ামত কায়িম হওয়ার জন্য আবেদন করতে থাকবে, যেন তারা সেখানে তাদের জন্যে সুনির্দিষ্ট বাসস্থানে পৌছতে পারে এবং তাদের পরিবারবর্গ এবং সন্তান-সন্তুতির সাথে একত্রিত হতে পারে।

আর কাফিরদের অবস্থা সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তাদের কবর থেকে জাহান্নাম পর্যন্ত দরজা খুলে দেয়া হবে। তারা তখন দোজখ দেখবে এবং দোজখের দুর্গন্ধ এবং কষ্ট পৌছতে থাকবে। আর তাদের উপর এমন একজন ফিরিশতাকে নিয়োগ করে দেয়া হবে, যিনি কিয়ামত পর্যন্ত তাদেরকে কবরে প্রহার করতে থাকবে। তখন তারা সেখানে আল্লাহ্ পাকের শাস্তির ভয়ে কিয়ামত দিবস পিছিয়ে দেয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে আবেদন জানাতে থাকবে,

যদিও এ বিষয়ে দুনিয়াতে তাদের সন্দেহে ছিল। রাসূল (সা.)-এর এ হাদীস থেকে যা কিছু জানা গেল তারপর শহীদদের এমন কি বৈশিষ্ট্য রইল যা অন্যরা পাবে না ? কাফির ও মু'মিন উভয়ে আলমে বারজখে জীবিত থাকবে, কাফিররা অবশ্য দোজখের আযাব ভোগ করতে থাকবে এবং মু'মিনগণ জান্নাতের অনন্ত-অসীম নিয়ামতে মুগ্ধ থাকবে।

উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তরে বলা হবে-আল্লাহ্ তা'আলা শহীদগণকে বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছেন এবং মু'মিনগণকে এবিষয়ে খবর দিয়েছেন। শহীদগণকে আলমে বারযাখে অবস্থানকালেই বেহেশতের খাদ্যসামগ্রী দ্বারা রিযিক প্রদান করা হবে। আর তাদেরকে জান্নাতের ঐ সব সুস্বাদ খাদ্য সম্ভার প্রদান করা হবে, যা অন্য কোন মানুষকে জান্নাতে প্রবেশ করার পূর্বে ব্যতীত প্রদান করা হবে না। আর তাই হল তাদের জন্য বিশেষ মর্যাদা, সম্মান এবং যা অন্যদের থাকবে না।

মু'মিনদের জন্য শহীদদের খবর প্রদানের মধ্যে ফায়দা হল এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্য ঘোষণা দিলেন-

وَ لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ اَمْوَتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ - فَرِحِيْنَ بِمَا اٰتٰهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهٖ -

"যারা আল্লাহ্‌র পথে শহীদ হয়েছেন, তাদেরকে আপনি মৃত মনে করবেন না ; বরং তারা জীবিত। তাদের প্রভুর নিকট হতে তাদেরকে রিযিক প্রদান করা হয়। আল্লাহ্‌ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা প্রদান করেছেন, তাতে তারা আনন্দিত।" ৩ ঃ ১৬৯–১৭০

আমরা এ ব্যাপারে যা বর্ণনা করলাম, সে সম্পর্কে নবী করীম (সা.)–এর হাদীস প্রণিধানযোগ্য ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) ইরশাদ করেছেন, শহীদগণ জান্নাতের দরজার সামনে ঝরনা ধারার পার্শ্বে সবুজ রঙের তাঁবুতে অবস্থান করবে–। অথবা তিনি বলেছেন, তারা সবুজ বাগানে অবস্থান করবে, আর জান্নাত থেকে সকাল–সন্ধায় তাদের কাছে খাদ্য সামগ্রী পৌছতে থাকবে।

আবূ কুরায়ব সূত্রে আবূ জা'ফর থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন যে, শহীদদের আত্মাসমূহ জান্নাতের সাদা রঙের তাঁবুতে অবস্থান করবে। প্রত্যেক তাঁবুতে দু'জন স্ত্রী থাকবে। প্রতিদিন তাদেরকে জীবিকা প্রদান করা হবে। সূর্য উদিত হবে এমনভাবে যে, তাতে থাকবে সাওর এবং হুত। আর সাওর থাকবে জান্নাতের ফলমূল জাতীয় যাবতীয় ফলের স্বাদ। আর হুতে থাকবে জান্নাতের যাবতীয় সুস্বাদ পানীয়।

যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, যে হাদীস এই মাত্র উল্লেখ করা হল, তাতে আল্লাহ্‌ পাক শহীদগণের নিয়ামত সম্পর্কে মু'মিনগণকে অবহিত করেছেন যা আলমে বারযাখে বিশেষভাবে তারা ভোগ করবে। পবিত্র কুরআনের আলোচ্য আয়াতে–وَ لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوٰتًا بَلْ اَحْيَاءٌ সেই সম্পর্কে কোন কথা নেই আলোচ্য আয়াতে শুধু শহীদগণের আবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে, তারা জীবিত থাকবে না মৃত? উত্তরে বলা হবে যে, আলোচ্য আয়াতে শহীদানের জীবন সম্পর্কে যে খবর দেয়া হয়েছে তার উদ্দেশ্য হল তাঁদেরকে প্রদত্ত নিয়ামতের উল্লেখ করা। কিন্তু এ কথা সত্য যে, অন্য আয়াতে আল্লাহ্‌ পাক শহীদানকে যে নিয়ামত দেয়া হবে তা সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন। পবিত্র কুরআনের ভাষায়–وَ لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوٰتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ 'যারা আল্লাহ্‌র রাহে প্রাণ উৎসর্গ করে তাদেরকে মৃত মনে করো না বরং জীবিত, তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদেরকে রিযিক প্রদান করা হয়। এদ্বারা মু'মিনগণ শহীদানের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হয়। আর পূর্বে উল্লেখিত আয়াত–وَ لاَ تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوٰتًا بَلْ اَحْيَاءٌ আল্লাহ্‌ পাক তাঁর সৃষ্টিকে নিষেধ করেছেন যেন শহীদগণকে মৃত না বলা হয়। আল্লাহ্‌ পাকের বাণী– وَ لٰكِنْ لاَّ تَشْعُرُوْنَ এর অর্থ হল ঃ তোমরা উপলব্ধি করতে পার না যে, শহীদগণ জীবিত। তোমরা আমার খবর প্রদানের মাধ্যমে তা জানতে পার।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী–

وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَىْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوْعِ وَ نَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَ الْاَنْفُسِ وَ الثَّمَرَاتِ

وَ بَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ–

অর্থ ঃ "এবং নিশ্চয় ধনসম্পদের ক্ষতি ও প্রাণহানী এবং ফল শস্যের ক্ষতি দ্বারা পরীক্ষা করব। হে রাসূল, আপনি সুসংবাদ দিন সবর অবলম্বনকারীদেকে। (সূরা বাকারা ঃ ১৫৫)

মহান আল্লাহ্র পক্ষ হতে এই সুসংবাদ উল্লেখের উদ্দেশ্যে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর অনুসরণের মাধ্যমে তাদেরকে পরীক্ষা করা এবং কঠোর কার্যসমূহ দ্বারা তাদেরকে যাচাই করা যেন এ কথা অবগত হওয়া যায় যে, কে রাসূলের অনুসরণ করে এবং কে নিজের পিছনের দিকে ধাবিত হয়। যেমন, তাদেরকে বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে বায়তুল্লাহ্র দিকে কিবলা প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়েছে। আরও যেমন তাদের পূর্ববর্তী সূফীগণকে পরীক্ষা করা হয়েছে এবং অপর আয়াতে তাদের ব্যাপারে অঙ্গীকার করা হয়েছে। অতএব, তিনি তাদের উদ্দেশ্যে ইরশাদ করেছেন ঃ

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَ الضَّرَّاءُ وَ زُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلُ الرَّسُوْلُ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ اَلَا اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ –

"তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে যদিও এখনো তোমাদের নিকট তোমাদের পূর্ববর্তিগণের অবস্থা আসেনি ? অর্থ–সংকট ও দুঃখ–কষ্ট তাদেরকে স্পর্শ করেছিল এবং তারা ভীত ও কম্পিত হয়েছিল। এমন কি রাসূল ও তাঁর সাথে মু'মিনগণও বলে উঠেছিল, আল্লাহ্র সাহায্য কখন আসবে? হাঁ, হাঁ, আল্লাহ্র সাহায্য অতি নিকটেই। (সূরা বাকারা ঃ ২১৪)

এ ব্যাপারে আমরা যা বর্ণনা করলাম, তৎসম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এবং অন্যান্য রাবীগণ যা বলেছেন, তা নিম্নে বর্ণিত হল।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে মহান আল্লাহ্র বাণী– **وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوْعِ** সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনগণকে সংবাদ দিয়েছেন যে, পৃথিবীটা হল একটি বিপদপূর্ণ স্থান। এখানে তাদেরকে বিভিন্ন বিপদের মুকাবিলা করতে হবে তাই তাদেরকে ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কাজেই, ধৈর্যশীলগণকে শুভ সংবাদ দেয়া হয়েছে। তাই তিনি বলেন, **وَ بَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ** 'এবং ধৈর্যশীলগণকে সুসংবাদ দিন'।

তারপর তাদেরকে খবর দেয়া হল যে, তিনি নবীগণ ও সূফীগণকে আত্মশুদ্ধির জন্য এমন কঠিন বিপদের সম্মুখীন করেছেন। তাই তিনি ইরশাদ করেন যে, **مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَ الضَّرَّاءُ وَ زُلْزِلُوْا** তাদেরকে আপদ–বিপদ এবং অস্থিরতা স্পর্শ করেছে, তাই তারা আতঙ্কে কেঁপে উঠেছে। **وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ** এর অর্থ **وَ لَنَخْبِرَنَّكُمْ** 'অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো'। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, **الابتلاء** এর

অর্থ **الاختبار** পরীক্ষা করা। যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। মহান আল্লাহ্‌র কালাম–**بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ** এর অর্থ শত্রুর ভয় জাতীয় বিষয়। **وَ بِالْجُوْعِ** 'এবং ক্ষুধা দ্বারা' অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ দ্বারা। তিনি বলেন যে, নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে ভয়–ভীতি দ্বারা পরীক্ষা করবো। অর্থাৎ তোমাদের মনে শত্রুর ভয় লাগবে এবং তোমরা দুভিক্ষে নিপতিত হবে। তাতে তোমরা ক্ষুধায় কাতর হবে এবং তোমাদের উদ্দেশ্য সাধন করা কষ্টকর হবে। তাতে তোমাদের মাল–সম্পদ কমবে। তোমাদের মাঝে এবং তোমাদের শত্রু কাফিরদের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হবে। তাতে তোমাদের সংখ্যা কমবে। আর তোমাদের সন্তান–সন্তুতিদের মৃত্যুতেও তোমাদের সংখ্যা কমবে। প্রাকৃতিক দুযোগ ও দুর্বিপাকেও তোমাদের শষ্য ও ফলমূলের ঘাটতি দেখা দিবে। এ সবই আমার পক্ষ হতে তোমাদের জন্য এক পরীক্ষা। তাতে তোমাদের মধ্য থেকে কে ঈমানদার এবং কে মিথ্যাবাদী তা প্রকাশ হয়ে যাবে। আর ধর্মীয় ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে কে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন দীনদার এবং কে মুনাফিক ও সন্দেহপোষণকারী সবই প্রকাশিত হয়ে পড়বে। উল্লিখিত সকলকেই সম্বোধন করা হয়েছে–হযরত রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) এবং তাঁর সঙ্গীগণের অনুগত হওয়ার জন্য।

হযরত আতা (র.) থেকে মহান আল্লাহ্‌র কালাম– **وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوْعِ** সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, আয়াতের **(مخاطب)** সম্বোধিত ব্যক্তিগণ হলেন হযরত মুহাম্মদ (সা.)–এর সাহাবাগণ। উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা– **بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ** বলেছেন, **و لم يقل بأشياء** এমন বলেননি। কারণ বস্তু বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। সুতরাং বান্দার জানা নেই যে, কিসের দ্বারা তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে। অতএব, যখন জানা গেল যে, উহা বিভিন্ন প্রকারের, তখন প্রমাণিত হল যে, বস্তুর প্রত্যেক প্রকারের পূর্বে **شئ** কথাটি উহ্য আছে। তখন আয়াতের অর্থ হবে এমন **ولنبلونكم بشيء من الخوف و بشئ من الجوع و بشئ من نقص الاموال** অর্থাৎ আয়াতের প্রারম্ভে **الشئ** কথাটির উল্লেখ করাই প্রমাণ করে যে, উহার প্রত্যেক প্রকারের পূর্বে **شئ** কথাটি পুনরুল্লিখিত হবে। সুতরাং আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের জন্য তার প্রত্যেক প্রকারের কথাই উল্লেখ করলেন এবং কষ্টদায়ক বিভিন্ন বস্তু দ্বারা তাদেরকে পরীক্ষা করার কথা বর্ণনা করলেন।

মুসান্না (র.) সূত্রে রাবী (র.) থেকে আল্লাহ্‌র বাণী–**وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوْعِ وَ نَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَ الْاَنْفُسِ وَ الثَّمَرَاتِ** সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, যা হবার তা হয়েছে এবং অচিরেই যা সংঘটিত হবে, তা এর চেয়ে কঠিনতর হবে। এমতবস্থায় আল্লাহ্‌ পাক বলেন– **وَ بَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ الَّذِيْنَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْا اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ اُولٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ وَّ اُولٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ** – "এবং ঐসমস্ত ধৈর্যশীলদেরকে শুভ সংবাদ প্রদান করুন, যখন

তাদের উপর কোন বিপদ পতিত হয়-তখন তারা বলে-নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ্‌রই জন্য এবং তাঁর দিকেই আমরা প্রত্যাবর্তনকারী। তাঁদের উপরই তাদের প্রভুর করুণা এবং অনুগ্রহ বর্ষিত হবে। এবং তাঁরাই সুপথগামী।"

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা নিজ নবীকে উদ্দেশ্য করে বলেন যে, হে মুহাম্মদ (সা.), ঐসমস্ত ধৈর্যশীলদেরকে আমার পরীক্ষার জন্য শুভ সংবাদ প্রদান করুন,যা দ্বারা আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি এবং ঐসমস্ত সংরক্ষণকারীদেরকে,-যারা আমার নিষিদ্ধ কাজ থেকে নিজ আত্মাকে সংরক্ষণ করেছে ; এবং ঐসমস্ত ব্যক্তিদেরকে-যাঁরা আমার (فرائض) কর্তব্য কাজসমূহ সম্পাদন করতে যেয়ে আমার পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে এবং বিপদে পতিত হয়ে বলেছে- اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ 'আমরা আল্লাহ্‌রই জন্য এবং তাঁর দিকেই আমরা প্রত্যাবর্তনশীল।' অতএব, আল্লাহ্ তা'আলা بشارة শুভসংবাদ দ্বারা ঐ সমস্ত ধৈর্যশীলদেরকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ও গুণান্বিত করেছে, যাঁদেরকে তিনি কঠিন বিপদে ফেলে পরীক্ষা করেছেন। التبشير শব্দের প্রকৃত অর্থ হল কোন লোক অন্য কোন লোককে নতুনভাবে এমন সংবাদ পরিবেশন করা-যাতে সে খুশী হয়-কিংবা নারাজ হয়।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী-

اَلَّذِيْنَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْا اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ-

অর্থ : **"যখন তাদের উপর বিপদ আপতিত হয়, তখন তারা বলে-নিশ্চয়ই আমরা তো আল্লাহ্‌রই এবং নিশ্চিতভাবে তাঁর দিকেই প্রর্তাবর্তনকারী।" (সূরা বাকারা : ১৫৬)**

ব্যাখ্যা :-হে রাসূল (সা.), আপনি ঐসমস্ত ধৈর্যশীলদেরকে শুভ সংবাদ দান করুন, যারা মনে করে যে, যাবতীয় নিয়ামত যা তারা পেয়েছে, সবই আমার নিকট হতেই পেয়েছে। তারা আমার দাসত্ব, একত্ববাদ এবং আমার প্রভুত্বকে স্বীকার করে। আর আমার প্রতি প্রত্যাবর্তনের কথা তারা বিশ্বাস করে। তারা আমার সন্তুষ্টির জন্যে আত্মসমর্পণ করে ও আমার নিকট সওয়াবের আশা করে এবং আমার শাস্তির ভয় করে। আমি তাদের কাছে অঙ্গীকার করেছি যে, আমি তাদেরকে পরীক্ষা করবো-বিভিন্ন ভয়-ভীতি, ক্ষুধা, জান ও মাল এবং ফলমূলের ক্ষতিসাধনের মাধ্যমে, তখন তারা বলে-আমাদের মালিক ও আমাদের প্রতিপালক এবং আমাদের উপাস্য আল্লাহ্ চিরজীবী। আমরা তাঁরই অনুগত। আর আমরা আমাদের মৃত্যুর পর তাঁর দিকেই সন্তুষ্টচিত্তে প্রত্যাবর্তনকারী এবং আমরা তাঁর আদেশ পালনে সদা প্রস্তুত বা রাযী।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী-

اُولٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ وَ اُولٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ -

অর্থ ঃ তাদের উপরই তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে করুণা ও অনুগ্রহ বর্ষিত হবে। আর তাঁরাই সুপথে পরিচালিত। (সূরা বাকারা ঃ ১৫৭)

আল্লাহ্‌র এই বাণীর মর্মার্থ হল–ঐসমস্ত ধৈর্যশীল, যাদের গুণাগুণ বর্ণিত হয়েছে, তাদের উপরই আল্লাহ্‌র মাগফিরাত বা ক্ষমা। **صلواة الله على عباده** এর অর্থ–**غفرانه لعباده** অর্থাৎ তাঁর বান্দাদের প্রতি তাঁর ক্ষমা। সে সম্পর্কে নবী করীম (সা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, **اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اٰلِ اَبِىْ اَوْفٰى** অর্থাৎ হে আল্লাহ্ ! তাদেরকে আপনি মাফ করে দিন। এবং এর মূল বিষয় সম্পর্কে আমরা অন্যত্র বর্ণনা করেছি। মহান আল্লাহ্‌র বাণী– **ورحمة** এর অর্থ–"এবং তাদের উপর এমন মাগফিরাত বর্ষিত হবে, যার দ্বারা তাদের গুনাহ্সমূহ মুছে যাবে এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে ও করুণায় তাকে ঢেকে ফেলবে। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা খবর দেন যে, তিনি তাদের কষ্টের উপর ধৈর্য ধারণের কারণে এবং তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণের জন্য তাদেরকে ক্ষমা ও করুণা প্রদান করবেন। যার ফলে তারা সুপথগামী এবং সত্য পথের অনুসারী হবে। আর যে সব কথায় আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হন, তাই তারা বলবে এবং যে সব অত্যাবশ্যকীয় কাজ সম্পাদন করলে–মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে অফুরন্ত সওয়াবের অধিকারী হবে, তাই তারা করবে। **اهتداء** শব্দের অর্থ ইতিপূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি। **الرشد** শব্দের অর্থ–সঠিক পথ। এ সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে যা বর্ণনা করেছি, তদ্বিষয়ে মুফাসসীরগণের কয়েকজনও অনুরূপ বলেছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে মহান আল্লাহ্‌র বাণী–**اَلَّذِيْنَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْا اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ – اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ وَّ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ –** সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা সংবাদ দিয়েছেন, যখন কোন ম'ুমিন তার কর্মের বিষয় আল্লাহ্‌র প্রতি সমর্পণ করে এবং বিপদের সময় তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য তিনটি কল্যাণকর বৈশিষ্ট্য প্রদানের কথা লিখে নেন। (১) আল্লাহ্ পাকের পক্ষ হতে করুণা ও অনুগ্রহ বর্ষণ, (২) সুপথের সন্ধান দান, (৩) হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি বিপদের সময় আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়, তার বিপদকে আল্লাহ্ তা'আলা দূরীভূত করে দেন এবং তার শাস্তিকে লাঘব করে দেন। আর তার জন্য এমন সব সৎপ্রতিনিধি (সন্তান–সন্তুতি) প্রদান করেন, যাতে সে সন্তুষ্ট হয়।

হযরত রাবী (র.) থেকে মহান আল্লাহ্‌র বাণী– **اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ** সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন যে, আল্লাহ্ পাকের করুণা ও অনুগ্রহ ঐসব লোকের উপর বর্ষিত হয়, যারা ধৈর্য–ধারণ করে এবং আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

হযরত ইবনে জুবায়র (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন যে, এ উম্মতের মধ্য হতে যারা বিপদে পতিত হয়ে– **اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ** বলে। তাদেরকে যা প্রদান করা হবে, অন্য কাকেও

তদ্রূপ প্রদান করা হবে না। তাদের উপরই প্রতিপালকের নিকট হতে করুণা এবং অনুগ্রহ বর্ষিত হবে। যদি কাকেও করুণা ও অনুগ্রহ প্রদান করা হয়ে থাকে, তবে তা নিশ্চয়ই ইয়াকূব (আ.)-কে প্রদান করা হয়েছিল। আপনি কি শ্রবণ করেননি আল্লাহ্ পাকের বাণী يا اسفى على يوسف ('হয়ে আক্ষেপ ইউসুফের উপর')

মহান আল্লাহ্‌র বাণী-

اِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا- فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ -

"সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্যতম। সুতরাং যে কেউ কা'বাগৃহের হজ্জ কিংবা উমরা সম্পন্ন করে এ দু'টির মধ্যে যাতায়াত করলে তার কোন পাপ নেই, এবং কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎকার্য করলে আল্লাহ্ পুরস্কারদাতা, সর্বজ্ঞ।" (সূরা বাকারা ঃ ১৫৭)

الصفا শব্দটি صفاه শব্দের বহুবচন। এর অর্থ (مكان المستوى) কংকরময়" সমতল স্থান। এই মর্মে কবি 'তুরমাহ' এর একটি কবিতাংশ-

ابى لى ذو القوى و الطول الا + يؤبس حافر أيدى صفاتى

আর তারা বলেন, الصفا শব্দটি একবচন। এর দ্বিবচন হল صفوان এবং বহু বচন হল اصفاء ও صفيا صفيا

এ বর্ণনা স্বপক্ষে কবি রাজেয (راجز) এর একটি কবিতাংশ তারা উদ্ধৃত করেছেন ঃ

كان متنبه من النفى + مواقع الطير على الصفى

আর তারা বলেন যে, صفا শব্দটি عصا - عصي এবং رحا - رحى - ارحاء ইত্যাদির ন্যায় المروة এর অর্থ الحصاة الصغيرة ছোট পাথর। খুব কম সময়ই এর বহুবচন مروات হয়। বহুবচন হিসেবে المرو শব্দটি বহুল প্রচলিত। যেমন تمرة - تمرات এবং تمر এ মর্মে কবি আ'শা মায়মূন ইবনে কায়স বলেন ঃ

و ترى بالارض خفا زائلا + فاذا ما صادف المرو رضح

المرو শব্দটির অর্থ الصخر الصغار ছোট পাথর। এ সম্পর্কে আবূ যুয়াইবুল হাযলী এর একটি কবিতাংশ উল্লেখ করা যেতে পারে-

حتى كأنى للحوادث مروة + بصفا المشرق كل يوم تقرع

মহান আল্লাহ্‌র বাণী– اِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ এখানে সাফা এবং মারওয়া দ্বারা দু'টি পাহাড়ের নাম বুঝানো হয়েছে। যে দু'টি পাহাড়কে অন্যান্য ছোট বড় (صفا و مروة) কংকরময় স্থান থেকে অধিক সম্মান প্রদান করা হয়েছে। এ কারণেই الصفا و المروة উভয় শব্দে আলিফ (الف) এবং (لام) লাম–সংযুক্ত করা হয়েছে। যেন স্বীয় বান্দাদেরকে অবগত করানো হয় যে, তা দ্বারা দু'টি বিখ্যাত পাহাড়কে বুঝানো হয়েছে, اصفاء এবং مروة এর অন্যান্য অর্থ ব্যতীত।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী–مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ এর অর্থ হল مِنَ مَّعَالِمَ اللّٰهِ অর্থাৎ–'আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহ থেকে।' তাকে তিনি স্বীয় বান্দাদের জন্য ধর্মীয় নিদর্শন হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, যেন তারা তার কাছে দু'আর মাধ্যমে মহান আল্লাহ্‌র ইবাদাত করে। এ ইবাদত মহান আল্লাহ্‌র যিকিরের মাধ্যমে হবে, অথবা সেখানে তাদের উপর অর্পিত নির্দিষ্ট কর্তব্য কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে হবে। এ মর্মে কবি কুমায়তের একটি কবিতাংশ উল্লেখ করা হলো।

نقتلهم جيلا فجيلا تراهم + شعائر قربان بهم يتقرب –

الشعائر সম্পর্কে হযরত মুজাহিদ (র.) নিম্নের হাদীস বর্ণনা করেছেন–হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে اِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন যে, (الشعائر) এর অর্থ– সেসব কল্যাণমূলক কাজ, যে, সম্পর্কে তোমাদেরকে খবর দেয়া হয়েছে। হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে যে, الشعائر শব্দটি شعيرة এর বহু বচন। সুতরাং (صفا) সাফা এবং (مروة) মারওয়া এর (طواف) পরিভ্রমণ এবং এদের মধ্যে বান্দার করণীয় কার্যাবলী আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্তর্গত। তাই এর মর্মার্থ হল–ঐ ব্যাপারে তাদেরকে অবহিত করা। এ রূপ ব্যাখ্যা সঠিক অর্থ হতে বহু দূরে।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী– اِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ দ্বারা তিনি আপন মু'মিন বান্দারেকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, এই উভয় পাহাড়ের মধ্যে সায়ী (سعى) করা হজ্জের নিদর্শনসমূহের অন্তর্গত, যা তিনি তাদের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ করে দিয়েছেন এবং তাঁর বন্ধু–ইবরাহীম (আ.)–কেও এ ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছিলেন, যখন তিনি এ ব্যাপারে তাঁর কাছে হজ্জের নিয়মাবলী জানতে চেয়ে ছিলেন। আর তা খবর হিসেবে পরিবেশন করা হলেও তা দ্বারা নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। কেননা, তিনি তাঁর নবী হযরত মুহাম্মাদ (স.)–কে নির্দেশ দিয়েছেন–মিল্লাতে ইবরাহীম–এর অনুসরণ করার জন্য। অতএব, তাকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, ثُمَّ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ اَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا "এরপর আমি আপনার নিকট ওহী নাযিল করলাম যে, আপনি খাঁটি মিল্লাতে ইবরাহীমী–এর অনুসরণ

করুন"। আল্লাহ্ তা'আলা ইবরাহীম (আ.)-কে তাঁর পরবর্তীদের জন্য ইমাম নির্ধারণ করেছেন।

অতএব একথা যখন ঠিক যে, সাফা এবং মারওয়া এর মধ্যে সায়ী ও তাওয়াফ (طواف ও سعى) করা আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের এবং হজ্জের নিয়মাবলীর অন্তর্গত। সুতরাং একথা জানা গেল যে, ইবরাহীম (আ.) এ কাজ করেছেন এবং তা তাঁর পরবর্তীদের জন্য অবশ্য করণীয় হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। আর আমাদের নবী করীম (সা.) এবং তাঁর উম্মতকে তাঁর আদর্শ অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব রাসূলুল্লাহ্ (সা.) –এর বর্ণনা অনুযায়ী তা তাদের জন্য করণীয় কাজ হিসেবে নির্ধারিত হয়েছে।

মহান আল্লাহ্র বাণী– فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ "অতএব যে ব্যক্তি এ কা'বার হজ্জ করে অথবা উমরা করে।' আল্লাহ্র বাণী– فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ এর মর্মার্থ হল যে ব্যক্তি তাওয়াফ শুরু করার পর সে দিকে বারবার ফিরে আসে। এমনিভাবে যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে অধিক মতবিরোধ করে, তাকে বলা হয় (সে তার প্রতি প্রত্যাবর্তনকারী)। এ মর্মে কবির একটি কবিতাংশ উলেখ করা হলো ঃ

و اشهد من عوف حلولا كثيرة + يحجون بيت الزبرقان المزعفرا

উল্লিখিত কবিতায় يحجون শব্দের মর্মার্থ অর্থাৎ তারা স্বীয় নেতৃত্ব এবং রাজত্বের জন্য বারবার ফিরে আসে। কেউ বলেন হাজীকে حاج বলা হয়, কারণ, সে বায়তুল্লাহ্তে আগমন করে আরাফাতে গমনের পূর্বে। এরপর আরাফাতে অবস্থানের পর কুরবানীর দিন (বায়তুল্লাহ্র) তাওয়াফের জন্য পুনরায় তার দিকে ফিরে আসে, তারপর এখান থেকে মিনার দিকে গমন করে।

এরপর 'তাওয়াফে সদর' এর জন্য আবার তার দিকে ফিরে আসে। অতএব, কা'বার দিকে প্রত্যাবর্তন করা একের পর এক এমনিভাবে কয়েকবার হয়। সুতরাং এ জন্য তাকে حاج (বারবার প্রত্যাবর্তনকারী) বলা হয়। المعتمر কে معتمر বলার কারণ –যখন সে বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ করে তখন زيارة (যিয়ারত) শেষে সেখানে থেকে প্রত্যাবর্তন করে। মহান আল্লাহ্র বাণী– او اعتمر এর অর্থ او اعتمر البيت অর্থাৎ ("কিংবা বায়তুল্লাহ্র উমরা করে"।) اعتمار শব্দের মর্মার্থ الزيارة সাক্ষাৎ করা। তাই কোন বস্তুর জন্য প্রত্যেক সংকল্পকারীকেই معتمر বলে। এ মর্মে কবি এজাজের একটি কবিতাংশ উল্লেখ করা হলো।

لقد سما ابن معمر حين اعتمر + مغزى بعيدا من بعيد و ضبر

উল্লিখিত কবিতায় حين اعتمر এর মর্মার্থ হল حين قصده و أمه "যখন সে তার ইচ্ছা করল এবং সংকল্প করল"। মহান আল্লাহ্র বাণী–فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا "অতএব তার জন্য উভয়ের

(طواف) প্রদক্ষিণ করা দোষণীয় নয়"। আল্লাহ্‌র এই বাণীর মর্মার্থ হল উভয়ের (طواف) প্রদক্ষিণের মধ্যে কোন ক্ষতি নেই কোন এবং পাপও নেই। যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, তবে এইরূপ বাক্যের অর্থ কি? অর্থাৎ আল্লাহ্‌র বাণী- إِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ ("নিশ্চয়ই সাফা এবং মারওয়া আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্তর্গত"।) যদিও বিষয়টিকে দৃশ্যত খবর হিসেবে পরিবেশন করা হয়েছে, কিন্তু এর অর্থ হবে الامر। নির্দেশসূচক। অর্থাৎ এই আয়াত দ্বারা উভয়ের (طواف) পরিভ্রমণের প্রতি নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু কিভাবে এর দ্বারা (طواف) পরিভ্রণের প্রতি নির্দেশ বুঝাবে ? যখন পরে বলা হল ("যে ব্যক্তি) বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ করে অথবা উমরা করে–তার জন্য সাফা ও মারওয়ার তাওয়াফ করা দোষণীয় নয়"।) الجناح শব্দটি ঐ ব্যক্তির বেলায় প্রযোজ্য, যার জন্য কাজটি করা বা না করার ইখতিয়ার আছে, যদি সে তা করে–তবে তার জন্য পাপ বা ক্ষতি হবে না। অথচ সাফা-মারওয়ার তাওয়াফ করার প্রতি নির্দেশ রয়েছে। অতএব সাফা-মারওয়ার তাওয়াফের মধ্যে (ترخيص) ইখতিয়ার থাকা অবৈধ। একই অবস্থাতে পাশাপাশি দু'টি নির্দেশের একত্রিত হওয়াও অবৈধ। এই প্রশ্নের প্রতি উত্তরে বলা হবে যে, প্রকৃত অবস্থা প্রশ্নকারীর প্রশ্নের বিপরীত। কারণ একদল তাফসীরকারের নিকট উল্লিখিত আয়াতের মর্ম হল যে, নবী করীম (সা.)যখন উমরা করলেন, তখন একদল লোক এতে ভীত হল, যারা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে–জাহেলিয়াত যুগে সাফা ও মারওয়াতে রাখা দু'টি মূর্তির সম্মানার্থে তাওয়াফ করতো ? কারণ আমরা নিশ্চিতভাবে জেনেছি যে, মূর্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য যে কোন কিছুর দাসত্ব করা শির্‌কমূলক কাজ। অতএব, উল্লিখিত পাহাড়ে রাখা পাথরদ্বয়ের (মূর্তির) উদ্দেশ্য আমাদের তাওয়াফ করা শির্‌ক। কেননা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে জাহেলিয়াতের যুগে ঐ পাহাড় দু'টিকে আমরা তাওয়াফ করতাম,–তাতে রক্ষিত দ'ুটি মূর্তির জন্য। আজ আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে ইসলাম গ্রহণের তাওফীক দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কিছুর সম্মান প্রদর্শন করার কোন উপায় নেই। অর্থাৎ তাঁর দাসত্বের সঙ্গে অন্য কিছুর শির্‌ক করার কোন পথ নেই। অতএব, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ঐ কাজের উল্লেখপূর্বক এই আয়াত ঃ إِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ অবতীর্ণ করেন। অর্থাৎ সাফা ও মারওয়ার তাওয়াফ আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্তর্গত। অতএব, উল্লিখিত আয়াতে الطواف بهما কথাটি পরিত্যাগ করা হয়েছে। কারণ পরবর্তী আয়াতে "هما" দ্বিবচনের (ضمير) সর্বনামটির উল্লেখ করাই সাফা ও মারওয়ারও তাওয়াফ করার অর্থ বুঝানোর জন্য যথেষ্ট। যখন সম্বোধিত ব্যক্তিদের কাছে একথা স্পষ্ট জানা আছে যে, এর তাওয়াফই আল্লাহ্‌র নিদর্শনের অন্তর্গত। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা আপন বান্দাদের ইবাদাতের জন্য সাফা ও মারওয়ার তাওয়াফ করাকেই নিদর্শন–হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। যেন যিকিরকারিগণ তাওয়াফের মাধ্যমে সেখানে আল্লাহ্‌র যিকির করে। অতএব, যে ব্যক্তি হজ্জ

অথবা উমরা করে সে যেন সাফা ও মারওয়ার তাওয়াফ করতে ভয় না করে। যেহেতু জাহেলিয়াত যুগে–তারা পাহাড় দু'টিতে দু'টি মূর্তি রেখে ধর্মীয় উপাসনার উদ্দেশ্যে তাওয়াফ করতো, তাই মুশরিকরা কুফরীর স্থলেই এর তাওয়াফ করতো। আর তোমরা তো এখন এ দু'টি পাহাড়ের তাওয়াফ করবে ঈমান গ্রহণপূর্বক আমার রাসূলকে সত্য জেনে এবং আমরা নির্দেশের অনুগত হয়ে। অতএব, এখন এই তাওয়াফ করায় কোন পাপ নেই। الجناح শব্দের অর্থ الاثم। পাপ। মূসা ইবনে হারূন সূত্রে সুদ্দী থেকে– فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন যে, যে ব্যক্তি তাওয়াফ করে তাদের কোন পাপ হবে না, বরং তার জন্য সওয়াব রয়েছে। এ ব্যাপারে আমরা যা উল্লেখ করলাম, এ সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরাম এবং তাবেঈনদের নিকট থেকেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল মালিক সূত্রে শা'বী থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, জাহেলিয়াত যুগে সাফা পাহাড়ের উপর (اساف) 'আসাফা' নামে একটি মূর্তি আর মারওয়া পাহাড়ের উপর 'নায়েলা' (نائلة) নামের অপর আর একটি মূর্তি ছিল। জাহেলিয়াত যুগের অধিবাসীরা যখন বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করতো, তখন তারা মূর্তি দু'টিকে স্পর্শ করতো। যখন ইসলাসের আবির্ভাব হল এবং মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে দেয়া হল তখন মুসলমানগণ বললেন সেকালে সাফা ও মারওয়ার তাওয়াফ করা হতো–ঐ মূর্তি দু'টির কারণে।

আজ (ইসলামী যুগে) সাফা ও মারওয়ার তাওয়াফ করা (شعائر) আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্তর্গত নয়। অতএব আল্লাহ্ পাক নাযিল করলেন এই আয়াত– فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا (যে, পাহাড় দু'টি আল্লাহ্‌র নিদর্শনের অন্তর্গত) সুতরাং যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ অথবা উমরা করে তার জন্য এ দুটি পাহাড়ের তাওয়াফ করায় কোন ক্ষতি নেই। মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না সূত্রে আমির (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, সাফা পাহাড়ের উপর যে মূর্তিটি ছিল, তাকে (اساف) 'আসাফ' নামে ডাকা হতো এবং মারওয়া পাহাড়ের উপর রক্ষিত মূর্তিটিকে (نائله)'নায়েলা' নামে অভিহিত করা হতো। অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে ইবনে আবূশ্ শাওয়ারেব থেকেও। তিনি তাতে কিছু অতিরিক্ত বাক্য সংযোজন করে বলেন যে, (الصفا) সাফাকে (مزكر) পুংলিঙ্গ শব্দ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, এতে রক্ষিত পুংলিঙ্গের মূর্তিটির কারণে। (مروة) আর মারওয়াকে (مؤنث) স্ত্রীলিঙ্গের শব্দ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, এতে রক্ষিত স্ত্রীলিঙ্গের মূর্তিটির কারণে।

হযরত শা'বী (র.) থেকে উল্লিখিত ইবনে আবূশ্ শাওয়ারেবের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে ইয়াযীদ থেকে যে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে, তাতে কিছু অতিরিক্ত বর্ণনা রয়েছে। তিনি বলেন, فجعل الله تطوّع خير 'কাজেই আল্লাহ্ তা'আলা–নফল কাজকে কল্যাণকর করেছেন।"

হযরত আসিমূল আহ্ওয়াল থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আমি আনাস ইবনে মালিক (রা.)–কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কি সাফা ও মারওয়ার তাওয়াফ করাকে মহান আল্লাহ্র এ আয়াত নাযিলের পূর্বে অপসন্দ করতেন ? তখন তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমরা এ উভয়ের তাওয়াফ করাকে অপসন্দ করতাম। কেননা, তা জাহেলিয়াত যুগের নিদর্শনসমূহের অন্তর্গত ছিল। যতক্ষণ না এই আয়াত– اِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَا ئِرِ اللّٰهِ অবতীর্ণ হয়।

হযরত আসিম (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আমি আনাস (রা.)–কে সাফা ও মারওয়ার (তাওয়াফ) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি বললেন, পাহাড় দু'টি জাহেলিয়াতের যুগের নিদর্শনসমূহের অন্তর্গত ছিল। তারপর যখন ইসলামের আবির্ভাব হল– তখন তারা তাদের তাওয়াফ করা থেকে বিরত রইল। তারপর এ আয়াত–اِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ অবতীর্ণ হয়। হযরত আমর ইবনে হাবশী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আমি ইবনে উমার (রা.) কে اِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি বললেন, আপনি ইবনে আব্বাস (রা.) এর নিকট গমন করুন এবং তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করুন। কারণ, হযরত মুহাম্মদ (সা.)–এর উপর যা নাযিল হয়েছে, তদ্বিষয়ে তিনি অধিক অবগত আছেন। আমি তাঁর নিকট গমন করলাম এবং এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি জবাবে বললেন, ঐ পাহাড় দুটিতে মূর্তি ছিল, তারা এদের উপাসনা করতো, যতক্ষণ না–اِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَا ئِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। তারপর তারা এতদুভয়ের তাওয়াফ থেকে বিরত রইল।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে আল্লাহ্র বাণী– اِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ সম্পর্কে বর্ণিত, তৎকালে কিছুসংখ্যক লোক সাফা এবং মারওয়ার তাওয়াফ করাকে খারাপ মনে করতো। আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করলেন যে, পাহাড় দুটি আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের অন্তর্গত এবং তাদের তাওয়াফ করা মহান আল্লাহ্র নিকট অধিক প্রিয়। কাজেই, তাদের মধ্যে তাওয়াফ করা (سنة) সুন্নাত হয়ে গেল।

হযরত সূদ্দী (র.) থেকে اِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِاعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا এ আয়াত সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আব্দুল মালিক (র.) ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, কিছু সংখ্যক শয়তান সাফা ও মারওয়ার মধ্যে রাত্রিতে অবস্থান করতো এবং তাদের মধ্যে কয়েকটি উপাস্য (الهة) ছিল। তারপর যখন ইসলামের আবির্ভাব ঘটল তখন মুসলমানগণ বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল ! আমরা সাফা ও মারওয়ার মধ্যে তাওয়াফ করবো না।

কেননা, তা শির্কমূলক কাজ, আমার জাহেলী যুগে তা' করতাম। কাজেই আল্লাহ্ তা'আলা فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا ("তাদের তাওয়াফের মধ্যে কোন পাপ নেই।") এ আয়াত অবতীর্ণ করেন।

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে মহান আল্লাহ্র বাণী– اِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, আনসারগণ বলল, এ দু'টি পাথরের (দু'পাহাড়ের) মধ্যে তাওয়াফ করা জাহেলী যুগের কাজ। কাজেই, আল্লাহ্ তা'আলা اِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে (উল্লিখিত হাদীসের) অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

হযরত ইবনে ওয়াহাব (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বললেন যে, ইবনে যায়েদ–মহান আল্লাহ্র এই বাণী– فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا সম্পর্কে বলেন, জাহেলী যুগের অধিবাসিগণ উভয় পাহাড়ের মূর্তি রেখে উপাসনা করতো। তারপর যখন তারা ইসলাম গ্রহণ করল, তখন সাফা ও মারওয়ার মধ্যে মূর্তি রাখার কারণে তারা এদুয়ের তাওয়াফ করাকে অপসন্দ করল। কাজেই আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, "নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের অন্তর্গত। সুতরাং যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ্র হজ্জ ও উমরা করে, তার জন্য এগুলোকে তাওয়াফ করার মধ্যে কোন পাপ নেই।" এরপর তিনি পাঠ করলেন, وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ "যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে ; তবে নিশ্চয়ই তা অন্তরসমূহের পরহিযগারীতার লক্ষণের অন্তর্গত।" আর হযরত রাসূলুল্লাহ্ এ উভয়ের তাওয়াফের প্রথা প্রচলন করলেন।

হযরত আসিম (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন যে, আমি আনাস (রা.)–কে সাফা ও মারওয়ার তাওয়াফ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যে, আপনারা কি–এ উভয়ের উপর রক্ষিত মূর্তির কারণে তার তাওয়াফ করাকে অপসন্দ করতেন ? যে মূর্তির ব্যাপারে আপনাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে ? তিনি জবাবে বললেন, হ্যাঁ। পরিশেষে اِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ এ আয়াত আল্লাহ্ তা'আলা অবতীর্ণ করেন।

হযরত আসিম (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন যে, আমি আনাস ইবনে মালিককে বলতে শুনেছি যে, সাফা ও মারওয়া জাহেলী যুগে–কুরায়শদের নিদর্শনসমূহের অন্তর্গত ছিল। তারপর যখন ইসলামের আবির্ভাব ঘটল–তখন আমরা এ উভয়ের তাওয়াফ করা পরিত্যাগ করলাম। আর অন্যান্য মুফাসসীরগণ বলেন, বরং উল্লিখিত আয়াত ঐসব সম্প্রদায়ের লোকদের কারণে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা জাহেলী যুগে এ উভয়ের তাওয়াফ করতো না। এরপর যখন ইসলামের আবির্ভাব হল, তখন তারা এ উভয়ের তাওয়াফ করতে ভয় করতো। যেমন, তারা তার তাওয়াফ করতে ভয় করতো জাহেলী যুগে। যাঁরা অভিমত পোষণ করেন, তাঁর স্বপক্ষে নিম্নের হাদীস উল্লেখযোগ্য।

হযরত কাতাদা (র.) থেকে মহান আল্লাহ্‌র বাণী সম্পর্কে-اَلاية - إِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ বর্ণিত হয়েছে যে, জাহেলী যুগে (تهامة) তিহামার অধিবাসী-একটি সম্প্রদায়ের লোকেরা এ উভয়ের তাওয়াফ করতো না। কাজেই, আল্লাহ্ তা'আলা খবর দিলেন যে, সাফা ও মারওয়া মহান আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্তর্গত।" আর এ উভয়ের তাওয়াফ করা হযরত ইবরাহীম (আ.) এবং হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর (سنة) সুন্নাতের অন্তর্গত।

হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিহামার (تهامة) অধিবাসীদের মধ্য হতে কিছুসংখ্যক লোক সাফা ও মারওয়ার মধ্যে তাওয়াফ করতো না। কাজেই আল্লাহ্ তা'আলা إِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ এ আয়াত অবতীর্ণ করেন।

হযরত ইবনে যুবায়ের (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন যে, আমি হযরত আয়েশা (রা.)-কে মহান আল্লাহ্‌র বাণী-إِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম-এবং তাঁকে একথাও আমি বললাম যে, আল্লাহ্‌র শপথ ! সাফা ও মারওয়ার তাওয়াফ না করলে কারো কোন অপরাধ নেই। এরপর হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, হে ভাগিনা ! তুমি কতই না মন্দ কথা বললে ! উল্লিখিত আয়াতের মর্মার্থ যদি তোমার ব্যাখ্যানুসারে হতো, তাহলে এ উভয়ের তাওয়াফ না করার মধ্যে কোন অপরাধ থাকতো না। কিন্তু উল্লিখিত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে আনসারগণের সম্পর্কে। তারা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে 'মানাত' নামক মূর্তির পূজা করতো। সাফা ও মারওয়ার তাওয়াফ করাকে তারা খারাপ মনে করতো। অতএব, তারা ঐ ব্যাপারে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করল যে, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.), আমরা তো ইতিপূর্বে সাফা ও মারওয়ার তাওয়াফ করাকে অপসন্দ মনে করতাম। তখন আল্লাহ্ তা'আলা إِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا এই আয়াত অবতীর্ণ করেন। আয়েশা (রা.) বলেন যে, এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এতদুভয়ের তাওয়াফের (سنة) প্রথা প্রচলন করেন। অতএব, কারো জন্যে এতদুভয়ের তাওয়াফ পরিত্যাগ করা উচিত হবে না।

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, আনসারগণের কিছু সংখ্যক লোক জাহেলী যুগে 'মানাত' নামক পূজা করতো। মানাত হল-মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে রক্ষিত একটি মূর্তি। তারা বলল, হে আল্লাহ্‌র নবী (সা.) ! আমরা মানাত নামক মূর্তির সম্মানার্থে ইতিপূর্বে সাফা ও মারওয়া এর তাওয়াফ করতাম না-। আমরা এখন সাফা ও মারওয়ার তাওয়াফ করলে কি কোন ক্ষতি আছে?

তখন আল্লাহ্ তা'আলা-اِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا এই আয়াত অবতীর্ণ করেন।

হযরত উরওয়া (রা.) বলেন যে, আমি আয়েশা (রা.)-কে বললাম, সাফা ও মারওয়ার তাওয়াফ না করার ব্যাপারে আমি কোন কিছু মনে করি না। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন- فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ আর্থাৎ সাফা ও মারওয়ার তাওয়াফ না করায় কোন ক্ষতি নেই। তখন তিনি বলেন, হে ভাগিনা ! তুমি কি লক্ষ্য কর নি যে, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ اِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ 'নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া মহান আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের অন্তর্গত'। ইমাম যুহ্রী (র.) আমি এসম্পর্কে আবূ বাকর ইবনে আবদুর রহমান ইবনে হারেছ ইবনে হিশামকে জিজ্ঞেস করলাম। তাই তিনি বলেন, "هـذا ا لـعلـم" তা একটি নির্দেশন। হযরত আবূ বাকর (রা.) বলেন আমি কয়েকজন জ্ঞানী ব্যক্তিকে একথা বলতে শুনেছি যে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ সম্পর্কে আয়াত নাযিল করেন, তখন তো সাফা ও মারওয়ার তাওয়াফ সম্পর্কে কোন আয়াত নাযিল করেননি। কেউ নবী করীম (সা.)-কে বলল, আমরা তো জাহেলী যুগে সাফা ও মারওয়ার মধ্যে তাওয়াফ করতাম। আর আল্লাহ্ তা'আলা উল্লিখিত আয়াতে বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সাফা ও মারওয়ার এর তাওয়াফের ব্যাপারে তো তিনি কিছু উল্লেখ করেননি। তবে কি আমরা এখন সাফা ও মারওয়া এ তাওয়াফ না করলে কোন ক্ষতি আছে ? অতএব আল্লাহ্ তা'আলা- اِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ এ আয়াত শেষ পর্যন্ত অবতীর্ণ করেন। হযরত আবূ বাকর (রা.) বলেন, আপনি শুনে রাখুন যে, এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে, যারা সাফা ও মারওয়ার তাওয়াফ করেছে এবং যারা তার তাওয়াফ করেনি, এ উভয় দলের উদ্দেশ্যেই।

হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিহামাহ্র অধিবাসীরা সাফা ও মারওয়ার মধ্যে তাওয়াফ করতো না। কাজেই আল্লাহ্ তা'আলা- اِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ এ আয়াত নাযিল করেন। এ ব্যাপারে আমাদের কাছে সঠিক বক্তব্য হল যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা সাফা ও মারওয়ার মধ্যকার তাওয়াফ-কে আল্লাহ্র নিদর্শন বলে উল্লেখ করেছেন, যেমনিভাবে বায়তুল্লাহ্র মধ্যকর তাওয়াফকে আল্লাহ্র নিদর্শন বলে উল্লেখ করেছেন। কাজেই, মহান আল্লাহ্র কালাম- فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا দ্বারা তা জায়েয বুঝায়। কেউ কেউ বলেন যে, হযরত শা'বীর (র.) বর্ণনা মতে উভয় দলের কিছু সংখ্যক লোক সাফা ও মারওয়ার উপর দু'টি মূর্তি রাখার কারণে তাদের তাওয়াফ করতে ভয় করতো, আর কিছু সংখ্যক লোক জাহেলী যুগে সাফা ও মারওয়ার তাওয়াফ করাকে অপসন্দ করতো। এ সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, উল্লিখিত দু'টি নির্দেশের যে, কোনটিতে মহান আল্লাহ্র বাণী - فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا- اَلاٰيَة দ্বারা একথা

প্রমাণিত হয় না যে, যারা সাফা ও মারওয়ারও তাওয়াফ করেছে তাদের অপরাধ হয়েছে, এই জন্য যে, মাহান আল্লাহ্‌র নিষেধের কারণে তা অবৈধ ছিল। তারপর সাফা ও মারওয়ার তাওয়াফকে সকলের জন্য ঐচ্ছিক করে দিয়েছেন। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা সে সময় ঐ ব্যাপারে নিষেধ করেননি। তারপর মহান আল্লাহ্‌র বাণী- فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا এ আয়াত দ্বারা তাতে ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে।

এ ব্যাপারে তত্ত্বজ্ঞানিগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। তাদের মধ্য থেকে কয়েকজনের অভিমত এই যে, সাফা ও মারওয়ার তাওয়াফ পরিত্যাগকারী, হজ্জের (مناسك) অন্যান্য ইবাদত স্থল কিংবা পদ্ধতিসমূহ পরিত্যাগকারীর অন্তর্গত। যা হুবহু কাযা (قضا) ব্যতীত এর ক্ষতিপূরণ হবে না। যেমন 'তাওয়াফে ইফাযা' পরিত্যাগকারীর জন্য তার হু-বহু 'কাযা' ব্যতীত এর ক্ষতিপূরণ হয় না-। তাঁরা বলেন, উভয় তাওয়াফ-ই মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশ। তন্মধ্যে একটি হল বায়তুল্লাহ্‌র এবং অপরটি হল-সাফা ও মারওয়ার তাওয়াফ। তাদের মধ্য হতে কয়েকজনের অভিমত হল-সাফা ও মারওয়ার তাওয়াফ পরিত্যাগকারীর জন্য (فدية) বিনিময় মূল্য হল এর ক্ষতিপূরণ। তাঁরা বলেন যে, সাফা মারওয়ার ও তাওয়াফের (حكم) আদেশ, (رمى الجمرات) কংকর নিক্ষেপের এবং (طواف الصدر) প্রত্যাগত তাওয়াফ ও অনুরূপ অন্যান্য বিষয়ের নির্দেশের সমতুল্য-। ঐ সব কার্যসমূহ পরিত্যাগকারীর জন্য (فدية) বিনিময় মূল্য প্রদানই যথেষ্ট। হুবহু কাযার জন্য কাজটি পুনরায় সম্পাদন করা তার জন্য অত্যাবশ্যক নয়-। অন্যান্য তফসীরকারগণ মনে করেন যে, সাফা ও মারওয়ার তাওয়াফ করা (تطوّع) নফল কাজ। যদি কেউ তা করে, তবে তা তার জন্য ভাল-। আর যদি কেউ তা না করে, তবে তার জন্য অন্য কোন কিছু অত্যাবশ্যক হবে না। অর্থাৎ কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। (و الله تعالى اعلم) (এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ তা'আলাই অধিক জ্ঞাত)।

ঐ ব্যক্তির জন্য নিম্নের হাদীস উল্লেখ করা হল-যিনি বলেন যে, সাফা ও মারওয়ার মধ্যকার তাওয়াফ করা (واجب) ওয়াজিব এবং তার ত্রুটিতে (فدية) (বিনিময় মূল্য) যথেষ্ট হবে না। আর যে ব্যক্তি তা পরিত্যাগ করবে, তার উপর তা পুনরায় আদায় করা অত্যাবশ্যকীয়।

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমার জীবনের শপথ ! ঐ ব্যক্তির হজ্জ হয়নি, যে ব্যক্তি সাফা ও মারওয়ার সায়ী করেনি। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, اِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ 'নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্‌র নিদের্শনসমূহের অন্তর্গত'।

হযরত মালিক ইবনে আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি সাফা ও মারওয়ার সায়ী করতে ভুলে যায়, তা হলে সে যদি মক্কা মুকাররমা থেকে দূরেও চলে যায় তবুও যেন সে ফিরে

এসে এ সায়ী করে। আর যদি সে স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়, তবে তার জন্য (عمره) উমরা এবং (هدى) বিনিময় মূল্য দেয়া (ওয়াজিব) অত্যাবশ্যকীয়। ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, যে ব্যক্তি সাফা ও মারওয়ার সায়ী করা পরিত্যাগ করল, এমন কি নিজ শহরে ফিরে গেলেও যেন সে মক্কা মুকাররমার দিকে প্রত্যাবর্তিত হয় এবং সাফা–মারওয়ার সায়ী করে–। সায়ী ব্যতীত এর কোন ক্ষতিপূরণ নেই।

হযরত রাবী (র.) থেকে বর্ণিত হাদীসে ঐ ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যিনি বলেন যে, (সাফা ও মারওয়ার সায়ী পরিত্যাগ করার কারণে) (دم) 'দন্ডস্বরূপ কুরবানী' দ্বারা ক্ষতিপূরণ করা যথেষ্ট। আর তার জন্য তার (قضا) কাযা করার জন্য প্রত্যাবর্তন করা অত্যাবশ্যক নয়–। ইমাম সাওরী (র.) নিম্নের হাদীসানুসারে বলেন ঃ

আলী ইবনে সাহ্ল সূত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.), ইমাম আবূ ইউসুফ (র.), ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, যদি কেউ সাফা ও মারওয়ার সায়ী পরিত্যাগ করে, আবার তা (قضا) কাযা করার জন্য যদি ফিরে আসে তবে উত্তম–। আর যদি ফিরে না আসে, তবে তার উপর (دم) দন্ডস্বরূপ কুরবানী দেয়া অত্যাবশ্যক–। যাঁরা বলেন যে, সাফা ও মারওয়ার সায়ী করা (تطوع) নফল কাজ–। আর যে ব্যক্তি তা পরিত্যাগ করে, তাতে কিছু যায় আসে না। আর তা ঐ ব্যক্তির জন্যও দলীল–যিনি পাঠ করেছেন যে, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا অর্থাৎ সাফা ও মারওয়ার সায়ী না করায় ক্ষতি নেই–তাদের সমর্থনে আলোচনা।

হযরত আতা (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, যদি কোন হাজী (جمراة العقبى) 'জামরাতুল আকাবায়' কংকর নিক্ষেপের পর বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ করে এবং (سعى) সায়ী না করেই স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়, তবে এতে কোন কিছু ক্ষতি হবে না। যেমন কুরআনে উল্লিখিত বিষয় সম্পর্কে ইবনে মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا অর্থাৎ "যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ্ শরীফের হজ্জ করে কিংবা উমরা করে, তাঁর জন্য সাফা ও মারওয়ার সায়ী না করায় কোন ক্ষতি নেই'। তখন আমি তাঁকে বললাম আপনি তো নবী করীম (সা.)–এর (سنة) সুন্নাত পরিত্যাগ করেছেন। তিনি তখন বললেন, আপনি কি শুনেন নি যে, তিনি বলেছেন, (فمن تطوع خيرا) "কাজেই যে ব্যক্তি নফল (তাওয়াফ) করল, সে উত্তম কাজ করল''। তাই সাফা ও মারওয়ার সায়ী পরিত্যাগ করার ক্ষতির বিষয়টি তিনি স্বীকার করলেন। اِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ – الاية) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি পাঠ করলেন "নিশ্চয়ই সাফা

ও মারওয়া আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্তর্গত''। (শেষ আয়াত পর্যন্ত) অতএব সাফা ও মারওয়ার সায়ী না করায় কোন ক্ষতি নাই।

হযরত আসিম (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন–আমি আনাস (র.)–কে একথা বলতে শুনেছি যে, (الطواف بينهما تطوع) "সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সায়ী করা নফল কাজ''।

হযরত আসিমুল আহওয়াল (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন যে, আনাস ইবনে মালিক (রা.) বলেছেন, (هما تطوع) "সাফা ও মারওয়ার সায়ী করা নফল কাজ''।

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকেও (উল্লিখিত হাদীসের) অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, اِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا তিনি এ আয়াত সম্পর্কে বলেন যে, فَلَمْ يَخْرُجْ مَنْ لَّمْ يَطُفْ بِهِمَا "যে ব্যক্তি সাফা ও মারওয়ার সায়ী করে নাই, তাতে কোন ক্ষতি নেই''।

আবদুল্লাহ্‌ ইবনে যুবায়ের (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, (هما تطوع) "সাফা–মারওয়ার মাঝে সায়ী করা নফল কাজ''। হযরত আসিম (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন যে, আমি আনাস ইবনে মালিক (রা.)–কে জিজ্ঞেস করলাম, সাফা ও মারওয়ার মধ্যকার সায়ী করা কি নফল কাজ ? তিনি বললেন, হাঁ, তা নফল। এ ব্যাপারে আমাদের সঠিক সিদ্ধান্ত হল যে, সাফা ও মারওয়ার মাঝে সায়ী করা (واجب) অত্যাবশ্যকীয়। আর যে ব্যক্তি তাকে ভুলে কিংবা স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করে–তার জন্য তার (قضا) কাযার উদ্দেশ্যে প্রত্যাবর্তন ব্যতীত অন্য কিছুতে এর ক্ষতিপূরণ যথেষ্ট হবে না। কারণ, এ বিষয়ে হযরত রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) থেকে স্পষ্ট হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে যখন হজ্জ করেন, তখন তাঁর হজ্জের করণীয় কাজসমূহের মধ্যে সাফা ও মারওয়ার সায়ী করাও অন্তর্গত ছিল।

এ মতের সমর্থনে আলোচনা ঃ

হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন যে, যখন হযরত রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) তাঁর হজ্জের সময় সাফা পাহাড়ের নিকট আমাদের সাথে মিলিত হন, তখন তিনি বললেন, اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ "নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্তর্গত''। তিনি সাফা পাহাড়ে আসলেন, কিছুক্ষণ তথায় অবস্থানের পর সেখান থেকে সায়ী শুরু করলেন, তারপর মারওয়াতে আসলেন সেখানেও দাঁড়ালেন এবং সেখান থেকেও সায়ী করলেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত নবী করীম (সা.) বর্ণনা করেছেন, اِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ "নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্তর্গত''। কাজেই তিনি সাফা আগমন করে সেখান থেকেই সায়ী শুরু করেন। তারপর তিনি তাতে আরোহণ

করে সায়ী শুরু করেন। ইজমায়ে উম্মত (উম্মতের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত) দ্বারা এ কথা সঠিকভাবে প্রমাণিত যে, সাফা ও মারওয়ার সায়ী দ্বারা হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উম্মতকে হজ্জের আহকাম সম্বন্ধে শিক্ষা দেয়াই উদ্দেশ্য ছিল। আর হজ্জের ব্যাপারে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হজ্জ এবং উমরা ইত্যাদি তাঁর উম্মতের কাছে আল্লাহ্ তা'আলা (نــص) দলীল হিসাবে বর্ণনা করেছেন। ব্যাপক অর্থবোধক সংক্ষিপ্ত আয়াতের মাধ্যমে। যে সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবে বর্ণনা করেছেন। আর তাঁকে এ ব্যাপারে এমন সব নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, যা তাঁর বর্ণনা ব্যতীত তাঁর উম্মতের জন্য করণীয় অত্যাবশ্যকীয় কাজ হিসেবে অবগত হওয়া যায় না। এ সম্পর্কে আমরা আমাদের কিতাবে-"كتاب البيان عن اصول الاحكام" "শরীয়তের মূলনীতি গ্রন্থে'' বর্ণনা করেছি। তা ওয়াজিব (واجب) হওয়ার ব্যাপারে উম্মতের ফকীহগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। তারপর সাফা ও মারওয়ার সায়ী সম্পর্কেও একাধিক মত রয়েছে, তা কি ওয়াজিব ? না ওয়াজিব নয় ? যে ব্যাক্তি হজ্জ কিংবা উমরা করে, তার উপর তা ওয়াজিব হওয়ার কথা আমরা বর্ণনা করেছি। এমনিভাবে যে ব্যাক্তি সাফা ও মারওয়ার সায়ী পরিত্যাগ করে তার উপর পুনরায় এর (قضا) কাযা (واجب) অত্যাবশ্যকীয় হওয়ার বহুল আলোচিত কথাও আমরা বর্ণনা করেছি। তা সত্ত্বেও এ কথার উপর (اجماع) সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যে কাজ নিজে করেছেন এবং তাঁর উম্মতগণকে তাদের হজ্জ ও উমরার বিষয়ে যা শিক্ষা দিয়েছেন, তা (واجب) অত্যাবশ্যকীয়। যেমন তিনি নিজে বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ করেছেন এবং উম্মতকে তাদের হজ্জ ও উমরা আহকাম (নির্দেশাবলী) শিক্ষা দিয়েছেন। এ কথার উপর (اجماع) সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে, বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফের জন্য কোন (فد يــة) বিনিময় মূল্য এবং কোন বদল কার্যকরী হবে না। আর তা পরিত্যাগকারীর জন্য তার (قضـــا) কাযা ব্যতীত অন্য কোন বিকল্প নেই। অনুরূপ দৃষ্টান্ত সাফা ও মারওয়া সায়ীর বেলায়ও প্রযোজ্য। তার জন্যও কোন (فد ية) বিনিময় মূল্য এবং বদল যথেষ্ট হবে না। আর তা পরিত্যাগকারীর জন্যও তার (قضا) কাযার উদ্দেশ্যে প্রত্যাবর্তন ব্যতীত অন্য কিছু কার্যকরী হবে না। সুতরাং, উভয় তাওয়াফ, অর্থাৎ একটি বায়তুল্লাহ্ শরীফের এবং অপরটি সাফা ও মারওয়ার হুকুম অভিন্ন। আর যে ব্যক্তি এ উভয় তাওয়াফের হুকুমের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে, তার উপরই এর উল্টো কথা বর্তাবে। তারপর সাফা ও মারওয়ার হুকুমের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়কারীর নিকট দলীল চাওয়া হয়েছে।

যদি কেউ ঐ ব্যক্তির পাঠ পদ্ধতি দ্বারা দলীল পেশ করে, যিনি এভাবে পাঠ করেছেন যে, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ لَّا يَّطَّوَّفَ بِهِمَا ("সাফা ও মারওয়ার সায়ী না করায় কোন ক্ষতি নেই'') তবে এর

উত্তরে বলা হবে যে, ذلك خلاف مافى مصاحف المسلمين ঐ পাঠ পদ্ধতি মুসলমানদের (مصحف) কুরআনে বর্ণিত পাঠ পদ্ধতির পরিপন্থী। তা অবৈধ। কারো অধিকার নেই যে, মুসলমানদের (مصاحف) কুরআনে এমন কিছু অতিরিক্ত বিষয় সংযোগ করে যা তাতে নেই। যদি কেউ ঐ কিরাআত বিশেষজ্ঞের মত কিরাআত পাঠ করে, কিংবা যে কোন কিরাআত বিশেষজ্ঞ যদি এমন ধরনের কিরাআত পড়ে যা (مصحف) কুরআনে নেই, তবে তাও অবৈধ হবে। যথা ثُمَّ لِيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ وَلْيُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطُوَّفُوْا بِهِ "তারপর তারা যেন তাদের পরিত্যাগ করা বিষয়ের (قضا) কাযা করে এবং তাদের মান্নতসমূহ যেন আদায় করে এবং বায়তুল্লাহ্‌র যেন তাওয়াফ করে। কাজেই সাফা ও মারওয়ার সায়ী না করায় তার জন্য কোন ক্ষতি নেই''। তবে কুরআনের আয়াতের সাথে যদি উল্লেখিত অতিরিক্ত দুটি সংযোগ আয়াতের যে কোন একটি দলীলরূপে পেশ করে, যা' কুরআন মজীদে নেই, তা হলে পরবর্তীটির হুকুমও প্রথমটির ন্যায় অকাট্য দলীল দ্বারা অবৈধ হবে। (محكم) অকাট্য দলীল হিসাবে প্রমাণিত আয়াতকে কেউ রদ করতে পারে না। উল্লিখিত পাঠ পদ্ধতি অবতরণকে অস্বীকার করে, হযরত আয়েশা (রা.) থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে তা বর্ণিত হল।

হযরত হিশাম ইবনে উরওয়া (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, আমি নবী করীম (সা.)-এর বিবি আয়েশা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম (তখন আমি কম বয়সী ছিলাম) যে, মহান আল্লাহ্‌র বাণী- اِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطُوَّفُوْا بِهِمَا এ আয়াত সম্পর্কে আপনার। অভিমত কি ? আমরা তো কাউকেও সাফা ও মারওয়ার সায়ী করতে দেখি না। তখন হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, কখনও না। যদি তা আপনার কথা মত হতো, তবে আয়াত হতো এমন فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ لَّا يَّطُوَّفَ بِهِمَا "যে ব্যক্তি সাফা ও মারওয়ার সায়ী না করে, তার জন্য এতে কোন পাপ নেই''। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হল-আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে আনসারগণকে উদ্দেশ্য করে। তারা (مناة) 'মানাত' নামক মূর্তির উপাসনা করতো। مناة 'মানাত' ছিল একটি পুরাতন মূর্তির নাম। তারা সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সায়ী করাকে অপসন্দ করতো। কাজেই যখন ইসলামের আবির্ভাব ঘটল, তখন তারা হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করল। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা তখন اِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا এ আয়াত নাযিল করেন। তবে ঐ ব্যক্তির পাঠ পদ্ধতিও গ্রহণযোগ্য হওয়ার সম্ভাবনা আছে, যিনি পাঠ করেছেন, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا যে

ব্যক্তি এতদুভয়ের সায়ী করবে না, তার কোন পাপ নেই। তখন এ কালামের প্রথমাংশে فَلَا جُنَاحَ এর মধ্যে "لا" অক্ষরটি (صلـه) সংযোগ অর্থ প্রকাশ করবে এবং বাক্যের মধ্যে نفى (নাবোধক) অর্থটি (تقدم) পূর্বাহ্নে হয়েছে মনে করতে হবে। কাজেই তা মহান আল্লাহ্র ঐ কালামের অনুরূপ হবে যা' অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে যে, مَا مَنَعَكَ اَنْ لاَ تَسْجُدَ اِذَا اَمَرْتُكَ

যেমন কোন কবি বলেছেন ঃ

مَا كَانَ يَرْضَى رَسُوْلُ اللهِ فِعْلَهُمَا + وَالطَّيِّبَانِ اَبُوْ بَكْرٍ وَّلاَ عُمَرُ

হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদের দু'জনের কর্মে সন্তুষ্ট নন, আর আবূ বাকর (রা.) এবং উমার (রা.) ও নন। যদি পবিত্র কুরআনের লেখা তার মত হয়, তবুও উল্লিখিত দাবীদারদের জন্য তা দলীল হবে না। যদিও আমরা তাকে পবিত্র কুরআনের বাণী হওয়ার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছি। তা ছিল হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উম্মতকে হজ্জের আহকাম সম্পর্কে শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে। এর উপর তাদের দাবীর স্বপক্ষে কিয়াসী দলীল পেশ করা কিরূপে হতে পারে? কারণ ঐ পাঠ পদ্ধতি মুসলমানদের পবিত্র কুরআনে লিখিত বর্ণনা পদ্ধতির পরিপন্থী। যদি কোন কিরাআত বিশেষজ্ঞ আজকাল ঐরূপভাবে পাঠ করে, তবে কিতাবুল্লার মধ্যে যা নেই, এর চেয়ে অতিরিক্ত কিছু সংযোগ করার কারণে সে শাস্তির উপযোগী হবে।

মহান আল্লাহ্র বাণী- وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَاِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ এর ব্যাখ্যায় "এবং যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কল্যাণকর কাজ করে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ গুণগ্রাহী মহাজ্ঞানী।" কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ এখানে মতবিরোধ করেছেন। উপরোল্লিখিত পঠন পদ্ধতি হল মদীনা ও বসরা অধিবাসী সর্বসাধারণের কিরাআত। وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا এর মধ্যে "تَطَوَّعَ" শব্দটি অতীত কালের (ماضى) রূপ। بالتاء তা-(ت) এর সাথে এবং ع এর মধ্যে فتح যবর যোগে। এই কিরাআত কূফাবাসী সাধারণ কারীগণের। وَمَنْ يَّطَّوَّعْ خَيْرًا এখানে ياء এর সাথে এবং "ع" এর মধ্যে جزم যোগে এবং طاء এর মধ্যে تشديد যোগে। তখন এর অর্থ হবে وَمَنْ يَتَطَوَّعْ "যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কাজ করে"। উল্লেখ্য যে, তা হল কারী আবদুল্লাহ্র কিরাআত। وَمَنْ يَتَطَوَّعْ এইরূপে পড়েছেন, কূফার অধিবাসিগণও। আবদুল্লাহ্র কিরাআত অনুসারে, যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। কিন্তু আসিম (عاصم) সাহেব মদীনাবাসীদের গঠন পদ্ধতি অনুসারে করেছেন। অতএব তাঁরা طاء এর মধ্যে تشديد যোগে পড়েছেনে, تاء কে طاء এর মধ্যে ادغام (প্রবেশ) করানোর উদ্দেশ্যে। উল্লিখিত উভয় ধরনের কিরাআতই প্রসিদ্ধ ও শুদ্ধ। উভয় ধরনের গঠন পদ্ধতির অর্থ অভিন্ন। কেননা, (অতীতকাল) فعل (ক্রিয়া) থেকে حروف الجزا এর

সাথে, **مستقبل** (ভবিষ্যত) অর্থে ব্যবহৃত। অতএব উল্লিখিত উভয় কিরাআতের যে কোন কিরাআত যে কোন কারীই পাঠ করুক না কেন তা শুদ্ধ হবে। তখন এর অর্থ হবে- **و من تطوع با الحج و العمرة بعد قضاء حجتـه الواجبة عليه فا ن الله شاكر لـه على تطوعه لـه بما تطوع به ذا لك ابتغاء وجهه فمجازيه به عليم بما قصروا** -

"যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের আশায় (**تطوع**) নফল হজ্জ এবং উমরা করে, ফরয হজ্জ সম্পাদনের পর, তার নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তার (**تطوع**) নফল কাজের জন্য তার প্রতি গুণগ্রাহী হবেন। অতএব, এই কাজের জন্য সে পুরস্কৃত হবে। আর তিনি বান্দাদের সম্পর্কেও অবগত আছেন।" উল্লিখিত (**تطوع**) শব্দের মর্মার্থ হল-বান্দাগণ যে সব নফল কাজ সম্পাদন করে। সুতরাং আমরা আল্লাহ্ পাকের কালাম **فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا** সম্পর্কে যে সঠিক অর্থ বর্ণনা করলাম, তা ঐ ব্যক্তির ধারণার পরিপন্থী হবে যে ব্যক্তি মনে করে যে, **فمن تطوع بالسعى و الطواف بين الصفا والمروة** সাফা ও মারওয়ার মধ্যকার তাওয়াফ (**طـواف**) এবং (**سعى**) সায়ী নফল কাজ। কেননা সাফা ও মারওয়ার পরিভ্রমণকারীর সায়ী করাটা নফল কাজ হিসেবে পরিগণিত হবে না। কিন্তু নফল হজ্জ কিংবা নফল উমরার বেলায় তা শুধু নফল কাজ হিসেবে পরিগণিত হবে। যা আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করলাম। যখন তা অনুরূপ হবে, তখন স্পষ্ট বুঝা যাবে যে, উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত **تطوع** শব্দটি দ্বারা হজ্জ এবং উমরার করণীয় কার্যাবলী বুঝানো হয়েছে। আর যারা মনে করে যে, সাফা ও মারওয়ার মধ্যকার সায়ী নফল কাজ ওয়াজিব নয়। সুতরাং তাদের ঐ কথা সঠিক ব্যাখ্যা হবে- **فمن تطوع بالطواف بهما فان الله شاكر عليم** "অতএব, যে ব্যক্তি সাফা ও মারওয়ার নফল তাওয়াফ করে, তার জন্য নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা গুণগ্রাহী"। কেননা হজ্জকারী এবং উমরাকারীর জন্য তখন এতদুভয়ের তাওয়াফ করা ঐচ্ছিক হবে। ইচ্ছা করলে করতেও পারে, আবার পারত্যাগও করতে পারে। এমতাবস্থায় বাক্যের অর্থ তাদের ব্যাখ্যার উপর হবে। যেমন- **فمن تطوع بالطواف بالصفا والمرواة فان الله شاكر تطوعه ذلك عليم بما ارد و دنوى الطائف بهما كذالك** অর্থাৎ-"যে ব্যক্তি সাফা ও মারওয়ার (**تطوع**) নফল তাওয়াফ করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তার ঐ নফল তাওয়াফের জন্য গুণগ্রাহী এবং সাফা ও মারওয়ার তাওয়াফকারী যা ইচ্ছা ও নিয়্যত করবে, সে বিষয়ে তিনি (**عليم**) অবগত আছেন।"

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে- **وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ** এ আয়াত সম্পর্কে বর্ণিত

হয়েছে যে, যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কল্যাণকর কাজ করে, তার জন্য তা কল্যাণকর হবে। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যে কাজ " تطوع" (নফল) হিসেবে করেছেন, তা সুন্নাতের অন্তর্গত। অন্যান্য মুফাসসীরগণ বলেছেন যে, তার অর্থ হল যে ব্যক্তি নফল 'উমরা' করেছে। এ রূপ বক্তব্যের স্বপক্ষে নিম্নের হাদীস উল্লেখযোগ্য।

হযরত ইবনে যায়েদ (রা.) থেকে মহান আল্লাহ্‌র বাণী–وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ এর মর্মার্থ হল –"যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় تطوع (নফল) হিসেবে কল্যাণকর কাজ করল, অর্থাৎ উমরা করল, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা এর জন্য গুণগ্রাহী, অভিজ্ঞ"। তিনি বলেন, হজ্জ করা ফরয কাজ এবং উমরা করা নফল কাজ। উমরা করা কোন লোকের জন্যই ওয়াজিব (واجب) নয়।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী–

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِى الْكِتٰبِ اُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ –

অর্থ ঃ "নিশ্চয় আমি মানবজাতির জন্য আমার কিতাবের মধ্যে যে সকল সুস্পষ্ট নিদর্শন ও উপদেশ নাযিল করেছি যারা তা গোপন করে আল্লাহ্ পাক তাদের প্রতি লানত করে থাকেন এবং লানতকারিগণও তাদেরকে লানত দিয়ে থাকে।" (সূরা বাকারা ১৫৯)

অর্থাৎ নিশ্চয় যারা গোপন করে, আমার নাযিলকৃত উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ, তারা হল ইয়াহুদী ও নাসারাদের ধর্মযাজক এবং পন্ডিত ব্যক্তি। তারা মানুষের নিকট মুহাম্মদ (সা.)–এর আদেশ–নিষেধ এবং তাঁর আনুগত্যের কথা গোপন করতো, অথচ তারা তা লিপিবদ্ধ অবস্থায় পেয়েছে, তাদের কাছে অবতীর্ণ তাওরাত এবং ইনজীলে' কিতাবে। ঐ সব উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী, যা আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মদ (সা.)–এর নবূওয়াতের বিষয় ও তাঁর উপর প্রেরিত ওহী এবং তাঁর গুণাবলীর কথা এই কিতাবদ্বয়ে উল্লেখ করেছেন। আহলে কিতাবগণ তাঁর গুণাবলীর কথা এই কিতাব দু'টিতে প্রাপ্ত হয়েছে। আল্লাহ্‌র বাণী بالهدى এর অর্থ হল তাঁর নির্দেশাবলী, যা তিনি তাদের জন্য সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন ঐসব কিতাবে, যা তিনি তাদের নবীগণের উপর অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ .... এই আয়াত উল্লেখপূর্বক বলেন যে, তারা মানুষের কাছে ঐসব বিষয় গোপন করতো, যা আমি তাদের কিতাবসমূহে মুহাম্মদ (সা.)–এর আদেশ–নিষেধ, তাঁর নবূওয়াত এবং তাঁর উপর অবতীর্ণ সত্য ধর্মের তথ্য বহুল বিষয় সম্পর্কে অবতীর্ণ করেছি, তা তারা জেনে শুনে তাদের (জনগণের) নিকট সংবাদ দিতো না। তারা আমার উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ মানবমন্ডলীকে শিক্ষা দিত না এবং তারা

আমার ঐসব সুস্পষ্ট বাণীগুলোও তাদেরকে জানাতো না, যা আমি তাদের নবীগণের প্রতি নাযিলকৃত কিতাবে বর্ণনা করেছি।– أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا – الآيَة – ইকরামা ইবনে আব্বাস থেকে বনর্ণা করে বলেন, إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ আয়াতে বর্ণিত গোপনকারিগণ হলো–ইয়াহূদীদের একদল ধর্মযাজক। অবূ কুরায়ব বলেন যে, তারা গোপন করতো যা কিছু তাওরাত কিতাবের মধ্যে ছিল। আর ইবনে হুমাইদ বলেন, তারা তাওরাতের কিছু কিছু বিষয় গোপন করতো এবং সাধারণ জনগণকে তা অবিহিত করতে অস্বীকার করতো। অতএব, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কথা উল্লেখ–পূর্বক এই আয়াতে নাযিল করেন ঃ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ মুজাহিদ (র.) থেকে আল্লাহ্‌র বাণী–إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন যে, গোপনকারীরা হল আহলে কিতাব।

মুসান্না সূত্রে মুজাহিদ থেকে (উল্লিখিত হাদীসের) অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

রাবী থেকে বর্ণিত তিনি–إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ সম্পর্কে তিনি বলেন যে, তারা মুহাম্মদ (সা.)–এর কথা গোপন করতো। অথচ তারা তা তাদের কিতাবে লিপিবদ্ধ অবস্থায় পাওয়া সত্ত্বেও শত্রুতামূলকভাবে এবং হিংসা করে গোপন করতো।

হযরত কাতাদা (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন তারা হল আহ্‌লে কিতাব। তারা আল্লাহ্‌র মনোনীত দীন ইসলামের কথা গোপন করতো এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)–এর কথাও গোপন করতো, যা তারা তাদের কিতাব–'তাওরাত' এবং 'ইনজীলে' লিপিবদ্ধ অবস্থায় পেয়েছিল।

হযরত সূদ্দী (র.) এ আয়াত সম্পর্কে বলেন যে, তাদের জানা মতে ইয়াহূদীদের মধ্যে থেকে এক ব্যক্তির বন্ধু ছিল আনসারগণের অপর এক ব্যক্তি। তাকে "ثعبة ابن غنمة" (সালাবা ইবনে গানামা (রা.) নামে ডাকা হতো। সে তাকে বলল, তুমি কি তোমাদের কিতাবে (কুরআনে) হযরত মুহাম্মদ (সা.)–এর বিষয় কিছু পেয়েছো ? সে প্রতি উত্তরে বলল,'না' । অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা.)–এর কোন নিদর্শন পায়নি। মহান আল্লাহ্‌র বাণী– مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ এর মধ্যে الناس শব্দের মর্মার্থ بعد الناس (কোন এক ব্যক্তি) কেননা, হযরত মুহাম্মদ (সা.)–এর নবূওয়াতের খবর, তাঁর গুণাবলী এবং তাঁর নবূওয়াত সম্পর্কে আহলে কিতাব ব্যতীত অন্য কারো জানা ছিল না। মহান আল্লাহ্‌র বাণী–لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ এর মধ্য الكتاب এর মর্মার্থ (توراة) তাওরাত এবং (انجيل) ইনজীল কিতাব। এ আয়াত যদিও মানবমন্ডলীর মধ্য থেকে এক বিশেষ সম্প্রদায় সম্পর্কে নাযিল হয়েছে,

তথাপি এর দ্বারা–যে জ্ঞান আল্লাহ্ তা'আলা মানবমণ্ডলীর নিকট প্রচার করার জন্য (فرض) ফরজ করে দিয়েছে"। তা যারা গোপন করে, তাদের কথাই এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এ ব্যাখ্যার স্বপক্ষে নবী করীম (সা.) থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি কোন (ধর্মীয়) জ্ঞান সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়, যা তার জানা আছে, তারপর সে তা গোপন করলে, এর পরিণামে কিয়ামত দিবসে আগুনের লাগাম তাকে পরানো হবে"।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, যদি আল্লাহ্র কিতাবে এমন কোন আয়াত না থাকতো, তা হলে আমি তোমাদেরকে এ সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করতাম না। তারপর তিনি কুরআনে করীমের এ আয়াত–إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَ الْهُدٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِى الْكِتٰبِ اُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ পাঠ করে শুনান–।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, যদি মাহান আল্লাহ্র কিতাবে এ দু'খানা আয়াত অবতীর্ণ না হত, তবে আমি এ সম্পকে কিছুই বর্ণনা করতাম না। প্রথম আয়াত হলো – إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ – اِلٰى اٰخِرِ الا يـة আর দ্বিতীয় আয়াত হলো وَاِذَا اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ – الاية "স্মরণ করো যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল, আল্লাহ্ তাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন তোমরা তা (কিতাব) মানুষের নিকট স্পষ্টভাবে প্রকাশ করবে..........। আয়াতের শেষ পর্যন্ত পাঠ করেন। (আল–ইমরান ঃ ১৮৭)

মহান আল্লাহ্র বাণী–اُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ

এর মর্মার্থ হল আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকেই অভিসম্পাত করেন, যারা আল্লাহ্ পাকের নাযিলকৃত বিষয় গোপন করে। আর তা হল হযরত মুহাম্মাদ (সা.)–এর প্রতি নাযিলকৃত নির্দেশাবলী, তাঁর গুণাবলী এবং তাঁর ধর্মের আদেশ নিষেধ সত্য হওয়ার ব্যাপারে মহান আল্লাহ্র বিস্তারিত বর্ণনার পরও তাদের তা গোপন করা–। তাদেরকে অভিসম্মাত করা হয়েছে। তাদের ঐ সব বিষয় গোপন করার কারণে এবং মানবমণ্ডলীর জন্য তা প্রচার না করার কারণে। واللعنة "শব্দটি الفعلة এর পরিমাপে مصدار মাসদার। من لعنه الله এর অর্থ أقصاه وأبعده و أسحقه "আল্লাহ্ তাকে শেষ প্রান্তে নিক্ষেপ করেছেন, দূর করেছেন এবং বহু দূরে ঠেলে দিয়েছেন। واصل اللعن লানত শব্দের মূল–হল–الطرد নিক্ষেপ করা। যেমন এ মর্মে কবি 'শামমাখ ইবনে যারার' এর একটি কবিতাংশ উল্লেখ করা হল–

ذَعَرْتُ بِهِ الْقَطَا وَنَفَيْتُ عَنْهُ + مَقَامَ الذِّئْبِ كَالرَّجُلِ اللَّعِيْنِ –

'অর্থাৎ مقام الزنب এর অর্থ– الطريد দূরে নিক্ষেপ করা। نعت الذ نب و العين শব্দটি এর (বিশেষণ) হয়েছে। আর مقام الزنب এর মর্মার্থ হল الطـريـد দূরে নিক্ষেপ করা, অভিসম্পাদিত ব্যক্তির মত। তখন আয়াতের অর্থ হবে–তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা নিজ অনুগ্রহ থেকে দূরে নিক্ষেপ করবেন। আর তাদের প্রতিপালক–অন্যান্য অভিসম্পাতকারীদেরকেও তাদের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণের নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং মানব সন্তান এবং অন্যান্য সকল সৃষ্ট জীবই এভাবে অভিসম্পাত করে বলে যে, اَللّٰهُمَّ الْعَنْهُ (হে আল্লাহ্ ! তুমি তার উপর অভিসম্পাত বর্ষণ কর)। যদি العـن এর অর্থ–الاقصاء الابعاد، দূরে অতিদূরে হয়, যা আমার বর্ণনা করলাম। আর لعنة الاعنين এর অর্থ সম্পর্কে আমরা যা বর্ণনা করলাম, তা হল–তাদের প্রতিপালকের আহবান অনুযায়ী তাদের প্রতি لعنة (অভিসম্পাত) বর্ষণ করা। যেমন তাদের কথা لعنه الله আল্লাহ্ তাকে অভিসম্পাত করুন কিংবা তারা বলে– عليه لعنة الله তার উপর আল্লাহ্র অভিসম্পাত। কেননা, হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে মহান আল্লাহ্র বাণী– أُولٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ সম্পর্কে বর্ণিত এর মর্মার্থ হল–তাদেরকে অভিসম্পাত করেন আল্লাহ্ এবং অন্যান্য অভিসম্পাতকারী (بهائم) চতুষ্পদ জন্তুরাও। রাবী বলেন, যখন কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেয়, তখন চতুষ্পদ জন্তুরাও বলে–মানব সন্তানের নাফরমানীর কারণেই এ অঘটন ঘটেছে। তখন আল্লাহ্ তা'আলাও মানব সন্তানের নাফরমান বান্দাদের উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করেন।

মুফাস্সীরগণ আল্লাহ্র বাণী– باللاعنين এর মর্মার্থের ব্যাপারে একাধিক মত পোষণ করেছেন। তাদের কেউ কেউ বলেন যে, এর মর্মার্থ হল دواب الارض و هوامها পৃথিবীতে বিচরণকারী প্রাণী এবং কীট–পতঙ্গ ও উদ্ভিদসমূহ। তাঁর অভিমতের স্বপক্ষে নিম্নের হাদীস উল্লেখ্য। মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন যে, تلعنهم دواب الارض وما شاء الله من الخنافس والعقارب تقول نمنع القطر بزنوبهم "পৃথিবীতে বিচরণকারী প্রাণী, কীট–পতঙ্গ তাদেরকে আভিসম্পাত করে এবং আল্লাহ্র ইচ্ছায় কাল রঙের দুর্গন্ধযুক্ত কীট, বিচ্ছুসমূহও তাদেরকে অভিসম্পাত করে। তারা বলে, তাদের (অপরাধীদের) অপরাধের কারণে আমাদের উপর বৃষ্টি বন্ধ হয়েছে"।

মুজাহিদ থেকে বর্ণিত তিনি আল্লাহ্র বাণী– أُولٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ সম্পর্কে বলেন যে, اللعنون এর মর্মার্থ হল دواب الارض العقارب والخنافس পৃথিবীতে বিচরণকারী প্রাণী, কীট–পতঙ্গ, বিচ্ছু এবং কাল রঙের দুর্গন্ধযুক্ত কীটসমূহ। তারা বলে যে, বনী আদমের পাপসমূহের কারণে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ হয়েছে।

মুজাহিদ থেকে وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন যে, পাপীদেরকে পৃথিবীর উদ্ভিদ এবং প্রাণীসমূহ অভিসম্পাত করে। তারা বলে যে, বনী আদমের অপরাধের কারণে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ হয়েছে।

ইকরামা (র.) থেকে আল্লাহ্‌র বাণী–أُولٰئِكَ وَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন যে, يلعنهم كل شئى حتى الخنافس والعقارب অর্থাৎ তাদেরকে প্রত্যেক বস্তুই এমনকি কাল রঙের দুর্গন্ধযুক্ত কীট এবং বিচ্ছুসমূহ পর্যন্ত অভিসম্পাত করে তারা বলে বনী আদমের অপরাধসমূহের কারণে আমাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ হয়েছে। হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন যে, اللعنون অভিসম্পাতকারীরা হল البهائم জীব–জন্তু। হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে মহান আল্লাহ্‌র বাণী ويلعنهم اللعنون সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন যে, অভিসম্পাতকারীরা হল–البهائم জীব–জন্তু। এসব মানব সন্তানকে অভিসম্পাত করে, তাদের নাফরমানীর কারণে। যখন তাদের পাপের কারণে তাদের উপর বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়। তখন পশু–পাখী বের হয়ে আসে এবং তাদেরকে অভিসম্পাত করে। অন্য সনদে হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে মহান আল্লাহ্‌র বাণী– أُولٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, যে, এর মর্মার্থ তাদের অভিসম্পাতকারীরা হল–পশুপাখী, উট, গাভী এবং ছাগল ইত্যাদি। যখন যমীন অনাবৃষ্টির কারণে শুকিয়ে যায়, তখন তারা মানবসন্তানের মধ্যে যারা নাফরমান তাদের প্রতি অভিসম্পাত করতে থাকে। যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, কি কারণে তারা মহান আল্লাহ্‌র বাণী–يَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ এর ব্যাখ্যা করল যে, অভিসম্পাতকারীরা হল কাল রঙের দুর্গন্ধযুক্ত কীট–পতঙ্গ, বিচ্ছুসমূহ, ইতাদি মৃত্তিকা কীট জাতীয় প্রাণী–? আমার জানা মতে اللعنون শব্দটি যখন جمع বহুবচন হয়, তখন তা দ্বারা মানবসন্তান ব্যতীত ইতর প্রাণী বুঝাবে না। তখন তা جمع বহু বচন আনা হয় نون ও ياء ব্যতীত এবং نون ও واو ব্যতীত। কাজেই তার جمع বহু বচন হয়–তখন تاء এর দ্বারা। তা আমাদের উল্লিখিত বর্ণনার পরিপন্থী। বহু বচনে বলা উচিত ছিল– اللاعنات শব্দ, কিংবা–অনুরূপ অন্য কোন শব্দ। জবাবে বলা যায়, যদি ব্যাপারটি এরূপ হয়, তবে জেনে রাখা চাই যে, আরবের প্রথানুসারে البهائم শব্দের কিংবা তা ব্যতীত অনুরূপ শব্দের যখন এমন শব্দ দ্বারা صفت (গুণ) বর্ণনা করা হয়, যা جمع বহুবচনের নির্দেশসূচক হয়, তখন তা تاء এর দ্বারা হবে। আর বহুবচনের অবস্থা ব্যতীত অন্য সময় মানবসন্তান এবং মানুষ জাতীয় যে কোন শব্দের বহু বচন হবে তাদের পুংলিঙ্গ শব্দের

বহুবচনের অনুকরণে। যেমন মহান আল্লাহ্‌র বাণী–وَ قَالُوْا لِجُلُوْدِهِمْ لِمَ شَهِدْ تُّمْ عَلَيْنَا "তারা শরীরের চামড়াকে লক্ষ্য করে বলবে, "কেন তোমরা বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে ?" এখানে অপ্রাণী বাচক বস্তুর বক্তব্যটা যেন মানুষের বক্তব্যের অনুরূপ হয়েছে। আরও যেমন আল্লাহ্ তা'আলা–ইরশাদ করছেন, يَا اَيُّهَا النَّمْلُ اُدْ خُلُوْا مَسَاكِنَكُمْ "হে পিপীলিকার দল ! তোমরা তোমাদের গর্তে প্রবেশ কর"। আরও যেমন তিনি ইরশাদ করেছেন, وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَاَيْتُهُمْ لِىْ سَاجِدِيْنَ (এবং সূর্য ও চন্দ্রকে দেখলাম, আমাকে সিজদাকারীরূপে"।) আর অন্যান্য মুফাস্‌সীরগণ বলেন যে, মহান আল্লাহ্‌র বাণী–وَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ এর মর্মার্থ হল–ফিরিশতা এবং মু'মিনগণ। যিনি এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন, তার স্ব–পক্ষে নিম্নের হাদীস উল্লেখ করা হল। হযরত কাতাদা (র.) থেকে وَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন যে, অভিসম্পাতকারীরা হল মহান আল্লাহ্‌র ফিরিশতা এবং মু'মিনগণ। অন্য সনদে হযরত কাতাদা (র.) থেকে وَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, অভিসম্পাতকারীরা হল ফিরিশতগণ। হযরত রাবী (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন যে, অভিসম্পাতকারীরা হল–মহান আল্লাহ্‌র ফিরিশতা এবং মু'মিনগণ। আন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন যে, اللعنون এর অর্থ হল–বনী আদম এবং জ্বিন ব্যতীত অন্য সব কিছু। যিনি এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন, তাঁর স্বপক্ষে নিম্নের হাদীস উল্লেখ করা হল।

মূসা সূত্রে সূদ্দী থেকে وَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন যে, বারা ইবনে আযিব বলেছেন, "নিশ্চয়ই কাফিরকে যখন কবরে রাখা হয়, তখন তার কাছে এমন এক (অদ্ভুত ধরনের) প্রাণী আসে যার চক্ষু দু'টি ধূম্রযুক্ত দু'টি ডেগ এর ন্যায়। তার সাথে থাকবে একটি লোহার হাতুরী। তারপর সে তা দ্বারা তার দু'কাঁধে প্রহার করবে। তখন সে এমন জোরে চিৎকার করবে যে, যে কোন প্রাণী তার চিৎকারে শুনে লা'নত করবে। তখন জ্বিন ও ইন্‌সান ব্যতীত সকল প্রাণীই এই চিৎকার শুনতে পাবে।"

হযরত যাহ্‌হাক (র.) থেকে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী– اُولٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন যে, কাফির (নাস্তিক)–কে যখন কবরে রাখা হবে তখন তাকে এমন জো -রে হাতুড়ি দ্বারা প্রহার করা হবে যে, সে ভীষণ জোরে চিৎকার করবে, তার এই চিৎকারের শব্দ জ্বিন ও ইনসান ব্যতীত সকল প্রাণীই শুনতে পাবে। অতএব, যে কোন প্রাণী তার এই (ভীষণ) চিৎকারে শ্রবণ করবে, সেই তাঁকে অভিসম্পাত করবে।

আমাদের নিকট উল্লিখিত ব্যাখ্যাসমূহের মধ্যে ঐ ব্যক্তির ব্যাখ্যাই অধিক নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয়, যিনি বলেন যে, اللعنون এর মর্মার্থ হল الملائكة و المؤمنون ফিরিশতাগণ ও মু'মিনগণ। কেননা

আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদেরকে লা'নত করেছেন। সুতরাং আল্লাহ্, ফিরিশতাবৃন্দ এবং মানবমন্ডলীর পক্ষ হতে তাদের উপর অভিসম্পাত। অতএব, আল্লাহ্ তা'আলা তার উল্লেখপূর্বক ইরশাদ করেছেন– وَ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ مَا تُوْا وَ هُمْ كُفَّارٌ اُولٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَ النَّاسِ اَجْمَعِيْنَ – "নিশ্চয়ই যারা কুফরী করেছে এবং কাফির অবস্থাতেই মরে গেছে, তাদের উপরই আল্লাহ্‌র, ফিরিশতাগণ এবং মানুষ সকলেই লা'নত দেয়।'' (সূরা বাকারা ঃ ১৬১)। এমনিভাবে اللعنة সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা যা ঘোষণা করেছেন, তা অপর দলের বেলায়ও তা প্রযোজ্য হবে। যেমন اَلَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَ الْهُدٰى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ (আমি যেসব) স্পষ্ট নিদর্শন ও পথ নির্দেশ মানুষের জন্য নাযিল করেছি তা যারা গোপন করে। (বাকারা ঃ ১৫৯)।

তাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার অভিসম্পাতের ঘোষণা যে, যারা কুফরী করেছে এবং এ অবস্থাতেই মরে গেছে, তারাও অভিশপ্ত। কেননা উভয় সম্প্রদায়ই কাফির (নাস্তিক)। সুতরাং তাদের বক্তব্য–যারা বলে যে, اَللاعنين এর মর্মার্থ হল–কাল রঙ্গের দুর্গন্ধযুক্ত কীটসমূহ, বিচ্ছুসমূহ এবং অনুরূপ অন্যান্য কীট–পতঙ্গ ও প্রাণী। কেননা, তা এমন কথা–যার কোন মূলতত্ত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। আল্লাহ্ তা'আলার ঘোষণা দ্বারা শুধু মাত্র এতটুকু প্রমাণ হয় যে, যারা একাজ করে তাদের জন্য তা দলীল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। আর এ সম্পর্কে হযরত নবী করীম (সা.) থেকেও কোন (خبر) হাদীসের উল্লেখ নেই। কাজেই এরূপ বলা বৈধ হতে পারে। আর যদি তা তদ্রূপই হয়, তবে তাদের ঐ বক্তব্যটাই সঠিক হবে, যা তারা বলেছে। কিতাবুল্লাহ্ থেকে প্রকাশ দলীল মওজুদ থাকলে, তখন তা উল্লিখিত মুফাস্সীরগণের বক্তব্যের পরিপন্থী হবে। যা আমরা এইমাত্র বর্ণনা করলাম। যদি এই ব্যাখ্যা বৈধ হয় যে, (اللاعنون) অভিসম্পাতকারীরা হল–পশুপাখী এবং মহান আল্লাহ্‌র যাবতীয় সৃষ্ট জীব, তবে তারা অভিসম্পাত করে ঐসমস্ত লোকদেরকে–যারা আল্লাহ্ পাকের নাযিলকৃত কিতাবে হযরত মুহাম্মদ (সা.)–এর গুণাবলী,নবূওয়াত ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়ার পর তা গোপন করে, একথা বুঝাবে। অতএব, একথার সাক্ষ্য পরিত্যাগ করা অবৈধ যে, আল্লাহ্ তা'আলা اللاعنون শব্দ দ্বারা পশুপাখী, উদ্ভিদসমূহ এবং মৃত্তিকা কীট ইত্যাদির অভিসম্পাত করার অর্থ নিয়েছেন। কিন্তু অসংলগ্ন সনদের দুর্বল দলীল দ্বারা প্রমাণিত। এ সম্পর্কে কোন সনদযুক্ত হাদীস নেই। কিতাবুল্লাহ্‌র যে আয়াত আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করলাম, তা তার পরিপন্থী।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী–

اِلاَّ الَّذِيْنَ تَابُوْا وَ اَصْلَحُوْا وَ بَيَّنُوْا فَاُولٰئِكَ اَتُوْبُ عَلَيْهِمْ وَ اَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ –

অর্থ ঃ কিন্তু যারা তওবা করে, এবং নিজেদেরকে সংশোধন করে আর সত্যকে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে, এরা হল–তারা যাদের প্রতি আমি ক্ষমাশীল হই, কারণ

আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা বাকারা ঃ ১৬০)

ব্যাখ্যা ঃ–নিশ্চয়ই আল্লাহ্ এবং অন্যান্য অভিসম্পাতকারীরা তাদেরকে অভিসম্পাত করে, যারা মানুষের কাছে ঐসব বিষয় গোপন করে–যা তারা আল্লাহ্র কিতাবের মাধ্যমে মুহাম্মদ (সা.)–এর নবূওয়াত, তাঁর প্রশংসা ও গুণাবলী ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে অবগত হতে পেরেছে। যা তিনি মানুষের কাছে বর্ণনার জন্য অবতীর্ণ করেছেন। কিন্তু যে ব্যক্তি তা গোপন করার কাজ থেকে বিরত থাকে এবং মুহাম্মদ (সা.)–কে বিশ্বাসপূর্বক তাঁকে স্বীকার করে এবং তিনি আল্লাহ্র নিকট হতে যে নবূওয়াত প্রাপ্ত হয়েছেন, এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং অন্যান্য নবীগণের উপর আল্লাহ্ তা'আলা যেসব কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, তা–ও তারা বিশ্বাস করে। আল্লাহ্র নৈকট্য ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভের আশায় কল্যাণকর কাজের মাধ্যমে যারা নিজেদের আত্মা পরিশুদ্ধ করে, আর নবীগণের প্রতি তিনি যেসব ওহী ও কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, তা তারা অবগত হয়ে প্রচার করে এবং অঙ্গীকার করে যে, তারা তাকে গোপন করবে না ও তা হতে পৃষ্ঠ প্রদর্শনও করবে না। তাদেরকেই অর্থাৎ যারা ঐসব গুণাবলীর কাজ করে, যা আমি বর্ণনা করলাম, তাদের তওবা আমি গ্রহণ করবো। অতএব তাদেরকেই আমার আনুগত্য ও আমার সন্তুষ্টি লাভের যোগ্য বলে বিবেচনা করবো। এরপর আল্লাহ্ বলেন, **وَ اَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ** "এবং আমি তওবা গ্রহণকারী, অনুগ্রহশীল।" অর্থাৎ আমার বান্দা যখন আমার আনুগত্য পরিত্যাগ করে পুনরায় আমার দিকে প্রত্যাবর্তিত হয় এবং আমার ভালবাসা কামনা করে, তখন আমি তাদের অন্তরসমূহের প্রতি সুদৃষ্টি প্রদান করি। আর আমার দিকে প্রত্যাবর্তনকারীদের প্রত্যাবর্তনের সাথে সাথে আমি অনুগ্রহশীল হই ; এবং আমার অনুগ্রহের দ্বারা তাদেরকে বেষ্টন করে ফেলি। আর আমি তখন তাদের বিরাট অপরাধকেও স্বীয় অনুগ্রহে ক্ষমা করে দেই।

যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, **فاولئك اتوب عليهم و هل يكون تائب** কিভাবে তওবাকারীর তওবা গ্রহণ করা হবে ? কি কারণে আল্লাহ্ তা'আলা একথা ইরশাদ করলেন, **اِلاَّ الَّذِيْنَ تَابُوْا فَاُولٰئِكَ اَتُوْبُ عَلَيْهِمْ** কিন্তু যারা তওবা করে ; আমি তাদের তওবা গ্রহণ করি। তবে কি তিনি তওবাকারী ? কিন্তু তিনি তো হলেন সেই মহান সত্ত্বা যাঁর কাছে তওবা করা হয়। এর প্রতি উত্তরে বলা যায় যে, তওবাকারী এবং যাঁর নিকট তওবা করা হয় এ'দু'টি বাক্য এমন যে একটি অপরটির পরিপূরক। আর ব্যবহারের দিকে দিয়ে উভয়টির অর্থে সমান তবে একটির অর্থ, তওবাকারী আর অপরটির অর্থ তওবা গ্রহণকারী। যাদের তওবা গ্রহণ করা হয়েছে তারাই প্রকৃত অর্থ তওবা করেছে। অথবা কেউ কেউ এর অর্থ এভাবে বলেছেন যে, "কিন্তু যারা তওবা করে নিশ্চয়ই আমি তাদের তওবা গ্রহণ করি।" ইতিপূর্বে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে, যার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। যারা এ মত পোষণ করেন তাঁদের আলোচনা ঃ

কাতাদা থেকে আল্লাহ্র বাণী–**اِلاَّ الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَ بَيَّنُوْا**–সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন যে, **اَصْلَحُوْا فِيْمَا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ اللّٰهِ**–এর অর্থ আল্লাহ্ পাক এবং তাদের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে,

ত্রুটি ছিল তা তারা সংশোধন করেছে। আর আল্লাহ্ পাকের নিকট থেকে যে সত্য এসেছে তা তারা বর্ণনা করেছে। তার কোন কিছু তারা গোপন করেনি এবং তা অস্বীকারও করেনি। এরা সেই সব লোক যাদের তওবা আমি কবূল করি। আর আমি অতিশয় তওবা গ্রহণকারী অতীব দয়াবান।

ইবেন যায়েদ থেকে আল্লাহ্ পাকের বাণী– إِلاَّ الَّذِيْنَ تَابُوْا فَأُولَٰئِكَ أَتُوْبُ عَلَيْهِمْ সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন এর অর্থ হলো, আল্লাহ্ পাকের কিতাবে মু'মিনদের সম্পর্কে যা কিছু আছে তা তারা বর্ণনা করেছে। ঐ ব্যাপারে নবী করীম (সা.) সম্পর্কে তারা যা কিছু জিজ্ঞেস করেছে, তাও তারা প্রকাশ করেছে। আর এ সব কথাই ইয়াহুদীদের সম্পর্কে। তাদের মধ্য কেউ কেউ মনে করে যে, আল্লাহ্র বাণী– وَ بَيَّنُوْا এর মর্মার্থ হল তারা (خلاص العمل) বিশুদ্ধ কর্মের মাধ্যমে তওবা করেছে। প্রকাশ্য কিতাব এবং অবতীর্ণ বিষয়ের প্রমাণ বিপরীত। কেননা ঐ সম্প্রদায়কে শাস্তিদানের কথা এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্ কর্তৃক নাযিলকৃত বিষয় গোপন করার কারণে। সুতরাং তিনি তাঁর কিতাবে মুহাম্মদ (সা.)–এর আদেশ–নিষেধ এবং তাঁর দীন বা জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কেও বর্ণনা দিয়েছেন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে পৃথক করেছেন, যারা মুহাম্মদ (সা.)–এর আদেশ–নিষেধ এবং ধর্মের বিষয় প্রকাশ করেছে। অতএব, তাদের উপর অস্বীকার করার এবং গোপন করার যে অভিযোগ ছিল, তা থেকে তারা তওবা করেছে। সুতরাং আল্লাহ্র অভিসম্পাত এবং অন্যান্য অভিসম্পাতকারীদের অভিসম্পাতের শাস্তি থেকে তাদেরকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন, যারা (اخلاص العمل) বিশুদ্ধ কাজ দ্বারা তওবা করেছে। তাদের উপর কোন তিরষ্কার নেই। যারা আল্লাহ্র নাযিলকৃত নিদর্শনসমূহ এবং হিদায়াতের বাণী মানবমন্ডলীর জন্য কিতাবের মধ্যে প্রকাশের পরও গোপন করেছে, তাদের মধ্য হতে কিছু সংখ্যক লোককে আল্লাহ্ তা'আলা পৃথক করেছেন। তাঁরা হলেন– আহ্লে কিতাবের অন্তর্গত আব্দুল্লাহ্ ইবনে সালাম এবং তাঁর সহযোগিগণ। যাঁরা উত্তমরূপে ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ্র অনুগত হয়েছিলেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী–

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ مَاتُوْا وَ هُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَ الْمَلٰئِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِيْنَ–

অর্থ ঃ যারা কুফরী করে এবং কুফরী অবস্থায় মারা যায় তাদেরকে আল্লাহ্, ফিরিশতা এবং মানুষ সকলেই লা'নত দেয়া। (সূরা বাকারা ঃ ১৬১)

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহ্র বাণী إِنَّ الَّذِيْنَ এর মর্মার্থ হল যারা মুহাম্মদ (সা.)–এর নবূওয়াতকে অস্বীকার করেছে এবং তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে–তারা হল–ইয়াহুদী, নাসারা এবং বিভিন্ন ধর্মের মুশরিকরা। যারা নানা ধরনের মূর্তির অর্চনা করে এবং কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। অর্থাৎ তাদের মৃত্যু হয়েছে ঐ সব বিষয় অস্বীকার এবং মুহাম্মাদ (সা.)–কে মিথ্যা পতিপন্ন করার অবস্থায়। অতএব তাদের উপরই আল্লাহ্র এবং ফিরিশ্তাসমূহের অভিস্পাত। অর্থাৎ যারা কুফরী করেছে এবং

নাস্তিক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের উপরই আল্লাহ্র অভিসম্পাত। বলা হয় যে, তাদেরকেই আল্লাহ্ তা'আলা তার অনুগ্রহ হতে বহু দূরে নিক্ষেপ করেছেন এবং তাঁর ফিরিশতাগণও অভিসম্পাত করে। অর্থাৎ ফিরিশতাগণ মানবকুলের সকলেই তাদের উপর অভিসম্পাত করে। اللعنة শব্দের অর্থ ইতিপূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি। সুতরাং এখানে এর পুনরুল্লেখ প্রয়োজন মনে করি না।

যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, অতীত সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে ঐ ব্যক্তি কিভাবে মুহাম্মাদ (সা.)-কে অস্বীকারকারী (كافر) হল,-যে ব্যক্তি তাঁর পূর্বেই মৃতুবরণ করেছে। তাদের অধিকাংশই তো তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনি এবং তাঁকে সত্যবাদী বলে মেনেও নেয়নি (কারণ তারা তো তাঁকে দেখেনি) তখন তাদের প্রতি উত্তরে বলা হবে যে, উল্লিখিত আয়াতের মর্মার্থ- তাদের প্রশ্নের বিপরীত। মুফাস্সীরগণ উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় একাধিক মত পোষণ করেছেন। অতএব, তাঁদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ বলেন যে, আল্লাহ্র বাণী- وَ النَّاسِ اَجْمَعِيْنَ এর মর্মার্থ বিশেষ করে আল্লাহ্ এবং তার রাসূলের প্রতি বিশ্বাসিগণকেই বুঝায়, অন্যান্য মানবমন্ডলী ব্যতীত। যারা এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তাঁদেরকে সমর্থনে আলোচনা।

হযরত কাতাদা (র.) মহান আল্লাহ্র বাণী- وَ النَّاسِ اَجْمَعِيْنَ শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন তাঁরা হলেন মু'মিনগণ।

হযরত রাবী (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, وَ النَّاسِ اَجْمَعِيْنَ এর মর্মার্থ হল -মু'মিনগণ। আর অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন যে, বরং সকল মানুষ কিয়ামত দিবসের কাফিরদেরকে তাদের সামনেই তাদের প্রতি অভিসম্পাত করবে।

এ বক্তব্যের সমর্থনে আলোচনা ঃ

হযরত আবুল আলীয়া (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, কাফিরদেরকে কিয়ামত দিবসে দন্ডায়মান করানো হবে, তখন প্রথমে আল্লাহ্ তা'আলা এদেরকে অভিসম্পাত করবেন, তারপর ফিরিশতাগণ, পরিশেষে সকল মানুষেই অভিসম্পাত করবে।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন যে, তা যেন ঐ কথার মত যে لعن الله الظالم আল্লাহ্ অত্যাচারীর প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। অতএব, তা প্রতিটি নাস্তিকের জন্যই প্রযোজ্য হবে। কেননা, কুফর জুলুমের অন্তর্গত।

এ বক্তব্যের সমর্থনে আলোচনাঃ

হযরত সুদ্দী (র.) থেকে আল্লাহ্র বাণী- اُولٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَ الْمَلَائِكَةِ وَ النَّاسِ اَجْمَعِيْنَ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, যে কোন দু'জন মু'মিন এবং কাফির পরস্পর অভিসম্পাত করার সময় যদি তাদের কোন একজন বলেঃ لَعَنَ اللّٰهُ الظَّالِمَ "আল্লাহ্ জালিমকে অভিসম্পাত করেছেন, তখন এই অভিসম্পাত কাফিরের উপর অত্যাবশ্যকীয় হিসেবে বর্তিবে। কেননা, সে সত্যিই অত্যাচরী। অতএব,

প্রত্যেক সৃষ্ট জীবই তাকে (لعنة) অভিসম্পাত করে। ঐসব ব্যক্তির কথাটারই আমাদের কাছে সঠিক বলে মনে হয়, যারা বলে যে ঐ আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা (جميع الناس) মানবকুলের সকলকেই বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ সকল মানুষই তাদেরকে অভিসম্পাত করে। যেমন তাদের বক্তব্য-لعن الله الظالم او الظالمين "আল্লাহ্ তা'আলা জালিমকে অথবা জালিমদেরকে অভিসম্পাত করেছেন। সুতরাং এর দ্বারা মানবজাতির সকল অত্যাচারীই শামিল। তারা যে কোন ধর্মের বা সম্প্রদায়েরই হোক না কেন, ঐ অভিসম্পাতের অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত দিবসের অভিশপ্ত ব্যক্তিদের খবর দিতে যেয়ে বলেছেন, فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ঐ ব্যক্তির চেয়ে কে অধিক অত্যাচারী? যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ্র উপর মিথ্যারোপ করেছে ? তাদেরকে তখন তাদের প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত করা হবে। তারপর সাক্ষীরা বলবে ঐ সব ব্যক্তিরাই তাদের প্রতিপালকের উপর মিথ্যারোপ করেছিল।

اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ সাবধান ! অত্যাারীদের উপরই আল্লাহ্র অভিসম্পাত"।

হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, উল্লিখিত আয়াতে الناس শব্দের মর্মার্থ بعض الناس কতক লোক। সুতরাং আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ এ বক্তব্যের পরিপন্থী। কেননা (خبر) হাদীসে এর সততার উপর কোন প্রমাণ নেই এবং দৃষ্টান্তও নেই। যদি ধারণা করা হয় যে, এর দ্বারা মু'মিনগণকে বুঝানো হয়েছে, কারণ, কাফিররা তো নিজেদেরকে এবং তাদের বন্ধু-বান্ধবদেরকে লা'নত করবে না।

আল্লাহ্ তা'আলা এ ব্যাপারে তাদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে যে, আখিরাতে তাদের প্রতি লা'নত করা হবে। সর্বজনবিদিত যে, কাফিররা চির অভিশপ্ত। তারা অন্ধকারে প্রবেশ করবে। প্রত্যেক কাফির নিজের প্রতি জুলুম করার কারণে ও তাদের প্রতিপালকের দানসমূহ অস্বীকার এবং তাঁর আদেশ-নিষেধের বিরোধিতার কারণে আঁধারে নিপতিত।

মহান আল্লাহ্র বাণী-

خَالِدِيْنَ فِيْهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَ لَاهُمْ يُنْظَرُوْنَ -

অর্থ "তন্মধ্যে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে, তাদের থেকে শাস্তি লঘু করা হবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হবে না"। (সূরা বাকারা : ১৬২)

এখন যদি কেউ আমাদেরকে প্রশ্ন করে যে, خَالِدِيْنَ فِيْهَا এর মধ্যে نصب (যবর) প্রদানের কারণ কি ? জবাবে বলা যায় যে তা حال (হাল) হয়েছে هاء এবং ميم বর্ণদ্বয় থেকে, যে দু'টি বর্ণ পূর্ববর্তী আয়াতের عَلَيْهِمْ শব্দের মধ্যে অবস্থিত। আর মহান আল্লাহ্র ঐ বাণীর মর্ম হল-اُولٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ

أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَ الْمَلٰئِكَةُ وَ النَّاسُ اَجْمَعُوْنَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا অর্থাৎ–তাদের উপরই আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত। তাদেরকেই আল্লাহ্ ও ফিরিশতাগণ এবং মানবকুলের সকলেই অভিসম্পাত করে, তারা তাতে অনন্তকাল অবস্থান করবে''। আর এই জন্যই পাঠ করেছে–أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَ الْمَلٰئِكَةِ وَ النَّاسِ اَجْمَعِيْنَ "আল্লাহ্, ফিরিশতাগণ এবং মানবকুলের সকলই তাদের উপর অভিসম্পাত করে''।

যে ব্যক্তি ঐ পাঠরীতি মুতাবিক পাঠ করেছে, আমার উপরোল্লিখিত বর্ণিত অর্থের সামঞ্জস্য–কল্পে, যদিও বাক্যের অনুরূপ প্রয়োগ আরবী ভাষায় বৈধ, তথাপি এমন পাঠরীতি অবৈধ। কেননা, তা মুসলমানদের পবিত্র কুরআনের লিখন পদ্ধতির পরিপন্থী এবং সাধারণ মুসলমানগণের প্রচলিত পাঠরীতিরও পরিপন্থী বিধায় অবৈধ। যে কথার দলীল প্রচলিত বর্ণনার মাধ্যমে প্রমাণিত, এর প্রতিবাদ কদাচিৎ হয়ে থাকে। فِيْهَا এর মধ্যে অবস্থিত, ها সর্বনামটি لعنة কে বুঝায়েছে। মহান আল্লাহ্, ফিরিশতাগণ এবং মানবমন্ডলীর পক্ষ হতে যে অভিসম্পাত তা কাফিরদের প্রতিই বুঝানো হয়েছে, এবং লা'নত দ্বারা জাহান্নামের শাস্তিকেই বুঝানো হয়েছে।

হযরত আবুল আলীয়া (র.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, خَالِدِيْنَ فِيْهَاএর অর্থ হল–তারা জাহান্নামে অনন্তকাল অভিশপ্ত অবস্থায় থাকবে। মহান আল্লাহ্‌র বাণী–لا يخفف عنهم العذاب এর অর্থ হল–অনন্তকাল পর্যন্ত তারা সেখানে অবস্থান করবে এবং তাদের শাস্তি লঘু করা হবে না। যেমন আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন, وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لا يُقْضٰى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا وَ لا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا "কিন্তু যারা কুফরী করে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাদের মৃত্যুর আদেশ দেয়া হবে না যে তারা মরবে এবং তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তিও লাঘব করা হবে না''। (সূরা ফাতির ঃ ৩৬)

যেমন তিনি আরো ইরশাদ করেছেন, كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوْداً غَيْرَهَا "যখন তাদের চামড়া জ্বলে যাবে, তখন এর স্থলে নতুন চামড়া সৃষ্টি করবো।' (সূরা নিসা ঃ ৫৬

আল্লাহ্‌র বাণী–وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ এর মর্মার্থ হল–"তাদের কাকুতি–মিনতি সত্ত্বেও তাদেরকে কোন বিরাম দেয়া হবে না''। যেমন, হযরত আবুল আলীয়া (রা.) থেকে وَ لاَ هُمْ يُنْظَرُوْنَ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন যে, তাদেরকে কোন বিরাম দেয়া হবে না, যাতে তারা আপত্তি উথাপন করতে পারে। যেমন এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্‌র বাণী–هٰذَا يَوْمُ لاَ يَنْطِقُوْنَ وَ لاَ يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُوْنَ "তা এমন একদিন যেদিন করো কথা বলার শক্তি থাকবে না এবং তাদেরকে মিনতি করার অনুমতি দেয়া হবে না।"

মহান আল্লাহ্‌র বাণী–

وَ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ –

অর্থ ঃ "এবং তোমাদের একই মাবুদ। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন মাবুদ নেই। তিনি পরম দয়াময়, অতি দয়ালু।" (সূরা বাকারা ঃ ১৬৩)

ইতিপূর্বে আমরা–**الالوهية** শব্দের ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছি। আর তা হল–**اعتباد الخلق** সৃষ্টিকে বান্দারূপে গ্রহণ করা। অতএব মহান আল্লাহ্‌র বাণী–**اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ** এর মর্মার্থ – হে মানবমন্ডলী ! যিনি তোমাদের আনুগত্যের অধিকারী এবং তোমাদের বন্দেগী যার জন্য অত্যাবশ্যকীয়, তিনি হলেন একক সত্ত্বার অধিকারী মাবুদ এবং অদ্বিতীয় প্রতিপালক। কাজেই তিনি ব্যতীত অন্য কারো বন্দেগী করবে না এবং তার সাথে অন্য কাউকে শরীক করবে না। তাই তোমাদের ইবাদতে তাঁর সাথে যাকে শরীক করতেছ, সে তো তোমাদের মাবুদের অন্যান্য সৃষ্টির ন্যায় একটি সৃষ্টি। প্রকৃত পক্ষে, একমাত্র আল্লাহ্ পাকই তোমাদের মাবূদ। তার ন্যায় কেউ নেই। তিনি অদ্বিতীয়, তিনি নযীর বিহীন। মহান আল্লাহ্‌র একত্ববাদের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারকগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। কাজেই তাদের কেউ কেউ বলেন যে, মহান আল্লাহ্‌র একত্ববাদের তাৎপর্য হলো, তাঁর কোন উপামা না থাকা। যেমন বলা হয় যে, **فلان واحد الناس** (অমুক) একক ব্যক্তি। অর্থাৎ তার সম্প্রদায়ের মধ্যে সে একক ব্যক্তিত্ব। তার দ্বারা বুঝা যায় যে, মানুষের মধ্যে তার কোন দৃষ্টান্ত নেই এবং তার সম্প্রদায়ের মধ্যে তার ন্যায় কেউ নেই। এমনিভাবে মহান আল্লাহ্‌র বাণী **واحد** এর মর্মার্থ আল্লাহ্ পাকের ন্যায় কেউ নেই এবং তার কোন দৃষ্টান্তও নেই। কাজেই তারা মনে করেন যে, তাদের এই ব্যাখ্যার প্রামাণ্য দলীল হিসাবে ঐ ব্যক্তির বক্তব্যটাই যথেষ্ট, যিনি বলেন যে, আয়াতে **واحد** শব্দ দ্বারা চার প্রকার অর্থ বুঝা যায়। (১) এক জাতীয় কোন জিনিষের একটি। যেমন–"মানব জাতির মধ্য থেকে একজন মানুষ"। (২) এমন সংখ্যা যাকে ভাগ করা যায় না। যেমন, বস্তুর এমন কোন অংশ, যাকে ভাঙ্গা যায় না। (৩) মর্মে ও দৃষ্টান্ত হওয়া। যেমন, কোন ব্যক্তির বক্তব্য–"এ দু'টি বস্তু এক। এর অর্থ হল–একটি আরেকটির ন্যায়। যেন দু'টি জিনিষ একই। (৪) নযীরবিহীন ও দৃষ্টান্তহীন। তারা বলেন, যখন উল্লিখিত তিনটি অর্থ **واحد** শব্দের প্রকৃত অর্থের পরিপন্থী তখন ৪র্থ অর্থটিই সঠিক **صحيح** বলে বিবেচিত। যা আমরা বর্ণনা করলাম।

অন্যান্য মুফাস্‌সীরগণ বলেছেন, উল্লিখিত আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদের অর্থ হল–বস্তুসমূহ থেকে তাঁকে পৃথক করা। তাঁরা বলেন যে, আল্লাহ্ হলেন একক সত্ত্বা। কেননা, তিনি কোন বস্তুর সাথে শামিল নন এবং কোন বস্তুও তাঁর সাথে শামিল নয়। তাঁরা বলেন, ঐ ব্যক্তির বক্তব্য সঠিক

নয়, যিনি বলেছেন যে, তিনি সকল বস্তু থেকে পৃথক। কিন্তু তিনি واحد শব্দের উল্লিখিত চারটি অর্থ অস্বীকার করেছেন, যা অন্যান্যগণ বলেছেন। মহান আল্লাহ্র বাণী–"তিনি ব্যতীত আর কোন মাবূদ নেই'', একথা "তিনি ব্যতীত জগতসমূহের কোন প্রতিপালক নেই'' বাক্যের উদ্দেশ্য হয়েছে। তিনি ব্যতীত বান্দার জন্য কারো বন্দেগী করা অত্যাবশ্যকীয় নয়। সকল কিছু তাঁরই সৃষ্টি। সকলের উপরই তাঁর আনুগত্য এবং তাঁর امر আদেশ–নিষেধের বাস্তবায়ন ও তিনি ব্যতীত অন্য কোন মাবূদের ইবাদত পরিত্যাগ করা, মূর্তিসমূহ এবং পুতুলসমূহের অর্চনা পরিত্যাগ করা অত্যাবশ্যকীয়। কেননা, এ সব কিছু তাঁরই সৃষ্টি। তাদের সকলেরই বিচারের দায়িত্ব একক সত্ত্বা আল্লাহ্ পাকের এবং মাবূদ হিসেবে তাঁকে মান্য করা তাদের উপর কর্তব্য। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ বন্দেগীর যোগ্য নয়। পৃথিবীর যাবতীয় নিয়ামত তাঁরই দান। তারা যে সব মূর্তির উপাসনা করে এবং যাদের সাথে অংশীদার করে তারা ব্যতীত, অর্থাৎ ঐ সব নিয়ামত তাদের দান নয়। পরকালে বান্দার নিকট যে সব নিয়ামত পৌছবে, তা তাঁর নিকট থেকেই আসবে। মহান আল্লাহ্র সাথে তারা যে সব মূর্তিকে শরীক করে, তারা তাদের জীবনে–মরণে, দুনিয়া–আখিরাতে কোন ক্ষতিও করতে পারবে না এবং কোন উপকারও করতে পারবে না। তার দ্বারা মহান আল্লাহ্র পক্ষ হতে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে যে, মুশরিকগণ গোমরাহীর উপর অবস্থিত। আর তাঁর নিকট হতে তাদেরকে কুফরী ও শিরক থেকে প্রত্যাবর্তনের আহবান করা হয়েছে। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা দলীল হিসেবে জ্ঞানীদের জন্য আয়াত পেশ করেছেন যাদ্বারা তাঁর একত্ববাদের উপর সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। তাঁর স্পষ্ট অকাট্য দলীল দ্বারা তাদের আপত্তিকে রহিত করা হয়েছে। অতএব, আল্লাহ্ তা'আলা এর উল্লেখ পূর্বক বলেছেন, হে মুশরিকগণ ! যদি তোমরা আমি যা তোমাদেরকে যে সম্পর্কে ঘোষণা দিয়েছি, তার সত্যতা ভুলে গিয়ে থাক, অথবা তাতে সন্দেহ পোষণ করে থাক, যেমন তোমাদের মাবূদ এক আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের যে সব মূর্তির উপাসনা করিতেছ, তা যথার্থ মনে কর, তবে আমার দলীলসমূহ একবার ভেবে দেখ এবং তাতে গভীর চিন্তা করে দেখ। নিশ্চয়ই আমার দলীলসমূহের মধ্য থেকে আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টি, রাত দিনের পরিবর্তন, সমুদ্র বক্ষে জাহাজের চলাচল, যাতে মানুষ উপকৃত হয় সবই বিদ্যমান। আর আমি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করি ও তার দ্বারা শুষ্ক ভূমি যিন্দা করি এবং তাতে নানা প্রকার জীব–জন্তুর সৃষ্টি করি। আকাশে ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী মেঘমালাকে নিয়ন্ত্রণ করি। অতএব তোমরা যে সব মূর্তি ও উপাস্যের অর্চনা কর এ সব অংশীদার একত্র হয়ে যদি সম্মিলিতভাবে, কিংবা যদি পৃথকভাবে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করেও যদি আমার সৃষ্টির অনুরূপ সৃষ্টির কোন দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সক্ষম হও, যা আমি তোমাদের জন্য বর্ণনা করলাম, তবে তোমরা আমাকে ব্যতীত যে সব মূর্তির উপাসনা করিতেছ, তাদের অর্চনার ব্যাপারে তখনই আপত্তি উথাপন করতে পারবে। অন্যথায় আমাকে ব্যতীত অন্যকোন মূর্তির অর্চনার ব্যাপারে তোমাদের কোন عذر আপত্তি খাটবে না। তোমরা আমাকে ব্যতীত যে সব মূতির অর্চনা করিতেছ, এ সম্পর্কে হে জ্ঞানীগণ ! একটু ভেবে দেখ। এ আয়াত এবং পরবর্তী আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা তাওহীদ সম্পর্কে পৃথিবীর সকল কাফির ও মুশরিকদের উপর অপারগতার অকাট্য দলীল পেশ

করেছেন। মহান আল্লাহ্‌র কালামের অকাট্যতা এবং অপারগতা ও তাঁর হিকমতের মাহাত্ম্য এবং যথোপযুক্ত পরিপূর্ণ প্রমাণ্য حجة দলীলের বর্ণনা কৌশল এক অপূর্ব নিদর্শন। আল্লাহ্ তা'আলা যে কারণে এই আয়াত তাঁর নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর অবতীর্ণ করেছেন, তা' হল-

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ الْفُلْكِ الَّتِىْ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَ بَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ وَّ تَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ وَ السَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ -

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিন-রাতের পরিবর্তনে, যা মানুষের কল্যাণ সাধন করে, তা এবং সমুদ্রে বিচরণশীল জলযানসমূহে, আল্লাহ্ আকাশ হতে যে বারিবর্ষণ দ্বারা পৃথিবীকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তাতে এবং এর মধ্যে যাবতীয় জীব-জন্তুর বিস্তারণে, বায়ুরদিক পরিবর্তনে, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে জ্ঞানবান জাতির জন্য নিদর্শন রয়েছে। (সূরা বাকারা ঃ ১৬৪)

ব্যাখ্যাঃ-এই আয়াত যে কারণে আল্লাহ্ তা'আলা মহা নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর অবতীর্ণ করেছেন, এ সম্পর্কে মুফাসসীরগণ একাধিকমত পোষণ করেছেন। তাঁদের মধ্য হতে কেউ কেউ বলেন যে, এই আয়াত তাঁর উপর নাযিল হয়েছে, ঐ সব মুশরিকদের উপর দলীল হিসেবে- যারা মূর্তির উপাসনা করতো। এই আয়াত তখনই অবতীর্ণ হয় যখন আল্লাহ্ তা'আলা মহানবী (সা.)-এর উপর পূর্বোল্লেখিত ১৬৩ নং আয়াত وَ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ অবতীর্ণ করেন। তখন তিনি এই আয়াতটি সাহাবিগণের নিকট তিলাওয়াত করলেন, তখন মূর্তি উপাসক মুশরিকরাও তা শ্রবণ করল। মুশরিকরা তখন বলল, এই কথার উপর কি কোন প্রমাণ আছে? আমরা তো এ কথার সত্যতা অস্বীকার করি। আমরা মনে করি যে, আমাদের অসংখ্য উপাস্য আছে। অতএব, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি উত্তরে এই আয়াত (اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ) মহা নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর দলীল হিসেবে অবতীর্ণ করেন।

এ মতের সমর্থনে আলোচনা ঃ-

'আতা (র.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, وَ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ এই আয়াত মদীনাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উপর অবতীর্ণ হয়। তখন মক্কার কুরায়শ বংশের কাফিররা বলল, "কি ভাবে একজন উপাস্য মানবমন্ডলীর যাবতীয় সমস্যার সমাধান করবে? তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত-

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ...... الى قوله الايت لِقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ –
অবতীর্ণ করেন। অতএব, এই আয়াত দ্বারা তারা অবগত হতে পারল যে, তিনি হলেন একমাত্র মা'বূদ আল্লাহ্ পাক তিনি প্রত্যেকেরই উপাস্য এবং প্রত্যেক বস্তুরই সৃষ্টিকর্তা। অন্যান্যরা বলেন যে, বরং আয়াতটি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উপর নাযিল হয়েছে, মুশরিকগণের এ ব্যাপরে রাসূলুল্লাহ্কে জিজ্ঞেস করার কারণে। অতএব, আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করে তার মাধ্যমে তাদেরকে অবগত করালেন যে, আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির মধ্যে এবং উল্লিখিত যাবতীয় বিষয়ের মধ্যে আল্লাহ্র একত্ববাদের উপর প্রকাশ্য নিদর্শন রয়েছে। তাঁর রাজত্বে অন্য কেউ অংশীদার নেই। বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল ব্যক্তির জন্য তা একটি সঠিক উপলব্ধি। যাঁরা তা বলেন, তাঁদের স্বপক্ষে নিম্নের হাদীস উল্লেখ করা হল ঃ

আবুদ্দোহা (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন যে, যখন এই আয়াত–وَ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ অবতীর্ণ হল। তখন মুশরিকরা বলল, যদি বিষয়টি এমনই হয়, তবে এ ব্যাপারে কোন নিদর্শন পেশ করুন। অতএব, আল্লাহ্ তা'আলা তখন এর উল্লেখ পূর্বক এ আয়াত اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ الاية – অবতীর্ণ করেন।

হযরত আবূ দোহা (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন যে, যখন এ আয়াতে করীমা وَ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ নাযিল হয়, তখন মুশরিকরা বলল, যদি বিষয়টি এমনই হয়, তবে এ ব্যাপারে নিদর্শন পেশ করুন। তাই তখন আল্লাহ্ ত'আলা তার উল্লেখপূর্বক এ আয়াত করীমা اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ الاية নাযিল করেন।

হযরত আবূ দোহা (র.) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত, তিনি বলেন যে, যখন এ আয়াত নাযিল হল–তখন মুশরিকরা আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলতে লাগল, সত্যই কি اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ তোমাদের মাবূদ এক আল্লাহ্ ? তোমরা যদি এ ব্যাপারে সত্যবাদী হও, তা হলে (فلتاتنا باية) আমাদের নিকট কোন (اية) দলীল পেশ কর।তখন আল্লাহ্ তা'আলা اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ الاية নাযিল করেন।

হযরত আতা ইবনে আবূ রুবাহ্ (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মুশরিকরা হযরত নবী করীম (সা.)-কে বলল, ارنا اية এ ব্যাপারে আমাদেরকে কোন নিদর্শন দেখান। সুতরাং তখন এ আয়াত–এর اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ নাযিল হয়।

হযরত সাঈদ (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন যে, কুরায়শ বংশের লোকেরা ইয়াহুদীদেরকে কিছু প্রশ্ন করলো। তারা বলল, হযরত মূসা (আ.) যে সব নিদর্শন নিয়ে আগমন

করেছিলেন, সে সম্পর্কে তোমরা আমাদেরকে বর্ণনা দাও। তখন তারা তাদেকে বলল, লাঠি, দর্শকের জন্য শুভ্রহস্ত, ইত্যাদি নিদর্শন নিয়ে তিনি আগমন করেছিলেন। তারপর হযরত ঈসা (আ.) যে সব নিদর্শন নিয়ে আগমন করেছিলেন, সে সম্পর্কে নাসারাদেরকে তারা কিছু প্রশ্ন করল। তারা তখন তাদেরকে বললো যে, তিনি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য এবং মৃত ব্যক্তিকে আল্লাহ্র অনুমতিতে জীবিত করতে পারতেন। তখন কুরায়শগণ হযরত নবী করীম (সা.)-কে বলল, আপনি আল্লাহ্র কাছে দু'আ করুন যে, তিনি যেন আমাদের জন্য 'সাফা' পাহাড়কে স্বর্ণে রূপান্তরিত করে দেন। তাহলে আমাদের ঈমান বৃদ্ধি পাবে এবং আমরা এর দ্বারা আমাদের শত্রুর উপর শক্তি সঞ্চয় করতে পারবো"। হযরত নবী করীম (সা.) তাদের কথামত আপন প্রতিপালকের নিকট দু'আ করলেন। তারপর মহান আল্লাহ্ তাঁর নিকট ওহী (وحى) প্রেরণ করলেন যে, "নিশ্চয়ই আমি তাদের দাবী অনুসারে 'সাফা' পাহাড়কে স্বর্ণে রূপান্তরিত করে দেব, কিন্তু পরে যদি তারা (আমার নির্দেশসমূহ) মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তবে আমি তাদেরকে এমন শাস্তি দিবো যার পূর্বে জগতবাসীর কাউকে ও আমি তদ্রূপ শাস্তি দেইনি। তারপর হযরত নবী করীম (সা.) দু'আ করলেন, (হে আল্লাহ্ !) আমাকে একটু অবসর দিন, যেন আমি তাদেরকে দিনের পর দিন (সত্য গ্রহণের জন্য) আহবান করতে পারি। মহান আল্লাহ্ তখন এ আয়াত اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ -الاية নাযিল করেন। নিশ্চয়ই তাতে তাদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। যদিও তারা ইচ্ছা পোষণ করেছিল যে, আমি যেন তাঁদের জন্য 'সাফা' পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত করে দেই। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি এবং রাত্র দিনের পরিবর্তনের মধ্যে তাদের বিশ্বাস বৃদ্ধির জন্যে 'সাফা' পাহাড়কে স্বর্ণে রূপান্তরিত করার চেয়ে সর্বাধিক বড় নিদর্শন রয়েছে।

হযরত সূদ্দী (র.) থেকে এ আয়াত اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, মুশরিকরা হযরত নবী করীম (সা.)-কে বলল 'আপনি 'সাফা' পাহাড়কে স্বর্ণে রূপান্তরিত করে দিন, যদি আপনি সত্যবাদী হয়ে থাকেন যে, কুরআন আল্লাহ্র নিকট অবতীর্ণ। কাজেই মহান আল্লাহ্ বলেন, উল্লিখিত আয়াতের মধ্যে অবশ্যই বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই নিদর্শনসমূহ রয়েছে। তিনি বললেন, নিশ্চয় তোমাদের পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের লোকেরা অনুরূপ নিদর্শনসমূহের প্রার্থনা করেছিল। এরপর তারা সে কারণেই অবিশ্বাসী হয়ে গিয়েছিল। উল্লেখিত বর্ণনার মধ্যে সঠিক কথা হল যে, আল্লাহ্ তা'আলা তার উল্লেখ পূর্বক আপন বান্দাদেরকে এ আয়াত দ্বারা তাঁর একত্ববাদ এবং অদ্বিতীয় মাবূদ হওয়ার প্রমাণের বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর ইবাদত নিষিদ্ধ। আয়াত যে বিষয়ে অবতীর্ণ হয়েছে, হযরত আতা (রা.) এর বক্তব্য তদনুযায়ী বৈধ আছে। আর হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (র.) এবং হযরত আবূ দোহা (র.) এ সম্পর্কে যা বলেছেন, তাও বৈধ আছে। উভয় দলের কারো কথা ঠিক হওয়ার ব্যাপারে আমাদের কাছে আপত্তি রহিত করতে পারে, এমন কোন হাদীস জানা নেই কাজেই দু'দলের কোন এক দলের

জন্য অপর দলের সঠিক কথার দ্বারা কোন বিষয় নিষ্পত্তি করা বৈধ। এ উভয় কথার যে কোনটিই শুদ্ধ হোক না কেন উল্লিখিত আয়াতের মর্ম হল,- আমার যা বর্ণনা করলাম, তাই। মহান আল্লাহ্‌র বাণী-إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْأَرْضِ এর মর্মার্থ হল-"নিশ্চয় আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টির মধ্যে" (অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে)। خلق الله الاشياء এর অর্থ হল তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং অস্তিত্বদান করেছেন, যার কোন আস্তিত্ব ছিল না।

ইতিপূর্বে যে কারণে ও যে অর্থের উপর ভিত্তি করে الارض শব্দ বলা হয়েছে, আমরা তা প্রমাণসহকারে বর্ণনা করেছি ; এবং কি কারণে الارض শব্দকে বহু বচনে ব্যবহার করা হয়নি, যেমন বহু বচনে ব্যবহৃত হয়েছে السموات শব্দটি, তার পুনরুল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী-وَ اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ "এবং রাত্রদিনের পরিবর্তনের মধ্যে।" এর মর্মার্থ হল-হে মানবমন্ডলী ! তোমাদের উপর রাত্র ও দিবসকে পরস্পরের অনুগামী করা হয়েছে। রাত্র ও দিনের প্রত্যেকটির প্রারম্ভিক কার্যক্রমের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা তার উল্লেখ করে ইরশাদ করেন وَ هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا এবং তিনি পর্যায়ক্রমে রজনী ও দিবসকে তারই জন্য সৃষ্টি করেছেন,-যে উপদেশ গ্রহণ করতে অথবা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে আকাঙক্ষা করে-(সূরা-ফুরকান ঃ ৬২)। অর্থাৎ উভয়ের (রাত্র ও দিনের) প্রত্যেকটিই একে অন্যের পশ্চাদ্ধাবন করে। যখন রাত্রি চলে যায়- তখন দিনের আগমন হয়-তার পরে। আর যখন দিন চলে যায়-তখন রাত আসে এর পিছনে। একারণেই বলা হয়েছে خلف فلان فلانا فى اهله بسوء অর্থাৎ তার পরিবারে অন্যায়ভাবে অমুক ব্যক্তি অমুকের পশচাদ্ধাবন করেছে।

এই মর্মে কবি যুহাইর-এর একটি কবিতাংশ নিম্নের প্রদত্ত হল-

بِهَا الْعَيْنُ وَ الْاٰرَامُ يَمْشِيْنَ خِلْفَةً + وَ أَطْلَاؤُهَا يَنْهَضْنَ مِنْ كُلِّ مَجْثَمِ

উল্লিখিত কবিতার কবি-শব্দ দ্বারা পশ্চাদ্ধাবনের অর্থ প্রকাশ করেছেন।

الليل শব্দেরই ليلة বহুবচন। যেমন শব্দের বহুবচন। যেমন التمر শব্দটিকتمرة শব্দের বহুবচন হয়। الليل শব্দের বহুবচন অবশ্যই ليال শব্দ দ্বারা ও হয়। অতএব, তারা এর বহুবচনে এমন বর্ণ অতিরিক্ত সংযোগ করেছেন, যা এর একবচনে নেই। তার মধ্যে ياء কে বর্ধিত করার দৃষ্টান্ত বিশেষ করে رباعية ও ثمانية এবং كراهية শব্দের মধ্যে রয়েছে। আরবগণ النهار শব্দের বহুবচন অন্য শব্দে তেমন ব্যবহার করেন না। কেননা তা الضوء শব্দের স্থলাভিষিক্ত। অবশই হ النهار শব্দের বহুবচনالنُّهُرُ হওয়ার কথা শুনা যায়। এই মর্মে জনৈক কবি বলেছেন,

لَوْلَا الثَّرِيْدَ اِنْ هَلَكْنَا بِالضُّرِ + ثَرِيْدُ لَيْلٍ وَ ثَرِيْدَ بِالنُّهُرِ

উল্লিখিত কবিতাংশে কবি শব্দটি بالنهر দ্বারা (النهار শব্দের) বহুবচন বুঝিয়েছেন। আর যদি কেউ বলে যে, এর বহুবচন انهرة খুব কম ব্যবহৃত হয়, তবে তা হবে قياسى বিধিসম্মত।

মহান আল্লাহ্র বাণী-وَ الْفُلْكِ الَّتِىْ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ "আর যা মানুষের কল্যাণ সাধন করে তৎসহ সমুদ্রে বিচরণশীল জলযানসমূহে।"

উল্লিখিত আয়াত و الفلك التى تجرى فى البحر এর মধ্যে الفلك শব্দের অর্থ السفن নৌকাসমূহ বা জাহাজসমূহ। এর একবচন, বহুবচন, স্ত্রীলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গ একই শব্দ দ্বারা হয়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্য আয়াতে বর্ণনা করেছেন وَ اٰيَةٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ এবং তাদের জন্য নিদর্শন হল যে, আমি তাদের বংশধরকে চলমান নৌকাসমূহে আরোহণ করলাম।" আর এই আয়াত و الفلك التى تجرى فى البحر সম্পর্কে তিনি বলেন, و هى مجراة তা চলমান কেননা যখন জলযান চালানো হয় فهى الجارية তখন তা চলে। অতএব একে এর বা গুণের দিকে اضافت বা সম্বন্ধে যুক্ত করা হয়েছে। আল্লাহ্র বাণী-بما ينفع الناس এর মর্মার্থ ينفع الناس فى البحر তা মানুষকে সমুদ্রে স্বার্থ দেয়।

মহান আল্লাহ্র বাণী-وَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَاَحْيَابِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا "আর আল্লাহ্ তা'আলা আকাশ থেকে যে বৃষ্টি বর্ষণ দ্বারা তিনি মৃত যমীনকে পুনর্জীবিত করেন তাতে আল্লাহ্র উল্লিখিত বাণী-وَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ এর মর্মার্থ হল-আল্লাহ্ আকাশ থেকে যে পানি অর্থাৎ বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন। مَاءٌ এর অর্থ المطر বৃষ্টি। আল্লাহ্র বাণী-فَاَحْيَابِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا অতএব, তা দ্বারা তিনি মৃত যমীনকে পুনর্জীবিত করেন। احياوها শব্দের মর্মার্থ عمارتها-এর আবাদ করা ; এবং اخراج نباتها-এর শস্য উৎপন্ন করা। উল্লিখিত به এর মধ্যে الهاء যমীর বা সর্বনামটির প্রত্যাবর্তন স্থল হল- الماء (পানি)-এর দিকে। উল্লিখিত বাক্য بعد موتها এর মধ্যে هاء এবং الف এর প্রত্যাবর্তন স্থল হল- الارض (যমীন) এর দিকে। موت الارض এর মর্মার্থ خرابها তা বিরাণ হয়ে যাওয়া, আবাদের অনুপযোগী হওয়া এবং এর উৎপন্ন ক্ষমতা রহিত হয়ে যাওয়া, যা বান্দাদের জন্য খাদ্য এবং অন্যান্য প্রাণীর উপাজীবিকার উৎস ছিল।

মহান আল্লাহ্র বাণী- وَ بَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ "এবং এতে তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন সবরকম জীব জন্তু।" আল্লাহ্র উল্লিখিত বাণী-وَبَثَّ فِيْهَا-এর মর্মার্থ وَ فَرَّقَ فِيْهَا অর্থাৎ এতে ছড়িয়ে দিয়েছেন।

যেমন কোন ব্যক্তির বক্তব্য بث الامير سراياه সেনাপতি আপন সেনাদলেকে ছড়িয়ে দিয়ছেন।" অর্থাৎ فرق বিভক্ত করেছেন।

আল্লাহ্‌র বাণী–فيها এর মধ্যে هاء এবং الف এর প্রত্যাবর্তনস্থল الارض (যমীন) এর দিকে। الدابة শব্দটি الفاعلة এর পরিমাপে, এর অর্থ–যেসব প্রাণী পৃথিবীর উপর বিচরণ করে। الدابة শব্দটি প্রত্যেক ذى روح প্রাণীবাচক শব্দের নাম। কিন্তু كان غير طائر بجناحيه পাখাযুক্ত প্রাণী ব্যতীত। কেননা الدابة হল–যেসব প্রাণী পৃথিবীর উপর বিচরণ করে।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী– وَ تَصْرِيْفِ الرِّيَاحِ এবং বায়ু রাশির গতি পরিবর্তনে" এর মর্মার্থ হল–و فى تصريف الرياح তার বায়ুরাশির গতি পরিবর্তনের মধ্যে। অতএব, এখানে فاعل কর্তার উল্লেখ উহ্য রয়েছে ; এবং فعل ক্রিয়াকে مفعول বা কর্মের দিকে اضافت করা হয়েছে। যেমন কেউ বলল, يعجبنى اكرام اخيك তোমার ভ্রাতার সম্মান প্রদর্শন আমাকে আশ্চর্যান্বিত করেছে। এর মর্মার্থ اكرام اخاك তোমার ভাইকে তোমার সম্মান প্রদর্শন আমাকে আশ্চর্যান্বিত করেছে। আল্লাহ্ কর্তৃক বায়ুরাশির গতি পরিবর্তনের অর্থ বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন দিক থেকে বায়ু সঞ্চালন করা, কখনও ফলপ্রসূ হিসেবে এবং কখনও বা শাস্তি হিসেবে প্রেরণ করেন, যাদ্বারা প্রত্যেক বস্তুকে প্রতিপালকের নির্দেশে ধ্বংস করে দেয়।

কাতাদা থেকে বর্ণিত তিনি আল্লাহ্‌র এ বাণী– وَ تَصْرِيْفِ الرِّيَاحِ وَ السَّحَابِ الْمُسَخَّرِ এর ব্যাখ্যায় বলেন–যে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ ক্ষমতাবান। যখন তিনি ইচ্ছা করেন তাকে ধ্বংসকারী শাস্তিতে রূপান্তরিত করেন। এমন প্রবল বায়ূ প্রেরণ করা হয়, যা শাস্তি হয়ে দাঁড়ায়।

আরবী ভাষাবিদগণের কেউ কেউ মনে করেন যে, মহান আল্লাহ্‌র বাণী– و تصريف الرياح এর অর্থ–বায়ু কখনও উত্তরে ও দক্ষিণে এবং সামনে ও পিছনের দিকে প্রবাহিত হয়। তারপর তিনি বলেন যে, তাই হল–تصريفها বাক্যের অর্থ। আর তা হলো الرياح শব্দের গুণ, যা দ্বারা তার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তা تصريفها এর صفة (গুণ) নয়। কেননা, تصريفها এর অর্থ تصريف الله لها আল্লাহ্ কর্তৃক তার সঞ্চালন বুঝায়। و تصرفها এর অর্থ اختلاف هبوبها বিভিন্ন দিকের বায়ু প্রবাহ। মহান আল্লাহ্‌র বাণী–و تصريف الرياح এর অর্থ হবে تصريف الله تعالى অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের আদেশক্রমে বায়ু সঞ্চালন। বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন দিক থেকে বায়ূ প্রবাহ বুঝায়।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী– "وَ السَّحَابِ الْمُسَخَّرَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ"আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালায় জ্ঞানবান সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।" وَ السَّحَابِ الْمُسَخَّرِ এর

মধ্যে السحاب শব্দটি سحابة শব্দের جمع বহুবচন। এর প্রমাণস্বরূপ মহান আল্লাহ্‌র কালামে উল্লেখ হয়েছে- وَ يُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ (তিনি ভারী মেঘমালা সৃষ্টি করেছেন।) (সূরা রা'দ ঃ ১২) সুতরাং المسخر শব্দটি একবচনে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন কেউ বলল, هذه تمرة এবং هذا تمر এমনিভাবে هذه نخلة এবং هذا نخل ইত্যাদি। السحاب শব্দটিকে سحاب নামে নামকরণের উদ্দেশ্য হল। আল্লাহ্ পাক যখন ইচ্ছা করেন তখন মেঘমালার কতক অংশ থেকে কতক অংশ বিচ্ছিন্ন করে দেন। যেমন, কোন ব্যক্তির কথা مر فلان يجرذيله অমুক ব্যক্তি তার চাদরের আচল টেনে চলে গেল। অর্থাৎ يجر ذيله এর অর্থ يسبحه তার চাদর টেনে নিয়ে চলল। মহান আল্লাহ্‌র বাণী لايات এর অর্থ নিদর্শনসমূহ এবং প্রমাণসমূহ। অর্থাৎ তা একথার প্রমাণ যে, ঐসব কিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং উদ্ভাবণকারী الله واحد একমাত্র আল্লাহ্‌পাক। لِقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্য অর্থাৎ যার বুদ্ধি আছে এবং আল্লাহ্‌র একত্ববাদের দলীল প্রমাণ পেশ করলে সে অনুধাবণ করতে পারে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা একথার উল্লেখপূর্বক তাঁর বান্দাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, الادلة و الحجج দলীল প্রমাণ শুধু বুদ্ধিমানদের জন্যই পেশ করা হয়। বুদ্ধিমান ব্যতীত অন্যান্য সৃষ্টজীব-এর ব্যতিক্রম। কেননা, বুদ্ধি মান সম্প্রদায়ই শুধু আদেশ-নিষেধ এবং আনুগত্য ও ইবাদতের জন্য বিশেষভাবে আদিষ্ট হয়েছে। আর তাদের জন্যই সওয়াব এবং তাদের প্রতিই শাস্তি প্রযোজ্য। যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, আল্লাহ্‌র বাণী اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ- الاية এই আয়াত যখন توحيد الله আল্লাহ্‌র একত্ববাদ প্রমাণের জন্য নাযিল হয়েছে। তখন কাফিরদের বিরুদ্ধে কিভাবে আলোচ্য আয়াত দলীল হিসেবে পেশ করা যায় ?

কাফিরদের একাধিক শ্রেণী রয়েছে তন্মধ্যে কোন কোন শ্রেণী আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর সৃষ্টি ও অন্যান্য যে সব বিষয়, আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে তাকে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি বলে অস্বীকার করে।

এর জবাবে বলা যায় আল্লাহ্ পাক যে, সমগ্র সৃষ্টি জগতের স্রষ্টা এ সত্য কেউ অস্বীকার করলে তাতে কিছু যায় আসে না।

এ পৃথিবীতে আল্লাহ্ পাকের ব্যবস্থাপনা এমন যাতে কোন প্রকার সন্দেহ করা যায় না। আর তিনি এমন স্রষ্টা যার কোন দৃষ্টান্ত নেই। যিনি অদ্বিতীয়, যারা এ কথায় বিশ্বাস করে যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাক তাদের স্রষ্টা ও পালনকর্তা; তাদের জন্যই এ আয়াত দ্বারা তিনি দলীল পেশ করেছেন। তাদের জন্য নয় যারা পৌত্তলিক। যারা আল্লাহ্ পাকের সাথে শির্‌ক করে তাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ পাক বলেছেন وَ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ অর্থ আর তোমাদের মা'বুদ তিনি একক। তারা মনে করেছে তার অনেক শরীক রয়েছে, এটাই আল্লাহ্ পাক আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন-নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের মা'বুদ-যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। আর তাতে চন্দ্র-সূর্যের পরিভ্রমণের ব্যবস্থা

করেছেন। আর এ চন্দ্র-সূর্যের পরিভ্রমণের মাধ্যমেই তোমাদের রিযিকের ব্যবস্থাপনা রয়েছে। আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ তা-ই। যাঁরা একথায় দৃঢ় বিশ্বাস করে যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সৃষ্টিকর্তা। তারা ব্যতীত, যারা তাঁর দাসত্বে অন্যজনকে শরীক করে এবং বিভিন্ন দেবদেবী ও মূর্তির উপাসনা করে। অতএব, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি দলীল হিসেবে পেশ করেছেন, যারা আল্লাহ্র বাণী- وَ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ এ কথার বিশ্বাসকে অস্বীকার করে ; এবং তারা ধারণা করে যে, তাঁর অনেক উপাস্য আছে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন যে, তোমাদের মা'বুদ হলেন তিনি-যিনি আকাশসমূহ সৃষ্টি করেছেন। উহাতে তোমাদের উপজীবিকার জন্য সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন তারা সদা-সর্বদা পরিভ্রমণে রত আছে, তাই (اِخْتِلَافِ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ) রাত দিন পরিবর্তনের অর্থ। وَ الْفُلْكِ الَّتِىْ تَجْرِىْ فِىْ الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ আর অর্থ ঃ মানুষের উপকার করে তা মহাসমুদ্রে বিচরণশীল নৌযানসমূহ ব্যাখ্যা আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন। অতএব, তা দ্বারা তিনি তোমাদের প্রান্তরসমূহ শুষ্ক হয়ে যাওয়ার পর শস্য-শ্যামল করে তুলেছেন ; এবং বিরাণ হয়ে যাওয়ার পর আবাদ উপযোগী করেছেন ; এবং তা দ্বারা তোমাদের নিরাশার পর আশার সঞ্চার করেছেন। আর তা-ই হল وَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَاَحْيَابِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا অর্থ ঃ আল্লাহ্ আকাশ থেকে যে, বারিবর্ষণ দ্বারা পৃথিবীকে এর মৃত্যুর পর সজীব করেন ! ব্যাখ্যা ঃ যে সব প্রাণী তোমাদের জন্য তিনি অনুগত করে দিয়েছেন, তাতে তোমাদের জন্য রয়েছে জীবিকা ও খাদ্য সামগ্রী। সৌন্দর্য ও পরিবহণের এবং আল্লাহ্র তাতে রয়েছেন তোমাদের জন্য আসবাব-পত্র ও পোশাক-পরিচ্ছদ। আর তাই হল মহান আল্লাহ্র বাণী- وَ بَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ এর অর্থ। অর্থাৎ তাতে তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন সবরকম প্রাণী এবং তোমাদের জন্য প্রবাহিত করেছেন বায়ুরাশি। তিনি তোমাদের জন্য বৃক্ষের ফলমূল, খাদ্য সামগ্রী এবং তোমাদের রিযিকের ব্যবস্থা করেছেন। তোমাদের জন্য তিনি মেঘমালা পরিচালনা করেন, যার বৃষ্টিতে তোমাদের জীবন এবং তোমাদের পালিত পশু পাখীদের সুখময় হয়। আর তাই হল মহান আল্লাহ্র বাণী- وَتَصْرِيْفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ এর অর্থ। কাজেই তাদেরকে খবর দেয়া হয়েছে যে, তাদের মা'বুদ হল-একমাত্র আল্লাহ্, যিনি তাদের প্রতি এসব দান করেছেন। তারপর তিনি ইরশাদ করেছেন যে, هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَّنْ يَّفْعَلُ مِنْ ذٰلِكُمْ مِّنْ شَيْءٍ তোমাদের দেব-দেবীদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে এ সমস্তের কোন একটি, করতে পারে? (সূরা রূম ঃ ৪০) যাকে তোমরা তোমাদের ইবাদতে আমাকে ব্যতীত শরীক করতেছ এবং আমার সমকক্ষ উপাস্য স্থির করতেছ ? কাজেই, যদি তোমাদের (من شركائكم) অংশীদারদের মধ্যে থেকে কেউ আমার ঐসব সৃষ্টির মত কোন কিছু সৃষ্টি করতে না পারে, তবে তোমরা বুদ্ধিমান হলে জেনে রেখো ! তোমাদের উপর আমার অগণিত দানই প্রমাণ করে যে, কে সত্য ও মিথ্যা এবং কে ন্যায়

ও অন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত-। নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে অনুগ্রহ করার ব্যাপারে অদ্বিতীয়। অথচ (আশ্চর্যের বিষয়) তোমরা তোমাদের ইবাদতে আমার সাথে (অন্যান্য উপাস্যের) শরীক করতেছে ! তাই হল উল্লিখিত আয়াতের মর্মার্থ, যাদের সম্পর্কে আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। আয়াতের দ্বারা যাদের বিপক্ষে দলীল পেশ করা হয়েছে, তারা ঐসব সম্প্রদায়ের লোক, যাদের গুণাগুণ সম্পর্কে আমি ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি, (د و ن المعطلة والد هر ية) 'মুয়াত্তালা' ও 'দাহরিয়াহ' ব্যতীত। যদিও আয়াতে উল্লিখিত বিষয় আল্লাহ্ পাক ব্যতীত সকল সৃষ্টিজীবের জন্যই প্রযোজ্য ; তথাপি এখানে তাদের বর্ণনা পরিত্যাগ করলাম, কিতাবের বৃদ্ধি হওয়ার আশংকায়।

মহান আল্লাহ্র বাণীঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا وَّاَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ -

অর্থঃ তথাপি কেউ কেউ আল্লাহ্ ব্যতীত অপরকে আল্লাহ্র সমকক্ষরূপে গ্রহণ এবং আল্লাহ্কে ভালোবাসার ন্যায় তাদেরকে ভালোবাসে, কিন্তু যারা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনেছে, তাদের ভালোবাসা দৃঢ়তম। সীমালংঘনকারীরা শাস্তি প্রত্যক্ষ করলে যেমন বুঝবে হায় ! এখন যদি তারা তেমন বুঝতো যে সমস্ত শক্তি আল্লাহ্রই এবং আল্লাহ্ শাস্তিদানে অত্যন্ত কঠোর। (সূরা বাকারা ঃ ১৬৫)

উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত الند শব্দের ব্যাখ্যা-দলীল প্রমাণসহকারে আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি। কাজেই এখানে এর পুনরুল্লেখ করা অপসন্দ মনে করি। নিশ্চয়, যারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য উপাস্যকে শরীক করে, তারা তাদের অংশীদারকে এমনভাবে ভালবাসে যেমনভাবে মু'মিনগণ আল্লাহ্কে ভালবাসে। তারপর তাদেরকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, নিশ্চয়ই মু'মিনদের আল্লাহ্র প্রতি ভালবাসা, মুশরিকদের তাদের শরীকদের প্রতি ভালবাসার চেয়ে অধিক দৃঢ়তম।

মুফাসসীরগণ الانداد শব্দের ব্যাখ্যায় একাধিক মত প্রকাশ করেছেন যে, তার স্বরূপ কি ? তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ বলেছেন যে الانداد ঐ সমস্ত উপাস্যদের বুঝায়, আল্লাহ্ ব্যতীত তারা যাদের উপাসনা করে। যারা এ অর্থ বলেছেন, তাদের স্বপক্ষে নিম্নের হাদীস উল্লেখ করা হল। আল্লাহ্র বাণী - وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ সম্পর্কে কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমানদারগণের ভালবাসা কাফিরদের মূর্তিসমূহের প্রতি তাদের ভালবাসার চেয়ে অধিক সুদৃঢ়। এ আয়াতের মর্মার্থ সম্পর্কে মুজাহিদ (র.)

থেকে একই ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে। রাবী ও ইবনে যায়েদ থেকে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। মু'মিনদের আল্লাহ্র প্রতি ভালবাসা কাফিরদের মূর্তিসমূহের প্রতি ভালবাসা হতে তুলনামূলকভাবে অধিকতর সুদৃঢ়। আর অন্যান্য মুফাসসীরগণ বলেন যে, এ স্থলে الانداد শব্দের মর্মার্থ হল আল্লাহ্র নাফরমানীর ব্যাপারে তারা যাদের অনুসরণ করত সে সব তথাকথিত কাফির নেতৃস্থানীয় লোক। যাঁরা এমত পোষণ করেন তাঁরা হলেন ঃ

সূদী থেকে وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ এই আয়াত সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন যে, الانداد শব্দের মর্মাহল ঐসমস্ত লোক, কাফিররা যাদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে, যেমন প্রকাশ করা হয়। যখন তারা কাফির কোন কাজের আদেশ দেয় তখন তারা তাদের আদেশ পালন এবং আল্লাহ্র নাফরমানী করে। যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, উল্লিখিত আয়াতে কিভাবে كَحُبِّ اللّٰهِ বলা হল ? আল্লাহ্ কি শির্ক করাকে ভালবাসেন ? মুশরিকরা কি আল্লাহ্কে ভালবাসে ? তখন এর উত্তরে বলা হবে, তারা দেবদেবীকে ভালবাসে মহান আল্লাহ্র প্রতি ভালবাসার মত। কেউ বলেন যে, এর প্রকৃত মর্ম তাদের প্রশ্নের পরিপন্থী। এর দৃষ্টান্ত ঐ ব্যাক্তির বক্তব্যের মত ঃ- যেমন بعث غلامى كبيع غلامك "আমি আমার দাসকে বিক্রি করলাম। তোমাদের দাসের বিক্রির ন্যায়। – و استوفيت حقى منه استيفاء حقك - بمعنى استيفائك حقك "আমি তার নিকট থেকে আমার প্রাপ্য পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করলাম, তোমার গ্রহণ করার ন্যায়। অর্থাৎ তোমরা প্রাপ্য গ্রহণ করার মত। তাই غلام এবং حق শব্দদ্বয়ের মধ্যে পরোক্ষ বর্ণনাই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। যেমন জনৈক কবি বলেন ঃ

فَلَسْتُ مُسْلِمًا مَا دُمْتُ حَيًّا + عَلَى زَيْدٍ بِتَسْلِيْمِ الْاَمِيْرِ –

"আমার জীবিত অবস্থায় যাদের কাছে এমনভাবে আত্মসমর্পণ করবো না, যেমনভাবে দলপতির কাছে আত্মসর্মপণ করা হয়। অতএব তখন বাক্যের অর্থ দাঁড়াবে–وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ – "হে ম'ুমিনগণ ! মানবমন্ডলীর মধ্য থেকে যারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যদেরকে আল্লাহ্র সমকক্ষ মনে করে, তারা ওদেরকে এমনভাবে ভালবাসে, যেমনভাবে আল্লাহ্র প্রতি ভালবাসা হয়ে থাকে। মহান আল্লাহ্র বাণী–وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا وَّ اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ "এবং যারা অত্যাচারী তারা যদি (আল্লাহ্ পাকের) আযাব প্রত্যক্ষ করতো, তবে বুঝতো যে, সমস্ত শক্তিই আল্লাহ্র এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শাস্তি দানে কঠোর। (সূরা বাকারা ঃ ১৬৫) এ আয়াতের পাঠরীতিতে কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। মদীনা ও সিরিয়ার সাধারণ কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ পাঠ করেছেন– وَلَوْ تَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا অর্থাৎ يرى

শব্দের পরিবর্তে تری পাঠ করেছেন, تاء এর সাথে। اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابِ এর মধ্যে ياء এর সাথে। اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا وَّ أَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ এর মধ্যে উভয় أَنَّ কে فتح (যবর) যোগে–। এখন আয়াতে কারীমার অর্থ দাঁড়ায়– "হে মুহাম্মদ (সা.) ! যদি আপনি ঐ সমস্ত কাফিরদেরকে লক্ষ্য করেন, যারা নিজ আত্মার উপর অত্যাচার করেছে, যখন তারা মহান আল্লাহ্‌র আযাবকে নিজেদের চোখের সামনে দেখতে পাবে তখন তারা বুঝতে পারবে যে, সমস্ত শক্তি মহান আল্লাহ্‌রই। এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাক শাস্তি দানে কঠোর।"

উল্লিখিত আয়াতে أن এর মধ্যে نصب (যবর) দানের মধ্যে দু'টি কারণ রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হল أن কে فتح (যবর) দেয়া হয়েছে একটি (محذوف) উহ্য বাক্যের কারণে। যা এখানে مطلوب আকাঙ্খিত। কাজেই, তখন বাক্যের (تاويل) ব্যাখ্যা হবে এমনভাবে যথা–و لو ترى يا محمد الذين ظلموا ان يرون عذاب الله لأقروا "হে মুহাম্মদ (সা.) ! আপনি যদি ঐসব লোকদেরকে দেখতেন, যখন তারা আল্লাহ্ পাকের আযাব স্বচক্ষে দেখবে তখন তারা অবশ্যই বিশ্বাস করবে। ترى শব্দের অর্থ تبصر ان القوة لله جميعا অর্থাৎ তখন তুমি প্রত্যক্ষ করবে যে, সমস্ত শক্তি মহান আল্লাহ্‌রই। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা কঠোর শাস্তি প্রদানকারী। উল্লিখিত যে কারণের উপর ভিত্তি করে أن কে فتح (যবর) প্রদান করা হয়েছে তাতে لو এর جواب (উত্তর) متروكًا (পরিত্যাক্ত) হবে। তখন এর অর্থ প্রকাশের জন্য "بدلالة الكلام" বাক্যের বর্ণনা পদ্ধতির উপরই নির্ভর করতে হবে। যে কারণে أن কে فتح (যবর) প্রদান করা হয়েছে, এ কিরাআত বিশেষজ্ঞদের পাঠ পদ্ধতির উপর নির্ভর করে যিনি পাঠ করছেন, ولوترى –تاء এর সাথে, যা আমি বর্ণনা করলাম।

দ্বিতীয় যে কারণে أن কে فتح (যবর) প্রদান করা হয়েছে, তখন এ অর্থ হবে و لو ترى يا محمد اذ يرى الذين ظلموا عذاب الله لأن القوة لله جميعا و ان الله شديد العذاب – "হে মুহাম্মদ (সা.) ! আপনি যদি ঐ সব অত্যাচারীদেরকে দেখতেন, যখন তারা আল্লাহ্ পাকের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে–তখন তারা বুঝবে যে, নিশ্চয় সমস্ত শক্তি আল্লাহ্‌রই এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ কঠোর শাস্তি প্রদানকারী। তখন আপনিও মহান আল্লাহ্‌র চরম সীমার (عذاب) আযাব প্রত্যক্ষ করবেন। এরপর যখন لام কে (حذف) উহ্য করা হবে, তখন أن কে لدلالة الكلام বাক্যের চাহিদানুযায়ী فتح (যবর) প্রদান করা হবে। প্রাচীনগণ এই আয়াত এভাবে পড়েছেন–وَ لَوْ تَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابِ إِنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا وَ اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ এর মর্মার্থ হল, হে মুহাম্মদ (সা.) ! আপনি যদি জালিমদের সেই অবস্থা দেখতেন, যখন

তারা আল্লাহ্‌র আযাব প্রত্যক্ষ করবে ! তখন তারা অবশ্যইঐ অবস্থা নিশ্চিত জানতে পারবে–যেদিকে তারা নিপতিত হবে। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কুদরত ও প্রাধান্যের কথা উল্লেখ করে ঘোষণা দিয়েছেন ঃ "নিশ্চয় ইহজগতে এবং পরজগতে আল্লাহ্‌রই যাবতীয় শক্তি। তিনি ব্যতীত অপর কোন উপাস্যের নয়। নিশ্চয় আল্লাহ্ সেই ব্যক্তিকে কঠোর শাস্তি প্রদানকারী, যে ব্যক্তি তাঁর সাথে শির্‌ক করে এবং তাঁর সাথে অন্যান্য উপাস্যের ইবাদতের দাবী করতঃ শরীক করে।

অন্য আর এক পঠন পদ্ধতিতে উল্লিখিত আয়াতে **إن** এর মধ্যে যের ; এবং **تَرَى** শব্দে **تاء** এর সাথে পড়ার নিয়ম প্রচলিত আছে–। তখন আয়াতের অর্থ হবে ঃ **و لو ترى يا محمد الذين ظلموا اذ يروى العذاب يقولو إن القوة لله جميعا و ان الله شد يد العذاب** – "হে মুহাম্মদ (সা.) ! আপনি যদি ঐ সব অত্যাচারীদের সেই অবস্থা দেখতেন, যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন বলবে যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌রই যাবতীয় ক্ষমতা এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ কঠোর শাস্তি প্রদানকারী'' । এরপর ইবারতটি উহ্য রেখে বক্তব্যের উপর নির্ভর করা হয়েছে। কোন কোন কিরআত বিশেষজ্ঞগণ এভাবে পাঠ করেছেন ঃ **وَ لَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابِ إِنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا وَّ أَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ** – এর মধ্যে **باء** যোগে এবং **أَنَّ** অব্যয়টি যবর যোগে পাঠ করেছেন। তখন **أَنَّ** এর অর্থ হবে **و لو ير الذين ظلموا عذاب الله الذى أعد لهم فى جهنم لعلوا حين يرونه فيعانيونه أن القوة لله جميعا – و ان الله شديد العذاب** – "যখন অত্যাচারীরা আল্লাহ্‌র সেই আযাব প্রত্যক্ষ করবে, যা তিনি তাদের জন্য দোযখে নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, তখন তারা অবশ্যই তা দেখতে পারবে এবং নিশ্চিতভাবে জানতে পারবে যে, যাবতীয় ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্‌রই জন্য। অতএব, তখন প্রথম **أن** এর মধ্যে (যবর) হবে, (**لتعلقهما بجواب** **لو المحذوف**) উহ্য **لَوْ** এর **جواب** এর সাথে সম্পর্ক রাখার জন্য। আর তখন জবাবটি পরিত্যক্ত হবে। আর দ্বিতীয় **أَنَّ** টি প্রথমটির উপর **عطف** সংযোগ হবে। ইহাই হল 'কূফা', বসরা এবং মক্কাবাসীদের সাধারণ পাঠ পদ্ধতি। বসরার কোন কোন ব্যাকরণবিদ মনে করেন যে, ঐসব কিরআত বিশেষজ্ঞদের পাঠের ব্যাখ্যা হবে–**وَ لَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابِ إِنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا وَ أَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ**–এই আয়াতে **يَرَى** শব্দের মধ্যে **ياء** যোগে এবং উল্লিখিত উভয় **أن** এর মধ্যে যবর যোগে। তখন এর অর্থ হবে–যদি তারা জানতো ! কেননা তারা যে শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, সে বিষয়ে তাদের জানা নেই। অবশ্য নবী করীম (সা.)–এর সে বিষয়ে জানা ছিল। যখন **و لو ترى** পাঠ করা হবে, তখন নবী করীম (সা.)–কে সম্বোধন করা হবে। আর যদি **إن** কে **إبتداء** প্রারম্ভিক হিসেবে যের দেয়া হয়, তবে তা বৈধ হবে। **و لو يرى** এর অর্থ **و لو يعلم** (যদি সে জানতো) আর কখনও **و لو يعلم** এর অর্থ কোন

বস্তুর সাথে সম্পর্কযুক্ত হয় না। যেমন তুমি কোন ব্যক্তিকে বললে- أما و الله لو يعلم আল্লাহ্র শপথ ! যদি সে জানতো ! যেমন প্রাক ইসলামিক যুগের কবি উবাইদ ইবনুল আবরাস-এর কবিতায় আছেঃ

اِنْ يَكُنْ طِبُّكَ الدَّلاَلَ فَلَوْ فِي + سَالِفِ الدَّهْرِ وَ السِّنِيْنَ الْخَوَالِي

উল্লিখিত পংক্তিতে لَوْ এর কোন জবাব উল্লেখ করা হয়নি। কবি আরো বলেন ঃ

وَ بِحَظٍّ مِمَّا نَعِيْشُ وَلاَ تَذْ + هَبْ بِكَ التُّرَّهَاتُ فِي الاَ هْوَالِ

উল্লিখিত কবিতায় عِيْشِي শব্দটি উহ্য আছে। এতে প্রমাণিত হয় আরবী কাব্যে এ ধরনের ব্যবহার প্রচলিত রয়েছে।

কোন কোন তাফসীরকার বলেন যে,. و لو ترى এর মধ্যে تاء যোগে এবং أن এর মধ্যে যবর যোগে পড়া সঠিক নয়। কেননা, নবী করীম (সা.) তো পরিণাম সম্পর্কে অবগত ছিলেন। কিন্তু তাঁর সংকল্প হল- মানুষকে তা জানিয়ে দেয়া। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ أم يقولون افتراه "তারা কি এ কথা বলে যে, তিনি তা নিজেই তৈরী করেছেন। মানুষকে তাদের অজ্ঞতা সম্পর্কে অবহিত করা যায়। আল্লাহ্ আরো বলেছেন, اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ "আপনি কি অবগত নন যে, আসমান-যমীনের মালিকানা একমাত্র আল্লাহ্রই। (সূরা বাকারা ঃ ১০৭)

ইমাম আবূ জা'ফর বলেন, একদল ভাষাবিদ বলেন যে, আলোচ্য আয়াতে اِنَّ এর কার্যকারিতা অস্বীকার করেছেন। আর তারা বলেন যে, নিশ্চয় অত্যাচারীরা শাস্তি প্রত্যক্ষ করার সময় বুঝতে পারবে যে, যাবতীয় ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্ পাকেরই। অতএব, এমন ব্যাখ্যা করার কোন ন্যায্য কারণ নেই যে وَ لَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ (আর যদি অত্যাচারীরা প্রত্যক্ষ করে যে, একমাত্র ক্ষমতা আল্লাহ্ পাকেরই) এ বাক্যে, لَوْ এর جواب হিসেবে أن এর মধ্যে عمل কার্যকর করা হয়েছে, যা العلم এর অর্থবোধক। তা প্রথম علم এর পূর্বাহ্নে উল্লিখিত থাকার কারণ হয়েছে।

কূফার কোন কোন ব্যাকরণবিদ বলেন যে, اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ এবং اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ এর মধ্যে যবর হয়েছে, ঐ পাঠ পদ্ধতি অনুযায়ী যিনি পাঠ করেছেন, و-لو يرى এর মধ্যে ياء যোগে। তাতে যবর হয়েছে, বাহ্যিক কার্যকারিতার কারণে। আর কোন ব্যক্তি তাতে যবর দিয়েছেন-ঐ পাঠ পদ্ধতি অনুসারে যিনি পাঠ করেছেন, و لو ترى এর মধ্যে ياء যোগে। তাই তাতে যবর দিয়েছেন, ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করে। لاَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا কেননা, সমস্ত ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্রই ; وَ لاَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ এবং যেহেতু আল্লাহ্ কঠোর শাস্তি প্রদানকারী। তিনি বলেন, যিনি উভয়টিতে كسره (যের)

দিয়েছেন, তাহল–ঐ ব্যক্তির পাঠরীতি অনুযায়ী, যিনি تاء (তা) যোগে পাঠ করেছেন। কাজেই তিনি উভয়টিতে كسره (যের) দিয়েছেন, خبر (বিধেয়) এর ভিত্তি করে।

তাঁদের মধ্য থেকে অন্যান্য মুফাসসীরগণ বলেন যে, أن এর মধ্যে فتح (যবর) হয়েছে, ঐ ব্যক্তির পাঠরীতি অনুযায়ী যিনি পাঠ করেছেন و لو يرى الذين ظلموا এর মধ্যে يرى এর মাঝে ياء যোগে। তখন جواب الكلام বাক্যের বিধেয় متر وكاً পরিত্যক্ত হবে। যেমন এ বাক্য وَ لَوْ أَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ এর মধ্যে جواب (বিধেয়) পরিত্যাগ করা হয়েছে। কেননা, বেহেশত এবং দোযখের অর্থ এখানে প্রসিদ্ধ। তারা আরো বলেন, ঐ ব্যক্তির পাঠরীতিতে أن কে كسره (যের) প্রদান করা (বৈধ) ঠিক হবে যিনি ياء যোগে পাঠ করেছেন। আর ঐ ব্যক্তির পাঠরীতির উপর নির্ভর করে أن এর মধ্যে نصب (যবর) প্রদান ও ঠিক হয়েছে, যিনি ياء যোগে পাঠ করেছেন তখন تاويل الكلام (এর ব্যাখ্যা) দাঁড়াবে এমন وَ لَوْ تَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا অর্থাৎ যদি আপনি অত্যাচারিদের সেই অবস্থা দেখতে পেতেন, যখন তারা عذاب (শাস্তি) প্রত্যক্ষ করবে–তখন তারা বুঝতে পারবে যে, মহান আল্লাহ্‌রই সমস্ত ক্ষমতা। তারা মনে করে যে, أن এর মধ্যে كسره (যের) প্রদানের একটি কারণ হল–যখন, وَ لَوْ تَرَى এর মধ্যে على الاستئناف যোগে পাঠ করা হবে (প্রারম্ভিক) হিসেবে। কেননা, মহান আল্লাহ্‌র বাণী–و لو ترى প্রয়োগ হবে তাদের উপর, যারা অত্যাচারী।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আমাদের নিকট উল্লিখিত আয়াতের সঠিক পাঠরীতি হল– لَوْ تَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا এর মধ্যে ترى এর মাঝে تاء যোগে। তখন আয়াতে কারীমার অর্থ হবে– "যখন তারা عذاب (শাস্তি) প্রত্যক্ষ করবে, তখন তারা বুঝতে পারবে যে, সমস্ত শক্তিই আল্লাহ্‌র এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক কঠোর শাস্তিদাতা। অর্থাৎ নিশ্চয় আপনি দেখতে পাবেন যে, যাবতীয় শক্তি একমাত্র আল্লাহ্‌রই এবং (আরো দেখতে পাবেন) নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক কঠোর শাস্তিদাতা। তাই, و أن الله এর পূর্বে দ্বিতীয় لرأيت শব্দটি محزوفة (উহ্য) আছে। তখন لَوْ تَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا এর উল্লেখ অপ্রত্যাশি হবে, যদি তা لو এর جواب জবাব হয় এবং যদি বাক্যটির সম্বোধনের উৎসস্থল হযরত রাসূলুল্লাহ্‌র (সা.) জন্য হয়, তবে, তিনি ব্যতীত অন্যের (نيابت) প্রতিনিধিত্বের প্রয়োজন নেই। কেননা, হযরত নবী করীম (সা.) নিঃসন্দেহে জ্ঞাত আছেন যে, اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا নিশ্চয় যাবতীয়

ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্‌রই وَ أَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ "এবং নিশ্চয় আল্লাহ্‌পাক কঠোর শাস্তিদাতা।" তা তখন আল্লাহ্‌পাকের কালামের অনুরূপ দৃষ্টান্ত হবে– যেমন **الم تعلم ان الله له ملك السموات و الارض** (আপনি কি অবগত নন যে, নিশ্চয় আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব একমাত্র আল্লাহ্‌রই। তার ব্যাখ্যা আমরা যথাস্থানে বর্ণনা করেছি। ইহাকে এখানে উল্লেখ করলাম–শুধু উল্লিখিত আয়াতে **ياء** যোগে পাঠ করার উপর ভিত্তি করে। কেননা, যখন **كافر** (নাস্তিক) সম্প্রদায়ের লোকেরা আযাব প্রত্যক্ষ করবে, তখন তারা বিশ্বাস করবে যে, **أن القوة لله جميعا و أن الله شديد العذاب** নিশ্চয় আল্লাহ্‌র যাবতীয় শক্তি এবং অবশ্যই তিনি কঠোর শাস্তিদাতা। অতএব, لَوْ يَرَوْنَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا একথা বলার কোন কারণ নেই। কেননা, لَوْ رَأَيْتَ কথাটি ঐব্যক্তির জন্য বলা হবে, যিনি দেখেননি। আর যে ব্যক্তি নিশ্চিতভাবে দেখেছে তাকে যদি তুমি দেখতে বলার কোন অর্থই হয় না। اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ অর্থ– যখন তারা আযাব প্রত্যক্ষ আয়াতাংশ করবে।

হযরত রাবী (র.) থেকে মহান আল্লাহ্‌র বাণী– وَ لَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا وَ أَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدَ الْعَذَابِ এ আয়াত সম্বন্ধে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন যে, তারা (নাস্তিকরা) যদি আযাব প্রত্যক্ষ করতো ! আল্লাহ্ তা'আলার বাণী– وَ لَوْ تَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا এর উল্লেখপূর্বক এমনভাবে প্রকাশ করেছেন যে, মহান আল্লাহ্‌র বাণী– وَ لَوْ تَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا এর মর্মার্থ "হে মুহাম্মদ (সা.) ! আপনি যদি ঐসব অত্যাচারীকে অবলোকন করেন, যারা স্বীয় আত্মার উপর অত্যাচার করেছে। অতএব, তারা আমাকে ব্যতীত অন্যান্য উপাস্য গ্রহণ করেছে, তারা ওদেরকে (মূর্তিদেরকে) এমন ভালবাসে–যেমন তোমাদের ভালবাসা (হে মু'মিনগণ !) আমার প্রতি। তখন তারা কিয়ামত দিবসে আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করতে পারবে, যা আমি তাদের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছি। অবশ্য তোমারও তখন অবগত হতে পারবে যে, যাবতীয় শক্তি একমাত্র আমারই, অন্যান্য দেবদেবী এবং উপাস্যদের নয়। অন্যান্য দেবদেবী এবং উপাস্যরা তথায় (কিয়ামত দিবসে) কোন কাজে আসবে না ; এবং আমি তাদের জন্য যে শাস্তি নির্ধারণ করে রেখেছি, তা তারা প্রতিরোধ ও করতে পারবে না। আর তোমরাও (হে মু'মিনগণ !) তখন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবে যে, আমার প্রতি **كفرى** (অবিশ্বাস) করেছে এবং আমার সাথে অন্য উপাস্যকে মেনেছে।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী–

اِذْ تَبَرَّاَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا وَ رَاَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابُ–

অর্থঃ "স্মরণ কর, সেদিনের কথা, যাদের অনুসরণ করা হয়েছে তারা যখন তাদের অনুসারীদের দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকার করবে এবং তারা আযাব প্রত্যক্ষ করবে ও তাদের মধ্যকার সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে।" (সূরা বাকারা **: ১৬৬**)

মহান আল্লাহ্র উল্লিখিত বাণীর মর্মার্থ হল-যাদের অনুসরণ করা হয়েছে-তারা যখন তাদের অনুসারীদের দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকার করবে। অর্থাৎ তাফসীরকারগণ এ আয়াতের **فِى الَّذِيْنَ** অংশের ব্যাখ্যার একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। তাদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ নিম্নের হাদীস অনুসারে নিজ নিজ বক্তব্য পেশ করেছেন।

হযরত কাতাদা (র.) থেকে মহান আল্লাহ্র এ বাণী- **اذ تبرأ الذين اتبعوا** সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, যাদের অনুসরণ করা হয়েছিল তারা হলো, প্রভাবশালী, ক্ষমতাশালী এবং নেতৃস্থানীয় মুশরিক। **من الذين اتبعوا** অর্থাৎ অনুসরণকারীরা হল-দুর্বল অনুগত ব্যক্তিবর্গ। **وَ رَاَوُا الْعَذَابَ** এবং তারা তখন আযাব প্রত্যক্ষ করবে।

হযরত রাবী (র.) থেকে **اِذْ تَبَرَّاَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا** এ আয়াত সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন যে, কিয়ামতের দিনে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা তাদের অনুসারীদের দায়িত্ব এড়িয়ে যাবে। হযরত ইবনে জুরাইজ (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন যে, আমি হযরত আতা (র.)-কে এই আয়াত **اِذْ تَبَرَّاَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا** সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তখন তিনি বললেন, কিয়ামতের দিনে তাদের দলপতিগণ, নেতাগণ এবং সরদারগণ নিজ নিজ অনুসারীদের দায়দায়িত্ব এড়িয়ে যাবে।

অন্যান্য মুফাসসীরগণ হযরত সূদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত হাদীস অনুসারে এ আয়াত **اِذْتَبَرَّاَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا** সম্পর্কে বলেন যে, যাদের অনুসরণ করা হয়েছে তারা হলো, **السياطين** শয়তান সম্প্রদায়। তারা **(تبروا من الانس)** মানুষের দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাবে। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন যে, আমার নিকট মহান আল্লাহ্র উল্লিখিত বাণী সম্পর্কে সঠিক অভিমত হল যে, আল্লাহ্র সাথে মুশরিক অনুসৃতরা তাদের অনুসারীদের প্রতি অসন্তুষ্ট হবে, যখন তারা আযাব প্রত্যক্ষ করবে। এই আয়াত দ্বারা কাউকেও নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি,-বরং আল্লাহ্কে অবিশ্বাস, পথভ্রষ্ট সকল ব্যক্তিই সাধারণভাবে এর অন্তর্ভুক্ত হবে। অর্থাৎ ইহলোকে নেতৃস্থানীয় পথভ্রষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি অসন্তুষ্ট হবে, যখন তারা পরকালে আযাব প্রত্যক্ষ করবে। অতএব, **اِذْ تَبَرَّاَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا** এই আয়াত দ্বারা যাদের বুঝানো হয়েছে-তারা হল ঐসব উপাস্য, যাদেরকে তারা আল্লাহ্ ব্যতীত উপাসনা করে। যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন -**وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ**

يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا এবং মানবমন্ডলীর একাংশ–যারা আল্লাহ্ ব্যতীত অপর উপাস্যকে শরীক স্থির করে, তারাই সেদিন তাদের অনুগামীদের প্রতি অসন্তুষ্ট হবে। যদি আয়াতটির দ্বারা উল্লিখিত অর্থই হয়, তবে সূদ্দী (র.) আল্লাহ্ পাকের বাণী– وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, তা–ই সঠিক হবে। এখানে الانداد শব্দের অর্থ হল ঐসমস্ত মুশরিক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, যাদের আদেশ–নিষেধ তাদের অনুসারীরা মেনে চলে এবং তাদের আনুগত্য করতে যেয়ে আল্লাহ্র নাফরমানী করে। যেমন মু'মিনগণ আল্লাহ্র অনুসরণ করে এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্য উপাস্যদের প্রতি অবাধ্যতা পোষণ করে। আর ঐ ব্যাখ্যা বাতিল বলে গণ্য হবে, যারা– اِذْ تَبَرَّاَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, انهم الشياطين –অনুসৃতরা হল–শয়তানসমূহ ; তারা তাদরে অনুগত সুহৃদ মানুষদের প্রতি তখন অসন্তুষ্ট হবে। কেননা উল্লিখিত আয়াতটি খবরের প্রকৃতিতে মুশরিকদের সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। মহান আল্লাহ্র বাণী– وَ تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابُ অর্থ ঃ এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে তখন তাদের মধ্যকার পারস্পরিক যাবতীয় সম্পর্ক।" ব্যাখ্যা ঃ أَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَـــذَابَ اِذْ تَبَرَّاَ الَّذِ يْنَ اتُّبِعُوْا وَ اِذْ تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابُ তফসীরকারগণ الاسباب শব্দের ব্যাখ্যায় একাধিক মত পোষণ করেছেন। তাদের মধ্য কেউ কেউ নিম্নের বর্ণনা অনুসারে আপন বক্তব্য পেশ করেছেন। মুজাহিদ(র.) وَ تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابُ সম্পর্কে বলেন যে, الاسباب হল الوصال الذى كان بينهم فى الدنيا ঐসব যোগসূত্র–যা তাদের পরস্পরের মাঝে পৃথিবীতে বিরাজমান ছিল। অন্য এক সূত্রে মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে, এর অর্থ হল– تواصلهم فى الد نيا পৃথিবীতে বিরাজিত তাদের পারস্পরিক সম্পর্কসমূহ। আরেক সূত্রে মুজাহিদ থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অন্য এক সূত্রে মুজাহিদ (র.) বলেন যে, এর অর্থ হল ঃ المؤدة অর্থাৎ তাদের মধ্যেকার পারস্পরিক বন্ধুত্ব। মুসান্না সূত্রে মুজাহিদ থেকেও অনুরূপ হয়েছে। আরেক সূত্রে মুজাহিদ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে, الاسباب এর মর্মার্থ হল تواصل كان بينهم بالمـؤدة فى الدنيا পৃথিবীতে বিরাজমান তাদেরকে পারস্পরিক সম্পর্কসমূহ। ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে وَ تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابُ ব্যাখ্যা সম্পর্কে তিনি বলেন যে, এর অর্থ হল المؤدة বন্ধুত্ব। কাতাদা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এর অর্থ হল اسباب الندامة يوم القيامة কিয়ামত দিবসে লজ্জিত হওয়ার উপকরণসমূহ। এবং الاسباب হল পারস্পরিক যোগসূত্র ঐসব উপকরণাদি, যা তাদের মাঝে পৃথিবীতে বিদ্যমান ছিল, যাদ্বারা তারা পারস্পরিক মিলন ও বন্ধুত্ব স্থাপন করতো। অতএব, কিয়ামত দিবসে তা পারস্পরিক শত্রুতায়

রূপান্তরিত হবে। এরপর কিয়ামত দিবসে একে অপরকে অবিশ্বাস করবে এবং একে অন্যকে অভিসম্পাত করবে এবং একে অন্যজনের প্রতি অসন্তুষ্ট হবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র ইশরাদ করেছেন ঃ **اَلْاَخِلَّاۤءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ** অর্থঃ–বন্ধুরা যেদিন হয়ে পড়বে একে অপরের শত্রু, তবে মুত্তাকিগণ ব্যতীত। (সূরা যুখরুফ ঃ ৬৭) অতএব সেদিন মানুষের সকল প্রকার বন্ধুত্বই শত্রুতায় রূপান্তরিত হবে, কিন্তু মুত্তাকীদের বন্ধুত্ব ব্যতীত।

কাতাদা থেকে অন্য সূত্রে, তিনি বলেন যে, **هو الوصل الذى كان بينهم فى الدنيا** তা হল সেই মিলন সূত্র, যা পৃথিবীতে তাদের পরস্পরের মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

রাবী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, **الاسباب** এর অর্থ **اَلندامة** লজ্জিত হওয়া।

কেউ কেউ বলেন যে, **الاسباب** এর অর্থ হল–ঐ সব পদমর্যাদা যা তাদের পৃথিবীতে বিদ্যমান ছিল। যারা এই অর্থ করেছেন, তাদের সমর্থনে আলোচনা ঃ–ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে, এর অর্থ হল–**تقطعت بهم المنازل** তাদের থেকে তাদের পদমর্যাদাসমূহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে–। অন্য এক সূত্রে ইবনে আসাম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, **الاسباب** এর অর্থ **اَلمنازل** পদমর্যাদাসমূহ। কেউ কেউ বলেন যে, **الاسباب** এর অর্থ হল **الارحام** রক্তের সম্পর্কে যুক্ত আত্মীয়তা। এ ব্যাখ্যার সমর্থনে আলোচনাঃ–ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, **وَ تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابُ** এর মর্মার্থ হল **الارحام** বা রক্তের সম্পর্কে যুক্ত আত্মীয়তা। কেউ কেউ বলেছেন যে, **الاسباب** এর মর্মার্থ হল ঐসব কার্যাবলী যা তারা পৃথিবীতে সম্পাদন করতো। এ ব্যাখ্যার সমর্থনে আলোচনাঃ সূদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, **الاسباب** এর অর্থ হল **الاعمال** কার্যসমূহ। ইবনে যায়েদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন যে, **اسباب** এর অর্থ **اعمالهم** তাদের কার্যাবলী। অতএব মুত্তাকীদের তখন তাদের সম্মুখে পেশ করা হবে। সুতরাং তারা তা সানন্দে গ্রহণ করবে। এরপর তাদেরকে এর বিনিময়ে দোযখের অগ্নি থেকে মুক্তি দেয়া হবে। আর অপর দলকে যখন তাদের মন্দ কার্যের ফল দেয়া হবে তখন তাদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কের বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে। অতএব, তারা তখন দোযখে গমন করবে। বর্ণনাকারী বলেন যে, **الاسباب** হল এমন বস্তু–যার দ্বারা স্থাপন করা হয়। তিনি বলেন, **السبب** এর অর্থ **الحبل** রশি। **الاسباب** শব্দটি **سبب** শব্দের বহুবচন। **سبب** এমন সব বিষয়কে বলে যার দ্বারা মানুষ স্বীয় প্রয়োজন ও প্রার্থনা পূরণের উপকরণাদি সংগ্রহ করতে পারে। অতএব, **حبل** শব্দকে **سبب** বলা হয়, কারণ তা দ্বারা প্রয়োজনীয় কাজ সম্পাদনের যোগসূত্র স্থাপন করা হয়। এর সাথে সম্পর্ক স্থাপন ব্যতীত আবশ্যকীয় বস্তুর মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হবে না। রাস্তাকেও **سبب**

বলা হয়, কারণ তা যাতায়াতের একটি যোগসূত্র। "وَ المصاهرة" পরস্পর দুগ্ধপান করাকেই سبب বলা হয়, কেননা তা (বিবাহ বন্ধন) নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ। الوسيلة কোন বস্তুর মাধ্যমকেও سبب বলা হয়, কারণ "حاجة" আবশ্যক পূরণের তা একটি যোগসূত্র। এমনিভাবে প্রত্যেক বস্তুই–যাদ্দারা প্রার্থিত বিষয় পাওয়া যায়, তাকেই প্রার্থিত বস্তু পাওয়ার سبب বলা হয়। অতএব এর অর্থ যখন এরূপ হয়– যা বর্ণিত হল,তখন উল্লিখিত আয়াত–وَ تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابُ এর সঠিক ব্যাখ্যা হবে– আল্লাহ্ তা'আলা তাকে উল্লেখ করেছেন, তাদেরকে খবর দেয়ার জন্য–যারা স্বীয় আত্মার উপর অত্যাচার করেছে। তারা হল ঐসব কাফির, যারা কুফুরী অবস্থায় মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছে। তারা আল্লাহ্র শাস্তি প্রত্যক্ষ করার সময় অনুসৃতরা অনুসারীদের প্রতি অসন্তুষ্ট হবে এবং তাদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক ও বিচ্ছিন্ন হবে। আর এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখ করেছেন যে, তাদের মধ্যকার একদল অপরদলকে অভিসম্পাত করবে। আর ও বলা হয়েছে যে, শয়তান তখন তার সুহৃদদেরকে লক্ষ্য করে বলবে –مَا اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَ مَا اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ اِنِّيْ كَفَرْتُ بِمَا اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ– অর্থঃ"আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্য করতে সক্ষম নই– এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে সাহায্য করতে সক্ষম নও তোমরা যে, পূর্বে আমাকে আল্লাহ্র শরীক করেছিলে এর সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।" (সূরা ইবরাহীম ঃ ২২) এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন যে, اَلْاَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ– অর্থ ঃ"বন্ধুরা সেদিন হয়ে পড়বে একে অপরের শত্রু, তবে মুত্তাকীরা ব্যতীত।" (সূরা যুখরুফ ঃ ৬৭) সেদিন কাফিররা কেউ কারো সাহায্য করতে পারবে না। এ অবস্থার কথা উল্লেখ করে আল্লাহ্ বলেন যে, – وَ قِفُوْهُمْ – اِنَّهُمْ مَّسْئُوْلُوْنَ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُوْنَ – অর্থঃ"আর থামাও, কারণ তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে। তোমাদের কি হল যে, তোমরা একে অপরের সাহায্য করছ না?" (সূরা সাফফাত ঃ ২৪–২৫) তাদের কোন আত্মীয় বা অনুগ্রহশীল ব্যক্তিও সেদিন কোন সাহায্য করবে না, যদি তার আত্মীয় আল্লাহ্র কোন (ولى) ওলীও হন। অতএব, এই অবস্থা উল্লেখ করে আল্লাহ্ বলেন– وَ مَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرَاهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَا اِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ اَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّاَ مِنْهُ – আর ইবরাহীম (আ.) তার পিতার জন্য استغفار ক্ষমাপ্রার্থনা করছিল,তাকে–এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বলে; তারপর যখন তা তাঁর নিকট সুস্পষ্ট হল যে, সে আল্লাহ্র শত্রু তখন ইবরাহীম (আ.) তার সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। (সূরা তাওবা ঃ ১১৪) আল্লাহ্ তা'আলা এ কথার দ্বারা ঘোষণা করেন যে, اَنَّ اَعْمَالَهُمْ تَصِيْرُ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٌ "তাদের কার্যাবলী (সেদিন) তাদের জন্য আক্ষেপের কারণ হয়ে দাঁড়াবে"। اسباب এর উল্লিখিত অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে পৃথিবীতে যে সব উপকরণাদির মাধ্যমে উদ্দেশ্যসমূহ ফলপ্রসূ হয়,

পরকালে আল্লাহ্ তা'আলা সেইসব উপকরণের স্বার্থ থেকে কাফিরদেরকে বঞ্চিত করবেন। কেননা, তা তাঁর আনুগত্য ও সন্তুষ্টির পরিপন্থী হওয়ার কারণে এর সুফল তাদের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তাদের প্রভুর দরবারে উপস্থিত হওয়ার সময় কোন বন্ধু অপর কোন বন্ধুকে সাহায্য করতে পারবে না; এবং তাদের উপাস্যের উপাসনায়ও না ; এবং তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের (শয়তান) আনুগত্যে না। আর তাদের উপর নিপতিত আল্লাহ্র কোন শাস্তিও তাদের কোন আত্মীয় পরিজন প্রতিরোধ করতে পারবে না এবং তাদের কোন আমলও তাদের কোন কাজে আসবে না। বরং তাদের কার্যাবলী তাদের উপর আক্ষেপের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এরপর কাফিরদের মধ্যেকার যাবতীয় সম্পর্ক সেদিন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। সুতরাং وَ تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابُ এর ব্যাখ্যার ব্যাপারে আল্লাহ্র গুণ সম্পর্কে চেয়ে অধিক পরিশুদ্ধ অর্থ আর হয় না। আর তা তাদের যাবতীয় সম্পর্ক সম্বন্ধে আমরা যা বর্ণনা করলাম, তার আংশিক ব্যতীত, যা ; আমরা ঐ সম্পর্কে বলেছি। আর যদি কেউ দাবী করে যে, ان المعنى بذلك خاص من الاسباب এর অর্থ বিশেষ সম্পর্কের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তবে তার দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে এমন ব্যাখ্যা প্রদানের কথা বলা হবে, যাতে কোন منازع বা বিতর্ক উথাপিত না হয়। তখন এতে তাদের বিরোধীদের কথাও উথাপিত হবে। অতএব, এসম্পর্কে কোন কথা না বলে বরং তা পরকালের বিষয় হিসেবে অত্যাবশ্যক মনে করাই বাঞ্ছনীয়।

মহান আল্লাহ্র বাণী–

وَ قَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّاَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُا مِنَّا كَذٰلِكَ يُرِيْهِمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرٰتٍ عَلَيْهِمْ وَمَاهُمْ بِخَارِجِيْنَ مِنَ النَّارِ–

অর্থ ঃ "এবং যারা অনুসরণ করেছিল তারা বলবে, হায়! যদি একবার আমাদের প্রত্যাবর্তন ঘটত তবে আমরাও তাদের সম্পর্ক ছিন্ন করতাম, যেমন তারা আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন করল। এভাবে আল্লাহ্ তাদের কার্যাবলী তাদের পরিতাপরূপে তাদেরকে দেখাবেন আর তারা কখনও অগ্নি হতে বের হতে পারবে না।" (সূরা বাকারা ঃ ১৬৭)

মহান আল্লাহ্র বাণী– وَ قَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا এর মর্মার্থ হল ঐ সমস্ত অনুসরণকারী–যারা তাদের নেতাদেরকে আল্লাহ্ পাকের সমকক্ষ মনে করে তাদের আনুগত্য প্রকাশ করেছিল মহান আল্লাহ্র নাফরমানির মাধ্যমে এবং তাদের আনুগত্য প্রকাশ করতে গিয়ে নিজেদের প্রতিপালকের অবাধ্য হয়েছিল। পরকালে যখন তারা আল্লাহ্র পাকের আযাব প্রত্যক্ষ করবে, তখন তারা বলবে, لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً (যদি আমাদেরকে পৃথিবীতে ফিরে যাবার অনুমতি দেয়া হতো !)

الكَرَّةُ শব্দের অর্থ হলো পৃথিবীর দিকে ফিরে আসা। যেমন কোন ব্যক্তির বক্তব্যঃ كرت على القوم

আমি জাতির কাছে ফিরে এলাম। كرًّا - اكرُّ এর অর্থ হল একবার প্রত্যাবর্তন করা। অর্থাৎ তাদের কাছ হতে প্রত্যাবর্তনের পর আবার ফিরে আসা। যেমন কবি (اخطل) আখতালের কবিতাংশে শব্দটি প্রত্যাবর্তন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যথা – وَ لَقَدْ عَطَفْنَ عَلَى فَزَارَةَ + كَرُّ الْمَنِيْحِ وَجُلْنَ لِمَاْمَجَالاً – উল্লিখিত কবিতার كَرٌّ শব্দের অর্থ হল প্রত্যাবর্তন করা।

হযরত কাতাদা (র.) থেকে এ আয়াত – وَ قَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّاَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُا مِنَّا সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, যদি আমাদেরকে পৃথিবীর দিকে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দেয়া হতো !

হযরত রাবী (র.) থেকে মহান আল্লাহ্‌র বাণী – وقال الذين اتبعوا لوأن لناكرة সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন যে, অনুসরণকারীরা বলবে, যদি আমাদেরকে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দেয়া হতো! তবে আমরাও তাদের প্রতি তদ্রূপ অসন্তুষ্ট হতাম, যেরূপ তারা আমাদের প্রতি আজ অসন্তুষ্ট হয়েছে। মহান আল্লাহ্‌র বাণী فنتبرأ منهم আয়াতাংশ منصوب হয়েছে لو (حرف تمنى) এর جواب হিসেবে। কেননা, কাফির সম্প্রদায় পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের আশাপোষণ করবে, যেন তারা তাদের ঐ সমস্ত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করতে পারে, যাদেরতে তারা মহান আল্লাহ্‌র অবাধ্যতায় আনুগত্য প্রকাশ করেছিল। যেমন, আজ তাদের প্রতি তাদের ঐ সমস্ত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা অসন্তুষ্ট হয়েছে, যারা পৃথিবীতে অনুসৃত ছিল মহান আল্লাহ্‌র সাথে কুফরী করার কাজে। যখন তারা মহান আল্লাহ্‌র ভীষণ শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন তারা বলবে. ياليت لنا كرة الى الدنيا فنتبرأ منهم و ياليننا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين – "কতই না ভাল হতো ! যদি আমরা পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করতে পারতাম, তবে আমরা তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হতাম ! আফসোস ! যদি আমরা প্রত্যাবর্তিত হতাম, তবে আমাদের প্রতিপালকের (ايات) নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতাম না এবং নিশ্চয়ই আমরা বিশ্বাসীদের অন্তর্গত হতাম"। মহান আল্লাহ্‌র বাণী–كَذَالِكَ يُرِيْهِمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ এভাবেই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কৃতকর্মসমূহ তাদের প্রতি দুঃখজনকভাবে প্রদর্শন করবেন"। আল্লাহ্ পাকের উল্লিখিত বাণী–كَذَالِكَ يُرِيْهِمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ এর মর্মার্থ হল "এভাবেই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কৃতকর্মসমূহ তাদের প্রতি প্রদর্শন করবেন যেভাবে তাদেরকে আযাব প্রদর্শন করা হয়েছে, যা পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। যথা و رأو العذاب "এবং তারা আযাব প্রত্যক্ষ করবে"। অর্থাৎ ইহজগতে মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে তারা যেভাবে (পরকালে) আযাব প্রত্যক্ষ করবে, ঠিক সেইভাবেই তাদের মন্দ কার্যাবলী যা আল্লাহ্ কর্তৃক শাস্তিযোগ্য, তা দুঃখজনকভাবে তাদের প্রতি প্রদর্শন করা হবে। حسرات শব্দের মর্মার্থ ندامت লজ্জা–

জনক বা দুঃখজনক। الحسرات শব্দটি حسرة শব্দের বহুবচন। এমনিভাবে প্রত্যেক اسم (বিশেষ্য) যা একবচনে فعلة এর পরিমাপে হয়, তার প্রথম অক্ষর مفتوح যবর যুক্ত এবং দ্বিতীয় অক্ষর ساكن সাকিন যুক্ত হবে। তখন তার جمع বহুবচন হবে فعلات এর পরিমাপে। যথা شهوة এবং تمرة শব্দ দ্বয়ের বহুবচন যথাক্রমে شهوات এবং تمرات হবে। আর যদি তা نعت (বিশেষণ) হয়, তবে তার দ্বিতীয় অক্ষরে ساكن প্রদান করা পরিত্যাগ করতে হবে। যথা ضخمة এর বহুবচন হবে ضخمات এবং عبلة এর বহুবচন عبلات হবে। আর অনেক সময় একাধিক اسم (বিশেষ্যের) বেলায় দ্বিতীয়টিতে ساكن হবে। যেমন কোন কবি বলেছেন,

عَلَّ صُرُوْفَ الدَّهْرِ اَوْ دُوْلَاتِهَا + يُدِلْتَنَا اللَّمَّةُ مِنْ لَمَّاتِهَا + فتستريح النفس من زفراتها

কাজেই উল্লিখিত কবিতায় الزفرات শব্দের দ্বিতীয় অক্ষরে ساكن হবে। আর তা হল اسم (বিশেষ্য)। কেউ বলেন যে, الحرة শব্দের অর্থ হল اشد الندامة অতিশয় লজ্জিত হওয়া। সুতরাং যদি কেহ আমাদের প্রশ্ন করে যে, فكيف يرون اعمالهم حسرات عليهم তাদের কার্যাবলী তাদের উপর কিভাবে অনুতাপের বিষয় হিসেবে প্রদর্শন করানো হবে ? কেননা, লজ্জাকারী তো শুধু ভাল কাজ পরিত্যাগ করা এবং ছুটে যাওয়ার কারণে লজ্জিত হবে। আর নিশ্চিতভাবে জানে যে, কাফিরদের এমন কোন ভাল কাজে নেই যার অধিকাংশ পরিত্যাগের জন্য তারা লজ্জিত হবে। বরং তাদের সকল কাজই মহান আল্লাহ্র নাফরমানীতে পরিপূর্ণ। কাজেই তাতে তাদের পরিতাপের কোন কারণ নেই। আক্ষেপ হতে পারে কেবল ঐ সব কাজের ব্যাপারে যা তারা মহান আল্লাহ্র আনুগত্যমূলক কাজ হিসেবে সম্পাদন করেনি। কেউ বলেল যে, মুফাসসীরগণ তার ব্যাখ্যার ব্যাপারে একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। কাজেই ঐ ব্যাপারে তাঁরা যা বলেছেন, তা আমরা যথাস্থান উল্লেখ করবো। তারপর এর উৎকৃষ্ট تاويل (ব্যাখ্যার) বিষয়েও আমরা ইন্‌শা আল্লাহ্ খবর প্রদান করবো। সুতরাং তাদের একদল লোক বলেন যে, এমনিভাবে তাদের ঐ সব কার্যাবলী আল্লাহ্ তা'আলা প্রদর্শন করবেন, যা তাদের জন্য পৃথিবীতে ফরয করে দেয়া হয়েছিল। তারপর তারা তা পরিত্যাগ করেছে ; এবং কখনও বাস্তবায়িতও করে নাই। পরিশেষে তাদের জন্য যা কিছু নির্ধারণ করার তা তিনি নির্ধারণ করে রেখেছেন। যদি তারা ইহলৌকিক জীবনে নিজ নিজ প্রতিপালকের আনুগত্য করতো ! তবে তাদের ব্যতীত অন্যান্যরা নিজ প্রতিপালকের আনুগত্য করে, যে সব সুন্দর বাসস্থান এবং অপূর্ব নিয়ামতপ্রাপ্ত হবে– তা তারাও প্রাপ্ত হতো। কিন্তু তারা তা পরিত্যাগ করে সে সব পুণ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে, যা আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য নিজের কাছে সংরক্ষণ করে রেখেছেন। দোযখে প্রবেশের সময় তারা তা

অবলোকন করে লজ্জাভরে ও আক্ষেপ করে বলবে, যদি তারা পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করতো–! তবে কতই না উত্তম হতো।

যাঁরা উল্লিখিত অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তাঁদের স্বপক্ষে নিম্নের হাদীস উল্লেখ করা হল।

সূদ্দী (র.) থেকে كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, ধারণা করা হয় যে, বেহেশত তাদের সামনে তুলে ধরা হবে। তারপর তারা সে দিকে দৃষ্টিপাত করে বেহেশত–বাসীদেরকে প্রত্যক্ষ করবে এবং আশাপোষণ করবে যে, তারা যদি আল্লাহ্‌র আনুগত্য করতে! তবে কতই না মঙ্গল হতো ! অতএব, তাদেরকে তখন বলা হবে, উহাই তোমাদের বাসস্থান হতো যদি তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য করতে–তারপর তা মু'মিনদের মাঝে বন্টিত হবে। সুতরাং তাদেরকেই তার উত্তরাধিকারী করা হবে। তখন তারা (তা অবলোকন করে) লজ্জিত হবে।

মুহাম্মদ ইবনে বাশার সূত্রে উল্লিখিত আয়াতের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন যে, প্রত্যেক আত্মাই (কিয়ামত দিবসে) বেহেশতের বাসস্থান এবং দোযখের বাসস্থান অবলোকন করবে। তাই হল يوم الحسرة আক্ষেপ দিবস। রাবী বলেন, দোযখবাসীরা বেহেশতবাসীদের সুখবর অবস্থা অবলোকন করবে। তারপর তাদেরকে বলা হবে, যদি তোমরা (আল্লাহ্‌র নির্দেশ মত) আমল করতে তবে তোমরাও এরূপ সুখের অধিকারী হতে। অতএব এতে তাদের খুবই অনুতাপ হবে। রাবী বলেন, তারপর বেহেশতবাসীরা দোযখবাসীদের বাসস্থান অবলোকন করবে। তখন তাদেরকে বলা হবে যদি আল্লাহ্ তোমাদের উপর অনুগ্রহ না করতেন, তবে তোমাদের অবস্থাও তদ্রূপ হতো।

যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কিভাবে তাদেরকে ঐ সমস্ত কাজের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হল যা তারা আমল করেনি ? প্রতি উত্তরে বলা হবে যেমন কোন ব্যক্তির উপর কোন কাজ সম্পাদনের দায়িত্ব প্রদান করা হল এবং তা তার সম্পাদনের পূর্বেই তাকে বলা হল এটা তোমার কাজ। এর মর্মার্থ এই কাজ সম্পাদন করা তোমার উপর অত্যাবশ্যকীয়। আরো যেমন কোন ব্যক্তির জন্য খাদ্য সামগ্রী উপস্থিত করে তার খাদ্য গ্রহণের পূর্বেই বলা হল ইহা তোমার অদ্যকার খাদ্য। এর মর্মার্থ আজকের দিনে তুমি যা খাবে তাই এই খাদ্য। এমনিভাবেই বর্ণিত হয়েছে আল্লাহ্‌র কালাম– كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ এর মর্মার্থ হল كذلك يريهم الله اعمالهم التى كان لازمالهم العمل بها فى الدنيا حسرات عليهم এমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কাছে ঐ সব কার্যাবলী উপস্থাপন করবেন, যা তাদের জন্য পৃথিবীতে অত্যাবশ্যকীয়ভাবে করণীয় ছিল। তাই তাদের জন্য আক্ষেপের বিষয় হয়ে দাঁড়াবে।

অন্যান্য মুফাসসীরগণ বলেন, উল্লিখিত আয়াতের মর্মার্থ হলো "এমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মন্দ কাজগুলো তাদের সামনে প্রদর্শন করবেন, যা তাদের জন্য আক্ষেপের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তখন তারা ভাববে কেন তারা তা করেছিল? এবং কেন তারা এর বিপরীত ভাল কাজ করে নি? যাতে আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হতেন। যারা এরূপ বলেছেন, তাঁর স্বপক্ষে নিম্নের হাদীস উল্লেখ করা হল।

মুসান্না সুত্রে রাবী থেকে- كَذٰلِكَ يُرِيْهِمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের মন্দ কার্যাবলীই কিয়ামত দিবসে তাদের জন্য আক্ষেপের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

ইবন যায়েদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি আল্লাহ্র এই বাণী- اَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ সম্পর্কে বলেন, তাদের মন্দ কার্যাবলী যাদ্দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করবেন, তা কি তাদের জন্য আক্ষেপের বিষয় নয়? রাবী বলেন, বেহেশতবাসীর কার্যাবলী তাদের জন্য সুফল দেবে। এরপর তিনি আল্লাহ্র এই কালাম পাঠ করেন- بِمَا اَسْلَفْتُمْ فِى الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ (অর্থাৎ তোমাদের পরকালীন এই সুখময় জীবন তোমাদের অতীত দিনসমূহের। কষ্টের বিনিময়ে প্রাপ্ত হয়েছে। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আয়াতের উল্লিখিত দু'টি ব্যাখ্যার মধ্যে ঐ ব্যক্তির ব্যাখ্যাটাই অধিক উত্তম যিনি আল্লাহ্র এই বাণী- كَذٰلِكَ يُرِيْهِمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ সম্পর্কে বলেছেন যে, এমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের মন্দ কাজগুলো তাদের উপর আক্ষেপের বিষয় হিসেবে প্রদর্শন করবেন। তারা তখন ভাববে কেন তারা এইরূপ মন্দ কাজ করেছিল এবং কেন তার বিপরীত ভাল কাজ করেনি। অতএব, তাদের এইরূপ মন্দ কাজগুলো পরিত্যক্ত হওয়ার পর যখন তারা আল্লাহ্র পক্ষ হতে এর প্রতিদান এবং তাঁর শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তারা লজ্জিত হবে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা পূর্বেই খবর দিয়ে রেখেছিলেন যে, তিনি তাদের কার্যাবলী দুঃখজনকভাবে তাদের প্রতি প্রদর্শন করবেন। অতএব, আয়াতের উত্তম ব্যাখ্যা তাই যা প্রকাশ্য আয়াতে প্রতিয়মান হয়। বাতিনী ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করে নয়। কেননা, এর গোপনীয় অর্থ হতে পারে-এ কথার উপর কোন দলীল প্রমাণ নেই। আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে সূদ্দী (র.) যা বলেছেন-তা বিতর্কমূলক অনেক দূরের কথা। এর উপরও কোন দলীল নেই। অতএব, উল্লিখিত কথার উপর দলীল প্রতিষ্ঠিত হলে অবশ্য গ্রহণযোগ্য হতো। আর প্রকাশ্য আয়াতের ব্যাখ্যার উপর কোন প্রমাণের প্রয়োজন নেই। কেননা তার উদ্দেশ্য একেবারেই স্পষ্ট। যদি বিষয়টি এমনই হয় তবে প্রকাশ্য আয়াতের বাতিনী ব্যাখ্যা বৈধ নয়।

মহান আল্লাহ্র বাণী-وَ مَاهُمْ بِخَارِجِيْنَ مِنَ النَّارِ "এবং কখনও তারা দোযখ হতে বের হতে পারবে না।" আল্লাহ্ তা'আলা উল্লিখিত আয়াত দ্বারা বুঝিয়েছেন যে, আমি ঐসব কাফিরদের যে, সব কর্মকান্ডের কথা ইতিপূর্বে বর্ণনা করলাম, তারা যদি আল্লাহ্ পাকের আযাব প্রত্যক্ষ করার পর নিজে দের মন্দ কার্যাবলীর জন্য একান্তভাবে লজ্জিত এবং অনুতপ্তও হয় ; এবং পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন ও তাদেরকে পথভ্রষ্টকারী নেতৃস্থানীয়, অনুকরণীয়, অনুসরণীয় ব্যক্তিদের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশের আশাও পোষণ করে তথাপি তারা দোযখ থেকে কস্মিনকালেও বের হতে পারবে না। পৃথিবীতে মহান আল্লাহ্র সাথে কুফরী করে পরকালে এর জন্য লজ্জিত হলে আল্লাহ্ পাকের শাস্তি থেকে কখনও মুক্তি পাবে না। বরং তারা তথায় অনন্তকাল থাকবে। এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, যারা আল্লাহ্ পাককে অবিশ্বাস করে ধারণা করেছিল কাফিররা দোযখবাসী হয়েও আল্লাহ্ পাকের

শাস্তি থেকে মুক্তি পেতে পারে, উল্লিখিত আয়াত এ কথার পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত কাফিরদের সম্পর্কে চূড়ান্তভাবে খবর দিয়েছেন যে, তারা কস্মিনকালেও দোযখ থেকে বের হতে পারবে না। কাজেই, তারা সেখানে সীমাহীনভাবে অনন্তকাল। অবস্থান করবে। মহান আল্লাহ্‌র বাণী–

يَا اَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلاَلاً طَيِّبًا وَّ لاَ تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّمُّبِيْنٌ –

অর্থ ঃ "হে মানবজাতি পৃথিবীতে যা কিছু হালাল ও পাক খাদ্যবস্তু রয়েছে, তা থেকে তোমরা আহার করো এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" (সূরা বাকারা ঃ ১৬৮)

আল্লাহ্ তা'আলা উল্লিখিত আয়াতের দ্বারা বুঝিয়েছেন যে, হে মানবমন্ডলী ! আমি আমার রাসূল মুহাম্মদ–এর ভাষায় তোমাদের জন্য যে, সব খাদ্যসামগ্রী বৈধ করে দিয়েছে, তা তোমার ভক্ষণ কর। অতএব, আমি তোমাদের জন্য যে সব জলজ ও স্থলজ, চতুষ্পদ ইত্যাদি প্রাণী বৈধ করে দিয়েছি, তোমরা স্বেচ্ছায় তা নিজেদের জন্য হারাম করে দিয়েছ। অথচ আমি তা তোমাদের জন্য হারাম করিনি। কিন্তু যেসব প্রাণীও খাদ্যসামগ্রী আমি তোমাদের উপর হারাম করেছি তা হল মৃতজন্তু, রক্ত, শূকরের গোশ্‌ত এবং আমি ছাড়া অন্যের নামে যে সব প্রাণী বধ করা হয়েছে ইত্যাদি। সুতরাং তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করা পরিত্যাগ কর, কেননা সে তোমাদেরকে ধ্বংস করবে এবং বিপজ্জনক স্থানে পৌঁছাবে। তোমাদের জন্য বৈধ সম্পদকে হারাম ঘোষণা দেবে। অতএব, তোমারা তার অনুসরণ করো না এবং তার কথা মত কাজও করো না। আল্লাহ্‌র বাণী– اِنَّهُ দ্বারা শয়তানকে বুঝানো হয়েছে। اِنَّهُ এর মধ্যে هَاء সর্বনামটি দ্বারা শয়তানকে বুঝিয়েছে। لَكُمْ অর্থ হে মানবমন্ডলী, তোমাদের জন্য শয়তান প্রকাশ্য শত্রু। অর্থাৎ তোমাদের জন্য তার শত্রুতা প্রকাশ পেয়েছে–তোমাদের পিতা আদমের প্রতি সিজদার নির্দেশের সময়কাল থেকে এবং আদমের প্রতি শয়তানের অহংকারের কারণে। অবশেষে সে তাঁকে বেহেশত থেকে বের করলো এবং একটি ভুলের সাথে তাকে জড়িয়ে পদস্খলন ঘটালো। তিনি একটি নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করলেন। আল্লাহ্ তা'আলা ঐ ঘটনার কথা উল্লেখ করে বলেন যে, হে মানবমন্ডলী ! তোমার তার উপদেশে গ্রহণ করো না, যার শত্রুতা–তোমাদের জন্য প্রকাশ পেয়েছে এবং সে তোমাদেরকে যে নির্দেশ প্রদান করে তা তোমরা ত্যাগ কর। আমি তোমাদেরকে যে বিষয়ের প্রতি আদেশ ও নিষেধ করেছি এবং যা কিছু আমি তোমাদের জন্য হালাল ও হারাম করেছি, তাতে তোমরা আমার আনুগত্য কর। কিন্তু তোমরা এর বিপরীত আমার হালালকৃত বস্তুসমূহ তোমাদের উপর স্বেচ্ছায় হারাম করেছ এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তার আনুগত্য করাকে তোমরা হালাল মনে করেছ। আল্লাহ্ পাকের বাণী– حَلاَلاً

এর অর্থ طلقا বা স্বাধীনভাবে কোন কাজ করার অনুমতি। ইটা مصدر মাসদার। যেমন কোন ব্যক্তির উক্তি قد حل لك هذا الشئى (তোমার জন্য এই বস্তুটি বৈধ)। অর্থাৎ তোমার জন্য এ কাজটি ইচ্ছাধীন হয়ে গেল। অতএব, এর অর্থ দাঁড়াল এ কাজটি তোমার জন্য বৈধ আরবী ভাষায় حِلٌّ শব্দের অর্থ طلق বা স্বাধীনভাবে কোন কাজ করার অনুমতি। আল্লাহ্‌র বাণী– طَيِّبًا এর অর্থ পবিত্র নাপাক নয় এবং নিষিদ্ধ নয়। الخطوات শব্দটি خطوة শব্দের বহুবচন। الخطوة শব্দের অর্থ পথচারীর পদচিহ্ন। الخوة শব্দটির خاء অক্ষরে যবর যোগে পাঠ করলে এর অর্থ হবে একবার পদ ফেলার কাজ করা। যেমন কোন ব্যক্তির উক্তি خطوت خطوة واحدةً "তুমি একবারই পদ ফেলেছ। الخطوة শব্দের বহুবচন হয় خطاءًএবং الخطوات এর বহুবচন خُطُوَاتٌ ও خطاءً (পদাঙ্কসমূহ) শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণের নিষেধ করার অর্থ হলো, "শয়তানের পথ এবং তার কার্যক্রমের প্রতি নিষেধ করা, যেদিকে সে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করার বিরুদ্ধে আহবান করে থাকে"।

মুফাস্‌সীরগণ الخطوات শব্দের ব্যাখ্যায় মতবিরোধ করেছেন। কেউ বলেন যে, خطوات الشيطان এর অর্থ তার কার্যাবলী।

যাঁরা এ মত পোষণ করেনঃ

ইব্‌নে আব্বাস (রা.) থেকে আল্লাহ্‌র বাণী– خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন যে, এর অর্থ তার কার্যাবলী। আর অন্যান্য তফসীরকারগণ বলেন, خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ এর অর্থ তার ভ্রান্তনীতিসমূহ।

যাঁরা এই মত পোষণ করেন ঃ

মুজাহিদ থেকে خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন যে, এর অর্থ তার ভ্রান্তনীতিসমূহ।

মুজাহিদ থেকে অন্য সূত্রেও একই অর্থ বর্ণিত হয়েছে।

কাতাদা থেকে আল্লাহ্‌র বাণী– وَ لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন যে, এর অর্থ তার ভ্রান্তনীতিসমূহ।

যাহ্‌হাক থেকে আল্লাহ্‌র বাণী এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন যে, এর অর্থ শয়তানের ঐ ভ্রান্তনীতিসমূহ যাদ্বারা সে আদেশ–নিষেধ করে থাকে। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন যে, خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ এর অর্থ তার আনুগত্য করা। যারা এই মত পোষণ করেন ঃ

সাদী থেকে, وَ لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন যে, এর অর্থ

তার আনুগত্য করা। অন্যান্য তফসীরকারগণ বলেন خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ এর অর্থ অন্যায় কাজের জন্য দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করা।

যাঁরা এই মত পোষণ করেন ঃ

মুজাহিদ থেকে আল্লাহ্‌র বাণী– وَ لاَ تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন যে, এর মর্মার্থ গোনাহ্‌র কাজে ইচ্ছা পোষণ করা। আল্লাহ্‌র বাণী– خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে আমি যা উল্লেখ করলাম–তন্মধ্যে পরস্পরের ব্যাখ্যা প্রায় কাছাকাছি। কেননা এ সম্পর্কে প্রত্যেকের বক্তব্য দ্বারা শয়তানের এবং তার পদাঙ্ক অনুসরণের প্রতি নিষেধের ইঙ্গিত প্রেরণ করা হয়েছে। কিন্তু শব্দের প্রকৃত অর্থ –'পথচারীর পদাঙ্ক' যা আমি ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি, এটাই পরে "তার কার্যক্রম এবং 'পথ'–বা 'নীতি' অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে, যা আমি এইমাত্র বর্ণনা করলাম।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী–

اِنَّمَا يَأْمُرُ كُمْ بِالسُّوْءِ وَ الْفَحْشَاءِ وَ اَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللهِ مَالاَ تَعْلَمُوْنَ –

অর্থ ঃ "সে তো কেবল তোমাদেরকে মন্দ ও অশ্লীল কাজের এবং আল্লাহ্ সম্বন্ধে তোমরা জান না এমন সব বিষয় বলার নির্দেশ দেয়।" (সূরা বাকারা ঃ ১৬৯)

আল্লাহ্ পাকের উল্লিখিত বাণীর মর্মার্থ হল, নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদেরকে নির্দেশ করে অন্যায় ও অশ্লীল কাজের বিষয় এবং তোমারা যেন আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন সব কথাবার্তা বল যে সম্বন্ধে তোমরা অবগত নও। السوء শব্দের অর্থ الاثم পাপ বা দুষ্কার্য। যেমন الضر ক্ষতিকারক বিষয়। যথা কোন ব্যক্তির উক্তি ساءك هذا الامر এই কাজটি তোমাকে ক্ষতি করেছে। يسوءك سؤا এর অর্থ ما يسؤ الفاعل কর্তাকে যে কার্যে ক্ষতি করে। و الفحشاء শব্দটি مصدر (মাসদার) তা এবং و السراء الضراء শব্দের মত। তা এমন কাজ যার উল্লেখ করাই লজ্জাজনক এবং অশ্রাব্য। বলা হয়, আল্লাহ্ পকের উল্লিখিত আয়াতে السوء শব্দের অর্থ আল্লাহ্ পাকের অবাধ্যতা। যদি তাই হয় তবে আল্লাহ্ তা'আলার নিষিদ্ধ কাজকে سوء বলার কারণ হল মন্দকাজ যে করে তার পরিণাম মহান আল্লাহ্‌র দরবারে তাকে লজ্জিত করবে। বলা হয়ে থাকে যে, الفحشاء শব্দের মর্মার্থ الزنا ব্যাভিচার। কেননা, তা এখন যা শুনতে খারাপ শুনায়। এ কাজ সবার নিকট ঘৃণীত।

যারা এমত পোষণ করেন, তাদের বক্তব্য ঃ

হযরত সুদ্দী (র.) থেকে এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, উক্ত আয়াতে سوء এর অর্থ পাপ।

শব্দের অর্থ الفحشاء শব্দের অর্থ الزنا ব্যভিচার।

মহান আল্লাহ্র বাণী- اَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ এর মর্মার্থ তারা স্বেচ্ছায় যে সব বাহীরা, সায়িবা, ওয়াসীলা এবং 'হাম' জাতীয় প্রাণীকে হারাম বলে ঘোষণা করেছে, আর ধারণা করেছে যে, ঐসব আল্লাহ্ তা'আলা হারাম করেছেন। অতএব, আল্লাহ্ তা'আলা-তাদের জন্য একথার উল্লেখপূর্বক ইরশাদ করেন ঃ

مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ وَّلَا سَائِبَةٍ وَّلَا وَصِيْلَةٍ وَّلَا حَامٍ وَّلٰكِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَاَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ "আল্লাহ্ কখনও বাহীরা,[১] সায়িরা,[২] ওয়াসীলা[৩] এবং হাম[৪] জাতীয় প্রাণী ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ করেন নি, বরং অবিশ্বাসীরাই আল্লাহ্র উপর মিথ্যারোপ করেছে, আর তাদের অধিকাংশই বুঝে না।" (সূরা মায়িদা ঃ ১০৩) আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে ঘোষণা করেছেন যে, তারা বলে থাকে যে, আল্লাহ্ তা হারাম করেছেন, এরূপ বক্তব্য আল্লাহ্র উপর মিথ্যারোপ ব্যতীত কিছু নয়,- যা বলার জন্য শয়তানই তাদেরকে প্ররোচনা দিয়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ বৈধ করেছেন এবং ঐসব বস্তু ভক্ষণ করতে নিষেধ করেননি। তারা অজ্ঞতাবশত মহান আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যারোপ করে। তারা শয়তানের অনুগত হয়ে এসব করে। তারা তাদের মূর্খ পথভ্রষ্ট পূর্ব পুরুষদের অনুসরণ করে এবং আল্লাহ্ পাকের পথ থেকে তাঁর প্রিয় রাসূলের প্রতি যা নাযিল হয়েছে তা অস্বীকার করে। এভাবে তারা হয়েছে সীমালংঘনকারী ও পথভ্রষ্ট। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা পাক কুরআনে ইরশাদ করেছেন-

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَاءَنَا اَوَلَوْ كَانَ اٰبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ -

অর্থ ঃ "যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন, তা তোমরা অনুসরণ কর, তারা বলে, না না বরং আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যাতে পেয়েছি, তার অনুসরণ করবো, এমনকি তাদের পিতৃপুরুষরা যদিও কিছুই বুঝতো না এবং তারা সৎপথেও ছিলো না, তথাপিও ? (সূরা বাকারা ঃ ১৭০)

ব্যাখ্যা ঃ এই আয়াতের দু' রকম ব্যাখ্যা হতে পারে। একটি হল ঃ

টিকা

১. বাহীরা-যে জন্তুর দুধ প্রতীমার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হত।

২. সায়িবা-যে জন্তু প্রতীমার নামে ছেড়ে দেয়া হত।

৩. ওয়াসীলা-যে উষ্ট্রী উপর্যুপরি মাদী বাচ্চা প্রসব করতো, তাকেও প্রতীমার নামে ছেড়ে দেয়া হত।

৪. হাম-যে নর উট দ্বারা বিশেষ সংখ্যক প্রজননের কাজ নেয়া হয়েছে, তাকেও প্রতীমার নামে ছেড়ে দেয়া হত।
উপরোক্ত জন্তুগুলোকে কোনো কাজে লাগানো তাদের নিষিদ্ধ ছিল।

আল্লাহ্‌র বাণী-وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ এর মধ্যে هُمْ সর্বনামের প্রত্যাবর্তন স্থল হল-مَنْ এর দিকে, যা আল্লাহ্‌র বাণী- وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا এর মধ্যে অবস্থিত। অতএব, তখন আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে-"মানবমন্ডলীর মধ্য থেকে যারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য উপাস্যকে অংশীদার সাব্যস্ত করে, যখন তাদেরকে বলা হয় যে, তোমরা আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন-তার অনুসরণ কর, তখন তারা বলে কক্ষণই না ; বরং আমরা তারই অনুসরণ করব যা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে পেয়েছি।

অপর ব্যাখ্যাটি হল-আল্লাহ্‌র বাণী-وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمُ এর মধ্যকার هُمْ সর্বনাম উল্লিখিত النّاس এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে, যা আল্লাহ্‌র বাণী-يَا اَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا এর মধ্যে অবস্থিত। তখন তা خطاب (উপস্থিত) থেকে غائب (অনুপস্থিত) এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। যেমন এইরূপ বাক্যের প্রয়োগ উল্লিখিত হয়েছে আল্লাহ্‌র বাণী-حَتّٰى اِذَا كُنْتُمْ فِى الْفُلْكِ وَ جَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْحٍ طَيِّبَةٍ এর মধ্যে। আমার নিকট উল্লিখিত আয়াত لَهُمْ এর মধ্যকার هُمْ সর্বনামের প্রত্যাবর্তন স্থল উল্লিখিত النّاس এর দিকে হবে বলে সঠিক মনে হয়। আর তা خطاب (উপস্থিত) থেকে غائب (অনুপস্থিত) এর দিকে প্রত্যাবর্তিত। কেননা, তা আল্লাহ্‌র বাণী- يَا اَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ এরপরে অবস্থিত। অতএব, তা তাদের (خبر) খবর (বিধেয়) হিসাবে হওয়া অধিক উত্তম, مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا এর (خبر) খবর হওয়ার চেয়ে। যদিও উভয় আয়াতের মধ্যে এতদভিন্ন নতুন ঘটনাবলী সংযোজিত হয়ে যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হয়েছে। উল্লিখিত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে-ইয়াহুদীদের একদল লোকের প্রতি, যখন তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের জন্য আহবান জানানো হল, তখন তারা তা বলেছিল।

এ সম্পর্কে ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আহলে কিতাবের অন্তর্গত একদল ইয়াহুদীকে যখন ইসলাম গ্রহণের প্রতি আহবান জানালেন এবং এতে উৎসাহ প্রদান করলেন ও আল্লাহ্‌র শাস্তির ভয় প্রদর্শন করলেন, তখন রাফি ইবনে খারিজা এবং মালিক ইবনে আউফ বলল; কক্ষণই না। বরং আমরা আমাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে যে রীতিনীতির উপর পেয়েছি, তারই অনুসরণ করবো। কেননা তারা আমাদের চেয়ে অধিক জ্ঞানী ও উত্তম ছিলেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত-

وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَاءَنَا اَوَ لَوْ كَانَ اٰبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا وَّ لَا يَهْتَدُوْنَ -

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে অন্যসূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এখানে রাফি ইবনে খারিজার

স্থানে আবূ রাফি ইবনে খারিজা উল্লেখ করেন। আল্লাহ্‌র বাণী–اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ এর ব্যাখ্যা হল–আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবের মধ্যে রাসূল (সা.)–এর উপর যা কিছু নাযিল করেছেন, তা তোমরা কার্যে পরিণত কর এবং তাঁর হালালকৃত বস্তুসমূহকে হালাল মনে কর ; এবং হারামকৃত বস্তুসমূহকে হারাম মনে কর। আর তাঁকে তোমরা ইমাম মনে করে তাঁর অনুসরণ কর এবং তাঁকে নেতা মনে করে–তাঁর যাবতীয় আদেশ–নিষেধের আনুগত্য কর। আল্লাহ্‌র বাণী– أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا এর মধ্যে الفينا শব্দের অর্থ–وجدنا (আমারা পেয়েছি) যেমন কোন কবি বলেন,

فَأَلْفَيْتُهُ غَيْرَ مُسْتَعْتِبٍ + وَلَا ذَاكِرِ اللَّهِ إِلَّا قَلِيلًا

অর্থ ঃ–"সুতরাং আমি তাকে তিরস্কারহীনভাবে পেলাম। আর অল্পসংখ্যক ব্যতীত আল্লাহ্‌র স্মরণকারী ছিল না।"

এখানে أَلْفَيْتُهُ এর অর্থ–وَجَدْتُهُ (আমি তাকে পেলাম) কাতাদা থেকে بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন যে, এর অর্থ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا যে বিষয়ের উপর আমরা আমাদের পিতৃপুরুষগণকে পেয়েছি।"

রাবী (র.) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। অতএব, আয়াতের মর্মার্থ হল–যখন ঐ সমস্ত কাফিরদেরকে বলা হবে যে, আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যা কিছু হালাল করেছেন, তা তোমরা খাও এবং শয়তানের পথ অনুসরণ বর্জন কর। আর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীর উপর যা নাযিল করেছেন, তার উপর আমল কর। আর তোমরা উচ্চস্বরে সত্যের দিকে আহবান কর। তখন তারা বলল, কক্ষণই না। বরং আমাদের পিতৃ–পুরুষরা যেসব বস্তু হালাল হিসেবে হালাল মনে করেছে এবং হারাম হিসেবে হারাম মনে করেছে, তারই আমরা অনুসরণ করবো। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্পর্কে ঘোষণা করেন– أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ অর্থাৎ এ কাফিরদের পূর্ব–পুরুষরা যারা মহান আল্লাহ্‌র নাফরমানীতে আজীবন মত্ত ছিলো, তারা তো আল্লাহ্ পাকের দীন এবং তাঁর তরফ থেকে আরোপিত ফরযসমূহ ও তাঁর আদেশ–নিষেধ সম্পর্কে কিছুই বুঝতো না। তাদের পূর্ব–পুরুষেরা যে পথে চলেছে তারা তাদেরই অনুসরণ করে এবং তাদের কার্যাবলীর অনুসরণ করে থাকে। তাদের পূর্ব–পুরুষরা সুপথগামী ছিল না, তাই তারাও সুপথ পায়নি এবং পাবেও না। অথচ, তারা তাদের ধারণায় সত্য ধর্মের অন্বেষণই পূর্ব–পুরুষদের অনুসরণ করে চলেছে। তারা তাদের পথভ্রষ্টতাকেই সত্য ও সঠিক মনে করতো। আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের সম্পর্কে ঘোষণা করেন, হে লোক সকল ! তোমরা তোমাদের পূর্ব–পুরুষদেরকে যে ভ্রান্ত নীতির উপর পেয়েছ, এর অনুসরণ কিভাবে করবে ? আর তোমাদের প্রতিপালক যা আদেশ করেছেন, তা কিভাবে পরিত্যাগ করবে ? তোমাদের পূর্ব–পুরুষরা তো আল্লাহ্ পাকের বিধানসমূহ সম্পর্কে কিছুই জানে না। তারা তো কখনও সত্যের সন্ধান পায়নি এবং সুপথগামীও হতে পারেনি। মানুষ তারই অনুসরণেই যে সম্পর্কে সে সম্পূর্ণ অবগত। আর মূর্খ

ব্যক্তির মূর্খতার বিষয়ে নির্বোধ ও বিবেকহীন ব্যক্তি ব্যতীত অন্যকেউ অনুসরণ করে না।

মহান আল্লাহ্র বাণী–

وَ مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَمَثَلِ الَّذِىْ يَنْعِقُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ اِلاَّ دُعَاءً وَّ نِدَاءً - صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لاَ يَعْقِلُوْنَ -

অর্থ ঃ "যারা কুফরী করে তাদের দৃষ্টান্ত হলো, যেমন কোনো ব্যক্তি এমন কিছুকে ডাকে, যে হাক–ডাক ব্যতীত আর কিছুই শোনে না। বধির, মূক, অন্ধ, সুতরাং তারা বুঝে না।" (সূরা বাকারা ঃ ১৭১)

তাফসীরকারগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। কেউ বলেন যে, আয়াতের অর্থ আল্লাহ্ পাক সম্পর্কে এবং মহান আল্লাহ্র কিতাবে বর্ণিত বিষয় সম্পর্কে যা, কিছু তাদের কাছে শোনানো হয়, সে বিষয়ে তাদের আগ্রহের অভাব এবং মহান আল্লাহ্র একত্ববাদ ও উপদেশাবলী গ্রহণ না করার প্রবণতা সম্পর্কে কাফিরদের দৃষ্টান্ত এমন পশুর ন্যায়–যখন সেটাকে আহ্বান করা হয়–তখন সে শব্দ শুনে বটে, কিন্তু তাকে কি বলা হল, সে বিষয়ে সে কিছুই বুঝে না।

এ ব্যাখ্যার সমর্থনে আলোচনা ঃ

হযরত ইকরামা (র.) থেকে মহান আল্লাহ্র বাণী–وَ مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَمَثَلِ الَّذِىْ يَنْعِقُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ اِلاَّ دُعَاءً وَّ نِدَاءً আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন যে, তারা উট এবং গাধার ন্যায়, যারা শুধু ডাকই শোনে, কিন্তু তার অর্থ বোঝে না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে– كَمَثَلِ الَّذِىْ يَنْعِقُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ এর ব্যাখ্যায় বলেন, সে (কাফির) হল ছাগল বা তার অনুরূপ প্রাণীর মত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে অন্য সনদে আল্লাহ্র বাণী–وَ مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَمَثَلِ الَّذِىْ يَنْعِقُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ اِلاَّ دُعَاءً وَّ نِدَاءً সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা হলো–উট, গাধা এবং ছাগলের ন্যায়। যদি তুমি সেগুলোর কোন একটিকে কোন কিছু বল, তবে সেগুলো সবই তোমাদের শব্দ ব্যতীত আর কিছুই বুঝতে পারে না। এমনিভাবে যদি তুমি কাফিরদেরকে কোন কল্যাণমূলক কাজের নির্দেশ কর কিংবা যদি তাকে কোন অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা কর, অথবা তাকে উপদেশ প্রদান কর, তবে সে তোমার শব্দ ব্যতীত আর কিছুই বুঝবে না। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তাদের দৃষ্টান্ত চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়, যদি তুমি তাকে আহ্বান কর–তবে সে তা শুনবে বটে, কিন্তু তুমি তাকে কি বললে সে সম্পর্কে সে কিছুই বোঝে না। এমনিভাবে কাফিরও সত্যের আওয়ায শুনে বটে, কিন্তু কিছু অনুধাবন করতে পারে না।

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে–كَمَثَلِ الَّذِىْ يَنْعِقُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, কাফিরের

দৃষ্টান্ত পশুর ন্যায়, সে আওয়ায শুনে বটে, কিন্তু বুঝে না।

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে- كَمَثَلِ الَّذِىْ يَنْعِقُ অন্য সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, তা একটি দৃষ্টান্ত যা আল্লাহ্ তা'আলা-কাফিরের জন্য বর্ণনা করেছেন। তাদেরকে যা বলা হয়-তারা তা শুনে ও তা বুঝেতে পারে না। যেমন পশুকে বিশেষ আওয়াযে আহবান করলে সে ডাক শুনে কিন্ত বুঝে না।

হযরত কাতাদা (র.) থেকে-وَ مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَمَثَلِ الَّذِىْ يَنْعِقُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ اِلاَّ دُعَاءً وَّ نِدَاءً এ আয়াতাংশ সম্পর্কে তিনি বলেন যে, কাফিরের দৃষ্টান্ত উট, ছাগলের ন্যায় তারা আওয়ায শুনে,- কিন্তু বুঝে না এবং আওয়াযের মর্মার্থ উপলব্ধি করতেও পারে না।

হযরত কাতাদা (র.) থেকে আল্লাহ্র বাণী-كَمَثَلِ الَّذِىْ يَنْعِقُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ اِلاَّ دُعَاءً وَّ نِدَاءً সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন যে, তা একটি দৃষ্টান্ত যা আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরের জন্য বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, এ কাফিরের দৃষ্টান্ত ঐ পশুর ন্যায়, সে, আওয়ায শুনে বটে, কিন্তু তাকে কি বলা হল- তা সে অনুধাবন করতে পারে না। এমনিভাবে কাফিরকেও যা বলা হয়,-তাতে তার কোন উপকার হয় না। হযরত রাবী (র.) থেকে বর্ণিত তাহল কাফিরের দৃষ্টান্ত, সে আওয়ায শুনে বটে, কিন্তু তাকে যা বলা হল তা সে বুঝে না।

হযরত ইবনে জুরাইজ (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন যে, আমি আতাকে জিজ্ঞেস করলাম, বলা হয় যে, প্রাণীরা বুঝবে না। কিন্তু আহবানকারীর আওয়ায শুনে এবং বিশেষ ধরনের আওয়াযটি বুঝে বটে তবে এর অর্থ হৃদয়াঙ্গম করতে পারে না। তিনি বলেন এমনিভাবে কাফিরদের অবস্থাও তাই। হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন, রাখাল যে বিশেষ ধরনের ডাক দেয়-তাতে অন্যান্য প্রাণীরা শুনে না। হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের দৃষ্টান্ত ঐ চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় যে, বিশেষ ধরনের আওয়াযে আহবান করলে অন্যান্য প্রাণীরা তা শুনে না।

হযরত সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, যে, তাদের দৃষ্টান্ত এমন,-যেমন কোন প্রাণীকে (বিশেষ ধরনের আওয়াযে আহবান করলে সে আহবান ও ধ্বনি ব্যতীত আর কিছু শুনে না এবং তাকে কি বলা হল-তাও সে বুঝে না। কিন্তু তুমি তাকে আহবান করলে তোমার কাছে আসবে এবং হাঁক বা ধ্বনি দিলে আবার সে চলে যাবে। ছাগলের রাখাল যদি (বিশেষ ধরনের আওয়াযে) ডাক দেয় তবে ছাগল আওয়ায শুনবে বটে, কিন্তু তাকে কি বলা হল-তা সে বুঝেবে না। শুধু হাঁক-ডাক এবং ধ্বনিটুকুই শুনবে। এমনিভাবে হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও এমন সবলোক (কাফিরদেরকে আহবান করেন, যারা তাঁর শেষ বাক্যটুকুও শুনে না। তাই আল্লাহ্ পাক ইরশাদ, করেন 'এরা হল মূক, বধির ও অন্ধ প্রকৃতির।' তাদের সম্পর্কে আমার বক্তব্য এবং অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ যা ব্যাখ্যা করেছেন, তা আমি বর্ণনা করলাম। কাফিরদের প্রতি উপদেশ এবং উপদেশকারীর দৃষ্টান্ত বর্ণিত হল। যেমন ছাগলের প্রতি (বিশেষ ধরনের আওয়াযে) আহবানকারীর আহবানের দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং কাফিরদের প্রতি উপদেশের দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছে এবং উপদেশকারীর উপদেশের বিষয়বস্তু পরিত্যাগ করা হয়েছে,

কেননা, বাক্যের প্রয়োগ পদ্ধতিই তা প্রমাণ করে। যেমন বলা হয়–اذا لقيت فلانا فعظمه تعظيم السلطان যখন তুমি অমুক ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে তখন তাকে বাদশাহর মত সম্মান প্রদর্শন করবে। এ ব্যাখ্যার মর্মার্থ সুলতানকে যেমন সম্মান প্রদর্শন করা হয়, তদ্রূপ সম্মান করা–।

যেমন কোন কবি বলেছেন ঃ

فَلَسْتُ مُسَلِّمًا مَا دُمْتُ حَيًّا + عَلٰى زَيْدٍ بِتَسْلِيْمِ الْأَمِيْرِ

অর্থ–"আমি যত দিন জীবিত থাকবো, ততদিন পর্যন্ত যাদেরকে দলপতির অভিবাদনের ন্যায় অভিবাদন করবো না"। বাক্যের মর্মার্থ যেমন আমীরের প্রতি অভিবাদন করা হয় তদ্রূপ।

সম্ভবত এই ব্যাখ্যার মর্ম এও হতে পারে যা উল্লিখিত তাফসীরকারগণ ব্যাখ্যা করেছেন যে, আল্লাহ্ ও তার রাসূলের প্রতি কাফিরদের স্বল্প বুঝের দৃষ্টান্ত, যেমন পশুদেরকে ডাকা হয়ে থাকে এর মত। পশু ধ্বনি ব্যতীত–আদেশ ও নিষেধের বিষয় কিছুই বুঝে না। যদি তাকে বলা হয়, ঘাস খাও, পানিতে নাম এ দ্বারা তাকে কি বলা হল–সে সম্পর্কে কিছুই বুঝে না ; শুধু একটি ধ্বনি। শুনতে পায়। এমনিভাবে কাফিরের স্বল্প বুঝের কারণে তার প্রতি যে আদেশ–নিষেধ হয়েছে–এর প্রতি তার মনোযোগিতা, অদূরদর্শিতা এবং অপসন্দনীয় তার দৃষ্টান্ত ঐ আহবান কৃত পশুর ন্যায় যে আদেশ–নিষেধ সম্পর্কে কিছুই বুঝে না। অতএব, বাক্যের মর্মার্থ আহবানকৃতকে–কেন্দ্র করে, আহবানকারীকে কেন্দ্র করে নয়। যেমন বনী যুবিয়ানের কবি নাবেগা বলেছেন,

وَقَدْ خِفْتُ حَتّٰى مَا تَزِيْدُ مَخَافَتِىْ + عَلٰى وَعِلٍ فِىْ ذِى الْمَطَارَةِ عَاقِلٍ

অনুরূপ অপর পংক্তিতে তিনি বলেছেন,

كَانَتْ فَرِيْضَـةً مَا تَقُوْلُ كَمَا + كَانَ الزِّنَاءُ فَرِيْضَـةَ الرَّجْمِ

কবিতার মর্মার্থ–'পাথর নিক্ষেপ করা যেমন ব্যভিচারের জন্য অত্যাবশ্যক, তেমনিভাবে ব্যভিচার করার জন্য ও পাথর নিক্ষেপ করা অত্যাবশ্যক। কারণ, শ্রোতার নিকট বাক্যের অর্থ একেবারেই স্পষ্ট।'

আরো যেমন অন্য কবি বলেছেন,–

اِنَّ سِرَاجًا لَكَرِيْمٌ مَفْخَرَةً + تَحْلٰى بِهِ الْعَيْنُ اِذَا مَا تَجْهَرَةً

উল্লিখিত কবিতার يحلى بالعين (চক্ষু দ্বারা খুলে যায়) এর মর্মার্থ تحلى به العين তা দ্বারা চক্ষু প্রসারিত হয়। আরবীভাষায় এমন দৃষ্টান্ত অগণিত আছে। যেমন তোমার বক্তব্য اعرض الحوض على الناقة এর অর্থ اعرض الناقة على الحرض উটণীকে জলাধারে অবতরণ করাও। অনুরূপ আরো বহু বাক্য রয়েছে।

অন্যান্য তফসীরকারগণ বলেন যে, আয়াতের মর্মার্থ হল যে সব কাফির প্রার্থনার বেলায় তাদের

উপাস্য ও মূর্তিসমূহকে ডাকে, কিন্তু তারা তা শুনেও না এবং বুঝেও না। তাদের দৃষ্টান্ত, ঐ সব প্রাণীর মত যাদেরকে ডাকলে ডাকের ধ্বনি ব্যতীত কিছুই শুনে না। তারা ডাক শুনে। কিন্ত ডাকের অর্থ বোঝে না। তা এমন প্রতিনিধির মত যার শব্দ শুনা যায় কিন্তু অর্থ বুঝা যায় না। অতএব, তখন বাক্যের ব্যাখ্যা হবে এমন যে, কাফিরের দৃষ্টান্ত হল যখন উপাসনার সময় তাদের উপাস্যদেরকে ডাকে, তখন তারা ডাকের কোন কিছুই বুঝে না এবং অনুধাবনও করতে পারে না। যেমন কেউ যখন কোন পশুকে ডাকে, তখন যে ডাকে সে পশুর নিকট হতে নিজের ডাকের প্রতিধ্বনি ব্যতীত আর কিছুই শুনতে পায় না। এ মতের সমর্থনে আলোচনা ঃ

হযরত ইবনে যায়েদ (র.) থেকে মহান আল্লাহ্র বাণী–وَ مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَمَثَلِ الَّذِىْ يَنْعِقُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ اِلاَّ دُعَاءً وَّ نِدَاءً সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন যে, কোন ব্যক্তি পাহাড়ের মধ্যে আওয়ায দিলে প্রতিধ্বনিত হয়ে যে শব্দ ফিরে আসে তাকে প্রতিধ্বনি বলে। অতএব, তাদের ঐ সব উপাস্যদের দৃষ্টান্ত প্রতিধ্বনিত শব্দের মত। যা তাকে কোন স্বার্থ প্রদান করবে না, আহ্বান ও ধ্বনি ব্যতীত। রাবী বলেন, আরবগণ তাকে (الصدى) প্রতিধ্বনি নামে আখ্যায়িত করেছেন। উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যাও এই تاويل ব্যাখ্যার মত হতে পারে।

অপর ব্যাখ্যাটি অন্যরূপ। যা এর অর্থের উপর নির্ভর করে রচিত। অর্থাৎ ঐ সব কাফির–যারা উপাসনার বেলায় তাদের উপাস্যদের অর্চনা করে থাকে, অথচ সে তাদের প্রার্থনা বুঝে না। তার দৃষ্টান্ত ছাগল–ভেড়াকে ডাক দিবার মত যে, সে তার ছাগলকে তার আওয়াযের অর্থ বুঝাতে পারে না। কাজেই, তার আহ্বানে কোন স্বার্থ হয় না, হাঁক–ডাক ও ধ্বনি ব্যতীত। এমনিভাবে কাফির নিজের উপাস্যের উপাসনার বেলায় শুধু তার আনুষ্ঠানিক অর্চনা এবং ডাক দেয়া ব্যতীত তার আর কিছুই স্বার্থ হয় না।

আমার কাছে উল্লিখিত আয়াতের প্রথম ব্যাখ্যাটিই অধিক পসন্দনীয়, যা হযরত আব্বাস (রা.) এবং তাঁর অনুসারিগণ বলেছেন। আর তাই হল আয়াতের সঠিক মর্মার্থ।

কাফিরদের প্রতি উপদেশ ও উপদেশ প্রদানকারীর দৃষ্টান্ত ছাগল–ভেড়াকে ডাকার মত। কেননা, সে তার আওয়ায শুনে বটে, কিন্তু কোন কথাই বুঝে না, যা আমি ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি। কাফিরদের প্রতি উপদেশাবলীর কথা উহ্য রাখার কারণ হল–এ ব্যাপারে দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। আমি এ ব্যাপারে ব্যাখ্যা প্রদান করলাম। আল্লাহ্র বাণী–مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِىْ اسْتَوْقَدَ نَارًا এর দ্বারা এবং অনুরূপ অন্যান্য আয়াতের মাধ্যমে, যার পুনরুল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। আমি আয়াতের উল্লিখিত ব্যাখ্যাটাই গ্রহণ করলাম, কারণ, আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে–বিশেষ করে ইয়াহূদীদেরকে উদ্দেশ্য করে।

আল্লাহ্র উল্লিখিত আয়াতের মর্মার্থ হল–ইয়াহূদীরা তো পুতুল পূজারী ছিল যে তারা এর উপাসনা করবে এবং মূর্তিপূজারীও ছিল না যে, তারা তার সম্মান করবে ; এবং তার উপকার ও

অনিষ্ট প্রতিরোধেরও আশা করবে। যদি বিষয়টি এমনই হয়, তবে ঐ ব্যক্তির এ আয়াতের- مثل الذى كفروا فى نداء هم الا لهة و دعائهم اياها এমন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। (অর্থাৎ "কাফিরদের উপাস্যদের উপাসনার বেলায় তাদের আহবানের দৃষ্টান্ত'' এ কথা বলার প্রয়োজন নেই)

যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, এই আয়াতের উদ্দেশ্য যে ইয়াহুদী সম্প্রদায়- এ কথার প্রমাণ কি? প্রতি উত্তরে বলা হবে যে, এই আয়াতের এবং পূর্ববর্তী আয়াতই আমাদের দলীল। কেননা এতে তাদেরকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অতএব, উভয় আয়াতের মধ্যবর্তী বক্তব্য তাদের জন্যই হওয়া, অন্যদের চেয়ে অধিক সত্য ও যুক্তি সঙ্গত। এমন কি তাদের থেকে অন্যদের প্রতি এ ঘোষণার প্রত্যাবর্তন না করার বিষয়ে প্রকাশ্য দলীলও এসেছে। যা আমরা ইতিপূর্বে প্রমাণের মাধ্যমে উল্লেখ করেছি যে, আয়াতটি তাদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে। যে হাদীসটি আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি, তা ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এই আয়াতটি তাদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে।

আমরা এই আয়াত সম্পর্কে যা বললাম, অর্থাৎ এর দ্বারা যে ইয়াহুদীদেরকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে, সে সম্পর্কে আতা থেকে নিম্নের হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

আতা (র.) থেকে বর্ণিত যে, এই আয়াতটি আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহুদীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ করেছেন।

পূর্ণ আয়াতটি হল-

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ يَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلاً فَمَا اَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ পর্যন্ত।

আল্লাহ্‌র বাণী- يَنْعِقُ (আহবান করে) অর্থাৎ রাখালের ছাগলকে ডাকা। এ সম্পর্কে কবি (اخطل) আখতালের একটি পংক্তি নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

فَانعِقْ بِضَانِكَ يَا جَرِيْرُ فَاِنَّمَا + مَنَّتْكَ نَفْسُكَ فِى الْخَلَاءِ ضَلَالاً

অর্থাৎ-ছাগলের ডাকে আওয়ায দাও।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী- صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ "মূক, বধির ও অন্ধ, তারা বুঝে না''। আল্লাহ্‌র উল্লিখিত আয়াতের মর্মার্থ হল-ঐ সব কাফির মূক, বধির ও অন্ধ। তাদের দৃষ্টান্ত ঐ পশুর মত যাকে আহবান করলে আহবান ও ধ্বনি ব্যতীত আর কিছুই শুনে না। তারা সত্য থেকে বধির, কেননা তারা তা শুনে না। তারা মূক-অর্থাৎ সত্য ও সঠিক কথা এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলীর যথার্থতা স্বীকার করা এবং এর ব্যাখ্যা প্রদান করার বিষয়ে তারা নির্বাক। তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র নির্দেশ ছিল যে, তোমরা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নির্দেশাবলী মানুষের কাছে বর্ণনা কর। কিন্তু তারা এ সম্পর্কে মানুষের কাছে কোন কথা বলে না এবং কোন ব্যাখ্যাও প্রদান করে না। তারা সুপথ ও সত্য পথ থেকে অন্ধ। অতএব, তারা তা দেখে না।

কাতাদা (র.) থেকে আল্লাহ্‌র বাণী- صُمٌّ - بُكْمٌ - عُمْىٌ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন যে,

তারা সত্য বিষয় থেকে বধির। অতএব, তারা তা শ্রবণ করে না, এর দ্বারা কোন স্বার্থও উদ্ধার করে না। অতএব, তারা তা দেখে না। সত্য থেকে তারা নির্বাক। অতএব, তারা সত্য কথা বলে না।

সাদী থেকে- عُمْیٌ - بُكْمٌ - صُمٌّ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন যে, তারা সত্য থেকে বধির, নির্বাক ও অন্ধ।

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে- عُمْیٌ - بُكْمٌ - صُمٌّ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন যে, তারা হিদায়াতের বিষয় শ্রবণ করে না, তা দেখে না এবং তা হৃদয়ঙ্গমও করে না। আল্লাহ্র বাণী এর মধ্যে পেশ হয়েছে, কেননা, তা বাক্যের প্রারম্ভে এসেছে। جمله استئنافيه তে এরূপই হয়। আল্লাহ্র বাণী- فَهُمْ لاَ يَعْقِلُوْنَ এর অর্থ যেমন কথায় বলে-সে বধির, শুনে না, সে মূক, কথা বলে না।

মহান আল্লাহ্র বাণী-

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ

অর্থ ঃ "হে মু'মিনগণ, তোমাদেরকে আমি যে সব পবিত্র বস্তু উপজীবিকা হিসেবে প্রদান করেছি, তা তোমরা আহার কর এবং আল্লাহ্র নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, যদি তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করে থাক।" (সূরা বাকারা ঃ ১৭২)

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا-আয়াতাংশের মর্মার্থ-হে মু'মিনগণ ! তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে সত্য বলে বিশ্বাস কর এবং আল্লাহ্র দাসত্ব স্বীকার কর এবং তাঁর অনুগত হও।

যেমন যাহ্হাক (র.) থেকে-আল্লাহ্র বাণী- يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হে মু'মিনগণ ! আমি তোমাদেরকে যে সব রিযিক দান করেছি তা থেকে উত্তম বস্তুসমূহ তোমরা আহার কর। অতএব, তোমাদের জন্য আমার হালাল কৃত বস্তুসমূহ তোমাদের ভাল লাগলো, যা তোমাদের ইতিপূর্বে নিজেরা হারাম মনে করে ছিলে। অথচ আমি ঐ সব বস্তুর পানাহার তোমাদের নিষেধ করিনি। অতএব, তোমরা এর জন্য আল্লাহ্ পাকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তিনি বলেন, তোমাদেরকে যে সব নিয়ামত রিযিক হিসেবে তিনি দান করেছেন এবং সেগুলোকে উত্তম করে দিয়েছেন, তজ্জন্য তোমরা আল্লাহ্ পাকের দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। যদি তোমরা শুধু তারই বন্দেগী কর। যদি তোমরা আল্লাহ্ পাকের অনুগত হও, তিনি আরও বলেন, তাঁর কথা যদি তোমরা শ্রবণ কর, তবে তোমাদের জন্য তিনি যে সব খাদ্য হালাল করেছেন তা খাও। আর আল্লাহ্ পাকের নিষিদ্ধ কার্যাবলীর ব্যাপারে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করা পরিত্যাগ কর।

কাফিররা অজ্ঞতার যুগে যে সব খাদ্য-দ্রব্য হারাম মনে করতো, এর কিছু সংখ্যক আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি। অথচ আল্লাহ্ পাক সেগুলো আহার করা হালাল করেছেন এবং ঐ সব বস্তুকে

হারাম মনে করে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। কেননা মূর্খতার যুগে ঐগুলো হারাম মনে করা ছিল শয়তানের আনুগত্য ও কাফির পূর্ব-পুরুষদের অনুসরণকল্পে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য যে সব বস্তু হারাম করেছেন, এর বিস্তারিত বর্ণনা ও ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী–

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلاَ عَادٍ فَلاَ اِثْمَ عَلَيْهِ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ –

অর্থ ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ মৃত জন্তু, রক্ত, শূকর গোশত এবং যার উপর আল্লাহ্র নাম ব্যতীত অন্যের নাম উচ্চারিত হয়েছে, তা তোমাদের জন্য হারাম করেছেন। কিন্তু অনন্যোপায় অথচ নাফরমান কিংবা সীমালংঘনকারী নয় তার কোন পাপ হবে না। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা বাকারা ঃ ১৭৩)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্ পাক বলেন, হে মু'মিনগণ, তোমরা নিজেদের উপর 'বাহীরা' ও 'সায়িবা' এবং অনুরূপ প্রাণী নিজেরাই হারাম করো না, যা আমি তোমাদের জন্য হারাম করিনি। বরং তোমরা তা খাও। আমি তো তোমাদের জন্য মৃত জীব, রক্ত, শূকরের গোশত এবং আমার নাম ব্যতীত অন্য নামে উৎসর্গকৃত প্রাণী ছাড়া অন্য কিছু হারাম করিনি।

আল্লাহ্ পাকের বাণী–اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ এর অর্থ **ما حرم عليكم الا الميتة** মৃত জীব ব্যতীত তোমাদের উপর অন্য কিছু হারাম করা হয়নি। **انما**একটি অব্যয়, এ জন্যই **الميتة** এবং **والدم** শব্দ দু'টিতে **نصب** (যবর) প্রদান করা হয়েছে। যখন **انما** কে অব্যয় হিসেবে ধরা হবে, তখন তাতে (যবর) ব্যতীত অন্য কোন "হরকত'' হবে না। যদি **انما** কে দু'টি অব্যয় হিসেবে গণ্য করা হয়, তবে তা **ان** থেকে পৃথক হয়ে যাবে, তখন **الميتة** এবং পরবর্তী শব্দ অবশ্যই (**مرفوعة**) পেশযুক্ত হবে। তখন আয়াতাংশের ব্যাখ্যা দাঁড়াবে **ان الذى حرم الله عليكم من المطاعم الميتة و الدم و لحم الخنزير لا غير ذلك** "নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উপর মৃত জীব, রক্ত, এবং শূকরের গোশত হারাম করেছেন, অন্য কিছু নয়''।

কোন কোন কিরাআত বিশেষজ্ঞ থেকে উল্লেখ আছে যে, তিনি এ ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করে ঐ পাঠ পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। আমি এ পাঠ পদ্ধতি বৈধ মনে করি না–যদি এর ব্যাখ্যায় এবং আরবী ভাষায় অন্য অর্থ প্রকাশ পায় ; এবং তার বিপক্ষে কিরাআত বিশেষজ্ঞগণের সম্মিলিত অভিমত ব্যক্ত হয়। কাজেই কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ সম্মিলিতভাবে যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তার প্রতিবাদ করা কারো জন্যে বৈধ নয়। যদি **حرم** শব্দের **حاء** এর মধ্যে **ضمه** (পেশ) দিয়ে পাঠ করা হয় তখন

الميتة শব্দের মধ্যে (পেশ) প্রদানের বেলায় দু'টি পদ্ধতি হবে। দু'টির একটি হল فاعل (কর্তা) তখন অনুল্লেখ থাকবে এবং انما একটির অব্যয় হিসেবে গণ্য হবে। দ্বিতীয়টি হল إن এবং ما দু'টি পৃথক অব্যয়ের অর্থ প্রকাশ করবে। আর حرم শব্দটি ما হরফের صله (সংযোজক) হবে। والميتة শব্দটি خبر খবর হিসেবে তাতে مرفوع পেশ হবে। এ কারণেই আমি তাকেও সঠিক পাঠ পদ্ধতি মনে করি না, যা আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করলাম। الميتة শব্দটিতে বিভিন্ন পাঠ পদ্ধতি রয়েছে। কেউ কেউ তাকে تخفيف (সাকিন) করে পাঠ করেছেন, তখন এর অর্থ হবে تشديد তাশদীদ দিয়ে পাঠ করলে যে অর্থ হতো, তাই। কিন্তু তবুও তাকে تخفيف করা হয়েছে, যেমন تخفيف করে পড়া হয়–و هو هين لين الهين اللين ইত্যাদি শব্দে। যেমন কোন কবি বলেছেন,

ليس من مات فاستراح بميت + انما الميت ميت الاحياء

অর্থ–"প্রকৃত পক্ষে ঐ ব্যক্তি মৃত নয়, যে মৃত্যু বরণ করেও শান্তিতে আছে। নিশ্চয়ই মৃত হল সেই ব্যক্তি, যে জীবিত অবস্থায়ই মৃত। (অর্থাৎ জীবিত অবস্থাই মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর।) কাজেই একই পংক্তিতে দু'টি لغة (পরিভাষা) একত্রিত হয়ে একই অর্থে প্রকাশ করেছে। কেউ কেউ তাকে تشديد দিয়ে পাঠ করেছেন, মূল শব্দের উপর ভিত্তি করে। তারা বলেন, মূল শব্দটি موت থেকে ميوت ছিল। কিন্তু ميوت শব্দের ياء বর্ণটি ساكن এবং واو বর্ণটি متحرك (হরকত বিশিষ্ট) হয়ে একত্রিত হয়েছে এবং ياء সাকিন (ساكن) হয়ে পূর্বে অবস্থিত থাকায় واو কে ياء দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে এবং تشديد প্রদান করা হয়েছে। অতএব, এ কারণেই উভয় ياء তাশদীদযুক্ত হয়েছে। যেমন আরবী ব্যাকরণবিদগণ অনুরূপভাবে سيد এবং جيد শব্দেও একই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। তারা বলেন, যারা تخفيف করে পাঠ করেছেন তাদের উদ্দেশ্য হল সহজভাবে মূল শব্দের উপর ভিত্তি করে পাঠ পড়া।

আমার নিকট الميتة শব্দটিতে উল্লেখিত বক্তব্য অনুসারে تشديد এবং تخفيف দ্বারা আরবের দু'টি প্রসিদ্ধ পাঠ পদ্ধতি অনুযায়ী যে কোনটিতেই পাঠ করুক না কেন যথার্থ হবে এবং ঐ কিরাআত বিশেষজ্ঞদের পাঠ পদ্ধতিও ঠিক হবে। কেননা তাতে অর্থের কোন পরিবর্তন হয় না।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী– وَ مَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّٰهِ এর মর্মার্থ–মহান আল্লাহ্‌র নাম অন্য যে সব উপাস্য এবং দেব–দেবী বা মূর্তির নামে যবেহ্ করা হয়। و ما اهل به কথাটি বলার কারণ হল–কেননা তারা যখন কোন প্রাণী যবেহ্ করার মনস্থ করতো, তখন তাদের উপাস্যদের নৈকট্য লাভের আশায়

উচ্চস্বরে উপাস্যের নাম নিয়ে যবেহ্ করতো। তখন থেকেই তাদের মধ্যে এ প্রথা প্রচলিত হয়ে আসছে। অতএব, বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক যবেহ্কারীকে উচ্চ স্বরে বিসমিল্লাহ্ বলে যবেহ করতে হবে। তা হল اهلال এর অর্থ। কাজেই, وَ مَا أُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ এর পরিপ্রেক্ষিতেই হজ্জ এবং উমরার সময় হাজীকে উচ্চ স্বরে تلبيه (তালবীয়া) পাঠ করার জন্য বলা হয়েছে। আর এ কারণেই সন্তান মাতৃগর্ভ থেকে যখন ভূমিষ্ট হয়ে চিৎকার দেয়, তখন তাকে استهلال الصبى বলা হয় এমনিভাবে বৃষ্টি যখন মাটিতে পতিত হয়ে শব্দ হয়, তখন তাকে استهلال المطر বলে। যেমন কবি আমর ইবনে কুমাইত বলেন–

ظلم البطاح له انهلال حريصة + فصفا النطاف له بعيد المقلع

ব্যাখ্যাকারগণ তাতে একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। কাজেই, তাদের কেউ কেউ বলেন যে, আল্লাহ্র বাণী– وَ مَا أُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ এর অর্থ হল–ما ذبح لغير الله আল্লাহ্ পাকের নাম ব্যতীত যা যবেহ করা হয়েছে। যিনি এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তার স্বপক্ষে নিম্নের হাদীস বর্ণিত হল।

হযরত কাতাদা (র.) থেকে وَ مَا أُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ সম্পর্কে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, এর অর্থ হল فاذبح অর্থাৎ–আল্লাহ্ পাকের নাম ব্যতীত যা যবেহ করা হয় হয়েছে। মহান আল্লাহ্র বাণী– فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ "যে ব্যক্তি অনন্যোপায় কিন্তু নাফরমান কিংবা সীমালংঘনকারী নয় তার কোন পাপ হবে না।"

ব্যাখ্যা ঃ فَمَنِ اضْطُرَّ (যে ব্যক্তি অনোন্যপায় হয়ে পড়ে) এর মর্মার্থ হল যাকে পেটের ক্ষুধায় অনন্যোপায় করে তুলেছে, তার জন্য হারামকৃত বস্তু যেমন মৃতজীব, রক্ত, শূকরের গোশত এবং যার উপর আল্লাহ্র নাম ব্যতীত অন্যের নাম উচ্চারিত হয়েছে, তা পূর্বে বর্ণিত বিশেষ অবস্থায় যা আমি বর্ণনা করেছি, সে মতে খাওয়া তার জন্য কোন পাপ হবে না। فَمَنِ اضْطُرَّ এর মধ্যে اضطر শব্দটি فعل রূপে প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়েছে। وَ غَيْرَ بَاغٍ এর মধ্যে نصب (যবর) হয়েছে পূর্ববর্তী مَنْ থেকে حال হওয়ার কারণে। এমতবস্থায় এর অর্থ দাঁড়ায় "যে ব্যক্তি নফরমান ও সীমালংঘনকারী না হয়ে, অনন্যোপায় অবস্থায় তা খায়, তখন তার জন্য তা হালাল।" কেউ বলেছেন যে, فمن اضطر এর অর্থ "কোন ব্যক্তিকে কেউ জোরপূর্বক তা খাওয়ার জন্য বল প্রয়োগ করলে যদি সে তা খায়, এমতবস্থায় তার কোন পাপ হবে না।" একথার স্বপক্ষে হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে নিম্নের হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

তিনি –فمن اضطر غير باغ و لاعاد এর অর্থ বলেছে–এমন ব্যক্তির জন্য তা বৈধ যাকে শত্রু

পাকড়াও করেছে এবং তাকে মহান আল্লাহ্র নাফরমানী করার জন্য আহবান করেছে। তাই মহান আল্লাহ্র বাণী– غير باغ و لاعاد এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে ব্যাখ্যাকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মধ্য হতে কেউ কেউ বলেন যে, غير باغ এর অর্থ–যে ব্যক্তি নিজের অস্ত্রসহ সেনাপতির (ইমামের) কোন প্রকার অত্যাচার ব্যতীত সেনাদল পরিত্যাগ করে না এবং যুদ্ধের সময় তাদের সাথে বিদ্রোহ করে সীমালংঘকারী ও পথভ্রষ্ট হয় না। যিনি এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন তাঁর স্বপক্ষে নিম্নের হাদীস বর্ণিত হল।

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, فمن اضطر غير باغ و لاعاد এর অর্থ হল–যে ব্যক্তি চোর, ডাকাত, দলত্যাগী এবং আল্লাহ্র নাফরমানীর কাজে বহির্গত নয়, অথচ অনন্যোপায় তার জন্য উল্লিখিত বস্তুসমূহ খাওয়ার অনুমতি রয়েছে।

হযরত মুজাহিদ (র.) فمن اضطر غير باغ و لاعاد থেকে সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট নয়, ইমাম বা সেনাপতির নির্দেশ অমান্যকারী নয় এবং আল্লাহ্ পাকের নাফরমানীর কাজে বহির্গত হয় নি অথচ অনন্যোপায়, এমন ব্যক্তির জন্য (উল্লিখিত বস্তুসমূহ) খাওয়ার অনুমতি রয়েছে। আর যে ব্যক্তি বিদ্রোহী কিংবা আল্লাহ্ পাকের নাফরমানীর কাজ করে সীমালংঘনকারী হয় তার জন্য (উল্লেখিত বস্তুসমূহ) খাওয়ার কোন অনুমতি নেই। যদিও সে ক্ষুধায় অনন্যোপায় হয়।

হযরত সাঈদ (র.) থেকে غير باغ و لا عاد সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন–যে ব্যক্তি বিদ্রোহ করে তার জন্য ক্ষুধার্ত অবস্থায় ও মৃত জন্তু খাওয়ার এবং তৃষ্ণার্ত অবস্থায়ও মদ্যপানের কোন অনুমতি নেই।

হযরত সাঈদ (র.) –فمن اضطر غير باغ و لاعاد থেকে সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন–সীমালংঘনকারী বিদ্রোহী হল সে ব্যক্তি যে চোর ডাকাত তাই তার জন্য (উল্লিখিত বস্তু খাওয়ার) কোন অনুমতি নেই এবং তার প্রতি কোন করুণাও নেই।

হযরত সাঈদ (র.) থেকে অন্য সূত্রে –فمن اضطر غير باغ و لاعاد সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন–যখন কোন ব্যক্তি আল্লাহ্পাকের পথসমূহের কোন এক পথে বের হয়, তারপর সেখানে সে তৃষ্ণায় কাতর হয়ে অনন্যোপায় অবস্থায় মদ্যপান করে এবং ক্ষুধার্ত অবস্থায় অনন্যোপায় হয়ে মৃত জন্তু আহার করে তখন তার কোন পাপ নেই। আর যখন পথভ্রষ্ট কিংবা বিদ্রোহী হয়–তখন তার জন্য (উল্লিখিত বস্তুসমূহ খাওয়ার) কোন অনুমতি নেই।

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন–ইমাম বা সেনাপতির প্রতি বিদ্রোহী না হলে এবং রাস্তার নিরাপত্তা বিনষ্টকারী না হলে, তবে তার জন্য অনুমতি রয়েছে।

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে– فمن اضطر غير باغ و لاعاد সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন যে, এর অর্থ হল–যে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট কিংবা বিদ্রোহী নয় এবং সেনাপতি থেকেও দলত্যাগী নয় এবং আল্লাহ্র অবাধ্যতায় বহির্গত হয়নি এমন ব্যক্তির জন্য খাওয়ার অনুমতি রয়েছে।

হান্নাদ (র.) সূত্রে মুজাহিদ (র.) থেকে– فمن اضطر غير باغ و لاعاد সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি ইমামগণের (সেনাপতিদের) প্রতি বিদ্রোহী না হয় এবং মুসাফির বা প্রবাসীদের প্রতি ছিনতাইকারী না হয় তবে তার জন্য অনুমতি রয়েছে।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ –غير باغ و لا عاد আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, এর অর্থ হল সাধারণত হারাম বস্তু খাওয়ার ব্যাপারে যে ব্যক্তি নাফরমান নয় এবং جائز বা বৈধ বস্তুসমূহের ব্যাপারেও যে ব্যক্তি সীমালংঘনকারী নয়,–আয়াতে তাদেরকেই বুঝানো হয়েছে। যে ব্যক্তি এ অভিমত পোষণ করেন তাঁর স্বপক্ষে নিম্নের হাদীস বর্ণিত হল।

হযরত কাতাদা (র.) থেকে– فمن اضطر غير باغ و لاعاد এ আয়াত সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি স্বীয় খাদ্যের ব্যাপারে নাফরমান নয় এবং হালাল বস্তুসমূহ হারামের সাথে সংমিশ্রণ করে সীমালংঘনকারী নয়, সেই ব্যক্তিই উল্লিখিত বস্তুসমূহ খাওয়ার অনুমতি পাবে।

হযরত হাসান (র.) থেকে– فمن اضطر غير باغ و لاعاد সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি বিদ্রোহী নয় এবং সীমালংঘনকারী নয়, সে শুধু তা খেতে পারবে–যদিও সে ব্যাপারে অভাবমুক্ত বা ধনীও হয়ে থাকে। হাসান (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

হযরত মুজাহিদ (র.) ও ইকরামা (র.) উভয় থেকে– فمن اضطر غير باغ و لاعاد সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, غير باغ এর ব্যাখ্যায় অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

হযরত রাবী' (র.) থেকে– فمن اضطر غير باغ و لاعاد সম্পর্কে বর্ণিত এর অর্থ হারাম বস্তু অন্বেষণ ব্যতীত এবং সীমালংঘন অনন্যোপায় হলে তুমি কি লক্ষ্য করনি যে, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَاۤءَ ذٰلِكَ فَاُولٰۤئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ তা ব্যতীত অন্য কিছু অন্বেষণ করে, তারাই হল সীমালংঘনকারী” (সূরা আল্–মু'মিনূন ঃ ৭ ও সূরা আল–মা'আরিজ ঃ ২৩)

হযরত ইবনে যায়েদ (রা.) থেকে– فمن اضطر غير باغ و لاعاد বলেছেন, এর অর্থ হল হালাল বস্তু ছেড়ে হারাম বস্তুসমূহ অন্যায়ভাবেও সীমালংঘন করে, খাওয়া হালাল বস্তু থাকা সত্ত্বেও খাওয়াই হল হারাম খেয়ে সে সীমালংঘন করে হারাম খেয়ে সে সীমালংঘন করে এবং সে অস্বীকার করেছে হালাল ও হারাম দুটি পৃথক জিনিষ অর্থাৎ হালাল ও হারাম একই।

অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ বলেন, উক্ত আয়াতাংশের অর্থ যে ব্যক্তি অনন্যোপায় হয়, তা তবে বিদ্রোহী নয় এবং সীমালংঘনকারীও নয়, তথা তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত সে গ্রহণ করে না, যাঁরা এ মত পোষণ করেন তাদের কথা ঃ

সূদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত তিনি- فمن اضطر غر باغ و لاعاد সম্পর্কে বলেন যে, باغ (নাফরমান হল) ঐ ব্যক্তি যে উল্লিখিত বস্তুসমূহ আহার করে পরিতৃপ্ত হতে চায়। আর عادي (সীমালংঘনকারী) হল-ঐ ব্যক্তি যে (মৃত জন্তু) সীমালংঘন করে. অর্থাৎ সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত না হওয়া পর্যন্ত আহার করে। কিন্তু তার শুধু জীবন রক্ষা হতে পারে-এই পরিমাণ আহার করা উচিত।

উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে যে সমস্ত বক্তব্য বর্ণিত হয়েছে তন্মধ্যে ঐ ব্যক্তির বক্তব্যই অধিক নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয় যিনি বলেছেনে- যে ব্যক্তি অনন্যোপায় অবস্থায় নাফরমান না হয়ে হারাম বস্তুসমূহ আহার করে এবং তা আহারের সীমালংঘনকারী না হয়-তার জন্য তা আহার পরিত্যাগ করা মুস্তাহাব, যদি তা ব্যতীত হালাল বস্তু পাওয়া যায়। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র উল্লেখ করেছেন যে, কোন অবস্থাতেই কোন ব্যক্তির জন্য আত্মহত্যা করার অনুমতি নেই। যদি তাই হয়-তবে এতে সন্দেহ নেই যে, ইমামের আদেশ অমান্যকারী অর্থাৎ-বিদ্রোহী এবং চোর-ডাকাত যদি তারা উভয়ে ক্ষুধা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য হারাম বস্তু খায় তবে তা বৈধ। কিন্তু যদি হারাম কাজ করার, জন্যই বের হয় এবং পৃথিবীতে অশান্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টির চেষ্টা করে তবে তা উভয়ের জন্যই অবৈধ, যা আল্লাহ্ তা'আলা উভয়ের উপর হারাম করে দিয়েছে। কিন্তু যদি তারা আত্মহত্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য জীবন রক্ষার তাগিদে তা যায় তবে তা তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা হারাম করেননি। বরং তা হবে তাদের করণীয় কাজ। আর যদি তা তাদেরকে আল্লাহ্র হারাম কাজের দিকে ধাবিত করে তবে ক্ষুধার সময় ও ইতিপূর্বের অবস্থায় তাদের জন্য যা হারাম ছিল-তা ভক্ষণের কোন অনুমতি নেই। আর যদি বিষয়টি এমনই হয় তবে চোর-ডাকাত ও ন্যায়-পরায়ণ বাদশাহর প্রতি বিদ্রোহীর জন্য আল্লাহ্র আনুগত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করা এবং স্বীয় অন্যায় কাজ থেকে তওবা করা ওয়াজিব বা অপরিহার্য। কিন্তু ক্ষুধার কারণে তাদের আত্মহত্যা করা বৈধ নয়। কেননা এতে তাদের পাপের সাথে আর একটি পাপ যোগ হবে। আর তাদের পক্ষে বিরোধিতা করা আল্লাহ্র আদেশের বিরোধিতা করার শামিল। এই কারণেই উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, তা ভক্ষণের সময় পরিতৃপ্তির সাথে ভক্ষণ করে যেন নাফরমান না হয়। আর যদি পরিতৃপ্তির সাথে ভক্ষণ করে, তবে তা মৃত্যুরোধের প্রয়োজনের তাগিদে হয়েছে বলে ধরা হবে না। কেননা এতে সে আল্লাহ্র নিষিদ্ধ কাজে প্রবেশ করল। তাই হল আয়াতের মর্ম যা আমি এর ব্যাখ্যায় বলেছি। যদিও তা বাহ্যিক শব্দার্থের পরিপন্থী। আল্লাহ্র বাণী -وَلَاعَادٍ এর নির্ভর যোগ্য ব্যাখ্যা হল-পরিতৃপ্তির সাথে মৃত জন্তুর গোশত ভক্ষণ করে যেন সীমালংঘনকারী না হয়। বরং ঐ পরিমাণ ভক্ষণ করবে, যাদ্বারা জীবন রক্ষা পায়। তাই হল খাদ্যের ব্যাপারে সীমালংঘন করার বিভিন্ন অর্থের একাংশ। কিন্তু আল্লাহ্

তা'আলা الاعتداء সীমালংঘন করার অর্থকে শুধু খাদ্যের ব্যাপারে সীমালংঘন করার অর্থের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করেননি। বরং বলা যায় যে, এর বিভিন্ন অর্থের মধ্যে তা হল একটি। যদি এর অর্থ তাই হয় তবে আমার কথাই হবে যথার্থ–যা আমি সীমালংঘনের ব্যাপারে বলেছি যেমন– الاعتداء বলতে প্রত্যেক নিষিদ্ধ কাজের মধ্যেই সীমালংঘনকে বুঝাবে।

আর আল্লাহ্‌র কালাম– فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ এর ব্যাখ্যায় বলা হয় যে, যে ব্যক্তি তা বিশেষ কারণে বিশেষ সময়ে ভক্ষণ করে যা আমরা বর্ণনা করলাম, তখন তার এইরূপ ভক্ষণ অন্যের জন্য অনুসরণযোগ্য হবে না। যদি এর অর্থ–তাই হয় তবে এতে কোন ক্ষতি নেই। মহান আল্লাহ্‌র বাণী– اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ অর্থ ঃ–"নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল পরম করুনাময়"। ব্যাখ্যা ঃ–নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল হবেন–যদি তোমরা ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নে আল্লাহ্‌র আনুগত্য প্রকাশ কর এবং তোমাদের উপর তিনি যা নিষিদ্ধ করেছেন–তা পরিহার করে চল এবং শয়তানের অনুসরণ করা পরিত্যাগ কর ; যে বিষয়ে অজ্ঞতার যুগে তোমরা শয়তানের অনুকরণ ও অনুসরণ করে নিজেরা হারাম মনে, করে নিয়েছিল যা আমি তোমাদের ইসলামী জীবনের পূর্বে কুফরী যিন্দিগীতে হারাম করিনি ; তা ছিল তোমাদের অপরাধ, পাপ এবং অবাধ্যতা। অতএব তিনি তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং তোমাদের উপর থেকে তিনি শাস্তি পরিহার করে নিয়েছেন। তিনি তোমাদের প্রতি করুণাময়–যদি তোমারা তাঁর আনুগত্য কর।

আল্লাহ্ পাকের বাণী–

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلاً – اُولٰئِكَ مَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ اِلاَّ النَّارَ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ –

অর্থঃ–"আল্লাহ্ যে কিতাব নাযিল করেছেন যারা তা গোপন রাখে ও বিনিময়ে তুচ্ছমূল্য গ্রহণ করে তারা নিজেদের জঠরে অগ্নি ব্যতীত আর কিছুই পূরে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাদের সাথে কথা বলবেন না, এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন না। তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে।" (সূরা বাকারা ঃ ১৭৪)

ব্যাখ্যা ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী–اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتَابِ এর অর্থ হল–ঐ সমস্ত ইয়াহূদী ধর্মযাজক যারা মানুষের নিকট গোপন করেছেন মুহাম্মদ (সা.)–এর শরীআতের নির্দেশাবলী এবং তাঁর নবূওয়াতের কথা, যা তারা তাদের উপর নাযিলকৃত তাওরাত কিতাবে লিখিত অবস্থায় পেয়েছিল। এই কাজটি তারা করেছে উৎকোচের বিনিময়ে–যা তাদেরকে দেয়া হত।

সাঈদ ইবনে কাতাদা (র.) থেকে–**اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتَابِ - الاية** সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, আহলে কিতাবদের উপর আল্লাহ্ তা'আলা যা নাযিল করেছেন তা তারা গোপনে করে। অথচ হযরত মুহাম্মদ (সা.)–এর নবূওয়াত এবং তাঁর নির্দেশাবলী ও সত্য বিষয়ে এবং সত্য পথ সম্পর্কে তাদেরকে পূর্বাহ্নে অবহিত করান হয়েছিল।

রাবী (র.) থেকে এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায়–**اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتَابِ** বর্ণিত যে, তারা একে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করতো। বর্ণনাকারী বলেন যে, তারা হল ইয়াহূদী সম্প্রদায়। তাদের কাছে আল্লাহ্ তা'আলা সত্য ধর্ম ইসলাম এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে যা কিছু নাযিল করেছেন, তা তারা গোপন করেছিল।

হযরত সূদ্দী (র.) থেকে–**اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتَابِ** সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা হল ইয়াহূদী সম্প্রদায়–তারা হযরত মুহাম্মদ (সা.)–এর নাম গোপন করেছিল।

হযরত ইকরামা (র.) থেকে–**اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتَابِ** সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তা সূরা–আল্–ইমরানে বর্ণিত–**اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا** উভয় আয়াতেই নাযিল হয়েছে–ইয়াহূদীদের সম্পর্কে–।

মহান আল্লাহ্র কালাম–**و يشترون به ثمنا قليلا** এর অর্থ তারা তা বিক্রয় করতো। **به** শব্দের মধ্যে **ه** অক্ষরটি **الكتمان** শব্দের দিকে প্রত্যাবর্তিত। তখন এর অর্থ হবে তারা মানুষের কাছে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর নবূওয়াতের আহকামসমূহ গোপন রেখে তুচ্ছ মূল্যে বিনিময় গ্রহণ করতো। এসব কিছু যা তাদেরকে প্রদান করা হতো তা মহান আল্লাহ্র কিতাব বিনা কারণে বিকৃত ও পরিবর্তন করার উদ্দেশ্যেই করতো। কেবলমাত্র পার্থিব সম্পদ লাভের উদ্দেশ্যই ছিল–তাদের সত্য গোপন করা। যেমন হযরত সূদ্দী (র.)থেকে – **و يشترون به ثمنا قليلا** সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা হযরত মুহাম্মদ (সা.)–এর নাম গোপন করে স্বল্প মূল্য বা তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করতো। **اشتراء** শব্দের ব্যাখ্যা আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি। এখানে এর পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

মহান আল্লাহ্র বাণী–**اُولٰئِكَ مَا يَأْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ اِلاَّ النَّارَ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ .** "তারা নিজেদের পেটে আগুন ব্যতীত আর কিছুই পুরে এবং কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাক তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।" আয়াতের মর্মার্থ হলো ঐ সমস্ত লোক,যারা কিতাবুল্লাহ্র মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে যা কিছু নাযিল করেছেন, সে বিষয়টি তাদেরকে যে উৎকোচ দেয়া হয় তার বিনিময়ে গোপন করে। এ কারণেই তারা আল্লাহ্ তা'আলার আয়াতসমূহ এবং আর

অর্থসমূহ বিকৃত ও পরিবর্তন করে। বলে তারা এ ব্যাপারে ঘুষ ও অন্যান্য বিনিময় নিয়ে যা খায় তা হল আগুনের মত। অর্থাৎ ঐ গুলোই তাদেরকে দোযখের আগুনে অবতরণ ও প্রবেশ করাবে। যেমন, অন্যত্র আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ اِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْمًا - اِنَّمَا يَأْ كُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا - "নিশ্চয় যারা ইয়াতীমদের মাল-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করে তারা তাদের উদরে আগুন ব্যতীত আর কিছু পূরে না। অচিরেই তারা দোযখে নিপতিত হবে। (সূরা নিসা ঃ ১০) এর মর্মার্থ হল-তারা তাদের উদরে যা পূরে এর ফলে তাদেরকে দোযখে দাখিল করা হবে। আয়াতে النار শব্দটির উল্লেখ অনাবশ্যক মনে করা হয়েছে, বাক্যের মমার্থ শ্রোতাদের বোধগম্যের কারণে। একই কারণে ما يورد هم او يد خلهم শব্দদ্বয়ের উল্লেখ করাও অনাবশ্যক মনে হয়েছে। এ ব্যাপারে ব্যাখ্যাকারগণ মধ্য হতে একদল লোক আমি যা বর্ণনা করলাম-এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। যাঁরা এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন তাঁদের স্বপক্ষে নিম্নের বর্ণিত হল।

রাবী (র.) থেকে- اُو لٰئِكَ مَا يَأْ كُلُوْنَ فِىْ بُطُوْ نِهِمْ اِلاَّ النَّارَا সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, এর অর্থ হল এ ব্যাপারে তারা যা কিছু বিনিময় গ্রহণ করেছে তা ; যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, উদর ব্যতীত ও কি খাদ্য গ্রহণ করা যায় ? তবে এর প্রতি উত্তরে বলা হবে যে, তাদের উদর (অগ্নি ব্যতীত) আরে কিছু গ্রহণ করে না। কেউ বলেছেন যে, আরবে এমন কথা প্রচলন আছে যে, جعت فى غير بطنى এবং وشبعت فى غير بطنى অর্থাৎ আমি আমাদের উদর ব্যতীতই ক্ষুধার্ত হলাম এবং আমার উদর ব্যতীতই তৃপ্ত হলাম-। কেউ বলেছেন যে, فى بطونهم কথাটি এ কারণেই বলা হয়েছে, যেমন বলা হয়ে থাকে- فعل فلان هذا نفسه অর্থাৎ এই কাজটি অমুক ব্যক্তি নিজেই করেছে। আর আমি তা ইতিপূর্বে অন্য স্থানেও বর্ণনা করেছি। আল্লাহ্র বাণী- وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "আর আল্লাহ্ তাদের সাথে কিয়ামত দিবসে কোন কথা বলবেন না" এর অর্থ হল তারা যা ভালবাসে এবং যা আকাঙক্ষা করে সে বিষয়ে তিনি তাদের সাথে কথা বলবেন না। সুতরাং যে বিষয় তাদেরকে পীড়া-দেবে এবং তাদের অপসন্দ হবে সে বিষয়েই তিনি তাদের সাথে অচিরেই কথা বলবেন। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কালামে এভাবে সংবাদ দিয়েছেন, কিয়ামত দিবসে যখন তারা বলবে, "হে আমাদের প্রতিপালক। আপনি আমাদেরকে এ দোজখ হতে বাহির করুন। যদি আমার তা পুনরায় করি তবে নিশ্চয় আমরা অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হবো"। তখন তিনি তাদের প্রতি উত্তরে বলবেন, "তোমরা উহাতে ক্ষতিগ্রস্থ হও এবং কোন কথা বলো না-" (সূরা মু'মিনূন ঃ ১০৭)। আর আল্লাহ্র বাণী- وَلاَ يُزَ كِّيْهِمْ এর অর্থ হল তাদেরকে আল্লাহ্ পাক তাদের পাপের এবং কুফরীর অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে-যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী–

أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلاَلَةَ بِالْهُدٰى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ - فَمَا اَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ .

অর্থ ঃ "ঐ সমস্ত লোকেরাই সুপথের বিনিময়ে কুপথ এবং ক্ষমার পরিবর্তে শাস্তি ক্রয় করেছে ; আগুন সহ্য করতে তারা কতোই না ধৈর্যশীল !" (সূরা বাকারা ঃ ১৭৫)

উল্লিখিত আল্লাহ্ পাকের বাণী– أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلاَلَةَ بِالْهُدٰى এর ঐ সমস্ত লোকেরা গোমরাহীকে গ্রহণ করেছে এবং হিদায়াত পরিত্যাগ করেছে কিয়ামতের যে কারণে আল্লাহ্ পাকের শাস্তি তাদের জন্য অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়াবে তাই তারা করেছে। আর যে বিষয় দ্বারা তাদের জন্য তাঁর ক্ষমা ও করুণা একান্তভাবে প্রাপ্য হতো তা তারা পরিত্যাগ করেছে। তাই উল্লিখিত আয়াতে আযাব মাগফিরাতের উল্লেখ করা যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। কারণ, যে বিষয়ে আযাব ও মাগফিরাতকে অত্যাবশ্যক করে এর মর্মার্থ ও উদ্দেশ্য শ্রোতাগণের জানা আছে। আর আমি এমন দৃষ্টান্তসমূহ এর আগেও বর্ণনা করেছি। এমনিভাবে হিদায়াতের পরিবর্তে গোমরাহী গ্রহণ করার কারণসমূহ ও একাধিক মত পোষণকারীগণের অভিমতসহ এ বিষয়ে আমি যে সমস্ত প্রমাণাদি উপস্থাপন করেছি তা আমি এর আগেও বর্ণনা করেছি। অতএব এখানে এর পুনরুল্লেখ করা অপসন্দনীয় মনে করি।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী– فَمَا اَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ "এরপর তারা জাহান্নামের আগুন কিরূপে সহ্য করবে"? এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বিশেষজ্ঞগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মধ্যে হতে কেউ কেউ বলেন যে, এর অর্থ হল কোন বস্তু তারেকে ঐ সমস্ত কাজ করতে সাহস যোগাল যে কাজ তাদেরকে জাহান্নামের নিকটবর্তী করবে? যাঁরা এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তাঁদের স্বপক্ষে নিম্নের হাদীস উল্লেখ করা হল।

হযরত কাতাদা (র.) থেকে–فما اصبرهم على النار সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন যে, কোন্ বিষয়ে তাদেরকে ঐ কাজ করতে হিম্মত প্রদান করলো, যে কাজ তাদেরকে জাহান্নামের নিকটবর্তী করবে ?

অন্যসূত্রে হযরত কাতাদা (র.) বলেছেন, কোন বস্তু তাদেরকে হিম্মত যোগাবে তার উপর স্থির থাকবে?

হযরত হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্‌র কসম! তাদের কি আছে দোযখের উপর স্থির থাকার মত! বরং দোযখের উপর তাদের টিকে থাকার কোন হিম্মতই হবে না।

হযরত রাবী (র.) থেকে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে যে, দোযখের উপর টিকে থাকার

তাদের কোন হিম্মত এবং ধৈর্য ধারণের ক্ষমতা হবে না।

আর অন্যান্য মুফাসসীরগণ বলেন যে, বরং তার অর্থ হবে কোন বস্তু তাদেরকে দোযখবাসীদের কার্য করতে অনুপ্রাণিত করল? যিনি এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন তাঁর স্বপক্ষে নিম্নের হাদীস বর্ণিত হল।

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, কোন্ জিনিষে তাদেরকে বাতিল কার্য করতে সাহস যোগাল?

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু ব্যাখ্যাকারগণ **فما اصبرهم على النار** এর মধ্যে "ما" এর ব্যাখ্যায় একাধিকমত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মধ্য হতে কেউ কেউ বলেছেন যে, এখানে مَا প্রশ্নবোধক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। যেন তিনি বলেছেন তারা কিভাবে দোযখের শাস্তির মধ্যে ধৈর্য ধারণ করবে? যাঁরা এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন তাঁর স্বপক্ষে নিম্নের হাদীস বর্ণিত হল।

হযরত সূদ্দী (র.) থেকে–**فما اصبرهم على النار** সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, আয়াতাংশের مَا অব্যয়টি প্রশ্নবোধক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। তখন এর অর্থ হবে যে, কোন বস্তু তাদেরকে দোযখের অগ্নির উপর ধৈর্য ধারণের ক্ষমতা দেবে ?

হযরত ইবনে জুরাইজ (র.) বলেন যে, আতা (র.) আমাকে বলেছেন–**فما اصبرهم على النار** এর অর্থ– কোন বস্তু তাদেরকে দোযখের অগ্নির উপর ধৈর্য ধারণের শক্তি দেবে, যখন তারা সত্য পথ পরিহার করেছে এবং বাতিলের অনুসরণ করেছে?

হযরত ইবনে ইয়াশ (র.) থেকে**فما اصبرهم على النار** সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন,এ আয়াত প্রশ্নবোধক, যদি **اصبر** শব্দটি **صبر** শব্দ হতে নির্গত হয়ে থাকে। তিনি বলেন যে, **فما اصبر** বাক্যটিতে তখন رفع (পেশ) (অর্থাৎ اَصْبَرَ স্থলে اَصْبَرُ) হবে। বর্ণনাকারী বলেন, বাক্যটি এমন যেন কোন ব্যক্তিকে বলা হল **ما اصبرك ما الذى فعل بك هذا** অর্থাৎ তোমার সাথে যেরূপ ব্যবহার করা হয়েছে তাতে তুমি কিভাবে সবর করবে ?

হযরত ইবনে যায়েদ (র.) থেকে–**فما اصبرهم على النار** সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, তা প্রশ্নবোধক বাক্য। কথাটি এভাবে বলা যায় যে, কোন্ বস্তু তাদেরকে দোযখের অগ্নির উপর ধৈর্য ধারণের হিম্মত যোগাবে ? যার ফলে তারা এ কাজ করতে সাহস পেয়েছে?

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন যে, তা আশ্চর্যবোধক বাক্য। অর্থাৎ তাদের কিভাবে এত অধিক সাহস হল যে, তারা দোযখেবাসীদের কার্যের ন্যায় কার্য করতে সাহস পেল !

যারা এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন ঃ

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে–فما اصبرهم على النار সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, দোযখবাসীদের কর্মের ন্যায় তাদের কর্মসমূহ কতই না দুঃখজনক! এ অভিমত হযরত হাসান (র.) এবং হযরত কাতাদা (র.)–এরও। এ কথা আমরা এর আগেও বর্ণনা করেছি। যাঁরা তা আশ্চর্যবোধক বাক্য বলেছেন তাঁদের বক্তব্য অনুসারে – أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ এর অর্থ হবে–তাদের ঐ সমস্ত কর্ম করতে কিভাবে এত সাহস হল যাতে তাদের জন্য দোযখের অগ্নি অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়াবে ! যেমন, এর উল্লেখপূর্বক আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ মানুষ ধ্বংস হোক, সে কত অকৃতজ্ঞ ! (সূরা আবাছা ঃ ১৭) এ আয়াতে "যিনি বান্দাকে সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টিকে সুসামঞ্জস্য করেছেন" তাঁরা কুফরী করাকে আশ্চর্য মনে করা হয়েছে।

আর যাঁরা উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় (استفهام) প্রশ্নবোধকের অর্থকে প্রধান্য দিয়েছেন–তাঁদের মতে আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে–"যে লোকেরাই সুপথের বিনিময়ে কুপথ এবং ক্ষমার পরিবর্তে শাস্তি ক্রয় করেছে"–তাদের কিভাবে দোযখের আগুনের উপর ধৈর্য ধারণের ক্ষমতা হবে ? দোযখ এমন স্থান যার উপর ধৈর্য ধারণের কারো ক্ষমা নেই, যতক্ষণ না তারা তাকে আল্লাহ্র ক্ষমতার দ্বারা পরিবর্তন করতে পারবে। তাই তোমরা দোযখের আগুনকে মাগফিরাত দ্বারা পরিবর্তন করিয়ে নাও। উল্লিখিত আয়াতের বিভিন্ন বক্তব্যের মধ্যে ঐ ব্যাখ্যাকারের বক্তব্যই অধিক পসন্দনীয় যিনি বলেছেন যে, "দোযখের উপর তারা কিভাবে ধৈর্যধারণের ক্ষমতা পাবে? অর্থাৎ দোযখের শাস্তির উপর তারা কিভাবে ধৈর্য ধারণের হিম্মত পাবে–যদি তাদের কার্যসমূহ দোযখবাসীদের কার্যের ন্যায় হয়? এরূপ উপমা আরবদের নিকট থেকেও শোনা যায়। যেমন, অমুক ব্যক্তি কিভাবে আল্লাহ্ পাকের উপর ধৈর্য ধারণ করবে? অর্থাৎ অমুক ব্যক্তির আল্লাহ্ পাকের উপর ধৈর্যধারণের কোন হিম্মতই নেই। প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সৃষ্ট জীবের মধ্যে ঐ সমস্ত সম্প্রদায়ের সংবাদ পরিবেশন করে আশ্চর্যবোধ করছেন যারা আল্লাহ্ পাকের নাযিলকৃত হযরত মুহাম্মদ (সা.)–এর নির্দেশাবলী ও তাঁর নবূওয়াতের কথা গোপন করেছে এবং উৎকোচ গ্রহণ করে তুচ্ছ মূল্যের বিনিময়ে তাকে বিক্রি করছে। এও আশ্চর্যের ব্যাপারে যে, তাদেরকে দেয়া উৎকোচের বিনিময়ে তারা যা করছে সে সম্পর্কে তাদের ভাল জানা আছে যে, এতে তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার গযব অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়াবে এবং তাঁর বেদনাদায়ক শাস্তি ও তাদের উপর পতিত হবে। প্রকৃতপক্ষে, তখন এর অর্থ হবে কোন্ বস্তু তাদেরকে দোযখের অগ্নির উপর ধৈর্যধারণের হিম্মত যোগাবে। এ কারণেই উল্লিখিত আয়াতের মধ্যে عذاب শব্দের উল্লেখ না করে النار শব্দের উল্লেখ করাই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। যেমন, বলা হবে – ما اشبه سخائك بحاتم তোমার দানশীলতাকে কিভাবে হাতেমের দানের সাথে তুলনা করা যায়! অর্থাৎ হাতেমের দানশীলতার সাথে তোমার দানশীলতার কোন তুলনাই হয় না। এমনিভাবে বলা

যায়- ما أشبه شجاعتك بعنترة কিভাবে তোমার বীরত্বকে আন্তরার বীরত্বের সাথে তুলনা করা যায় !

মহান আল্লাহ্র বাণী-

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَ اِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِى الْكِتٰبِ لَفِىْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ

অর্থ ঃ "তা এ জন্য যে, আল্লাহ্ সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছেন এবং যারা কিতাব সম্বন্ধে মতভেদ সৃষ্টি করেছে, নিশ্চয় তারা দুস্তর মতভেদে রয়েছে।" (সূরা বাকারা ঃ ১৭৬)

মহান আল্লাহ্র কালাম-ذلك بان الله نزل الكتاب بالحق এর মধ্যে "ذلك" শব্দের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন, তাঁদের মধ্যে হতে কেউ কেউ বলেন যে, ذلك শব্দের ব্যাখ্যা হল-তাদের ঐ সমস্ত কার্যাবলী যা জাহান্নামের শাস্তিযোগ্য মনে করে ও তারা হিম্মতের সাথে এ কাজ করেছে। যেমন তাদের আল্লাহ্ পাকের বিরুদ্ধাচরণ করা, এবং মানুষের নিকট আল্লাহ্ পাকের কিতাবে বর্ণিত বিষয়সমূহ গোপন করা ; এবং তাদের জন্য বর্ণনার উদ্দেশ্যে যে সমস্ত নির্দেশাবলী ঘোষণা করা হয়েছে, যেমন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সম্পর্কেও ধর্মীয় নির্দেশাবলী যা আল্লাহ্ তা'আলা সত্যসহ কিতাবে নাযিল করেছেন, তা গোপন করা বুঝায়। نزل الكتاب بالحق আয়াতাংশ তাদের জন্য ঘোষণাস্বরূপ বর্ণিত হয়েছে। যেমন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ্ পাকের এ কালাম-

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَ عَلٰى سَمْعِهِمْ وَعَلٰى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَّلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ٠

"নিশ্চয় যারা কুফরী করে, আপনি তাদেরকে সতর্ক করুন বা না করুন তাদের পক্ষে উভয় সমান, তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। আল্লাহ্ তাদের হৃদয়ও কানে মোহরাঙ্কিত করে দিয়েছেন এবং তাদের চক্ষুসমূহের উপর আবরণ আছে এবং তাদের জন্য গুরুতর শাস্তি রয়েছে।" (সূরা বাকারা ঃ ৬-৭)

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ঈমান না আনা (خبر) ঘোষণা দেয়া সত্ত্বেও তাদের নিকট হতে সুপথের বিনিময়ে কুপথ এবং ক্ষমার বিনিময়ে শাস্তি ক্রয় করা ব্যতীত অন্য কিছু পাওয়া যাবে না। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন যে, তাদের ذالك শব্দের অর্থ জানা আছে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। আর নিশ্চয়ই কিতাবের মাধ্যমে আমাদেরকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তাদের জন্য ঐ শাস্তি এবং কিতাব সত্য। যেন, এ কথাটি তাদের মতানুসারেই আয়াতের ব্যাখ্য স্বরূপ। ঐ শাস্তি যা আল্লাহ্ তা'আলা فما اصبرهم আয়াতাংশের মধ্যে উল্লেখ

করেছেন, তা তাদের জানা আছে যে, তা তাদের জন্যই নির্ধারিত। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পাক কিতাবের বহু স্থানে ঘোষণা দিয়েছেন যে, "নিশ্চয় জাহান্নাম কাফিরদের জন্যই"। আর একথা ঠিক যে, আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত বিষয় সত্য। সুতরাং ذالك শব্দের (خبر) খবর তাদের নিকট উহ্য আছে। আর অন্যান্য মুফাসসীরগণ বলেন যে, ذالك শব্দ দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা– (اهل النار) দোযখবাসীদেরকে বুঝিয়েছেন। অতএব, তিনি বলেছেন যে, فما اصبرهم على النار "তারা দোযখে কিরূপে ধৈর্য ধারণ করবে? তার পর বলেছেন, (هذا العذاب بكفرهم) এ শাস্তি তাদের নাফরমানীর কারণে। তাদের মতে এখানে هذا কে ذالك এর স্থলে ব্যবহার করা হয়েছে। যেন তিনি বলেছেন, فعلنا ذالك আমি তা করেছি। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছেন। আর তারা তাকে অবিশ্বাস করেছে। আরবী ব্যাকরণ মতে উল্লিখিত অর্থ তখনই হবে যখন ذالك শব্দটি نصب (যবর)– এর অবস্থায় হবে। আর با এর সাথে হলে رفع (পেশ) হবে। আয়াতের বিভিন্ন ব্যাখ্যার মধ্যে এ ব্যাখ্যাটাই আমার নিকট অধিক পসন্দনীয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা ذالك শব্দদ্বারা তাঁর যাবতীয় ইচ্ছার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

মহান আল্লাহ্‌র কালাম– ذَا لِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ থেকে নিয়ে اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتَابِ – نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ পর্যন্ত বর্ণনা, এ আয়াতে ইয়াহূদী ধর্ম যাজকদের কীর্তিকলাপের বিবরণ রয়েছে ; এর সঙ্গে সঙ্গে তাদের জন্য যে শাস্তি তৈরি আছে তারও উল্লেখ আছে। তাই তিনি বলেছেন, ঐ সমস্ত কার্যাকলাপ যা ইয়াহূদী ধর্মযাজক যা করেছে, যেমন জানা সত্ত্বেও মানুষের নিকট হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর নবূওয়াতের কথা গোপন রাখা। শুধু পার্থিব তুচ্ছ বস্তু লাভের আশায়। সেহেতু তারা আমার আদেশ অমান্য করেছে। তাই আমি তাদেরকে পবিত্র করা, তাদের সংশোধন ও কথা বলা পরিত্যাগ করেছি। আর তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তৈরি করে রেখেছি। আমি সত্য কিতাব নাযিল করেছি। তারা তা অস্বীকার করেছে এবং তাতে মতভেদ করেছে। এমতাবস্থায় তখন ذالك এর মধ্যে رفع (পেশ) এবং نصب (যবর) দু' ধরনের হরকত হবে। رفع (পেশ) হবে با এর সাথে। আর نصب হবে যখন এর অর্থ হয় فعلت ذالك আমি তা করেছি। কেননা আমি সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছি। তারপর তারা তাকে অবিশ্বাস করল এবং তার বিরোধিতা করল। আর কালামুল্লাহ্ শরীফে فكفروا به واختلفوا এ কথাগুলোর উল্লেখ করা পরিহার করার কারণ হল বাক্যের মধ্যে এ কথার উপর ইঙ্গিতের উল্লেখ থাকাই এর যথেষ্ট।

মহান আল্লাহ্‌র কালাম– وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِى الْكِتَابِ لَفِىْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ এর দ্বারা ইয়াহূদী এবং

নাসারা সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে। কেননা, তারাই মহান আল্লাহ্র কিতাবের বিরোধিতা করেছে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা, হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম এবং তাঁর মাতার যেসব ঘটনাবলীর কথা উল্লেখ করেছেন তাও ইয়াহূদীরা অস্বীকার করলো। আর নাসারারা কিতাবের কিছু অংশকে সত্য বলে মনে করল এবং কিছু অংশের প্রতি অবিশ্বাস করল। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের জন্য যেসব নির্দেশ প্রদান করেছেন এর সবকিছুই তারা অবিশ্বাস করল। তারপর তিনি নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে মুহাম্মদ (সা.) ! আমি আপনার উপর যা কিছু অবতীর্ণ করেছি ঐ সমস্ত লোকেরাই তার বিরোধিতা করেছে এবং ঝগড়ায় লিপ্ত হয়েছে ও সত্য থেকে পৃথক হয়ে সুপথ ও সঠিক বিষয় হতে বহু দূরে সরে গিয়েছে। যেমন, একথার উল্লেখপূর্বক আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَا اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدِاهْتَدَوْا وَ اِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَاهُمْ فِىْ شِقَاقٍ "তোমরা যাতে ঈমান এনেছো, তারা যদি তদ্রূপ ঈমান আনে তবে নিশ্চয় তারা সৎপথ পাবে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়,তবে তারা নিশ্চয় বিরুদ্ধভাবাপন্ন।" (সূরা বাকারা ঃ ১৩৭)।

হযরত সুদ্দী (র.) থেকে-وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِى الْكِتَابِ لَفِىْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা হল ইয়াহূদী এবং নাসারা সম্প্রদায়। তিনি বলেন যে, তারা মারাত্মক শত্রু তার মধ্যে রয়েছে। আমি আগেও الشقاق শব্দের অর্থ বর্ণনা করে দিয়েছি। মহান আল্লাহ্র বাণী-

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ الْمَلٰئِكَةِ وَ الْكِتَابِ وَ النَّبِيّٖنَ وَ اٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَ السَّائِلِيْنَ وَ فِى الرِّقَابِ ط وَ اَقَامَ الصَّلٰوةَ وَ اٰتَى الزَّكٰوةَ وَ الْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوْا - وَ الصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ حِيْنَ الْبَاْسِ ط وَ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ -

তোমাদের মুখমন্ডল পূর্ব ও পশ্চিম দিকে মুখ ফিরানোতে কোনো পুণ্য নেই। কিন্তু পুণ্য আছে কেউ আল্লাহ্, আখিরাত, ফিরিশতাগণ, সমস্ত কিতাব ও নবীগণের প্রতি ঈমান আনলে এবং আল্লাহ্-প্রেমে আত্মীয়স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, পর্যটক, সাহায্যপ্রার্থীদেরকে এবং দাসমুক্তির জন্য অর্থদান করলে, সালাত কায়েম করলে ও যাকাত প্রদান করলে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পুরা করলে, অর্থ-সংকটে দুঃখ-ক্লেশে ও সংগ্রাম সংকটে ধৈর্যধারণ করলে এরাই তারাই যারা সত্যপরায়ণ এবং তারাই মুত্তাকী। (সূরা বাকারা ঃ ১৭৭)

ব্যাখ্যাকারগণ এ আয়াতের করীমার ব্যাখ্যা একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। তাদের মধ্যে হতে কেউ কেউ বলেছেন যে, আয়াতে করীমার মর্মার্থ হল শুধু নামাযই একমাত্র পুণ্যেরে কাজ নয়, বরং পুণ্য হল ঐ সব বৈশিষ্ট্য যা আমি তোমাদের উদ্দেশ্যে বর্ণনা করবো।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে মহান আল্লাহ্‌র কালাম–ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق المغرب - সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, এর মর্মার্থ হল–(الصلواة) সালাত। তিনি বলেন যে, তোমারা সালাত আদায় করবে এবং অপরাপর আমল করবে না, তাতে কোন পুণ্য নেই। এই আয়াত নাযিল হয়েছিল যখন তিনি মক্কা মুকাররমা থেকে মদীনা মুনাওয়ারাতে প্রত্যাবর্তন করে ছিলেন, তখন বিভিন্ন ফরয কার্য এবং শরীয়তের নির্দেশাবলী নাযিল হয়েছিল। তাই আল্লাহ্ তা'আলা ফরয কার্যসমূহ ও তৎপ্রতি আমল করার নির্দেশ দিলেন।

হযরত মুজাহিদ (র.) বর্ণিত হয়েছে যে, তোমাদের মুখমন্ডল পূর্ব বা পশ্চিম দিকে ফিরানো মধ্যে কোন পুণ্য নেই, বরং পুণ্য হবে তোমাদের অন্তরসমূহের মধ্যে আল্লাহ্‌র আনুগত্যের বিষয় যা কিছু সুপ্রতিষ্ঠিত আছে তাতে–। হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এ আয়াত মদীনায় নাযিল হয়েছিল। ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق المغرب - এ আয়াত দ্বারা নামায বুঝানো হয়েছে। তিনি বলেন যে, তোমারা নামায আদায় করবে এবং তা ছাড়া অন্যকোন ভালকাজ করবে না, এতে কোন পুণ্য নেই। হযরত মুজাহিদ (র.) বলেছেন, ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق المغرب - এ আয়াত দ্বারা অবশ্য (السجود) সিজদা করাকে বুঝায়, কিন্তু প্রকৃত পুণ্যের কাজ হল অন্তরের মধ্যে আল্লাহ্‌র আনুগত্যমূলক যা কিছু বদ্ধমূল থাকে।

হযরত যাহ্হাক ইবনে মুযাহিম (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, তোমরা নামায আদায় করবে এবং তাছাড়া অন্য কোন ভাল কাজ করবে না এতে কোন পুণ্য নেই। এ আয়াত তখনই নাযিল হয়েছিল–যখন হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মক্কা মুকাররমা থেকে মদীনা তয়্যিবাতে হিজরত করেছিলেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বিভিন্ন ফরয ও শরীয়তের বিধি–নিষেধ নাযিল করেন এবং ফরয কাজসমূহ যথাযথভাবে পালনের নির্দেশ দান করেন।

আর আন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ বলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত দ্বারা ইয়াহুদী ও নাসারা সম্প্রদায়কে বুঝিয়েছেন। কেননা, ইয়াহুদীরা নামায আদায় করতো বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে। আর নাসারারাও নামায আদায় করতো বটে, কিন্তু তারা কিবলা পালন করতো পূর্ব দিককে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উদ্দেশ্যেই এ আয়াত নাযিল করে ঘোষণা করেন যে, প্রকৃত পুণ্য হল –তারা যেসব কার্য করিতেছে সেসব ব্যতীত যা আমরা এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেছি। যিনি এ অভিমত

পোষণ করেন তাঁর স্বপক্ষে নিম্নের হাদীস বর্ণিত হল।

হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, ইয়াহুদীরা নামায আদায় করতো বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে এবং নাসারারা নামায আদায় করতো পূর্বদিকে। তারপর – لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ - وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِا للهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ – এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মহান আল্লাহ্র কালাম–ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب - সম্পর্কে আমাদের কাছে বর্ণনা করা হল যে, একবার এক ব্যক্তি হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–কে البر (পুণ্য) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে ছিল। তখনই আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন। আমাদের কাছে একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ঐ ব্যক্তিকে ডেকে এনে তার কাছে এ আয়াত পাঠ করে শুনান। যদি কোন ব্যক্তি শরীয়তের অলংঘনীয় বিধানসমূহ নাযিল হওয়ার পূর্বে একথার সাক্ষ্য দিয়ে থাকে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মাবূদ নেই এবং মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও তাঁর রাসূল, তারপর এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তখন কি তার পরকালীন মুক্তি ও কল্যাণের আশা করা যায় ? তখন আল্লাহ্ তা'আলা ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب - এ আয়াত নাযিল করেন। ইয়াহুদীরা পশ্চিম দিকে এবং নাসারারা পূর্বদিকে কিবলা করতো, কিন্তু পুণ্য হল যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে।'' শেষ আয়াত পর্যন্ত।

রাবী ইবনে আনাস (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, ইয়াহূদীরা সালাত পড়তো পশ্চিম দিকে এবং নাসারা সম্প্রদায় পড়তো পূব দিকে। তখনই উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত উভয় প্রকার বক্তব্যের মধ্যে সেই বক্তব্যটাই অধিক পসন্দনীয় যা কাতাদা (র.) এবং রাবী ইবনে আনাস (র.) বর্ণনা করেছেন। তাঁরা বলেন, আল্লাহ্র কালাম–ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب - এই আয়াতে দ্বারা ইয়াহূদী এবং নাসারা সম্প্রদায়কেই বুঝানো হয়েছে। কেননা পূর্ববর্তী আয়াতসমূহ তাদের প্রতি হুঁশিয়ার উচ্চারণ এবং ভর্ৎসনা করে নাযিল হয়েছে। আর তাদের জন্য যে সব যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তৈরী করে রেখেছেন সে সম্বন্ধেও তাদেরকে খবর দেয়া হয়েছে। একথা পূর্ববর্তী বাক্যের বর্ণনা ভঙ্গিতেই বুঝায়। যদি বিষয়টি এমনই হয়–তবে জেনে রেখো–হে ইয়াহূদী ও নাসারা সম্প্রদায় ! তোমাদের কারো পূর্ব দিকে এবং কারো পশ্চিম দিকে মুখ ফিরানোর মধ্যে কোন পুণ্য নেই। বরং পুণ্য হল–সেই ব্যক্তির জন্য যে, ব্যক্তি আল্লাহ্, আখিরাত, ফিরিশতাগণ ও কিতাবসমূহ এবং আয়াতের শেষ পর্যন্ত বর্ণিত অন্যান্য বিষয়সমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে।

এখন যদি কোন ব্যক্তি প্রশ্ন করে যে, وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللهِ এ কথাটি কিভাবে বলা হল ?

আমাদের নিশ্চয় জানা আছে যে, **البرّ** শব্দটি **فعل** (ক্রিয়া) এবং **مَنْ** শব্দটি **اسم** বিশেষ্য। তবে কিভাবে **فعل** (ক্রিয়াটি) **الانسان** মানুষ অর্থে ব্যবহৃত হল ? এখন এর জবাবে বলা হবে যে, আয়াতের মর্মার্থ তোমার ধারণার পরিপন্থী। কেননা, আয়াতের প্রকৃত অর্থ হল **ولكن البر من امن بالله** অর্থাৎ বরং পুণ্যের কাজ হল–সেই ব্যক্তির কাজের অনুরূপ যে আল্লাহ্ পাকের প্রতি এবং আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। তাই তাকে **فعل** (ক্রিয়ার) স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে, এর প্রতি ইঙ্গিত বহন করার কারণে এবং সে **صله** (সংযুক্ত অব্যয়) এর কারণে, যা **فعل محزو ف** (উহ্য ক্রিয়া) **صفة** থেকে বিশেষণ) হয়েছে। যেমন আরববাসিগণ এরূপ বাক্য প্রয়োগ করে থাকে। তাই তারা **اسم** (বিশেষ্যকে) ঐসমস্ত **افعال** (ক্রিয়াসমূহের) স্থলাভিষিক্ত করে থাকে–যা তার সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার প্রসিদ্ধি আছে। কাজেই তারা বলে থাকে– **الجود حاتم** এবং **الشجاعة عنترة** প্রকৃতপক্ষে বাক্য দু'টির অর্থ হল– **الجود جود حاتم** দানটি হাতেমের দানের ন্যায় এবং **الشجاعة شجاعة عنترة** বীরত্বটি আন্তারার বীরত্বের ন্যায়। উল্লিখিত বাক্যে দানশীলতায় হাতেমের যেরূপ প্রসিদ্ধি রয়েছে সেখানে একবার **جود** (দানশীলতা) এর কথা উল্লেখ করার পর দ্বিতীয়বার **جود** কথাটির পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কেননা, বাক্যের বর্ণনাভঙ্গীতেই **جود** কথাটি তার স্থলাভিষিক্ত বুঝায়, যা (**محذوف**) উহ্য রয়েছে। যেমন, অন্যস্থানে বলা হয়েছে **واسأل القرية التى كنا فيها** এই বাক্যে **و اسأل القرية** গ্রামকে জিজ্ঞেস করুন, এর অর্থ **واسأل اهل القرية** গ্রামবাসীকে জিজ্ঞেস করুন। যেমন কবি যুলখিরাকুত–তোহাবী বলেছেনঃ

حَسِبْتُ بُغَامَ رَاحِلَتِىْ عَنَاقًا + وَ مَا هِىَ وَيْبَ غَيْرِكِ بِالْعَنَاقِ –

উল্লিখিত কবিতায় **بغام** কথাটির অর্থ শব্দটির অর্থ শব্দ–বা "আওয়ায।" যেমন আরো বলা হয়– **حسبت صياحى صياح اخاك** এর অর্থ **حسبت صياحى صياح أخيك** আমি ধারণা করলাম যে, আমার আওয়াযটি তোমার ভাইয়ের আওয়াযের ন্যায়। উল্লিখিত আয়াতের মর্মার্থ এমনও হতে পারে যে, **ولكن البرّ من آمن بالله** পুণ্যবান ব্যক্তি হল–সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। এখানে **البرّ** শব্দটি **مصد ر** হলেও **اسم** (বিশেষ্যের) স্থলাভিষিক্ত হয়েছে।

মহান আল্লাহ্র বাণী– **وَ اٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَ الْيَتَامٰى وَ الْمَسَاكِيْنَ وَ ابْنَ السَّبِيْلِ وَ السَّائِلِيْنَ وَ فِى الرِّقَابِ –** "এবং আল্লাহ্ পাকের মুহাব্বতে আত্মীয়স্বজন, পিতৃহীনগণ, দরিদ্রবৃন্দ, পথিকগণও ভিক্ষুকদেরকে এবং দাসত্ব–মোচনের জন্য ধন–সম্পদ দান করে।" উল্লিখিত মহান

আল্লাহ্র বাণী- و اتى المال على حبه এর মর্মার্থ হল যে ব্যক্তি কৃপণতা পরিহার করে স্বীয় ধন-সম্পদ একমাত্র আল্লাহ্ পাকের ভালবাসায় দান করে। যেমন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, و اتى المال على حبه এর মর্মার্থ হল মহান আল্লাহ্র পথে দান খায়রাত করা এমন অবস্থায় যে, সে কৃপণ, বিলাসী জীবন যাপনের আকাংক্ষী এবং দরিদ্র হয়ে যাওয়ার জন্য ভীত।

হযরত আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে و اتى المال على حبه সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, এমন অবস্থায় দান করা যে, তুমি সুস্বাস্থ্য বিলাসী জীবন যাপনের আকাক্ষী এবং দারিদ্রকে ভয় করছ।

হযরত আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি এ আয়াত و اتى المال على حبه সম্পর্কে বলেছেন, তোমার দান হবে এমন অবস্থায় যে, তুমি লোভী, কৃপণ, ধনী হওয়ার আকাংক্ষী এবং দরিদ্র হওয়ার ভয় করছ।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, দান করা এমন অবস্থায় যে, সে লোভী ও কৃপণ, ধনী হওয়ার আকাংক্ষী এবং দরিদ্র হয়ে যাওয়ার ভয় করছে।

হযরত ইসমাঈল ইবনে সালেম (র.) হযরত শাবী (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন, আমি তার কাছে শুনলাম যে, তিনি জিজ্ঞাসিত হয়েছেন, কোন ব্যক্তির জন্য কি তাঁর মালের মধ্যে যাকাত ব্যতীত আরও কোন হক আছে ? তিনি জবাবে বলেছেন, হাঁ। তারপর এ আয়াত-و اتى المال على حبه ذوى القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل و السائلين و فى الرقاب و اقام الصلاة و اتى الزكاة - পাঠ করে শুনান।

হযরত আবূ হামযা (র.) বলেছেন যে, আমি শা'বী (র.) জিজ্ঞেস করলাম, যখন কোন ব্যক্তি নিজ মালের যাকাত আদায় করে তখন তাই কি তার মালে পবিত্র হওয়ার জন্য যথেষ্ট ? জবাবে তিনি এ আয়াত ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق و المغرب থেকে নিয়ে- و اتى المال على حبه আয়াতের শেষ পর্যন্ত পাঠ করে শোনালেন। তারপর বলেন, আমাকে ফাতেমা বিনতে কায়েস (রা.) বলেছেন, তিনি হযরত রাসূলুল্লাহ্ (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন-হে আল্লাহ্র রাসূল ! আমার কাছে সত্তর মিসকাল পরিমাণের স্বর্ণমুদ্রা রয়েছে। তখন তিনি জবাবে বললেন, তা তোমার নিকটাত্মীয়দের মধ্যে বন্টন করে দাও।

হযরত আমের (রা.)-ফাতেমা বিনতে কায়স (রা.) থেকে বর্ণনা করে বলেছেন, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি যে, নিশ্চয় মালের মধ্যে যাকাত ব্যতীত আরও হক বা অধিকার রয়েছে।

হযরত মুযাহিম ইবনে যুফার (র.) থেকে বর্ণিত, আমি একদা হযরত আতা (র.)-এর নিকট বসা ছিলাম। এমন সময় এক আরবী ব্যক্তি আগমন করল এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করল, আমার কয়েকটি উট আছে, তাতে কি আমার জন্য সাদকা প্রদানের পরও কোন হক বাকী থাকে ? তখন

তিনি জবাবে বললেন, হ্যাঁ সে জিজ্ঞেস করলেন, তবে তা কি পরিমাণ ? জবাবে তিনি বললেন, عارية الذلول و طروق الفحل و الحلب "নিকৃষ্ট ব্যক্তি বা সাধারণ লোকজনকে ঋণ দেবে, রাস্তায় উম্মুক্ত বিচরণকারী নর উট দ্বারা–প্রয়োজনবোধে. প্রজননে–সাহায্য করবে এবং দুগ্ধদান করে সাহায্য করবে।"

হযরত মুররাতুল হামদানী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি و اتى المال على حبه সম্পর্কে বলেছেন যে, আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা.) এ সম্পর্কে বলেছেন, তোমার দান হবে এমন অবস্থায় যে, তুমি কৃপণ, দীর্ঘ আশা পোষণকারী এবং দারিদ্র্যের আশংকায় ভীত। তিনি হযরত সূদ্দী (র.) থেকে আরো বর্ণনা করেছেন যে, সম্পদের মধ্য থেকে এরূপ দান অত্যাবশ্যকীয়। মালদারের উপর যাকাত ব্যতীত এরূপ দান করা অবশ্য কর্তব্য।

হযরত ফাতেমা বিনতে কায়স (রা.) থেকে বর্ণিত হযরত নবী করীম (সা.) ঘোষণা করেছেন যে, মালের মধ্যে যাকাত ব্যতীত ও (গরীবের) হক রয়েছে। তারপর তিনি এ আয়াত ليس البرّ শেষ পর্যন্ত পাঠ করে শোনান।

হযরত আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে মহান আল্লাহ্‌র কালাম–و اتى المال على حبه সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন কোন ব্যক্তির দান করা এমন অবস্থায় যে, সে সুস্বাস্থ্য, কৃপণ, বিলাসী জীবন–যাপনের আকাংক্ষী এবং দারিদ্রকে ভয় করে। কাজেই আয়াতের ব্যাখ্যা করা হয় এভাবে যে, সে সম্পদ দান করে, এমতাবস্থায় যে, তার হৃদয়ে ধন–সম্পদের মোহ রয়েছে এবং অর্থ সঞ্চয়ের একান্ত লোভী হয়েও নিকটাত্মীয়দের সাথে কৃপণ সাজে। আমি মহান আল্লাহ্‌র বাণী–ذوى القربى এর ব্যাখ্যা করেছি–ذوى قرابة (অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের ভালবাসায় আত্মীয়–স্বজনদেরকে দান করা)। আমি এ ব্যাখ্যা করেছি হযরত রাসুলুল্লাহ্ (সা.) এর বর্ণিত হাদীস অনুসারে, যা তিনি ফাতিমা বিনতে কায়স (রা.)–কে নির্দেশ দিয়েছিলেন। যখন হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) জিজ্ঞাসিত হয়েছিলেন যে, কোন্ প্রকার দান উত্তম ? তখন তিনি বলেছিলেন, অভাবী আত্মীয়–স্বজনকে কম সম্পদ দিয়ে হলেও সাহায্যের চেষ্টা করা। আর–اليتامى এবং المساكين শব্দদ্বয়ের অর্থ আমি ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি। আর ابن السبيل (পথিক) কথাটি পুরুষ ব্যক্তির সাথেই সম্পর্ক যুক্ত। তারপর জ্ঞানীগণ তার বিশেষণে একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মধ্য হতে কেউ কেউ বলেছেন যে, তার দ্বারা ضيف মেহমানকে বুঝানো হয়েছে। যারা এ অভিমত পোষণ করেন, তাঁদের সমর্থনে আলোচনা।

হযরত কাতাদা (র.) থেকে–ابن السبيل সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, ইবনুস সাবীল অর্থ মেহমান বা অতিথি। বর্ণনাকারী বলেন, আমাদের কাছে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত

নবী করীম (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে সে যেন (মেহমানের সাথে) ভাল কথা বলে অথবা চুপ থাকে। বর্ণনাকারী বলেন যে, তিনি আরো বলেছেন, আতিথেয়তার (حق)অধিকার তিন রাত্রি পর্যন্ত। এরপরও যে, মেহমানদারী করবে তা হবে সাদকা। কেউ কেউ বলেন যে, ابن السبيل দ্বারা مسافر (অপরিচিত পর্যটক)–কে বুঝায়, যে তোমার নিকট হঠাৎ আগমন করেছে। যাঁরা এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন তাঁদের আলোচনা।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) থেকে–ابن السبيل সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি এমন ব্যক্তি যিনি একদেশ থেকে অন্যদেশে ভ্রমণ করেন।

হযরত কাতাদা (র.) থেকে মহান আল্লাহ্র বাণী–ابن السبيل সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি আগন্তক বা পর্যটক হিসেবে তোমার নিকট আগমন করে সেই হল (مسافر) মুসাফির।

হযরত মুজাহিদ ও কাতাদা (র.) থেকে উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। মুসাফির–ابن السبيل বলা হয়েছে, কারণ সে পথের সাথে সার্বক্ষণিকভাবে সম্পর্কযুক্ত। আর طريق (পথ)কেই سبيل বলে। সুতরাং বলা হয় যে, বিশেষ করে ভ্রমণের মধ্যে তার সাথে সার্বক্ষণিক থাকার কারণেই পথিককে ابنه তার সন্তান বলা হয়েছে। যেমন طير الماء সাতারুকে ابن الماء বলা হয়ে থাকে, তার সাথে সার্বক্ষণিক সম্পর্কে থাকার কারণে। এমনিভাবে যে ব্যক্তির জীবনে অনেক যুগ অতিবাহিত হয়েছে–তাকে ابن الايام و الليالى বলা হয়ে থাকে। একথার স্বপক্ষেই কবি ذى الرمة "যিরিম্মাহ" এর একটি কবিতাংশ উধৃত করা হল।

و رد ت اعتسا فا و الثريا كأنها + على قمة الرأس ابن ماء محلق –

আর আল্লাহ্ পাকের বাণী– والسائلين এর মর্মার্থ হল খাদ্য প্রার্থীগণ। যেমন এ সম্পর্কে নিম্নের হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হযরত ইকরামা (র.) থেকে মহান আল্লাহ্র বাণী– والسائلين সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, سائل (সায়েল)–হল ঐ ব্যক্তি–যে তোমার নিকট কোন কিছু প্রার্থনা করে।

আল্লাহ্র বাণী– وفى الرقاب এর মর্মার্থ হল কৃতদাসদের দাসত্ব মোচনে সাহায্য করা। তারা হল ঐ সমস্ত মুকাতিব (مكاتب) বা দাসগণ যারা বিনিময় মূল্যের মাধ্যমে তাদের দাসত্ব মোচনের জন্য চেষ্টা করে, যা তাদের মনিবগণ তাদেরকে লিখে দিয়েছে।

মহান আল্লাহ্র বাণী– وَ اَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا "এবং সালাত

কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে এবং অঙ্গীকার করলে যারা সেই অঙ্গীকার পূর্ণকারী হয়''।

আল্লাহ্‌র বাণী– و اقام الصلوٰة এর অর্থ উহার (সালাতের) আহকামসহ সারাক্ষণ আমালে লিপ্ত থাকা। আর মহান আল্লাহ্‌র বাণী واتى الزكاة এর অর্থ, যে পরিমাণ সম্পদ প্রদানের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা ফরয করে দিয়েছেন তা আদায় করে দেয়া।

যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, ফরয 'যাকাত' আদায়ের পরও কি কোন মাল প্রদান করা– و اجب (অত্যাবশ্যকীয়) ? জবাবে বলা হবে যে, ব্যাখ্যাকারগণ এর ব্যাখ্যায় একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ বলেন যে, মালের মধ্যে যাকাত ব্যতীত আরও حقوق (অধিকারসমূহ) রয়েছে। তাঁরা এ আয়াতের দ্বারা তাঁদের বক্তব্যের স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, واتى المال على حبه ذ و ى القربٰى "এবং তাঁর ভালবাসায় আত্মীয়দেরকে সম্পদ দান করে'' এ আয়াতাংশকে দলীল হিসাবে উল্লেখ করেছেন। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমে আত্মীয়দের নাম উল্লেখ করেছেন। তারপর ইরশাদ করেছেন– و اقام الصلوٰة واتى الزكاة ("এবং সালাত কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে'') এর দ্বারা আমরা জানতে পারলাম যে, আত্মীয়–স্বজনদেরকে যে সম্পদ প্রদানের জন্য মু'মিনদেরকে বলা হয়েছে তা যাকাত ব্যতীত অন্য মাল সম্পদ। যদি আত্মীয়দের দান এবং যাকাতের দান একই সম্পদ বুঝাতো তা হলে উল্লিখিত আয়াতে একই অর্থবোধক দু'টি শব্দ বারবার উল্লেখ হতো না। তাঁরা বলেন, যে কথার কোন অর্থ নেই, তেমন কথা মহান আল্লাহ্‌র পক্ষে অসমীচীন। তাতে আমরা বুঝতে পারলাম যে, আয়াতে উল্লিখিত প্রথম (মাল) مال দ্বারা যাকাতের অর্থ–সম্পদ ব্যতীত অন্য مال (সম্পদ) বুঝানো হয়েছে। আর যে مال (মাল) দ্বারা যাকাত বুঝানো হয়েছে তা আয়াতের শেষাংশে উল্লিখিত হয়েছে। তাঁরা বলেন, পরবর্তীতে ব্যাখ্যাকারগণ যে ব্যাখ্যা প্রকাশ করেছেন তাতে আমরা যে কথা বলেছি তারই সত্যতা প্রমাণ করে।

অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ বলেছেন যে, বরং প্রথম مال "মাল'' দ্বারা যাকাত বুঝানো হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা আয়াতের প্রথমাংশে দাতাগণকে তা ম'ুমিনদেরকে প্রদানের জন্য বর্ণনা করেছেন। তাই, মহান আল্লাহ্ তাঁর এ কথা বর্ণনার পর যেসব খাতে তাদেরকে যাকাত প্রদান করতে হবে সেসব নির্দেশিত খাতের কথাও জানিয়ে দিয়েছেন। তারপর তাঁর কালাম–و اتى الزكاة আয়াতাংশের দ্বারা তাদেরকে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। যে مال (মাল) জনগণকে প্রদানের নির্দেশ রয়েছে তা الزكاة) (المفرو ضة ফরয যাকাতের কথা–যা তাদের উপর বাধ্যতামূলক। যারা এর অংশ প্রাপক তাদের সম্পর্কেই আয়াতের প্রথমাংশে খবর দেয়া হয়েছে যে, যাকাতদাতাগণ তাদেরকেই তাদের মাল (مال)

প্রদান করবে। মহান আল্লাহ্‌র কালাম- و الموفون بعهد هم اذا عاهدوا এর অর্থ -যারা অঙ্গীকার করার পর আল্লাহ্ পাকের সঙ্গে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না বরং তারা তা পূর্ণ করে যা অঙ্গীকার করেছে। যেমন, এ মর্মে নিম্নের হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

হযরত রাবী' ইবনে আনাস (র.) থেকে মহান আল্লাহ্‌র বাণী- الموفون بعهد هم اذا عاهدوا সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ্‌র সাথে ওয়াদা দিয়ে তা ভঙ্গ করে, আল্লাহ্ পাক তার নিকট হতে প্রতিশোধ নেবেন। আর যে ব্যক্তি হযরত নবী করীম (সা.)-এর সাথে কোন বিষয়ে অঙ্গীকার করে বিশ্বাসঘাতকতা করে, হযরত নবী করীম (সা.) কিয়ামতের দিন তাকে অভিযুক্ত করবেন। আমি العهد শব্দের অর্থ এর আগে বর্ণনা করেছি। কাজেই এখানে এর পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী- وَالصَّابِرِيْنَ فِى الْبَأْسَاءِ وَ الضَّرَّاءِ "এবং যারা অর্থ-সংকটে ও ক্লেশে ধৈর্যশীল''। আমি الصبر শব্দের অর্থ এর আগে বর্ণনা করেছি। তাই আয়াতাংশের অর্থ, যারা নিজেদেরকে অভাবে ও ক্লেশে এবং যুদ্ধের সময়ে আল্লাহ্‌পাকের অপসন্দীয় কাজ থেকে বিরত থাকে এবং তার আনুগত্যমূলক কাজগুলো যথাযথ পালন করে। তারপর ব্যাখ্যাকারগণ الضراء এবং البأساء শব্দদ্বয় সম্পর্কে যা' বলেছেন-সে সম্পর্কে নিম্নের হাদীস বর্ণিত হল।

হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত, البأساء শব্দের অর্থ, الفقر দারিদ্র্য এবং الضراء শব্দের অর্থ, (السقم) রোগ-বা ক্লেশ । হযরত আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে আল্লাহ্‌র বাণী- وَالصَّابِرِيْنَ فِى الْبَأْسَاءِ وَ الضَّرَّاءِ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন البأساء শব্দের অর্থ, (الجوع) ক্ষুধা এবং الضراء শব্দের অর্থ, (المرض) রোগ।

হযরত আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি البأساء শব্দের অর্থ বলেছেন (الحاجة) অভাব এবং و الضراء শব্দের অর্থ বলেছেন-রোগ।

হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, البأساء শব্দের অর্থ হল (البؤس و الفقر) ক্লেশ ও অভাব। الضراء এর অর্থ, (القسم) রোগ। মহান আল্লাহ্‌র নবী হযরত আইয়ূব (আ.) বলেছিলেন, اِنِّىْ مَسَّنِى الضُّرُّ وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّحِمِيْنَ "আমি দুঃখ-কষ্টে পড়েছি, তুমিই তো দয়ালুগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। পরম (সূরা আম্বিয়া ঃ ৮৩)

রাবী (র.) থেকে আল্লাহ্‌র বাণী- وَالصَّابِرِيْنَ فِى الْبَأْسَاءِ وَ الضَّرَّاءِ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে,

তিনি বলেছেন, **البؤس** শব্দের অর্থ হল–**الفاقة والفقر** ক্ষুধার্ত এবং দারিদ্র্য। **وَ الضَّرَّاءِ** শব্দের অর্থ হল–শরীরে ব্যাথা কিংবা রোগের কারণে আত্মার কষ্ট। কাতাদা (র.) থেকে আল্লাহ্‌র বাণী– **اَلْبَاْسَاءِ وَ الضَّرَّاءِ** সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, শব্দের অর্থ হল–অভাব এবং শব্দের অর্থ হল–শরীরে ব্যাথা বা রোগ। দাহ্‌হাক (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, **اَلْبَاْسَاءِ وَ الضَّرَّاءِ** উভয় শব্দের অর্থ হল–রোগ।

ইবনে জুরাইজ (র.) থেকে– **وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَاءِ وَ الضَّرَّاءِ** সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, **البأساء** শব্দের অর্থ হল– **(البؤس و الفقر)** অভাব এবং দারিদ্র্য। **و الضراء** শব্দের অর্থ হল– **(السقم و الوجع)** রোগ এবং ব্যাথা। ইব্‌ন মুযাহিম (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি এই আয়াত সম্পর্কে বলেছেন যে, **البأساء** শব্দের অর্থ হল **(الفقر)** দারিদ্র্য। **و الضراء** শব্দের অর্থ হল–রোগ।

আরববাসিগণ এই ব্যাপারে মতবিরোধ করেছেন। তাঁদের মধ্য হতে কেউ কেউ বলেছেন যে, **اَلْبَاْسَاءِ وَ الضَّرَّاءِ** শব্দ দু'টি মাসদার (مصدر) **فعلاء** এর পরিমাপে এসেছে। এর কোন ক্রিয়া নেই। কেননা তা হল বিশেষ্য (اسم)। যেমন কোন কোন সময় **(افعل)** ক্রিয়াসমূহ (اسماء) বিশেষ্যের রূপে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু **فعلاء** এর পরিমাপে হয় না। যেমন **احمد** শব্দকে তারা বলে যে, **افعل** এর পরিমাপে **صفة** বা বিশেষণ হয়েছে। কিন্তু তা **فعلاء** এর পরিমাপে আসে না। যেমন তারা বলে **انت من ذلك اوجل** কিন্তু **او جلاء** বলে না। আর তাদের মধ্য হতে কেউ কেউ বলেছেন যে, এই (اسم) বিশেষ্যই **فعل** বা ক্রিয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা **البأساء** এর অর্থই হল **البؤس** (অভাব বা দারিদ্র্য) এবং **و الضراء** এর অর্থ হল **الفر** (রোগ)। তা **اسم** বা (বিশেষ্য। স্ত্রীলিঙ্গ এবং পুংলিঙ্গ উভয় অর্থেই ব্যবহার করা চলে। যেমন কবি যুহাইর (মুয়াল্লাকায়) বলেছেন,

فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم + كأحمر عاد ثم ترضع فتفطم –

উল্লিখিত কবিতাংশে **أشأم** শব্দটি **شئوم** অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাদের মধ্য হতে কেউ কেউ বলেছেন যে, যদি তা **اسم** (বিশেষ্য) হতো তবে পুংলিঙ্গ এবং স্ত্রীলিঙ্গে রূপান্তরিত করা বৈধ হতো। তখন অবশ্য অনির্দিষ্ট বিশেষ্য পদের মধ্যে **افعل** বা ক্রিয়া প্রচলন বৈধ হতো। কিন্তু তা **اسم** (বিশেষ্য) হিসেবে মাসদার এর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। এর দলীল হিসেবে তাদের বচন যেমন–**لئن طلبت نعر تهم لتجد نهم غير أبعد** অপ্রচলিত কথা। বর্ণনাকারী বলেন, তা **اسم** (বিশেষ্য) হয়েছে (مصدر) মাসদারের

জন্যে। কেননা যখন علم শব্দটি উল্লেখ করা হয় তখন এর দ্বারা (مصدر) মাসদারের অর্থ লওয়া হয়। আর অন্যান্যরা বলেন, যদি তা (مصدر) মাসদার হতো, তবে তা স্ত্রী লিঙ্গের হতো, পুংলিঙ্গের হতো না। আর যদি তা পুংলিঙ্গের হতো, তবে স্ত্রী লিঙ্গের হতো না। কেননা, এ কারণেই افعل এর পরিমাপের শব্দ فعلى এর পরিমাপে রূপান্তরিত হয় না। আর এ জন্যেই فعلى এর পরিমাপের শব্দ أفعل এর পরিমাপে রূপান্তরিত হয় না।

কেননা প্রত্যেক اسم (বিশেষ্য) তার স্বকীয়তা বজায় রেখে অন্যের দিকে রূপান্তরিত হয় না। কিন্তু উভয়েই দু'টি (পৃথক) لغة বা পরিভাষা। যখন তা পুংলিঙ্গের হবে তখন اشأم এর ন্যায় হবে। আর যদি তা الباساء এবং والضراء এর মধ্যে পতিত হয় তবে الباساء এর মধ্যে উহ্য থেকে এবং الضراء এর মধ্যেও উহ্য থাকবে। যদি তা الضراء এর উপর الاضر রূপে প্রকাশ না পায় এবং الاشام এর উপর الشاماء রূপে না হয়। কেননা, তখন তা تانيث (স্ত্রীলিঙ্গ) থেকে تذكير (পুংলিঙ্গে) পরিবর্তিত হবে না। এবং تذكير (পুংলিঙ্গ) থেকেও تانيث (স্ত্রীলিঙ্গে) পরিবর্তিত হবে না। যেমন, আরবগণ বলেন امراة حسناء সুন্দরী মহিলা। কিন্তু رجل احسن (অতিসুন্দর পুরুষ) এভাবে বলে না। তাই তারা বলে رجل امرد কিন্তু امراة مرداء এভাবে বলে না। যদি কেউ বলে যে, الضراء এর নিয়মে এবং اشام এর ন্যায় হয় তখন তা (مصدر) মাসদার এর অর্থ বহন করে। এমতাবস্থায় তাদের اسم (বিশেষ্য) হওয়ার প্রয়োজন নেই, যদি (مصدر) মাসদার হওয়াতেই যথেষ্ট হয়। আমরা الباساء এবং الضراء এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে (اهل علم) জ্ঞানীগণের যে ব্যাখ্যার কথা ইতিপূর্বে বর্ণনা করলাম, এ কথা তার (مخاطب) পরিপন্থী, যদিও তা আরবগণের (مذهب) মতানুসারে (صحيح) সঠিক। তবে তা হবে ব্যাখ্যাকারগণের মতানুসারে যা তারা الباساء শব্দের ব্যাখ্যা البؤس শব্দ দ্বারা করেছেন এবং الضراء এর অর্থ الضر فى الجسد (শরীরের কষ্ট) শব্দ দ্বারা করেছেন। তাঁদের এ ব্যাখ্যা الباساء এবং الضراء কে اسماء الافعال এর দিকে প্রত্যাবর্তিত করার কারণে হয়েছে। কিন্তু صفات الاسماء বিশেষ্যের গুণ বা বিশেষণের উপর ভিত্তি করে হয় নাই। الباساء এবং الضراء সম্পর্কে ব্যাখ্যাকারগণের ঐ কথাটাই অধিক পসন্দনীয় যে, الباساء এবং الضراء শব্দ দু'টি اسماء افعال হয়েছে। তখন الباساء শব্দটি البؤس শব্দের اسم (বিশেষ্য) এবং والضراء শব্দটি الضر শব্দের اسم

(বিশেষ্য) হবে। আর الصابرين শব্দের মধ্যে نصب হয়েছে المدح এর পদ্ধতিতে نعت (বিশেষণ) হওয়ার কারণে। কেননা, আরবী ব্যাকরণের পদ্ধতি অনুসারে যখন المدح والذم এর মুকাবিলায় একটি صفت সুদীর্ঘ হয় তখন কখনও نصب (যবর) হয় এবং কখনও رفع (পেশ) হয়। যেমন কোন কবি বলেছেনঃ

الى الملك القوم و ابن الهام + و ليت الكتيبة في المز دحم

و ذا الراى حين تغم الامور + بذات الصليل و ذات اللجم –

উল্লিখিত কবিতাংশে ليت الكتيبة এবং ذا الراى শব্দ দু'টিতে مدح এর ভিত্তি করে نصب (যবর) হয়েছে এবং এ দু'টির পূর্বের اسم এর মধ্যে مخفوض পেশের বিপরীত جر (যের) হরকত) হয়েছে, একই (صفة) বিশেষণের কারণে। এ প্রসঙ্গেই অন্য আর এক কবির একটি কবিতাংশ নিম্নে বর্ণিত হল।

فليث التى فيها النجوم تواضعت + على كل غث منهم و سمين

غيوث الورى فى كل محل وازمة + اسود الشرى يحمين كل عرين –

তাদের মধ্য হতে কেউ কেউ মনে করেন যে, و الصابرين فى الباساء এর মধ্যে نصب (যবর) হয়েছে পূর্ববর্তী السائلين শব্দের উপর عطف (সংযোগ) হওয়ার কারণে। তখন তাদের মতে বাক্যের অর্থ দাঁড়াবে এমন–"এবং তাঁরই প্রেমে আত্মীয় স্বজন, পিতৃহীনগণ, দরিদ্রবৃন্দ, পথিকগণ, ভিক্ষকগণ এবং অভাবে ও ক্লেশে নিপতিতদেরকে ধন সম্পদ দান করে"। এমতাবস্থায় প্রকাশ্য কিতাবুল্লাহ্ এ কথার ভুল প্রমাণ করে। এ কারণেই الصابرين فى الباساء و الضراء বলতে তাদেরকে বুঝাবে যারা শরীরে দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত। আর যারা ধন–সম্পদে প্রভাবশালী, এবং যাদেরকে مال সম্পদ প্রদান করতে হবে তাদের বর্ণনা ইতিপূর্বে মহান আল্লাহ্র বাণী– و المساكين و ابن السبيل و السائلين এর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। যারা অভাবী ও দরিদ্র তারাই হল اهل الباساء و الضراء কেননা, যে ব্যক্তি রুগ্ন ও অভাবী নয় সে ব্যক্তি صدقة দান গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। কেননা, দান গ্রহণের জন্য শর্ত হল যখন তার রোগের সাথে অভাব একত্রিত হয়। আর যখন রোগের সাথে অভাব এসে একত্র হবে তখনই সে اهل المسكنة হবে, অর্থাৎ মিসকীনদের দলভুক্ত হবে। যাদের বর্ণনা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। মহান আল্লাহ্র বাণী– و الصابرين فى الباساء এর ব্যাখ্যা যখন এমন হবে তখন তাতে نصب (যবর) হবে, মহান আল্লাহ্র কালাম– و اتى المال على حبه এর সাথে। এমতাবস্থায়

একই বাক্য অনর্থক (تكرار) দু'বার উল্লিখিত হবে। কেউ কেউ বলেন, যেন বাক্যের প্রয়োগ হবে এমন و اتى المال على حبه ذوى القربى و اليتامى و المساكين তাতে والمساكين শব্দটি দু'বার উচ্চারিত হল। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের প্রতি এরূপ অনর্থক خطبه (ভাষণ) প্রদান করা হতে সম্পূর্ণ পবিত্র। কিন্তু বাক্যের প্রকৃত অর্থ হবে এমন–

وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ-وَ الْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوْا وَ الصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَاءِ وَ الضَّرَّاءِ

"বরং পুণ্যবান ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী,–যারা অঙ্গীকার করে তদনুযায়ী তা' পূর্ণকারী হয় এবং যারা অভাবে ও ক্লেশে ধৈর্যশীল হয়।" و الموفون শব্দটি رفع এর অবস্থায় হয়েছে। কেননা, তা পূর্ববর্তী مَن থেকে صفة (বিশেষণ) হয়েছে। সুতরাং তা স্বীয় اعراب অনুসারে معرب (পরিবর্তনশীল) হরকত) হয়েছে। والصابرين এর মধ্যে نصب (যবর) হয়েছে, যদি ও তা المدح (প্রশংসাবোধক ক্রিয়া) হওয়ার দিক থেকে صفة বিশেষণ হয়েছে। যা আমরা এর আগে বর্ণনা করেছি।

মহান আল্লাহ্র বাণী–وَ حِيْنَ الْبَاْسِ এবং যুদ্ধের সময়ে–

এর ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্র বাণী وَ حِيْنَ الْبَاْسِ একথার মর্মার্থ হল যুদ্ধের সময়ে অর্থাৎ যুদ্ধ ক্ষেত্রে তুমুল যুদ্ধের কঠিন বিপদের সময়– ধৈর্যশীল হওয়া। যেমন এই মর্মে নিম্নের হাদীস বর্ণিত হল ঃ

আবদুল্লাহ্ (র.) থেকে আল্লাহ্র বাণী–وَ حِيْنَ الْبَاْسِ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে এর অর্থ হল–حين القتال (যুদ্ধকালে)। মূসা সূত্রে আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

মুজাহিদ (র.) থেকে وَ حِيْنَ الْبَاْسِ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, এর অর্থ হল القتال (যুদ্ধবিগ্রহ)।

কাতাদা (র.) থেকে–وَ حِيْنَ الْبَاْسِ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, এর অর্থ হল عند مواطن القتال (যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিতির সময়)।

হাসান ইবনে ইয়াহ্ইয়া (র.) সূত্রে কাতাদা (রা.) থেকে وَ حِيْنَ الْبَاْسِ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, এর অর্থ হল القتال (যুদ্ধবিগ্রহ)।

বারী' (রা.) থেকে وَ حِيْنَ الْبَاْسِ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, এর অর্থ হল–عند لقاء العدو (শত্রুর মুকাবিলার সময়)।

যাহ্হাক (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, وَ حِيْنَ الْبَاْسِ এর মর্মার্থ হল القتال (যুদ্ধবিগ্রহ)।

আহমাদ ইবন ইসহাক (র.) সূত্রে যাহ্হাক ইবনে মুযাহিম (র.) থেকে وَ حِيْنَ الْبَاْسِ সম্পর্কে

বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, এর অর্থ হল القتال (যুদ্ধবিগ্রহ)।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী– أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَ أُولٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ (তাঁরাই সত্যপরায়ণ এবং তাঁরাই আল্লাহ্ ভীরু)

এর ব্যাখ্যাঃ উল্লিখিত আল্লাহ্‌র বাণী– أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا এর মর্মার্থ হল তাঁরাই সত্যপরায়ণ, যাঁরা আল্লাহ্ এবং আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে তাদের গুণাগুণ সম্পর্কেই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। বলা হয় যাঁরা উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পাদন করেছেন তাঁরাই নিজ বিশ্বাসানুযায়ী আল্লাহ্‌কে সত্য বলে জেনেছেন এবং তাদের মুখের কথাগুলো তাঁদের কার্য দ্বারা সঠিক বলে প্রমাণ করেছেন। তারা প্রকৃত বিশ্বাসী নয়, যারা পূর্ব অথবা পশ্চিম দিকে মুখ করেছে, এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশের বিরোধিতা করেছে ও তাঁর সাথে সম্পাদিত অঙ্গীকার এবং ওয়াদা ভঙ্গ করেছে। আর যে বিষয় বর্ণনা করতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, তা তারা মানুষের নিকট গোপন করেছে এবং তাঁর রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে।

আল্লাহ্‌র বাণী–أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا এর মর্মার্থ হল যাঁরা আল্লাহ্‌র শাস্তিকে ভয় করেছেন এবং তাঁর নাফরমানী করা থেকে নিজেদেরকে বিরত রেখেছেন ও তাঁর সাথে অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে ভয় করেছেন। আর তাঁর সীমালংঘন করেননি এবং তাঁকে ভয় করে তাঁর ফরয কার্যসমূহ সম্পাদন করতে দন্ডায়মান হয়েছে–أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا সম্পর্কে আমরা যা বললাম, তদনুযায়ী বারী' ইবন আনাস (রা.) ও নিম্নের হাদীসে বর্ণনা করেছেন ঃ

আম্মার ইবনুল হাসান (রা.)–এর সূত্রে রাবী' (রা.) থেকে أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, তাঁরা ঈমানের কথা পরস্পর আলোচনা করেছেন। অতএব, তাঁদের প্রকৃত 'আমর হল আল্লাহ্ পাক কে বিশ্বাস করা। হাসান (র.) বলেন, এ হল ঈমানের কথা এবং তার প্রকৃত অবস্থা হল 'আমল করা। আর যদি কথার সাথে আমল না হয়,–তবে এতে কোন তার কোন মূল্য নেই।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী–

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ اَخِيْهِ شَىْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَ اَدَاءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ط ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ ط فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ اَلِيْمٌ –

অর্থ : "হে মু'মিনগণ! নিহত ব্যক্তিগণের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের বিধান দেয়া হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তির পরিবর্তে স্বাধীন ব্যক্তি, এবং ক্রীতদাসের পরিবর্তে ক্রীতদাস এবং নারীর পরিবর্তে নারী। কিন্তু, তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে, যথাযথ বিধির অনুসরণ করা ও সততার সাথে তার দেয় আদায় বিধেয়। তা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ভার লাঘব ও অনুগ্রহ, এরপরও যে সীমালঙঘন করে, তার জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে।" (সূরা বাকারা : ১৭৮)

মহান আল্লাহ্‌র কালাম–كتب عليكم القصاص فى القتلى এর অর্থ فرض عليكم (তোমাদের উপর ফরয করা হলেন)।যদি কেউ প্রশ্ন করে যে নিহত ব্যক্তির ওয়ারীশদের জন্য কি হত্যাকারীর ওয়ারীশদের নিকট হতে قصاص (প্রতিশোধ) গ্রহণ করা فرض (অত্যাবশ্যকীয়) করা হয়েছে ? জবাবে বলা যায়, না, বরং তার জন্য তা مباح বৈধ। সে ইচ্ছা করলে ক্ষমাও করতে পারে এবং دية মুক্তিপণও গ্রহণ করতে পারে। এরপর যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, তবে কি ভাবে বলা হল كتب عليكم القصاص "তোমাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করা ফরয করা হল।" জবাবে বলা যায় যে, এর প্রকৃতি মর্মার্থ–যা মনে করেছ তার উল্টা। এ আয়াত–يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى – এর প্রকৃত মর্মার্থ হল "যখন কোন স্বাধীন ব্যক্তি কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করে –তখন হত্যাকারীর دم (রক্তপণ) নিহত ব্যক্তির রক্তের বদলা হয়ে যায়। আর হত্যাকারী ব্যতীত অন্য মানুষের নিকট হতে قصاص (প্রতিশোধ) গ্রহণ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি হত্যা করেই এমন ব্যক্তির নিকট হতে হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করে, তোমরা সীমালংঘন করো না। কেননা, নিহত ব্যক্তির قاتل হত্যাকারী ব্যতীত অন্য ব্যক্তিকে হত্যা করা তোমাদের জন্য (حرام) হারাম। এখানে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের উপর (قصاص) কিসাস গ্রহণ ফরয করেছেন বলে যে فرض কথাটা উল্লেখ করেছেন–এর মর্মার্থ হল তাই যা আমি বর্ণনা করেছি যে, নিহত ব্যক্তির হত্যাকারী ব্যতীত অন্য ব্যক্তিকে হত্যা করার প্রতিশোধ (قصاص) গ্রহণ সীমালঙঘন পরিত্যাগ করা। এখানে فرض (ফরয) কথাটির অর্থ এমন নয় যে, আমাদের উপর قصاص প্রতিশোধ গ্রহণকে এমভাবে فرض (অত্যাবশ্যক) করা হয়েছে, যেমন সালাত, সাওম فرض (অত্যাবশ্যক) যা, আমাদের জন্য পরিত্যাগ করা চলে না। যদি তা قصاص এমনভাবে ফরয হতো, তবে আমাদের জন্য তা পরিত্যাগ করা কোন মতেই (جائز) বৈধ হতো না এবং আল্লাহ্‌র কালাম– فمن عفى له من اخيه شئى

("কিন্তু যদি কেউ তার কর্তৃক কোন বিষয় ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়") এ কথাটিরও কোন অর্থ হতো না। কেননা, (قصاص) কিসাস গ্রহণ ফরয হওয়ার পর কোন প্রকার (عفو) ক্ষমা প্রযোজ্য হতো না। তাই فمن عفى له من اخيه شئى সম্পর্কে বলা হয় যে, এ আয়াতে قصاص কিসাস গ্রহণের অর্থ হল কোন কোন হত্যার ব্যাপারে কতক (ديات) অর্থদন্ড বা ক্ষতিপূরণই এর উদ্দেশ্য। কেননা, তাদের মতে এ আয়াত নাযিল হয়েছে দু'টি সম্প্রদায় সম্পর্কে, যারা হযরত নবী করীম (সা.)-এর যামানায় পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। তাই তাদের কিছুসংখ্যক অপর দলের কিছুসংখ্যক লোককে হত্যা করল। তখন নবী করীম (সা.) তাদের মধ্যে (صلح) মীমাংসার নির্দেশ দিলেন, যেন দু'দলের একদলের মহিলার (ديات) অর্থদন্ড বা ক্ষতিপূরণ দ্বারা অপর দলের মহিলার এবং তাদের পুরুষদের (ديات) অর্থদন্ডের দ্বারা অপর দলের পুরুষদের এবং একদলের দাসদের (ديات) অর্থদন্ডের দ্বারা অপর দলের দাসদের, কিসাস (قصاص) গ্রহণ (ساقط) বাতিল বা রহিত হয়ে যায়। তাদের মতে এ আয়াতে বর্ণিত (قصاص) কিসাস গ্রহণের মর্মার্থ তাই। যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, মহান আল্লাহ্র কালাম-كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى এ আয়াতে কেন আমাদেরকে (الحر) স্বাধীন ব্যক্তির (قصاص) কিসাস, স্বাধীন حر থেকে এবং (الانثى) নারীর (قصاص) কিসাস,-নারী থেকে গ্রহণ করতে বলা হল? জবাবে বলা হবে যে, ব্যাপাটি এরূপ নয় , বরং আমাদের জন্য (حر) স্বাধীন ব্যক্তির (قصاص) বদলা,-عبد (দাস) থেকে এবং নারীর (قصاص) কিসাস,-পুরুষ থেকে গ্রহণ করার অনুমতি রয়েছে, মহান আল্লাহ্র কালাম-وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطَانًا এ আয়াতে অনুযায়ী। এ ব্যাপারে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বর্ণিত হাদীস অনুযায়ীও দলীল গ্রহণ করা যায়, যেমন হযরত রাসুলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "মুসলমানগণ তাদের (قصاص) প্রতিশোধের বেলায় পরস্পর সমান অধিকারী। এমতাবস্থায় যদি কেউ পুনরায় প্রশ্ন করে যে, তবে আয়াতের উল্লিখিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন কি ? জবাবে বলা হবে যে, তার উদেশ্য সম্পর্কে ব্যাখ্যাকার একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের কেউ কেউ বলেন যে আয়াত নাযিল হয়েছে ঐ সম্প্রদায় সম্পর্কে যাদের মধ্য হতে কোন স্বাধীন ব্যক্তি অপর কোন সম্প্রদায়ের কোন দাসকে যদি হত্যা করতো, তবে হত্যাকারী থেকে নিহত ব্যক্তির খুনের বদলা নিতে সম্মত হতো না, যেহেতু সে-দাস-এ কারণে। কিন্তু তার বদলে তার মনিবকে হত্যা করা হতো। আর যদি কোন মহিলা অন্য কোন গোত্রের কোন পুরুষকে হত্যা করতো, তবে তারা হত্যাকারী মহিলা থেকে (قصاص) খুনের বদলা নিতে হতো না, বরং তারা মহিলার স্বগোত্রীয় কোন পুরুষ কিংবা তার স্বামীকে এর জন্য হত্যা করতো। তখন আল্লাহ্ তা'আলা

এ আয়াতে নাযিল করেন। তাই তাদেরকে ফরয কিসাস সম্পর্কে ঘোষণা দিয়ে দেয়া হল যে, হত্যাকারী পুরুষের কিসাস হত্যাকারী পুরুষ থেকেই নেয়া হবে। অন্য কোন ব্যক্তি থেকে নয়। আর হত্যাকারী মহিলার কিসাস ঐ মহিলা থেকেই নেয়া হবে। সে ব্যতীত অন্য কোন পুরুষ থেকে নয়। আর হত্যাকারী দাসের বদলা ঐ দাস থেকেই নেয়া হবে। সে ব্যতীত অন্য কোন স্বাধীন ব্যক্তি থেকে নয়। কাজেই তাদেরকে নিষেধ করে দেয়া হলো যে, কিসাসের ব্যাপারে হত্যাকারী ব্যতীত অন্য কোন বক্তি থেকে যেন কিসাস গ্রহণ করা না হয়। যারা এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তাঁদের স্বপক্ষে নিম্নের হাদীস বর্ণিত হল ঃ

শা'বী (র) থেকে আল্লাহ্‌র কালাম–اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, আরবের গোত্রসমূহের মধ্যে বিবাদমান দু'টি গোত্রের ঝগড়া সম্পর্কে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়, যারা 'ইম্মিয়া (عمية) নামী ব্যক্তিকে হত্যা করেছিল। তখন তারা বলল, আমাদের দাসের বিনিময়ে অমুক ব্যক্তির পুত্র অমুককে এবং অমুক মহিলার বদলায় অমুকের পুত্র অমুককে আমরা হত্যা করবো। তখনই আল্লাহ্ তা'আলা–اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى এই আয়াত অবতীর্ণ করেন।

কাতাদা (র.) থেকে আল্লাহ্‌র কালাম–كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, অজ্ঞতার যুগে তাদের মধ্যে বিদ্রোহী ও শয়তানের অনুসরণকারী ছিল। অতএব প্রভাবশালী ও শক্তিশালী কোন গোত্রের দাসকে যদি অপর কোন গোত্রের দাসে হত্যা করতো, তখন তারা অপরের উপর নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি ও সম্মান রক্ষার্থে বলতো– আমরা এর জন্য স্বাধীন ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাউকে হত্যা করবো না। আর যদি তাদের গোত্রের কোন মহিলাকে অপর কোন গোত্রে মহিলা হত্যা করতো, যে, এর বদলায় আমরা পুরুষ ব্যতীত অন্য কাউকে হত্যা করবো না। তখই আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করে তাদেরকে সংবাদ দিলেন যে, দাসের বদলায় এবং নারীকে নারী বদলায় কিসাস নেয়া হবে। আর তাদেরকে বিদ্রোহ করতে নিষেধ করা হল। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা সূরা মায়িদার এই আয়াত–
وَ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَ الْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوْحَ قِصَاصٌ "এবং আমি তাদের জন্য এ বিষয়ে বিধান দিয়েছিলাম যে, জীবনের জন্য জীবন, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং সকল প্রকার যখমের বদলা অনুরূপ" (সূরা মায়েদা ঃ ৪৫) অবতীর্ণ করেন।

কাতাদা (র.) থেকে আল্লাহ্‌র বাণী–كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, আমাদের পূর্ববর্তী লোকদের জন্য অর্থদণ্ডের কোন ব্যবস্থাছিল না। হত্যাকারী হত্যা করা হতো, অথবা ক্ষমা করে দেয়া হতো। তখনই আল্লাহ্‌র এই আয়াত সেই সম্প্রদায় সম্পর্কে

অবতীর্ণ হয়–যারা সংখ্যায় অধিক ছিল। অতএব, যদি কোন অধিক লোক সম্পন্ন কোন গোত্রে কোন দাস নিহত হতো, তখন তারা বলতো আমরা এর বদলায় স্বাধীন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাউকে হত্যা করবো না। আর যদি তাদের কোন মহিলা নিহত হতো , তবে তারা বলতো যে, আমরা এর বদলায় পুরুষ ব্যতীত অন্য কাউকে হত্যা করবো না। তখনই আল্লাহ্ তা'আলা–اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى এই আয়াত নাযিল করেন।

আমের (রা.) থেকে এই আয়াত–كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى অবতীর্ণ হয়–। তিনি বলেন, এ আয়াত খানা 'ইম্মিয়া গোত্রে যুদ্ধের ব্যাপারে নাযিল হয়েছিল। যখন পরস্পর দু'গোত্রে এক দাস অপর দাসকে হত্যা করতো তখন উভয়েই একে অন্যের বদলা হয়ে যেতো। এমনিভাবে দু'জন মহিলার বেলায় এবং দুজন স্বাধীনের বেলায়ও একই হুকুম। অর্থাৎ একে অন্যের বদলা হয়ে যাবে। ইনশা আল্লাহ্ তাই হলো এর মর্মার্থ।

মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, আল্লাহ্র উল্লিখিত কালামের ব্যাখ্যায় এ ব্যাখ্যাটিও অন্তর্ভুক্ত যেমন–الرجل بالمراة و المراة بالرجل এ সম্পর্কে আতা (র.) বলেছেন, উভয় ব্যক্তি (নারী পুরুষ এর) মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন যে, বরং আয়াতটি নাযিল হয়েছে এমন দুটি গোত্রকে উপলক্ষ্য করে যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর সময়ে পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। অতএব উভয় দল থেকে বহু সংখ্যক নারী–পুরুষ নিহত হল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদের মধ্যে সন্ধি করার নির্দেশ দিলেন– এভাবে যে, উভয় দলের মহিলারা যেন অর্থদণ্ডের মাধ্যমে খুনের বদলা (قصاص) প্রদান করে। আর পুরুষদের মাধ্যমে পুরুষদের এবং দাসদের মাধ্যমে দাসদের যেন ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়। এই হল আল্লাহ্র বাণী– كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى এর মর্মার্থ।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন তাঁদের স্বপক্ষে নিম্নের হাদীস বর্ণিত হল ঃ

সূদ্দী (র.) থেকে আল্লাহ্র বাণী–كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, আরবের দু'টি সম্প্রদায় পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। তন্মধ্যে একটি ছিল মুসলিম এবং অপরটি ছিল কোন বিষয়ে অঙ্গীকারে আবদ্ধ আরবের অন্য একটি সম্প্রদায়ের লোক। তখন নবী করীম (সা.) তাদের মধ্যে সন্ধি করিয়ে দিলেন, স্বাধীন, দাস এবং মহিলাদেরকে হত্যা করেছিল। নবী করীম (সা.) তাদের মধ্যে এই শর্তের উপর সন্ধি করে দিয়েছেলেন যে, স্বাধীনগণ স্বাধীনদের, দাসগণ দাসদের এবং মহিলাগণ মহিলাদের ক্ষতিপূরণ (دية) দেবে। অতএব, এভাবে তাদের একজন অপরজন থেকে খুনের বদলা গ্রহণ করল।

আবূ মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, আনসারদের এক সম্প্রদায় অপর

সম্প্রদায়ের উপর প্রাধান্য ছিল। যেন তারা পরস্পর প্রাধান্য কামনা করতো। এমতাবস্থায় নবী করীম (সা.) তাদের মধ্যে মীমাংসার জন্য এগিয়ে এলেন। তখনই এই আয়াত– اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى অবতীর্ণ হয়। এতএব নবী করীম (সা.) স্বাধীন ব্যক্তিকে স্বাধীনের বিনিময়ে, দাসকে দাসের বিনিময়ে এবং নারীকে নারীর বিনিময়ে খুনের বদলা গ্রহণের নির্দেশ দিলেন।

শা'বী (র.) থেকে এই আয়াত– كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, আয়াতটি নাযিল হয়েছে উমাইয়া গোত্রের মধ্যে যুদ্ধের ব্যাপারে। শুবা (র.) বলেছেন, যেন তা আপোষ মীমাংসা (صلح) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি বললেন, তোমরা এই ব্যাপারে সন্ধি করে ফেল।

শা'বী (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি– كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى সম্পর্কে বলেন যে, এ আয়াত উমাইয়া গোত্রের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। তিনি বলেন ঘটনাটি নবী করীম (সা.)–এর সময়ে সংঘটিত হয়েছিল।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন যে, ব্যাপারটি তা নয়, বরং এ হল আল্লাহ্ পাকের একটি নির্দেশ। এর উদ্দেশ্য হল ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যার ব্যাপারে স্বাধীন, দাস, পুরুষ ও নারীর খুনের বদলা বা অর্থদন্ড সম্পর্কে বর্ণনা করা। যেমন হত্যাকারী থেকে যদি নিহত ব্যক্তির খুনের বদলা নেয়ার ইচ্ছা করে এবং নিহত ব্যাক্তি ও যার নিকট হতে কিসাস নেয়া হবে–তাদের মধ্য হতে অতিরিক্ত কিছু পারস্পরিক সম্মতিতে ফেরত নেয়। তবে যারা এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন তাদের স্বপক্ষে নিম্নের হাদীস বর্ণিত হল।

রাবী (র.) থেকে এ আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, আলী ইবনে আবূ তালিব (রা.) আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, যে কোন স্বাধীন ব্যক্তি যদি কোন কৃতদাসকে হত্যা করে তবে সে তার কিসাস হবে। যদি দাসের মনিবগণ ইচ্ছা করেন তাকে হত্যা করার তবে তাকে হত্যা করবে এবং স্বাধীন ব্যক্তি থেকে প্রদত্ত অর্থদন্ড বা ক্ষতিপূরণ কৃতদাসের মূল্য পরিমাণ কিসাস হিসেবে গ্রহণ করবে এবং স্বাধীন ব্যক্তির অভিভাবকদেরকে অবশিষ্ট দীয়ত বা ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে। আর যদি কোন দাস কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করে তবে সে তার কিসাস হবে। যদি স্বাধীন ব্যক্তির অভিভাবকগণ ইচ্ছা করেন তবে তারা দাসকে হত্যা করবে এবং স্বাধীন ব্যক্তির অর্থদন্ড থেকে কৃতদাসের মূল্য পরিমাণ বদলা হিসাবে গ্রহণ করবে এবং অবশিষ্ট দীয়ত (অর্থদন্ড) স্বাধীন ব্যক্তির অভিভাবকদেরকে প্রদান করবে। আর যদি তারা ইচ্ছা করেন তবে সম্পূর্ণ (دية) ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করতে পারে এবং দাসকে জীবিত রাখতে পারে। আর যদি কোন স্বাধীন ব্যক্তির কোন মহিলাকে হত্যা করে তবে সে ঐ মহিলার জন্য কিসাস হবে। যদি মহিলার অভিভাবকগণ ইচ্ছা করেন, তবে তাকে হত্যা করতে পারবে এবং ক্ষতিপূরণের অর্ধেক স্বাধীন ব্যক্তির

অভিভাবকদেরকে প্রদান করে দেবে। আর যদি কোন মহিলা কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করে তবে সে এর জন্য কিসাস হবে। যদি স্বাধীন ব্যক্তির অভিভাবকগণ ইচ্ছা করেন তবে তারা ঐ মহিলাকে হত্যা করতে পারবেন এবং অর্ধেক দীয়ত গ্রহণ করতে পারবেন। আর যদি তারা ইচ্ছা করেন তবে সমস্ত ক্ষতিপূরণই গ্রহণ করতে পারেন এবং মহিলাকে জীবিত রেখে ক্ষমাও করে দিতে পারেন।

হাসান (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আলী (রা.) বলেছেন, যদি কোন পুরুষ কোন মহিলাকে হত্যা করে তবে মহিলার অভিভাবকগণ ইচ্ছা করলে তারা তাকে হত্যাও করতে পারে এবং ক্ষতিপূরণ হিসেবে অর্ধেক দীয়ত গ্রহণও করতে পারে।

হাসান (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, কোন পুরুষকে কোন মহিলার বদলে হত্যা করা যাবে না–যতক্ষণ না অর্ধেক ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়।

শাবী (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করল, তখন তার অভিভাবকগণ আলী (রা.) এর নিকট এ ব্যাপারে জানাল। তখন তিনি বললেন, যদি তোমরা ইচ্ছা তবে তোমরা তাকে হত্যা করতে পার এবং মহিলার দীয়ত এর উপর পুরুষের দীয়ত বা ক্ষতিপূরণের অতিরিক্ত ফেরত দিয়ে দিবে। আর অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন যে, বরং এ আয়াত নাযিল হয়েছে সেসব সম্প্রদায় সম্পর্কে যারা মহিলার কিসাসরূপে পুরুষদেরকে হত্যা করতো না, কিন্তু তারা পুরুষের কিসাসারূপে পুরুষ এবং মহিলার কিসাসরূপে মহিলাকে হত্যা করতো। পরিশেষে, আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত–كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ দ্বারা সকলের মধ্যে একটি সাধারণ হুকুমজারি করেছেন। তাই তাদের সকলকেই একে পরের কিসাস গ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট করে দিলেন। যারা এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তাদের স্বপক্ষে নিম্নের হাদীস বর্ণিত হল।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে মহান আল্লাহ্র বাণী– و الانثى بالانثى সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, এ আয়াত নাযিলের কারণ হল, তারা কোন মহিলার কিসাসরূপে পুরুষকে হত্যা করতো না। বরং তারা পুরুষের কিসাসে পুরুষ এবং মহিলার কিসাসে মহিলাকে হত্যা করতো। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত النفس بالنفس নাযিল করেন। ইচ্ছাকৃত হত্যার ব্যাপারে স্বাধীন নারী–পুরুষ উভয়েই সমান এবং দাসদের নারী–পুরুষও উভয়ই সমান।

আর যে কারণে এ আয়াত নাযিল হয়েছে তাতে যদি বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তি হয়, যা আমরা এর আগে বর্ণনা করেছি,তবে আমাদের উপর (واجب) কর্তব্য হবে এর সঠিক ব্যবহার করা, যে সম্পর্কে সাধারণভাবে সুষ্ট হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, স্বাধীনা নারীর জীবনের বিনিময়ে স্বাধীন পুরুষের জীবন قصاص (খুনের বদলা) জন্য যিম্মাদার থাকবে। যখন তা এরূপ হয় এবং দাসী ও নারী–পুরুষের রক্তপণ (دية) এর বেলায় সম্মিলিতভাবে অতিরিক্ত কিছু প্রত্যাবর্তনের বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগে হয়, যা আমরা অন্যান্যদের কথার বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছি, তা হলে তাদের কথা প্রকাশ্য ভুল বলে

পরিগণিত হবে, যারা ঐ ব্যাপারে قصاص এর কথা বলেছেন এবং দু'টি রক্তপণ (دية) মধ্যে **অতিরিক্তটুকু** সম্মিলিতভাবে প্রত্যাবর্তনের কথা বলেছেন, সে মতে ইসলামের সমস্ত আলিমগণের সম্মিলিত বক্তব্যানুসারে কোন নিহিত ব্যক্তির শরীর থেকে কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আংশিক বিনিময় **গ্রহণ হারাম** বা অবৈধ। কাজেই, এর সবটুকু পরিত্যাগ করেছেন। সে (قاتل) ব্যতীত অন্যের নিকট হতেও ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করা حرام (অবৈধ)। যেমন এ কারণে তার বদলে কোন (عوض) বিনিময় দান **গ্রহণ** করাও হারাম করা হয়েছে। অতএব (واجب) কর্তব্য হল স্বাধীন নারীর জীবনের বিনিময়ে স্বাধীন **পুরুষের** জীবন যিম্মাদার থাকবে। যদি বিষয়টি তাই হয়, তবে মহান আল্লাহ্র উল্লিখিত বাণী– الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে না। বরং এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে (حر) স্বাধীন ব্যক্তির বদলে (عبد) দাস থেকে কিসাস গ্রহণ করা যাবে না ; এবং (الانثى) নারীকে ও **পুরুষের** বদলে হত্যা করা যাবে না, এবং পুরুষকেও (الانثى) নারীর বদলে নয়। যদি বিষয়টি তাই হয়, তবে এখানে আয়াতের শেষ দু'টি অর্থের যে কোন একটি প্রযোজ্য হবে। এ ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য হল হত্যাকারী এবং অপরাধী ব্যতীত অন্য কারো উপর قصاص (খুনের) বদলা প্রযোজ্য হবে না। তাই (হত্যাকারী) নারীর বিনিময়ে পুরুষকে, এবং দাসের বদলে স্বাধীনকে পাকড়াও করা হবে। আর এ ব্যাপারে দ্বিতীয় কথা হল যে, এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে বিশেষ একটি সম্প্রদায় সম্পর্কে যাদেরকে হযরত নবী করীম (সা.) তাদের একজনকে অপর জনের হত্যার বিনিময়ে রক্তপণকে (قصاص) কিসাস হিসাবে গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। যেমন হযরত সূদ্দী (র.) বলেছেন, যার কথা আমরা এর আগেই বর্ণনা করেছি। আর সকল তাফসীরকারগণই দ্বিধাহীনচিত্তে এ কথার উপর একমত হয়েছেন যে, (حقوق) অধিকারের মধ্যে পারস্পরিক (قصاص) বদলা গ্রহণ (غير واجب) অত্যাবশ্যক নয়। সকলেই এ কথার উপর একমত হয়েছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা (قصاص) কিসাসের ব্যাপারে এ ধরনের কোন ফায়সালা দেননি। তারপর তাকে (منسوخ) বাতিল করে দিয়েছেন। যদি বিষয়টি তাই হয়, তবে মহান আল্লাহ্র উল্লিখিত কালাম– كتب عليكم القصاص এর অর্থ হবে فُرِضَ **অর্থাৎ** কিসাস (قصاص) ফরয করা হয়েছে। প্রকাশ থকে যে, এ বক্তব্যটি ঐ ব্যক্তির কথার **পরিপন্থী**–যিনি বলেছেন, অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের উপর যে কাজ করা ফরয তাতে তাদের জন্য তা সম্পাদন না করার কোন এখতিয়ার নেই। আর সকল তফসীরকারগণই একথার উপর একমত যে, অধিকার প্রাপ্তদের জন্য একজন অপরজন থেকে (قصاص) কিসাস গ্রহণের অধিকারের মধ্যে এখতিয়ার রয়েছে। তাই যখন একথা নির্দিষ্ট হয়ে গেল যে, এ ধরনের ব্যাখ্যা বাতিল যোগ্য–যা

আমরা উল্লেখ করলাম। তখন ঐ বিষয়ে আমরা ইতিপূর্বে যা বর্ণনা করেছি তাই (صحيح) সঠিক বলে গণ্য হবে।

যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, যখন উল্লেখ করা হল যে, كتب عليكم القصاص এর অর্থ–فُرِضَ عليكم القصاص এমতাবস্থায় বক্তার বক্তব্য অনুসারে رسم الخط এ বর্ণিত كتاب এর অর্থ কিভাবে এরূপ হল–তা বুঝানো গেল না। কাজেই এ ব্যাপারে আপনার কাছে কি প্রমাণ আছে যে, মহান আল্লাহ্‌র বাণী–كتب এর অর্থ فُرِضَ করা হয়েছে ? জবাবে বলা হবে যে, এরূপ অর্থের ব্যবহার আরবী ভাষায় বিদ্যমান আছে এবং তাদের বিভিন্ন কবির কবিতায় ও এর প্রয়োগ দেখা যায়। এ মর্মে তাদের একজন কবির কবিতাংশ বর্ণিত হল।

كتب القتل و القتال علينا + وعلى المحصنات جر الز يول –

এমনিভাবে বনী জুদাহ্ এর কবি নাবেগার একটি কবিতাংশ ও বর্ণিত হল।

يا بنت عمى كتاب الله اخرجنى + عنكم فهل امنعن الله ما فعلا–

উল্লিখিত দু'টি পংক্তিতে كتاب শব্দের অর্থ فرض অত্যাবশ্যকীয়–অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এরূপ অর্থের ব্যবহার তাদের কথা ও কবিতায় অসংখ্য বর্ণিত হয়েছে। যদিও তাদের ব্যবহারিক ভাষায় এর অর্থ فَرض হয়েছে। কিন্তু আমার নিকট এর প্রমাণ রয়েছে যে, এরূপ অর্থ কিতাবুল্লাহ্‌র رسم خط (লেখা থেকেই) নেয়া হয়েছে। এরূপ অর্থ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবেও ঘোষণা করেছেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের উপর যা কিছু লিখেছেন, অর্থাৎ ফরয করেছেন এবং তারা যে কোন কাজ করে–এসব কিছুই (لوح محفوظ) লাওহে মাহফুজে সংরক্ষিত আছে। একথার উল্লেখপূর্বক আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে বর্ণনা করেছেন بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ (সূরা বুরূজ ঃ ২১)

আরো তিনি ইরশাদ করেছেন, اِنَّهٗ لَقُرْآنٌ كَرِيْمٌ فِيْ كِتَابٍ مَّكْنُوْنٍ (সূরা ওয়াকিয়াহ্ ঃ ৭৭) অতএব এর দ্বারা একথা স্থির হয়েছে যে, যা কিছু আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের উপর ফরয করেছেন, তা লাওহে মাহফুজের মধ্যে লিখিত রয়েছে। মহান আল্লাহ্‌র কালামের অর্থ যখন তাই হয় তখন كتب عليكم القصاص এর অর্থ হবে– كتب عليكم فى اللوح المحفوظ القصاص فى القتلى فرضا অর্থাৎ নিহত ব্যক্তিগণের ব্যাপারে তোমাদের উপর قصاص খুনের বদলা নেয়া–লাওহে মাহ্ফুযে লিপিবদ্ধ হয়েছে (فرض) ফরযরূপে। যেন তোমরা হত্যাকারী ব্যতীত নিহত ব্যক্তির বদলে অন্য কাউকে হত্যা না কর। قصاص শব্দের ব্যবহার তাদের ব্যবহারিক জীবনেও পাওয়া যায়। যেমন কোন ব্যক্তির উক্তি–

قاصصت فلانا حقي قبله من حقه قبلي (অমুক ব্যক্তি)–কে আমার প্রাপ্য বন্টন করে দিলাম, তার প্রাপ্য চাওয়ার পূর্বেই)। হত্যাকারী হত্যার বিনিময়ে যাকে হত্যা করা হয় তাই হল **قصاص**–বা বদলা। কেননা, তা **مفعول به** হয়েছে, এর অর্থ হল–যে তাকে হত্যা করেছে তার অনুরূপ কর্ম করা। যদি দু'টি কর্মের একটি অত্যাচারমূলক হয় এবং অপরটি হয় সত্য, তবে তা উভয়ের জন্যেই হবে। আর যদি এভাবে মতবিরোধ হয়, তবে উভয়ই একথায় একমত হবে যে, তাদের প্রত্যেকেই তার সাথীর সাথে এমন ব্যবহার করবে–যেরূপ তার সাথে করা হয়েছে। আর প্রথম নিহত ব্যক্তির অভিভাবক যখন হত্যাকারীর অভিভাবককে **قصاص** খুনের বদলা হিসাবে হত্যা করে, তখন তা যদি তার হত্যার কারণে ঐ ব্যক্তির হত্যা সাব্যস্ত হয়, যে তাকে হত্যা করেছে, তবে নিহত ব্যক্তির (**ولى**) অভিভাবকই যেন সে ব্যক্তি যে তার হত্যাকারীর হত্যার **ولى** অভিভাবক হিসাবে তার নিকট হতে **قصاص** খুনের বদলা গ্রহণ করেছে।

القتلى শব্দটি বহুবচন হল–**قتيل** শব্দের। যেমন **الصرعى** শব্দটি বহুবচন হল–**صريع** শব্দের। **الجرحى** শব্দটি বহুবচন হল–**جريح** শব্দের। আর **فعيل** শব্দটি **فعلى** শব্দের উপর (**جمع**) বহুবচন হয় যখন তা **موصوف** এর **صفت** হিসেবে হয়–। তখন এর অর্থ হবে–**الزمانة** (চিরস্থায়ী রোগ) এবং**والفور** হল–এমন ধরনের ক্ষতি বা রোগ যার সাথে তার সঙ্গী ধ্বংসস্থল কিংবা মৃত্যুস্থল থেকে সুস্থ হওয়ার বা বাঁচার কোন ক্ষমতা রাখে না। যেমন–**القتلى فى معاركم** তাদের যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তিবর্গ। **والصرعى فى مواضعهم** তাদের স্থানে ধ্বংসপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ। **الجرحى** এবং এর অনুরূপ যেসব শব্দ রয়েছে। এমতবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার কালামের ব্যাখ্যা হবে–হে মু'মিনগণ ! নিহত ব্যক্তিগণের ব্যাপারে তোমাদের উপর (**قصاص**) খুনের বদলা (**فرض**) অত্যাবশ্যক করা হয়েছে। যেন স্বাধীনের বদলে স্বাধীন, দাসের বদলে দাস এবং নারীর বদলে নারী হয়। এরপর **اَنْ يُقتص** (যেন বদলা নেয়া হয়) কথাটির উল্লেখ পরিত্যাগ করা হয়েছে। কেননা মহান আল্লাহ্র কালাম **كتب عليكم القصاص عليه** আয়াতাংশই ঐকথা প্রমাণের জন্য যথেষ্ঠ।

মহান আল্লাহ্র কালাম–**فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيْهِ شَيْئٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُفِ وَ اَدَاءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ** তবে যাকে তার ভাইয়ের তরফ থেকে কিছুমাত্র মার্জনা করে দেয়া হয়, তার পক্ষে যথাদস্তুর তা মেনে চলা এবং উত্তমভাবে তাকে তা আদায় করা চাই। ব্যাখ্যা ঃ তাফসীরকারগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের কেউ কেউ বলেছেন, যে ব্যক্তি হত্যার ব্যাপারে অত্যাচারিত অবস্থায় কোন ওয়াজিব বিষয় পরিত্যাগ করে , তবে তার ভাইয়ের জন্য খুনের বদলা নেয়ার

অধিকার রয়েছে। এবিষয়েই আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, فمن عفى له من اخيه شئى "যদি কেউ তার ভ্রাতা কর্তৃক কোন বিষয়ে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়" তখন হত্যাকারীর دية (অর্থদন্ড) আদায়ের পূর্বে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য ক্ষমাকারীর অনুসরণ করা (واجب) অত্যাবশ্যকীয় ! তা তার জন্য অনুগ্রহ বা সৌজন্যমূলক আচরণ। যাঁরা এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন–তাঁদের স্বপক্ষে নিম্নের হাদীস বর্ণিত হল।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে–فمن عفى له من اخيه شئى সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, এখানে العفو শব্দের অর্থ ইচ্ছাকৃত হত্যা (قتل عمد) এর ব্যাপারে دية (ক্ষতিপূরণ) গ্রহণ করা। আর اتباع بالمعروف এর অর্থ সদ্ভাবে তা প্রার্থনা করা এবং সৌজন্যমূলকভাবে তা আদায় করে দেয়া।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে–বর্ণিত হয়েছে যে, মহান আল্লাহ্র কালাম–فمن عفى له من اخيه شئى فاتباع بالمعروف و اداء اليه باحسان সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে, এ হুকুম (قتل عمد) ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যার ব্যাপারে যখন دية প্রদানের মালিক ক্ষতিপূরণ দিতে সম্মত থাকে। আর اتباع بالمعروف এর অর্থ দীয়াত প্রার্থীকে এর দ্বারা প্রার্থীত বস্তু তার কাছে সৌজন্যমূলকভাবে প্রদানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি دية (ক্ষতিপূরণ) গ্রহণ করবে–তা হবে তার নিকট হতে (عفو) ক্ষমাতুল্য। আর اتباع بالمعروف এর অর্থ–তার ভাই কর্তৃক ক্ষমাপ্রাপ্ত বিষয় সৌজন্যমূলকভাবে তার নিকট আদায় করে দেয়া।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে আল্লাহ্র কালাম–

فمن عفى له من اخيه شئى فاتباع بالمعروف و اداء اليه باحسان এর অর্থ হল (دية) অর্থদন্ড প্রার্থীকে তা প্রার্থনার সময় সদ্ভাবে প্রার্থনা করা। আর و اداء اليه باحسان এর অর্থ প্রার্থিত বস্তু সৌজন্যমূলকভাবে আদায় করে দেয়া।

হযরত মুজাহিদ (রা.) থেকে–فمن عفى له من اخيه شئى فاتباع بالمعروف و اداء اليه باحسان সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, এখানে العفو (ক্ষমা) এর অর্থ–(الدم) খুনের বদলা নেয়ার বিষয়ে ক্ষমা করে দেয়া এবং এর বিনিময়ে (دية) ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করা।

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে فمن عفى له من اخيه شئى সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, এর মর্মার্থ–الدية ক্ষতিপূরণ গ্রহণ ।

হযরত হাসান (রা.) থেকে و اداء اليه باحسان সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে,তিনি বলেছেন (دية) ক্ষতিপূরণ প্রাপক যেন তা মোলায়েমভাবে দাবী করে। এমনিভাবে প্রাপ্য বস্তু যেন দাতা ব্যক্তি-সৌজন্যমূলকভাবে আদায় করে দেয়।

হযরত মুজাহিদ (রা.) থেকে فمن عفى له من اخيه شئى فاتباع بالمعروف সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, এখানে العفو (ক্ষমা এর অর্থ খুনের বদলা কিসাস ক্ষমা করে দেয়া এবং এর বিনিময়ে ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করা।

শাবী (র.) থেকে-আল্লাহ্র কালাম-فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيْهِ شَئْىٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَ اَدَاءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, ইচ্ছাকৃত হত্যার বেলায় নিহত ব্যক্তির অভিভাবক ক্ষতিপূরণ নিতে সম্মত হওয়া।-

শাবী (র.) থেকে অপর এক সূত্রে অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

হযরত কাতাদা (র.) থেকে فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيْهِ شَئْىٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَ اَدَاءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, কোন ব্যক্তি কাউকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করল। তারপর তাকে খুনের বদলা নেয়া থেকে ক্ষমা করে দেয়া হল-এবং তার নিকট হতে ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করা হল। বর্ণনাকারী বলেন, فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ এর অর্থ প্রাপক সুন্দরভাবে তার প্রাপ্য দাবী করার নির্দেশ দেয়া হল। আর ক্ষতিপূরণ আদায়কারীকে সৌজন্যমূলকভাবে আদায়ের নির্দেশ দেয়া হল। ইচ্ছাকৃত হত্যার শাস্তি হল খুনের বদলা নেয়া। ইহাতে কিসাসের বিকল্প কোন ব্যবস্থা নেই।

কিন্তু যদি তারা অর্থদন্ড গ্রহণে সম্মত হয়। অর্থদন্ড দিতে তারা সম্মত হয়, তবে একশত উট প্রদানে করতে হবে। আর যদি তারা বলে যে, আমরা এত সংখ্যক দিতে সম্মত নই, বরং এই পরিমাণ দিতে চাই। তবে তারা তাই পাবে।

হযরত কাতাদা (র.) থেকে উপরোক্ত আয়াতাংশ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। যে, তিনি বলেছেন, প্রার্থনাকারী এ বিষয়ে সদ্ভাবে প্রার্থনা করবে এবং প্রাপ্য বস্তু সৌজন্যমূলকভাবে আদায় করে দেবে।

হযরত রাবী (রা.) থেকে উক্ত আয়াতাংশ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করল, তারপর তাকে ক্ষমা করে দেয়া হল-এবং তার নিকট হতে ক্ষতিপূরণ নেয়া হল। তিনি বলেন, فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ এর অর্থ-অর্থদন্ডকারী ব্যক্তিকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে-সে যেন তা সৌজন্যমূলকভাব গ্রহণ করে এবং তা আদায়কারীকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সে যেন তা সদ্ভাবে আদায় করে দেয়।

হযরত ইবনে জুরাইজ (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আমি আতা (র.)-কে فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيْهِ شَئى فَاتِّبَاعٌ بِالمَعرُوفِ وَ اَدَاءٌ اِلَيهِ بِاِحسَانٍ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তখন তিনি বললেন, ঐ

ব্যাপারে যখন রক্তপণ গ্রহণ করা হয় তখন তাকেই عفو (ক্ষমা) বলে।

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত যখন دية গ্রহণ করল, তখন অবশ্যই (قصاص) কিসাস ক্ষমা করে দেয়া হল। এর অর্থই হল– فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيْهِ شَيْئٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَ اَدَاءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ এ সম্পর্কে বর্ণনাকারী বলেন যে, আরায (রা.) মুজাহিদ (রা.) থেকে উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এর মধ্যে এটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, যখন دية গ্রহণ করল তখন তার উপর কর্তব্য হবে এ ব্যাপারে সদ্ভাব অনুসরণ করা। আর যে, ব্যক্তি কিসাস ক্ষমা করে দেয়া হল তার উপর কর্তব্য হল সৌজন্যমূলকভাবে তা আদায় করে দেয়া।

হযরত ইবনে যায়েদ (র.) বলেছেন, وَ اَدَاءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ এর অর্থ হল–তোমাকে ক্ষমা করে দেয়া হলো।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে মহান আল্লাহ্ তা'আলার বাণী– فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيْهِ شَيْئٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَ اَدَاءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, এর মর্মার্থ হল রক্তপণ বা ক্ষতিপূরণ। যেন তার প্রার্থী সদ্ভাবে তা চায় এবং তা যেন সদ্ভাবে তার কাছে আদায় করে দেয়া হয়। অর্থাৎ প্রার্থিত বিষয় যেন সে সৌজন্যমূলকভাবে আদায় করে দেয়। আর অন্যান্য মুফাসসীরগণ বলেন যে, মহান আল্লাহ্র বাণী এর মর্মার্থ যার প্রতি অনুগ্রহ করা হল এবং যাকে অবসর দেয়া হল। তারা বলেন, মহান আল্লাহ্র বাণী–فمن عفى এর মর্মার্থ যার প্রতি অনুগ্রহ করা হল এবং যাকে অবসর দেয়া হল। তারা বলেন, মহান আল্লাহ্র বাণী–من اخيه شئى এর মর্মার্থ ঃ من دية اخيه شئى অর্থাৎ তার ভ্রাতার অর্থ দন্ডের কিছু ক্ষতি পূরণ বুঝায়। কিংবা তার আঘাতের বদলা বুঝায়। কাজেই হত্যাকারী কিংবা আঘাতকারী থেকে নিহত ব্যক্তির ولى এর যে প্রতিশোধ নেয়া বাকী রয়েছে তা হত্যাকারী কিংবা আঘাতকারী থেকে সৌজন্যমূলকভাবে আদায় করা এবং হত্যাকারী কর্তৃক অর্থদন্ড বা ক্ষতি পূরণ সৌজন্যমূলকভাবে প্রদান করা। তা ঐ ব্যক্তির কথা যিনি মনে করেন যে, এ আয়াত নাযিল হয়েছে এ মর্মে যে, يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى হে বিশ্বাসীগণ ! তোমাদের উপর নিহতগণের খুনের বদলা ফরয করা হয়েছে, যারা হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর সময়ে পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদের মধ্যে তার মীমাংসা করার নির্দেশ দিলেন। কাজেই তাদের একজন অপর জন থেকে অর্থদন্ডের মাধ্যমে বদলা গ্রহণ করবে। আর একজন অপর জনকে দিয়ে দেবে যা তার নিকট বাকী থাকে আমি মনে করি যে, এ কথার যিনি প্রবর্তক তিনি এ স্থানে ক্ষমার ব্যাখ্যাটাই অধিক প্রধান্য দিয়েছেন। মহান আল্লাহ্র উল্লিখিত حتى عفوا এ ব্যক্তব্য অনুসারে। কাজেই তাদের নিকট বাক্যের অর্থ ইতিপূর্বে হত্যাকারীর ভ্রাতার জন্য যা অধিক

যুক্তিযুক্ত মনে হয়ে ছিল। যারা এ অভিমত ব্যক্ত করেন তাঁদের স্বপক্ষে নিম্নের হাদীস বর্ণিত হল।

সুদ্দী (র.) থেকে–فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, যার জন্য তার ভাইয়ের রক্তপণ থেকে কিছু বাকী রয়েছে কিংবা যার আঘাতের বদলা বাকী রয়েছে, সে যেন সদ্ভাবের অনুসরণ করে এবং অপরপক্ষ যেন সৌজন্যমূলকভাবে তার প্রতি তা আদায় করে দেয়।

আমরা হাসান (রা.) এবং আলী (রা.) থেকে আল্লাহ্‌র বাণী– كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ সম্পর্কে যে, কথা বর্ণনা করেছি, এর ব্যাখ্যার ব্যাপারে কর্তব্য হবে এমনভাবে এর অর্থ করা যে, পুরুষ ব্যক্তির রক্তপণের বিনিময়ে নারীর রক্তপণ বদলা গ্রহণ এবং স্বাধীন ব্যক্তি থেকে দাসের রক্তপণ দ্বারা কিসাস গ্রহণ করা। আর দু’ ব্যক্তির রক্তপণ অতিরিক্ত এভাবে প্রত্যাবর্তন করা যে, তখন فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ এর অর্থ হবে যে, ব্যক্তি তার ভ্রাতা কর্তৃক অত্যাবশ্যকীয় বিষয় যেমন তাদের একজনের রক্তপণ দ্বারা অপরজনের দীয়াত এর বিনিময়ে বদলা গ্রহণ এবং নিহত ব্যক্তির অভিভাবকের অর্থ দন্ড দ্বারা কিসাস গ্রহণের ব্যাপারে সদ্ভাবের অনুসরণ করা এবং হত্যাকারীর জন্য তা তার প্রতি সৌজন্যমূলকভাবে আদায় করে দেয়া কর্তব্য।

অতএব আল্লাহ্‌র বাণী–فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ সম্পর্কে বর্ণিত বক্তব্যসমূহের মধ্যে আমার নিকট সব চেয়ে অধিক পসন্দনীয় ও সঠিক কথা হল যে ব্যক্তি ভাইয়ের উপর বাদলা গ্রহণ অত্যাবশ্যকীয় থাকা সত্ত্বেও রক্তপণ পূরণ গ্রহণ করে সদ্ভাবের অনুসরণ করেছে। তাই হল ক্ষমাকারী অভিভাবকের পক্ষ থেকে অর্থদন্ডের মাধ্যমে খুনের বদলা ক্ষমা করতে সম্মত থেকে হত্যাকারী হতে অর্থদন্ড গ্রহণ করাই হল তার প্রতি ইহসান প্রদর্শনের শামিল। কেননা, এ সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে এর কারণসমূহ বর্ণনা করেছি যে, আল্লাহ্‌র বাণী– كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ এর অর্থ হল–ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যাকারী এবং আঘাতকারী বা যখমকারী ব্যক্তিবর্গ থেকে বদলা গ্রহণ করা। এমনিভাবে তাদের থেকে ক্ষমা প্রদর্শনও এর অন্তর্গত। আর আল্লাহ্‌র বাণী– فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ এর মর্মার্থ হল– আল্লাহ্ তা’আলা হত্যাকারী ব্যক্তির অভিভাবকের উপর যে সত্য বিষয় অনুসরণ করা অত্যাবশ্যক করেছেন, তা বুঝায়। তার উপর এমন কিছু অতিরিক্ত বিষয় আরোপ করা যাবে না–যা ফরযের অন্তর্ভুক্ত নয়। কিংবা তা ব্যতীত । অথবা এমন কিছু বিষয় তার উপর বাধ্যতামূলক করা যাবে না–যা তার উপর আল্লাহ্ তা’আলা অত্যাবশ্যক করে দেননি। যেমন নিম্নের হাদীসে তা বর্ণিত হয়েছে।

কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, নবী করীম (সা.) থেকে আমাদের নিকট হাদীসের বাণী পৌছেছে যে, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি একটি উটও অতিরিক্ত দাবী করল, অর্থাৎ রক্তপণের নির্ধারিত উট থেকে দাবী করা জাহেলিয়া যুগের কর্মকান্ডের অন্তর্গত। আর অর্থদন্ড আদায়ের ব্যাপারে অপর জনের সৌজন্যমূলক আচরণ হল হত্যার কারণে নিহত ব্যক্তির অভিভাবকের জন্য আল্লাহ্ তা’আলা যা কিছু প্রদান করা হত্যাকারীর উপর অত্যাবশ্যকীয় করে দিয়েছেন, তা

যথাযথভাবে আদায় করে দেয়া। এ ব্যাপারে তার যা প্রাপ্য তা থেকে যেন কম না হয় এবং প্রার্থিত বিষয়ের চাহিদা যেন উপেক্ষা করা না হয়।

এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, কিভাবে فاتباع بالمعروف و اداء اليه باحسان কথাটি বলা হল ? আর কেনই বা فاتباعا بالمعروف و اداء اليه باحسان এ ভাবে বলা হল না। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب এভাবে বলেছেন। এর প্রতি উত্তরে বলা হয়েছে যে, যদি অবতীর্ণ আয়াতে نصب যবর প্রদান করে فاتباعا بالمعروف و اداء اليه باحسان এভাবে বলা হতো, তবে আরবী ভাষায় বৈধ হতো বটে, امر নির্দেশসূচক হিসেবে। যেমন বলা হয় ضربا ضربا আরও যেমন বলা হয়–و اذا لقيت فلانا فتبجيلا و تعظيما কিন্তু আরবী ব্যাকরণে এইরূপ স্থলে যবর থেকে পেশ হওয়াই অধিকতর শুদ্ধ। এমনিভাবে অনুরূপ প্রত্যেক দৃষ্টান্তের বেলায়েই যা সাধারণত ফরয হিসেবে নির্ধারিত হয়ে কারো বেলায় কার্যকরী হয় এবং কারো বেলায় কার্যকরী হয় না। যখন কার্যকরী হয় তখন তা মুস্তাহাব বা ঐচ্ছিক হিসাবে হয় না। পেশ হওয়ার সময় فمن عفى له من اخيه شئى এর মধ্যে اتباع بالمعروف সদ্ভাবে অনুসরণে নির্দেশ হবে এবং সৌজন্যমূলকভাবে রক্তপণ নিহত ব্যক্তির অভিভাবকের নিকট প্রদান করা বুঝাবে। কিংবা তাতে সদ্ভাবে অনুসরণের হুকুমে বুঝাবে। আরবী ভাষার কোন কোন পন্ডিত ব্যক্তি বলেছেন, তাতে পেশ হলে مَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ اَخِيْهِ شَئْىٌ এর অর্থ দাঁড়াবে فعليه اتباع بالمعروف অর্থাৎ তার উপর সদ্ভাবে অনুসরণ করা কর্তা। এও একদলের অভিমত। এ ব্যাপারে সর্ব প্রথম আমরা যা বললাম, তাই কালামুল্লাহ্‌র প্রকৃত ব্যাখ্যা। এমনিভাবে কুরআন শরীফে অন্যান্য প্রত্যেক দৃষ্টান্তের বেলায়েই এরূপ ব্যাখ্যা প্রযোজ্য হবে। আর যদি এরত পেশ দেয়া হয় সেই অনুপাতে, যা আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করলাম, তবে তা দৃষ্টান্ত হবে আল্লাহ্‌র এই কালামের–فامساك بمعروف او এবং আল্লাহ্‌র বাণী و من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم এবং تسريح باحسان এর অনুরূপ। আর আল্লাহ্‌র বাণী –فضرب الرقاب এখানে যবর-ই সঠিক হরকত। বাক্যের একটি ব্যবহারিক পদ্ধতি। কেননা এইরূপ পদ্ধতিতে বাক্য প্রয়োগ করে আল্লাহ্ তা'আলা আপন বান্দাদেরকে শত্রুর মুকাবিলার সময় যুদ্ধের প্রতি উৎসাহিত বা উত্তেজিত করেছেন। যেমন বলা হয় যখন তোমারা শত্রুর মুকাবিলা করবে তখন তোমারা আল্লাহু আকবার এবং تهليل অর্থাৎ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলবে। এইরূপ নির্দেশ দেয়া হয়েছে শুধু আল্লাহু আকবার বলার প্রতি উৎসাহ প্রদানের জন্য, অত্যাবশ্যক বা অলংঘনীয় হিসাবে নয়।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী– ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ তা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে লঘু বিধান ও করুণা এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ঃ

আল্লাহ্‌র উল্লিখিত বাণী ذلك–এর মর্মার্থ হল– ذلك الذى حكمت به (ঐ হুকুম যা আমি তোমাদেরকে প্রদান করলাম)। হে উম্মতে মুহাম্মদী ! হত্যাকারী থেকে নিহত ব্যক্তির অভিভাবকের খুনের বদলা নেয়ার পরিবর্তে অর্থদন্ড গ্রহণের প্রথা আমি তোমাদের জন্য প্রচলন করেদিলাম এবং তা আমার পক্ষ হতে তোমাদের জন্য বৈধ করে দিলাম। এতে তোমরা অর্থদন্ড বা ক্ষতি পূরণের সম্পদ গ্রহণ করে সত্বাধিকারী হয়েছে। অথচ আমি তোমাদের পূর্ববর্তী সকল সম্পদায়ের জন্য তা নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলাম। এটাই تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ (তোমাদের প্রতিপালকের লঘু বিধান)। আল্লাহ্ বলেন, এটা আমার পক্ষ হতে তোমাদের জন্য সহজ বিধান, যা আমি তোমাদের ব্যতীত অন্যান্য সম্পদায়ের উপর হারাম করে কঠিনতা আরোপ করেছিলাম। আর এখন ইহা আমার পক্ষ হতে তোমাদের জন্য করুণাস্বরূপ হয়েছে। যেমন এ সম্পর্কে নিম্নে হাদীস বর্ণিত হল ঃ

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, বনী ইসরাঈলের জন্য কিসাস বাধ্যতামূলক ছিল। তাদের জন্য অর্থদন্ডের প্রথা বৈধ ছিল না। অতএব, আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতের মাধ্য– كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلَى اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ থেকে নিয়ে– فَمَنْ عُفِىَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَئٌ পর্যন্ত অবতরণ করে বলেন যে, ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যার বেলায় দিয়্যত গ্রহণ করে ক্ষমা প্রদর্শনের প্রথা প্রচলন করা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে এক সহজ বিধান। তিনি বলেন, যে নির্দেশ তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য কঠিন ছিল তা তোমাদের জন্য সহজ করে দেয়া হয়েছে। যেন প্রাপক তা সদ্ভাবে প্রার্থনা করে এবং প্রদানকারী যেন সৌজন্যমূলকভাবে তা আদায় করে দেয়।

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তিগণ নিহত ব্যক্তির হত্যার বিনিময়ে হত্যাকারীকে হত্যা করতো। তাদের নিকট হতে অর্থদন্ড গ্রহণ করা হতো না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা– يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلَى اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ الاى থেকে নিয়ে শেষ আয়াত পর্যন্ত নাযিল করেন। এটাই তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে সহজ পদ্ধতি। তিনি বলেন, তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য অর্থদন্ড গ্রহণের প্রথা প্রচলিত ছিল না। কাজেই তোমাদের জন্য অর্থদন্ড গ্রহণ একটা লঘু বিধান। যে ব্যক্তি দিয়্যত গ্রহণ করে সেটাই তার নিকট হতে ক্ষমার ক্ষমাতুল্য।

আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, বনী ইসরাঈলের উপর যে দিয়্যত গ্রহণ হারাম ছিল, সেটাই তোমাদের জন্য বৈধ হওয়ায় তা আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে তোমাদের জন্য সহজ বিধান ও করুণাস্বরূপ হয়েছে।

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, বনী ইসরাঈলের উপর হত্যার ব্যাপারে কিসাস ফরয ছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে হত্যা বা আঘাতের বেলায় রক্তপণ গ্রহণের প্রথা চালু ছিল না। আর ঐ ব্যাপারে আল্লাহ্‌র বাণী– وَ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ الاية

এই আয়াতেই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মদ (সা.) থেকে ঐ আদেশ হালকা করে দিয়েছেন এবং হত্যা ও আঘাতের বিনিময়ে তাদের নিকট হতে অর্থদন্ডের প্রথা কবূল করেছেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ পাকের বাণী-ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ তা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমাদের জন্য লঘু বিধান।

কাতাদা (র.) থেকে আল্লাহ্র বাণী-ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, নিশ্চয়ই তা রহমত বা করুণাস্বরূপ। আল্লাহ্ তা'আলা এর দ্বারা এই উম্মতের জন্য দিয়্যতের মাল খাওয়া হালাল করে অনুগ্রহ করেছেন। অথচ তা তাদের পূর্ববর্তী কোন সম্প্রদায়ের জন্য হালাল ছিল না। তাওরাতের অনুসারীদের জন্য হত্যার ব্যাপারে কিসাস ছিল, অথবা ক্ষমা করে দেয়ার বিধান ছিল নির্ধারিত। এই দু'য়ের মধ্যে আর কোন বিকল্প ব্যবস্থা ছিল না। আর ইনজীল কিতাবের জন্য হত্যার ব্যাপারে ক্ষমা করে দেয়ার নির্দেশ ছিল। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা এই উম্মতে মুহাম্মদী (সা.)-এর জন্য কিসাস গ্রহণ, ক্ষমা করা এবং দিয়্যত গ্রহণের নির্দেশ দিলেন। যদি তারা ইচ্ছা করে তবে উল্লেখিত ব্যবস্থার মধ্যে যে কোনটি নিজেদের জন্য হালাল করে নিতে পারে। এরূপ ব্যবস্থা তাদের পূর্ববর্তী কোন সম্প্রদায়ের জন্য ছিল না।

রাবী (র.) থেকে উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তিনি **ليس بينها سنى** একথাটি তাঁর বর্ণনা উল্লেখ করেননি।

কাতাদা (র.)থেকে আল্লাহ্র বাণী-كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, আমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য দিয়্যতের প্রথা ছিল না। হত্যার ব্যাপারে হয়ত হত্যাই করতে হত, অথবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দিতে হত। এরপর এ আয়াত এমন জাতির জন্য নাযিল হল-যারা সংখ্যায় তাদের চেয়ে অনেক বেশী।

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, বনী ইসরাঈলের উপর খুনের বদলা নেয়া ফরয করা হয়েছিল। আর এই উম্মত থেকে তা লঘু বিধান করা হয়েছে। আমর ইবনে দীনার এই আয়াত-ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ পাঠ করে শুনান। ঐ ব্যক্তির বক্তব্য অনুসারে বলা হয় যে, যিনি বলেছেন, এই আয়াত উল্লেখিত قصاص শব্দের এর অর্থ হল দিয়্যতের মাধ্যমে একজন অপর জন থেকে খুনের বদলা গ্রহণ করা। এর পরিপ্রেক্ষিতে সুদ্দী (র.) বলেন যে, উল্লেখিত আয়াতের ব্যাখ্যা এমন হওয়া উচিত যে, হে মু'মিনগণ ! হত্যার ব্যাপারে অর্থদন্ডের মাধ্যমে একজন অপরজন থেকে খুনের বদলা গ্রহণের যে ব্যবস্থা আমি করেছি এবং নিহত ব্যক্তির হত্যাকারীর সঙ্গী সাথীদের ও অপরাপর ব্যক্তিদের থেকে অত্যাবশ্যকীয়ভাবে কিসাসের নির্দেশ পরিত্যাগপূর্বক তার নিকট হতে অর্থদন্ডের মাধ্যমে যে ব্যবস্থা আমি করেছি, তা আমার পক্ষ হতে তোমাদের জন্য কঠিন বিধান থেকে লঘু বিধান ; এবং আমার পক্ষ হতে তোমাদের জন্য করুণা।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী- فَمَنِ اعْتَدٰى ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গেঃ অর্থাৎ "সুতরাং তারপর যে কেউ সীমালংঘন করবে, তার জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে"। আল্লাহ্‌র উল্লিখিত বাণী- فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ এর মর্মার্থ হল যদি কেউ আল্লাহ্‌র নির্ধারিত অর্থদন্ড গ্রহণের পর সীমা-লংঘনপূর্বক হত্যাকারীর অভিভাবককে অন্যায়ভাবে হত্যা করে এবং রক্তপাত ঘটায়, যে সব অত্যাচার ও সীমালংঘন আমি তাদের উপর হারাম করে দিয়েছি; এতে তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। মুফাস্‌সীর (র.) বলেন, আমি الاعتداء শব্দের অর্থ ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি। এখানে এর পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আর আমি এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে যা কিছু বলেছি, তদ্বিষয়ে অন্যান্য তাফসীরকারগণ যে সব অভিমত ব্যক্ত করেছেন, সে সম্পর্কে নিম্নের হাদীস বর্ণিত হল ঃ

মুজাহিদ (র.) থেকে- فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ ব্যাখ্যা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, এরপর যে ব্যক্তি হত্যা করল, তার জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

মুজাহিদ (র.) থেকে অন্য সূত্রে- فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি দিয়্যত গ্রহণের পর সীমালংঘন করে তার জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

কাতাদা (র.) থেকে আল্লাহ্‌র বাণী- فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে; তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি দিয়্যত গ্রহণের পর সীমালংঘন করে (হত্যাকারীকে) হত্যা করল, তার জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। তিনি বলেন, আমাদের জন্য হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বর্ণনা করেছেন যে, কোন ব্যক্তির দিয়্যত গ্রহণের পর (হত্যাকারীকে) হত্যা করার কোন অধিকার নেই।

কাতাদা (র.) থেকে অপর সূত্রে আল্লাহ্ পাকের বাণী- فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, এর অর্থ হল দিয়্যত গ্রহণের পর হত্যা করা। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি দিয়্যত গ্রহণের পর হত্যা করল, তার উপর হত্যা অত্যাবশ্যক, এমতাবস্থায় তার নিকট হতে তখন দিয়্যত গ্রহণ করা হবে না

রাবী (র.) থেকে আল্লাহ্‌র বাণী- فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি "দিয়্যত" গ্রহণের পর সীমালংঘন করল, তার জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

হযরত হাসান (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, অজ্ঞতার যুগে যখন কোন ব্যক্তি কাউকে হত্যা করতো, তখন সে স্বগোত্রের দিকে পলায়ন করতো। এরপর তার গোত্রের লোকেরা এসে দিয়্যতের মাধ্যমে এর মীমাংসা করতো। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর যখন পলায়নকারী জনসমক্ষে বের হতো এবং নিজের জীবনের নিরাপত্তা হয়েছে বলে মনে করতো, তখন (নিহত ব্যক্তির ওলী কর্তৃক) তাকে হত্যা করা হতো, তারপর তার দিয়্যতের সম্পদ তাদেরকে ফেরত দিয়ে দিতো। বর্ণনাকারী বলেন

যে, তাই হল ذَٰلِكَ الْاِعْتِدَاءُ এর মর্মার্থ।

আবূ আকিল (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, আমি হাসান (র.)-কে এ আয়াত فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيْهِ شَيْئٌ সম্পর্কে বলতে শুনেছি যে, যখন হত্যাকারীকে অণ্বেষণ করে পাকড়াও করতে সক্ষম না হতো, তখন হত্যাকারীর অভিভাবকের নিকট হতে (নিহত ব্যক্তির অভিভাবকগণ) দিয়্যত গ্রহণ করতো ; এবং তার জীবনের নিরাপত্তা দেয়া হতো। এরপর তাকে পাকড়াও করে হত্যা করতো। হাসান (র.) বলেন, দিয়্যত এর যে মাল সে গ্রহণ করল, তাই হল সীমালংঘন।

হারূন ইবনে সুলায়মান (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, আমি ইকরামা (র.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, যে ব্যক্তি দিয়্যত গ্রহণের পর (হত্যাকারীকে) হত্যা করল তার সম্পর্কে । তখন তিনি প্রতি উত্তরে বললেন, তাকে হত্যা করা হবে। এইরূপ হত্যার ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন- فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ এই কথা কি তুমি শোন নি।

সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি দিয়্যত গ্রহণের পর সীমালংঘন করল, এরপর (হত্যাকারীকে) হত্যা করল, তার জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে- فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি দিয়্যত গ্রহণের পর সীমালংঘন করল, তার জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

ইবনে যায়েদ (র.) থেকে- فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, নিহত ব্যক্তির অভিভাবক যখন দিয়্যত গ্রহণ করল, এরপর (হত্যাকারীকে) হত্যা করল, তখন তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

তাফসীরকারকগ العذاب اليم এর অর্থ বর্ণনায় একাধিক মত পোষণ করেছেন, যা আল্লাহ্ তা'আলা নির্ধারিত করে রেখেছেন-ঐ ব্যক্তির জন্য যে নিহত ব্যক্তির অভিভাবক, হত্যাকারী থেকে দিয়্যত গ্রহণের পর সীমালংঘন করল। তাঁদের মধ্য হতে কেউ কেউ বলেন যে, ঐ শাস্তি- ذلك العذاب হল ঐ ব্যক্তির জন্য যে নিহত ব্যক্তির অভিভাবক, হত্যাকারী থেকে অর্থদন্ড (دية) গ্রহণের পর এবং তাকে খুনের বদলা ক্ষমা করে দেয়ার পরে হত্যা করল।

যে ব্যক্তি এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তাঁর স্বপক্ষে নিম্নের হাদীস বর্ণিত হল।

যাহ্হাক (র.) থেকে- فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি হত্যা করল, তার জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। তিনি বলেন, عذاب اليم এর অর্থ عذاب موجع অর্থাৎ-যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

ইকরামা (র.) থেকে- فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি

বলেছেন, এর মর্মার্থ হল–হত্যা করা। আর তাঁদের মধ্য হতে কেউ কেউ বলেন যে, ঐ শাস্তির মর্মার্থ–অপরাধের শাস্তি, যা শাসক অপরাধীর অপরাধ অনুযায়ী প্রদান করে থাকেন।

যাঁরা এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তাঁদের স্বপক্ষে নিম্নের হাদীস বর্ণিত হল ঃ

লাইস (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, একদল নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী বলেছেন যে, নবী করীম (সা.) কসম কিংবা অন্য কিছু দ্বারা অত্যাবশ্যক করে দিয়েছেন যে, ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমা করা হবে না–যে ব্যক্তি অর্থদন্ড গ্রহণ করল এবং (হত্যাকারীকে) ক্ষমা করে দিল, তারপর সীমালংঘনপূর্বক তাকে হত্যা করল।

ইবনে জুরাইজ বলেন, উমার ইবনে 'আবদুল 'আযীয থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (সা.) থেকে 'উমার (রা.)–কে যে চিঠিটি লেখা হয়েছিল, সে সম্পর্কে তিনি বলেন, তাতে লেখা ছিল–সীমালংঘন সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা যা উল্লেখ করেছেন, তা হল–যদি কোন ব্যক্তি (অর্থদন্ড) গ্রহণ করে অথবা (قصاص) কিসাস গ্রহণ করে কিংবা যখম বা হত্যার ব্যাপারে শাসক কর্তৃক কোন নিষ্পত্তিকে মেনে নেয়, এরপর একজন অপরজন থেকে স্বীয় (حق) অধিকার নিয়ে সীমালংঘন করে, তবে যে এরূপ করল, সে নিশ্চয়ই সীমালংঘন করল। শাসকের প্রতি এ ব্যাপারে নির্দেশ হল, যার মধ্যে এরূপ অপরাধ প্রবণতা পরিলক্ষিত হবে তাকে শাস্তি প্রদান করা। তিনি বলেন, যদি হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দেয়া হয়, তবে ক্ষমা পরিত্যাগ করে অধিকার আদায়ের প্রার্থনা করা কারো জন্যে এখতিয়ার নেই। কেননা তা এমন নির্দেশ–যে ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা আয়াত নাযিল করেছেন–فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِى شَيْئٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُوْلِ وَ اِلَىٰ اُوْلِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ("যদি তোমরা পরস্পর কোন বিষয়ে ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হও, তবে এর মীমাংসা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল ও জ্ঞানী–গুণীদের প্রতি ছেড়ে দাও।'')

হযরত হাসান (র.) থেকে এক ব্যক্তি সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, সে অপর এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিল এবং এর বিনিময়ে তার নিকট হতে দিয়্যাত গ্রহণ করা হয়েছিল, তারপর নিহত ব্যক্তির ولى (অভিভাবক) হত্যাকারীকে হত্যা করল। হযরত হাসান (র.) বলেন যে, তার নিকট হতেও সেইরূপ দিয়্যত গ্রহণ করা হবে যেরূপ সে গ্রহণ করে ছিল এবং এর বিনিময়ে তাকে হত্যা করা হবে না।

উল্লিখিত মহান আল্লাহ্র কালাম–فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ সম্পর্কে এর আগে বর্ণিত দু'টি ব্যাখ্যার মধ্যে ঐ ব্যাখ্যাটাই অধিক পসন্দনীয় যিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি দিয়্যত গ্রহণের পর হত্যাকারীর অভিভাবককে হত্যা করল, তার জন্য রয়েছে পার্থিব জগতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আর তা হল القتل (হত্যার বিনিময়ে মৃত্যুদন্ড)। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক অত্যাচারিত নিহত ব্যক্তির অভিভাবককে হত্যাকারীর আভিভাবকের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। এ কথা উল্লেখপূর্বক আল্লাহ্

তা'আলা ইরশাদ করেছেন-وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِفْ فِى الْقَتْلِ "কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হলে তার উত্তরাধীকারীকে তো আমি তার প্রতিকারের অধিকার দিয়েছি। কিন্তু হত্যার ব্যাপারে সে কখনো বাড়াবাড়ি না করে।'') (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩৩)

যদি তার ব্যাখ্যা তাই হয়, তবে শরীয়তের সমস্ত জ্ঞানী গুণীগণ একথার উপর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি হত্যাকারীর অভিভাবককে নিহত ব্যক্তির বিনিময়ে দিয়্যত গ্রহণ এবং ক্ষমা প্রদর্শনের পর হত্যা করল, তবে তার হত্যার ব্যাপারে সে অবশ্যই অত্যাচারী বলে সাব্যস্ত হবে। কেননা, আমাদের মতে, যে ব্যক্তি অত্যাচার করে তাকে হত্যা করল, তাকে কর্তৃত্ব প্রদান করা হবে না। এমনিভাবে কিসাসের মধ্যে প্রাধান্যের বেলায়, ক্ষমা প্রদর্শনের বেলায় এবং دية গ্রহণের বিষয়েও একই হুকুম। অর্থাৎ তা হবে তখন ঐচ্ছিক। যদি ব্যাক্যাটি এমনই হয়, তবে এ কথা জানা যে, তা হবে তার জন্য শাস্তিস্বরূপ। কেননা পৃথিবীতে যদিকোন ব্যক্তির উপর শরীয়তের শাস্তি (حد) কার্যকরী হয়, তবে ইহা তার অপরাধের শাস্তি হয়ে যাবে। আর এ জন্য সে পরকালে অভিযুক্ত করা হবে না। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)থেকে ইবনে জুরাইজ বর্ণনা করেন যে, যে ব্যক্তি হত্যাকারীর (ولى) অভিভাবককে হত্যা করল, তাকে ক্ষমা করে দেয়ার পর এবং তার নিকট হতে অর্থদন্ড (دية) গ্রহণের পর, তখন নিহত ব্যক্তির অভিভাবকولى হবে امام বা প্রশাসক, নিহত ব্যক্তির অভিভাকগণ ব্যতীত। এই বক্তব্যটি প্রকাশ্য কিতাবুল্লাহ্র হুকুমের পরিপন্থী। এ কথার উপরই 'উলামাদের ঐক্যমত (اجماع) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা প্রশাসককে প্রত্যেক অত্যাচারিত নিহত ব্যক্তির অভিভাবক (ولى) সাব্যস্ত করেছেন। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ নয়। কেননা এই হুকুম বিশেষ ধরনের নিহত ব্যক্তির বেলায় প্রযোজ্য (অর্থাৎ অত্যাচারিত অবস্থায় নিহত হলে)। অন্যান্য সাধারণ হত্যার বেলায় নয়, যে ব্যক্তিকে হত্যা করা হল সে নিহত ব্যক্তির অভিভাবক হোক, কিংবা অন্য কেউ হোক। আর যে ব্যক্তি তা হতে কোন বিষয়কে নির্দিষ্ট করল,তার নিকট হতে এর মূল (اصل) কিংবা অনুরূপ দৃষ্টান্তের প্রমাণ (برهان) চাওয়া হবে। এ ব্যাপারে এর বিপরীত বক্তব্যও রয়েছে। তারপর নিশ্চয়ই ঐ ব্যাপারে এমন কোন কথা বলা যাবে না যার পরিণামে অনুরূপ বিষয়ের জবাবদিহির অত্যাবশ্যক হবে না। তারপর ঐ ব্যাপারে বলা হল এর পরিপন্থী সর্বসম্মত প্রমাণই সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য যথেষ্ট ,বিশৃংখলা (فساد) সৃষ্টির প্রয়াশ ব্যতীত।

মহান আল্লাহ্র বাণী–

وَ لَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ –

অর্থ ঃ "হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ ! কিসাসের মধ্যে জীবন রয়েছে–যাতে তোমরা সাবধান হতে পার।" (সূরা বাকারা ঃ ১৭৯)

এর মর্মার্থ হল–হে বুদ্ধিমানগণ ! তোমাদের একে অন্যের খুন ও যখমের বদলা গ্রহণকে আমি তোমাদের উপর ফরয করে দিয়েছি, যে সব হত্যাকান্ড তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। তাদ্বারা তেমাদেরকে জীবন দান করা হয়েছে। কাজেই তোমাদের জন্য আমার এ হুকুম বাস্তবায়নের মধ্যে জীবন রয়েছে।

ব্যাখ্যাকারগণ এ আয়াতের একাধিক মত প্রকাশ করেছেন ঃ

তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন যে, এর অর্থ হল–অনুরূপ কথা–যা আমরা বর্ণনা করেছি। যাঁরা এ অর্থ গ্রহণ করেছেন তাদের স্বপক্ষে বর্ণনা ঃ

হযরত মুজাহিদ (র.) উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তা হলো কৃতকর্মের শাস্তি।

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে অন্যসুত্রে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

হযরত কাতাদা (র.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা কিসাস গ্রহণের মধ্যে জীবন দিয়েছেন। আর মূর্খ ও অজ্ঞ লোকদের জন্য তাকে শাস্তি হিসেবে স্থির করেছেন। অনেক লোকই বিশৃংখলা বা ধ্বংসের চরমসীমায় গিয়ে পৌঁছতো, যদি কিসাসের ভয় না থাকতো। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা কিসাসের একজনকে অপরজন থেকে রক্ষা করেছেন। মহান আল্লাহ্র প্রত্যেক নির্দেশের মধ্যেই ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ রয়েছে–আর আল্লাহ্ পাকের প্রত্যেক নিষিদ্ধ কাজের মধ্যেই পার্থিব ও ধর্মীয় অকল্যাণ বা অশান্তি রয়েছে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন কিসে তাঁর সৃষ্টির কল্যাণ হবে।

হযরত কাতাদা (র.)– و لكم فى القصاص حيوة الاية থেকে সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা কিসাস গ্রহণের মধ্যে জীবন দিয়েছেন। কেননা, এর মাধ্যমে তিনি অত্যাচারী সীমালংঘনকারীকে হত্যা থেকে বিরত থাকার কথা উল্লেখ করেছেন।

হযরত রাবী (র.) থেকে–و لكم فى القصاص حيوة الاية সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা–কিসাসকে তোমাদের জন্য জীবন ও উপদেশমূলক করেছেন। অনেক মানুষই অত্যাচারের চরমসীমায় গিয়ে পৌঁছতো, কিন্তু কিসাসের ভয়–ভীতিই তাকে বিরত রেখেছেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা কিসাসের মাধ্যমে আপন বান্দাদের একজনকে অপরজন থেকে রক্ষা করেছেন।

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে মহান আল্লাহ্র বাণী– و لكم فى القصاص حيوة الاية সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, তাহল কৃতকর্মের শাস্তি।

হযরত ইবনে জুরাইজ (র.) বলেন, এর অর্থ হল জীবন ও প্রতিরোধ ।

হযরত ইবনে যায়েদ (র.) থেকে মহান আল্লাহ্র বাণী– و لكم فى القصاص حيوة الاية সম্পর্কে

বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন এর অর্থ জীবন ও স্থায়িত্ব। যখন কেউ ভয় করে যে, আমাকে হত্যা করা হবে তখন সে মনে করে যে, আমার পক্ষ হতে এর প্রতিরোধ প্রয়োজন। হয়ত সে মনে ভাবে যে, আমার শত্রু আমাকে হত্যা করার ইচ্ছা পোষণ করতেছে, এমতবস্থায় কিসাসের মাধ্যমে হত্যার কথা উথাপিত হয়, তখন সে ভয় করে যে, আমাকে হত্যা করা হবে, এমতবস্থায় কিসাসের মাধ্যমে সেই ব্যক্তির হত্যা প্রতিরোধ করা হয়–যে হত্যার ভয় করতে ছিল। যদি কিসাসের ব্যবস্থা করা না হতো, তবে তাকে হত্যা করা হতো।

হযরত আবূ সালেহ্ (র.) থেকে–و لكم فى القصاص حيوة الاية সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, এর অর্থ হল বেঁচে থাকা।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন যে, এর অর্থ হল–হত্যাকারীর কিসাস গ্রহণের মধ্যে অন্যান্যদের জীবন রক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। কেননা, আল্লাহ্ পাকের হুকুম মতে এখন নিহত ব্যক্তির বিনিময়ে হত্যাকারী ব্যতীত অন্য কাউকে হত্যা করা যাবে না। আর তারা অজ্ঞতার যুগে নারীর বদলে পুরুষকে এবং দাসের বদলে স্বাধীনকে হত্যা করতো। যারা এইরূপ অভিমত পোষণ করেন তাঁদের স্বপক্ষে নিম্নের হাদীস বর্ণিত হল।

হযরত সূদ্দী (র.) থেকে– و لكم فى القصاص حيوة সম্পর্ক বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, এর অর্থ হল বেঁচে থাকা, অর্থাৎ হত্যাকারী ব্যতীত তার অপরাধের জন্য অন্য কাউকে হত্যা করা যাবে না। আর মহান আল্লাহ্র বাণী–يا اولى الالباب এর ব্যাখ্যা হল–يا اولى العقول হে বুদ্ধিমানগণ! اَلاَلبَابُ শব্দটি لُبٌّ এর বহুবচন। اللُّبُّ এর অথ اَلعقل বুদ্ধি। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সম্ভাষণে اهل و العقول বুদ্ধিমানদের কথা উল্লেখ করেছেন। কেননা, একমাত্র তাঁরাই আল্লাহ্ পাকের আদেশ নিষেধের কথা বুঝেন এবং তাঁর নিদর্শনসমূহ ও প্রমাণাদি উপলব্ধি করতে পারেন। তাঁদের ব্যতীত অন্য কেউ নয়। মহান আল্লাহ্র বাণী– لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ "যেন তোমরা পরহিযগার হও।"

মহান আল্লাহ্র বাণী لعلكم تتقون এর মর্মার্থ হল যেন তোমরা কিসাসকে ভয় করে হত্যা থেকে বিরত থাকে। যেমন এ সম্পর্কে নিম্নের হাদীস বর্ণিত হল।

হযরত ইবনে যায়েদ (র.) থেকে–لعلكم تتقون সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, এর অর্থ হল–যেন তুমি কাউকে হত্যা করতে ভয় কর, কেননা তা হলে তার বিনিময়ে তোমাকেও হত্যা করা হবে।

মহান আল্লাহ্র বাণী–

كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرَا نِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَ الْاَقْرَبِيْنَ

بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ –

অর্থ ঃ "যখন তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যুকাল উপস্থিত হলে, সে যদি ধন–সম্পত্তি রেখে যায়, তবে ন্যায়ানুগ প্রথামত তার পিতা–মাতা, আত্মীয়–স্বজনের জন্য ওসীয়ত করার বিধান তোমাদের দেয়া হল। এটা মুত্তাকীদের জন্য একটি কর্তব্য।"

উল্লিখিত মহান আল্লাহ্‌র বাণী– كُتِبَ عَلَيْكُمْ এর অর্থ فُرِضَ عَلَيْكُمْ তোমাদের উপর ফরয করা হল। অর্থাৎ হে মু'মিনগণ ! যখন তোমাদের কারো মৃত্যুকাল উপস্থিত হয় এবং সে যদি সম্পদ রেখে যায়, তবে তার উপর (وصية) ওসীয়ত করা কর্তব্য। والخير এর অর্থ المال অর্থাৎ (সম্পদ) অর্থাৎ পরিত্যক্ত সম্পদের কিয়দংশ বিধিবদ্ধভাবে পিতা–মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্য ওসীয়ত করা কর্তব্য, যাদের উত্তরাধিকারী নাই। আর ওসীয়তের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা যতটুকুর অনুমতি দিয়েছেন এবং বৈধ করেছেন, এর পরিমাণে যেন ثلث (⅓) এক তৃতীয়াংশ অতিক্রম না করে এবং ওসীয়তকারী যেন (ظلم) অবিচারের চেষ্টা না করে। এমনিভাবে ওসীয়ত করা–মুত্তাকীদের উপর কর্তব্য। অর্থাৎ উল্লিখিত فرض عليكم এর মর্মার্থ হল–আল্লাহ্ তা'আলা উল্লিখিত পরিমাণ সম্পদের ওসীয়ত করাকে কর্তব্য স্থির করেছেন। অর্থাৎ তা (حقا) কর্তব্য হল ঐব্যক্তির উপর যে মহান আল্লাহ্‌কে ভয় করে, তাঁর আনুগত্য করে এবং তদনুযায়ী কর্তব্য সম্পাদন করে।

যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, সম্পদশালী ব্যক্তির পিতা–মাতা এবং আত্মীয়–স্বজন, যারা তার উত্তরাধিকারী হয় না, এমন ব্যক্তির উপর কি তাদের জন্য ওসীয়ত করা (فرض) কর্তব্য? তখন জবাবে বলা হবে, হ্যাঁ। যদি কেউ আবার প্রশ্ন করে যে, যদি সে তাতে সীমালংঘন করে এবং (فرض) ফরয বিনষ্ট করার উপক্রম হয়, তবে তার বিনষ্ট থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য কি তাদের জন্য ওসীয়ত করবে না ? তখন জবাবে বলা হবে হ্যাঁ। এখন যদি প্রশ্ন করে যে, ঐব্যাপারে কোন প্রমাণ আছে কি ? জবাবে মহান আল্লাহ্‌র বাণী–كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرَ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَ الْاَقْرَبِيْنَ এর উল্লেখপূর্বক বলা হবে–জেনে রেখো যে, كتبه علينا এর অর্থ হল–فرضه علينا অর্থাৎ তিনি তাকে আমাদের জন্য ফরয করেছেন। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ তোমাদের উপর (صوم) সওম ফরয করা হয়েছে। সকলেই এতে একমত যে, সামর্থ্যবান ব্যক্তি যদি রোযা না রাখে, তবে সে মহান আল্লাহ্‌র ফরয বিধান অমান্য করার অপরাধে অপরাধী। এমনিভাবে পিতা–মাতা এবং আত্মীয়–স্বজনের জন্য ওসীয়ত করা পরিত্যাগ হুকুমও

আল্লাহ্ তা'আলার ফরয পরিত্যাগের শামিল। এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, আপনার তো জানা আছে যে, কয়েকজন আলিমের অভিমত হল যে, الوصية للوالدين و الاقربين এই আয়াত اية الميراث দ্বারা منسوخ (বাতিল) হয়ে গেছে। তবে এর জবাবে বলা হবে যে, তাদের বক্তব্যের–বিরোধিতা করে অপর কয়েকজন আলিম বলেছেন, আয়াত منسوخ বাতিল হয়নি, বরং তা اية محكه যার حكم হুকুম বাকী আছে। যখন আয়াতটি منسوخ বাতিল হওয়া সম্পর্কে আলিমগণের মধ্যে একাধিক মত রয়েছে, এমতবস্থায় এর উপর সঠিক রায় দেয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা, সকল তাফসীরকারের اجماع ঐক্যমত ব্যতীত কোন আয়াতকে منسوخ বলে মেনে নেয়া আমাদের উপর কর্তব্য নয়, যদি এ আয়াত এবং اية الميراث এর (حكم) হুকুম একই অবস্থায় اجتماع একত্র হওয়া অসম্ভব না হয় এবং একটির হুকুম অপরটির হুকুমের পরিপন্থী না হয়। আর (ناسخ) বাতিলকারী আয়াত এবং (منسوخ) বাতিলকৃত আয়াত পৃথক অর্থবোধক হওয়ার কারণে দু'টির (حكم) বিধান একই অবস্থায় একত্র হওয়া (جائز) বৈধ নয়। কেননা, একটি অপরটির বিধানকে নিষেধ করে। এ ব্যাপারে আমরা যা বললাম, সে সম্পর্কে কয়েকজন পূর্ববর্তী (متقدمين) এবং কয়েকজন পরবর্তী (متاخرين) তাফসীরকারও ঐক্যমত পোষণ করেছেন। যাঁরা অভিমত গ্রহণ করেছেন, তাদের স্বপক্ষে নিম্নের হাদীস বর্ণিত হল।

হযরত যাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হল–অথচ সে তার আত্মীয়–স্বজনদের জন্য ওসীয়ত করল না, তবে এ অপরাধের কারণে তার আমলসমূহ বাতিল হয়ে যাবে।

হযরত মাসরূক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি এক ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হলে সে এমন কিছু সম্পদ ওসীয়ত করলো, যা তার জন্য সমীচীন হয়নি। তখন মাসরূক (রা.) তাকে বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের মধ্যে (সম্পদ) বন্টন করে দিয়েছেন। তিনি উত্তমভাবে বন্টন করেছেন। যে ব্যক্তি নিজের অভিমত অনুসারে মহান আল্লাহ্র বিধান থেকে বিমুখ হয়, তবে সে পথভ্রষ্ট হবে। তুমি তোমার এমন নিকটাত্মীয়দের জন্য ওসীয়ত করে যাও, যারা তোমার উত্তরাধিকারী নয়। কাজেই আল্লাহ্র বন্টন পদ্ধতি অনুসারে তুমি সম্পদ রেখে যাও।

হযরত যাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত, উত্তরাধিকারীর উদ্দেশ্যে ওসীয়ত করা বৈধ নয়, এবং সে যেন নিকটাত্মীয় ব্যতীত ওসীয়ত না করে। যদি সে নিকটাত্মীয় ব্যতীত অন্য কারো জন্য ওসীয়ত করে তবে সে নিশ্চয়ই পাপের কাজ করলো। আর যদি তার কোন নিকটাত্মীয় না থাকে, তবে যেন সে মুসলমান (فقير) ফকীর ব্যক্তিদের জন্য ওসীয়ত করে।

হযরত মুগীরা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, আবুল আলীয়ার জন্য আশ্চর্যের ব্যাপার

হল যে, বনী রিবাহ্ গোত্রের এক মহিলা তাকে আযাদ করলো, অথচ সে তার সম্পদের ওসীয়ত করল বনী হাশিমের জন্য।

হযরত শাবী (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, এরূপ অবস্থায় তার কোন মর্যাদা নেই।

আবদুল্লাহ্ ইবনে মামার থেকে ওসীয়ত সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি যার জন্য ওসীয়ত করবে আমরাও সেইভাবেই তা বন্টন করবো। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ মত কথা বলে আমরা তাকে তার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বন্টনের কথা বলবো।

হযরত ইমরান ইবনে জাবীর (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, আমি আবূ মাজলাম (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, প্রত্যেক মুসলমানেরই কি ওসীয়ত করা কর্তব্য ? তিনি জবাবে বললেন, যে ব্যক্তি সম্পদ রেখে যায় শুধু তার উপরই তা অত্যাবশ্যক।

হযরত ইমরান ইবনে জারীর (র.) থেকে বর্ণিত যে, আমি লাহেক ইবনে হুমাইদ (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওসীয়ত করা কি কর্তব্য ? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি সম্পদ রেখে যায় ? তা তার উপর। বিশেষজ্ঞগণ এ আয়াতের হুকুম সম্পর্কে একধিক মত প্রকাশ করেছেন। তাদের কেউ কেউ বলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতের হুকুমের কিছুই (منسوخ) রহিত করেননি। আয়াতের বাহ্যিক ইবারতেই এর হুকুমস্পষ্ট রয়েছে এবং তা দ্বারা সাধারণত প্রত্যেক পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনকে বুঝায়। আয়াতের হুকুমের ব্যাপারে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল তাদের মধ্যে হতে কিছু সংখ্যক লোক, সকলেই নয়। আর তারা হল যারা মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হয় না, কিন্তু যারা উত্তরাধিকারী হয়, তারা ব্যতীত। এ হল সেই ব্যক্তির কথা, যার বক্তব্য আমি উল্লেখ করেছি। আর তাদের ব্যতীত অন্য এক দল লোকের বক্তব্য ও তাদের সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ। যাদের কথা উল্লেখ করা হয় নি, তাদের বক্তব্যের অনুরূপ নিম্নের হাদীসে বর্ণিত হল।

হযরত জাবের ইবনে যায়েদ (র.) থেকে এক ব্যক্তি সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, সে নিজের অভাবী আত্মীয়-স্বজন থাকা সত্ত্বেও অনাত্মীয় ব্যক্তির জন্য ওসীয়ত করেছিল। তিনি বলেন,সে তিন ভাগের দু'ভাগ (⅔) তাদের জন্যে অর্থাৎ আত্মীয়দের জন্য এবং তিন ভাগের এক ভাগ (⅓) ওসীয়তকৃত ব্যক্তির জন্য।

আব্দুল মালিক ইবনে ইয়া'লা থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা (সাহাবাগণ) এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছেন, যে ব্যক্তির তার অনাত্মীয় অপর ব্যক্তির জন্য ওসীয়ত করেছিল, অথচ তার এমন আত্মীয় ছিল-যারা তার উত্তরাধিকারী হয় না। তিনি বলেন, তখন বলেন, তখন তাঁরা (সাহাবাগণ) তার সম্পত্তির (⅔) তিন ভাগের দু'ভাগ আত্মীয়-স্বজনদের জন্য এবং (⅓) তিন ভাগের এক ভাগ ওসীয়তকৃত ব্যক্তির জন্য নির্ধারণ করেন।

হযরত হাসান (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলতেন যখন কোন ব্যক্তি তার কোন অনাত্মীয় ব্যক্তির জন্য (⅓) তিন ভাগের এক ভাগ ওসীয়ত করে, তখন তাদের জন্য এক তৃতীয়াংশের তিন ভাগের

এক ভাগ প্রযোজ্য হবে এবং (⅔) তিন তাদের দু'ভাগ হবে আত্মীয় স্বজনদের জন্য।

হযরত ইবনে তাউসের (র.) পিতা থেকে বর্ণিত হয়েছেন যে, তিনি বলেন, যদি কোন ব্যক্তি ওসীয়ত করে কোনো সম্প্রদায়ের জন্য, অথচ তার অভাবগ্রস্ত আত্মীয়-স্বজনকে বাদ দেয়, এমন ক্ষেত্রে সে সম্পদ তাদের থেকে ফিরিয়ে নিয়ে নিকটাত্মীয়দের মধ্যে বন্টন করতে হবে। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন যে, বরং এ আয়াতের হুকুম অত্যাবশ্যকীয় ছিল এবং তা কার্যকরও ছিল, এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাকে اية الميراث (উত্তরাধিকার বিষয়ক আয়াত) দ্বারা করে দিয়েছেন। তাতে বর্ণিত হয়েছে যে, ওসীয়তকারীর পিতা-মাতা এবং তার আত্মীয়-স্বজন-যারা তার উত্তরাধিকারী হয় এবং এ হুকুম বলবৎ থাকবে যারা উত্তরাধিকারী নয়। যারা এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তাঁদের স্বপক্ষে নিম্নের হাদীস বর্ণিত হল।

হযরত কাতাদা (র.) মহান আল্লাহ্র বাণী-كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَ كُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرَانِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَ الْاَقْرَبِيْنَ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, উল্লিখিত আয়াতে পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনের জন্য ওসীয়ত নির্ধারিত ছিল। পরে তা প্রত্যাহার করা হয়। কাজেই উভযের জন্য নির্দিষ্ট অংশ ধার্য হয়েছে। এখন ওসীয়ত হল ঐসব আত্মীয়-স্বজনের জন্য যারা ওয়ারিস হয় না।যখন পিতা-মাতার জন্য নির্দিষ্ট অংশ ধার্য হয়েছে, তখন ওয়ারিসানের জন্য তাদের উদ্দেশ্যে ওসীয়ত বৈধ নয়।

হযরত কাতাদা (র.) থেকে অন্য সূত্রে মহান আল্লাহ্র বাণী- اِنْ تَرَكَ خَيْرَانِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَ الْاَقْرَبِيْنَ এ আয়াতের সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন তাতে পিতা-মাতার জন্যে ওসীয়ত করার বিধান প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং ঐ সমস্ত আত্মীয়-স্বজনের জন্য এ হুকুম বাকী রয়েছে- যারা ওয়ারীস নয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে মহান আল্লাহ্র বাণী- اِنْ تَرَكَ خَيْرًا نِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَ الْاَقْرَبِيْنَ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, যারা ওয়ারীস, তাদের বেলায় এ আয়াতের হুকুম মানসূখ হয়ে গেছে। এবং ঐ সমস্ত আত্মীয়-স্বজনের জন্য منسوخ হয় নাই-যারা উত্তরাধিকারী নয়।

হযরত তাউস (র.) এর পিতা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, উত্তরাধিকারের বিধান নাযিলের পূর্বে পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য ওসীয়তের নিয়ম ছিল। উত্তরাধিকারের আয়াত নাযিলের পর ওয়ারীসগণের বেলায় তা মনসূখ হয়ে গেছে এবং যে ব্যক্তি ওয়ারিস নয় শুধু তার জন্য অসীয়তের হুকুম বাকী রয়েছে। যে ব্যক্তি ওয়ারীস আত্মীয়ের জন্য ওসীয়ত করল, সে ওসীয়ত বেধ নয়।

হযরত হাসান (রা.) আল্লাহ্র বাণী-اِنْ تَرَكَ خَيْرَانِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَ الْاَقْرَبِيْنَ সম্পর্কে বর্ণিত

হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, এই হুকুম পিতামার জন্য মানসূখ হয়ে গেছে এবং ঐসমস্ত আত্মীয়-স্বজনের জন্য এখন বলবৎ রয়েছে-যারা বঞ্চিত এবং আইনত উত্তরাধিকারী নয়।

হযরত হাসান (র.) থেকে এ আয়াত- الوصية للوالدين و الاقربين সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, পিতা-মাতার জন্য এ হুকুম মানসূখ হয়ে গেছে এবং ওসীয়ত শুধু আত্মীয়দের জন্যে, যদি ও তারা ধনী হয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে মহান আল্লাহ্র বাণী- اِنْ تَرَكَ خَيْرَانِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَ الْاَقْرَبِيْنَ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, পিতা-মাতার সাথে কেউ উত্তারধিকারী হতো না। কিন্তু, নিকট আত্মীয়দের জন্য ওসীয়তের বিধান ছিল। পরে আল্লাহ্ তা'আলা ولابه لكل واحد منها السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث এ আয়াত নাযিল করেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা পিতা-মাতার জন্য উত্তরাধিকারী হওয়ার কথা বর্ণনা করেন এবং আত্মীয়দের জন্যে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি থেকে এক তৃতীয়াংশ ওসীয়ত করার হুকুম নির্দিষ্ট করে দেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে মহান আল্লাহ্র বাণী- اِنْ تَرَكَ خَيْرَانِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَ الْاَقْرَبِيْنَ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, এ আয়াত দ্বারা পিতা-মাতার জন্য ওসীয়ত করার বিষয় মানসূখ হয়ে গেছে এবং যে সমস্ত আত্মীয়-স্বজন উত্তরাধিকারী হয় না শুধু তাদের জন্য ওসীয়তের হুকুম বলবৎ রয়েছে।

হযরত রাবী (র.) থেকে মহান আল্লাহর বাণী- كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرَانِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَ الْاَقْرَبِيْنَ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, এ আয়াতের হুকুমে -সূরা-নিসা নাযিলের পূর্বে পর্যন্ত কার্যকর ছিল। পরে যখন (اية الميراث) "আয়াতুল মী'রাস"-নাযিল হল তখন পিতা-মাতার জন্য ওসীয়তের বিষয় منسوخ হয়ে গেল এবং উভয়ই উত্তরাধিকার আইনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। আর ওসীয়তের বিষয়টি ঐ সমস্ত আত্মীয়-স্বজনের জন্যে স্থির হয়ে গেল-যারা উত্তরাধিকারী নয়।

হযরত আ'লা' ইবনে যিয়াদ (র.) থেকে মহান আল্লাহ্র বাণী- اِنْ تَرَكَ خَيْرَانِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَ الْاَقْرَبِيْنَ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা উভয়ই বলেন , আয়াতের হুকুম আত্মীয়-স্বজনে মধ্যে কার্যকর রয়েছে।

ইয়াস ইবনে মু'আবীয়া (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, আয়াতের হুকুম কার্যকর রয়েছে আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে। আর অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, বরং আল্লাহ্ তা'আলা তার

সম্পূর্ণ হুকুমেই منسوخ করেছেন এবং রেখে যাওয়া সম্পত্তির বন্টন ও উত্তরাধিকারিত্ব অনুযায়ী বন্টন ব্যবস্থাকে অত্যাবশ্যক করে দিয়েছেন।

হযরত ইবনে যায়েদ (র.) থেকে মহান আল্লাহ্‌র বাণী– اِنْ تَرَكَ خَيْرَانِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَ الْاَقْرَبِيْنَ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা সম্পূর্ণ আয়াতের হুকুমই منسوخ বাতিল করে দিয়ে শরীয়তের বন্টন ব্যবস্থাকে অত্যাবশ্যক করে দিয়েছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি একবার একদল লোকের উদ্দেশ্যে এক ভাষণ দিলেন এবং তাদের কাছে সূরা বাকারার ليبين لهم এ আয়াত থেকে নিয়ে اِنْ تَرَكَ خَيْرَانِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَ الْاَقْرَبِيْنَ পর্যন্ত পাঠ করে বললেন, এ আয়াতে হুকুম বাতিল হয়ে গেছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে মহান আল্লাহ্‌র বাণী–اِنْ تَرَكَ خَيْرَانِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَ الْاَقْرَبِيْنَ এ আয়াতে পিতা–মাতা এবং আত্মীয়–স্বজনদের জন্য বর্ণিত ওসীয়তের বিষয়টি মিরাসের আয়াত দ্বারা মানসূখ হয়ে গেছে।

আবদুল্লাহ ইবনে বদর (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, আমি ইবনে উমার (রা.) কে আল্লাহ্‌র এই বাণী–اِنْ تَرَكَ خَيْرَانِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَ الْاَقْرَبِيْنَ সম্পর্কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন, এই আয়াতাট মীরাসের আয়াত দ্বারা মনসূখ হয়ে গেছে। ইবনে বাশার (র.) বলেন যে, আবদুর রহমান (র.) বলেছেন , আমি জাহ্‌যাম (র.) কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু তা তার স্মরণ ছিল না।

ইকরামা (র.) এবং হাসানুল বসরী (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা উভয়ই বলেছেন, اِنْ تَرَكَ خَيْرَانِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَ الْاَقْرَبِيْنَ এ আয়াতে বর্ণিত ওসীয়তের বিষয় যথাযথভাবেই কার্যকর ছিল। মীরাসের আয়াত মানসূখ করে দিয়েছে।

শুরাইহ্ (র.) থেকে এই– اِنْ تَرَكَ خَيْرَانِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَ الْاَقْرَبِيْنَ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি তার সমস্ত সম্পত্তিই ওসীয়ত করেছিল, এর পরিপ্রেক্ষিতেই মিরাসের আয়াত নাযিল হয়।

মু'তামের (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন, কাতাদা (র.) মনে করেন যে, সূরা–নিসা–এর মীরাসের আয়াত দ্বারা সূরা বাকারায় বর্ণিত ওসীয়তের বিষয়টি মানসূখ হয়ে গেছে।

মুজাহিদ (র.) থেকে আল্লাহ্‌র বাণী–اِنْ تَرَكَ خَيْرَانِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَ الْاَقْرَبِيْنَ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, উত্তরাধিকারী স্বত্ব ছিল পুত্রের জন্য এবং ওসীয়ত ছিল পিতা–মাতা ও

আত্মীয়-স্বজনদের জন্য এবং তা মানসূখ হয়ে গেছে।

মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, উত্তরাধিকার স্বত্ব ছিল পুত্রের জন্য এবং ওসীয়ত ছিল পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের জন্য। পরে তা মনসূখ হয়ে গেছে সূরা নিসায় বর্ণিত اِنْ تَرَكَ خَيْرَانِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَ الْاَقْرَبِيْنَ এই আয়াত দ্বারা মানসূখ হয়ে গিয়েছে।

সূদ্দী (র.) থেকে- كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرَانِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَ الْاَقْرَبِيْنَ- সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, পিতামাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের উল্লেখপূর্বক এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। কারণ তৎকালে মানুষের জন্য কোন বন্টননীতি নিদিষ্ট ছিল না। অতএব মানুষ তার পিতা-মাতা এবং পরিবার পরিজনদের জন্য ওসীয়ত করে যেতো, সেই অনুসারেই তাদের মধ্যে সম্পদ বন্টিত হতো। এরপর সূরা-নিসার আয়াত يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِىْ اَوْلَادِكُمْ নাযিল হলে তা মনসূখ হয়ে যায়।

নাফি' (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, ইবনে উমার (রা.) জীবনে ওসীয়ত করেননি। তিনি বলেছেন, আমার যে সম্পদ আছে তা ভবিষ্যত জীবনে আমি তাতে কি করবো সে কথা আল্লাহ্ জ্ঞাত। অতএব আমি পসন্দ করি না যে, আমার সন্তানরা তাতে অন্য কাউকে অংশীদার করুক।

ইবনে সাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি রাবী' ইবনে খায়ছুম (রা.)-কে বললেন, আমাকে আপনি আপনার কাছে রক্ষিত কুরআন মজীদ অনুযায়ী ওসীয়ত করুন । বর্ণনাকারী বলেন যে, তখন তিনি তাঁর পিতার দিকে দৃষ্টিপাত করেলেন, এরপর বললেন, আল্লাহ্র কিতাবে রক্ত সম্পর্কযুক্ত আত্মীয় একজন অপরজনের কাছে অধিক হকদার।

ইবরাহীম (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, আমরা যায়েদ (রা.) এবং তালহা (রা.)-এর কথা উল্লেখ করলাম যে, তারা উভয়েই ওসীয়তের ব্যাপারে কড়াকড়ি করতেন। তখন তিনি বলেন, তাঁদের এ রূপ কার্য করা উচিত হয়নি। কারণ নবী করীম (সা.)-এর ইন্তিকালের সময় তিনি ওসীয়ত করেননি। আর আবূ বাকর (রা.) যে, ওসীয়ত করেছিলেন, তা ছিল হাসান বা অতি উত্তম পর্যায়ের।

ইবরাহীম (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, তাঁর নিকট যায়েদ (রা.) এবং তালহা (রা.) এর কথা উত্থাপিত হল তখন তাঁরা উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। আর সম্পদ ছেড়ে যায় তার উপর পিতা-মাতা এবং ঐ সমস্ত আত্মীয়-স্বজনদের জন্য ওসীয়ত করা কর্তব্য- যারা উত্তরাধিকারী নয়। উল্লিখিত الخير শব্দের অর্থ সম্পদ।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে মহান আল্লাহ্র বাণী- اِنْ تَرَكَ خَيْرًا সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, এর অর্থ হল সম্পদ।

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে মহান আল্লাহ্‌র বাণী–اِنْ تَرَكَ خَيْرًا সমাপর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, এর অর্থ হল সম্পদ।

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে–اِنْ تَرَكَ خَيْرًا সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলতেন, কুরআনে উল্লিখিত সমস্ত اَلْخَيْرُ শব্দের অর্থই সম্পদ। لِحُبِّ الْخير শব্দের অর্থ لِشَدِيْدِ الْخَيْرِ الْمَالِ সম্পদের অধিক ভালবাস। وَ اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ এর অর্থ আমার প্রভুর বর্ণনা মতে সম্পদ। আরো যেমন বর্ণিত হয়েছে– وَ اِنْ تَرَكَ خَيْرَانِ الْوَصِيَّةُ এর মধ্যে اَلْخَيْرُ শব্দের অর্থ المال সম্পদ। فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا এর মধ্যে خيرا শব্দের অর্থ সম্পদ।

হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, وَ اِنْ تَرَكَ خَيْرَانِ الْوَصِيَّةُ এর মধ্যে اَلْخَيْرُ এর অর্থ সম্পদ।

হযরত সুদ্দী (র.) থেকে وَ اِنْ تَرَكَ خَيْرَانِ الْوَصِيَّةُ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, اَلْخَيْرُ শব্দের অর্থ সম্পদ।

হযরত রাবী (র.) থেকে اِنْ تَرَكَ خَيْرًا স°পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, এর অর্থ হল اِنْ تَرَكَ مَالاً যদি সে সম্পদ পরিত্যাগ করে যায়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছেন যে, মহান আল্লাহ্‌র বাণী– اِنْ تَرَكَ خَيْرًا সম্পর্কে তিনি বলেছেন, اَلْخَيْرُ শব্দের অর্থ হল সম্পদ।

হযরত যাহ্‌হাক (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মহান আল্লাহ্‌র বাণী– اِنْ تَرَكَ خَيْرَانِ الْوَصِيَّةُ এর মর্মার্থ হল সম্পদ। তুমি কি লক্ষ্য করনি যে, তিনি বলেছেন, قَالَ شُعَيْبُ لِقَوْمِهِ اِنِّى اَرَاكُمْ بِخَيْرِ এখনে خَيْر শব্দের অর্থ প্রাচুর্য।

হযরত আতা ইবনে আবী রিবাহ্ (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি পাঠ করলেন এ আয়াত كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرًا এরপর আতা (র.) বললেন, যা দেখা যায় তাতে মনে হয় الخير এর অর্থ সম্পদ। তাফসীরকারগণ পরিত্যক্ত সম্পদের পরিমাণ সম্পর্কে একাধিক মত প্রকাশ করেছেন, যা উল্লিখিত আয়াতের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন, তার পরিমাণ হল এক হাজার দিরহাম। যারা এ অভিমত পোষণ করেন তাঁদের স্বপক্ষে নিম্নের হাদীস বর্ণিত হল।

কাতাদা (র.) থেকে এ আয়াত– ان ترك خيرا الوصية সম্পর্কে বর্ণিত। তিনি বলেন, الخير (সম্পদ)–এর পরিমাণ হল এক হাজার দিরহাম কিংবা তারও বেশী।

উরওয়া (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আলী ইবনে আবূ তালিব (রা.) তাঁর রুগ্ন চাচার দেখা–শোনার উদ্দেশ্যে তাঁর কাছে গমন করেন। তখন তিনি বললেন, আমি ওসীয়ত করতে মনস্থ করেছি। এমন সময় আলী (রা.) বললেন, আপনি ওসীয়ত করবেন না। কেননা আপনি এমন কোন সম্পদ রেখে যাচ্ছেন না যে, আপনি ওসীয়ত করতে পারেন। বর্ণনাকারী বলেন, তাঁর পরিত্যক্ত সম্পদের পরিমাণ ছিল সাতশ থেকে নয়শ (দিরহাম)।

আলী ইবনে আবূ তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি একদা এক রুগ্ন ব্যক্তির নিকট গমন করেন, তখন তিনি তাঁর নিকট ওসীয়ত করার কথা উল্লেখ করেন। তখন তিনি বললেন, আপনি ওসীয়ত করবেন না। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন,– اِنْ تَرَكَ خَيْرًا যদি সে মৃত্যুকালে ধন–সম্পদ রেখে যায় (তখন ওসীয়ত করা চলে)। আর আপনি তো কোন ধন–সম্পদ রেখে যাচ্ছেন না। ইবনে আবূ যিনাদ (রা.) এ সম্পর্কে বলেন যে, তুমি তোমার ধন–সম্পদ তোমার সন্তানের জন্যে রেখে যাও। আমি কি আবদুল্লাহ্ ইবনে উয়াইনা (রা.), অথবা উতবা (রা.) থেকে তা শুনেছিলাম–তাতে আমার সন্দেহ আছে যে, এক ব্যক্তি মৃত্যুকালে ওসীয়ত করতে মনস্থ করেছিল, অথচ তার অনেক সন্তান ছিল। সে চারশ দীনার রেখে যাচ্ছিল। এমতাবস্থায় আয়েশা (রা.) বলেন যে, আমি ওসীয়ত করার মধ্যে কোন কল্যাণ দেখি না।

হিশাম ইবনে উরওয়া তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, আলী (রা.) তাঁর কোন এক চাচাতো ভাইয়ের মৃত্যুর সময় তাঁর কাছে গমন করেন। তখন তাঁর কাছে সাতশ কিংবা ছয়শ দিরহাম ছিল। তখন তিনি বললেন, আমি কি ওসীয়ত করবো না ? এমতাবস্থায় আলী (রা.) বললেন, না। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন– اِنْ تَرَكَ خَيْرًا। যদি সে (পর্যাপ্ত) সম্পদ রেখে যায়, (তখন সে ওসীয়ত করতে পারে) অথচ তোমার তো অধিক সম্পদ নেই। কোন কোন বর্ণনাকারী বলেন যে, তার পরিমাণ পাঁচশ থেকে এক হাজারের মাঝামাঝি। যাঁরা এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তাঁদের সপক্ষে নিম্নের হাদীস বর্ণিত হল।

আবান ইবনে ইবরাহীম নাখঈ (র.) থেকে আল্লাহ্র বাণী–اِنْ تَرَكَ خَيْرًا সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, এর পরিমাণ ছিল পাঁচশ থেকে এক হাজার (মুদ্রা) পর্যন্ত। কোন কোন মুফাসসীরগণ বলেছেন যে, কম–বেশী সব ধরনের সম্পদেই ওসীয়ত করলে তা ওয়াজিব হয়ে যাবে। যাঁরা এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তাঁদের সপক্ষে নিম্নের হাদীস বর্ণিত হল।

জুহরী (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, সম্পদ কম হোক অথবা বেশী হোক ওসীয়ত করা বৈধ। আল্লাহ্ পাকের বাণী – كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرًا اِۨلْوَصِيَّةُ সম্পর্কে বর্ণিত

ব্যাখ্যায় উল্লিখিত বক্তব্যসমূহের মধ্যে উত্তম ও সঠিক বক্তব্য তাই যা জুহরী (র.) বলেছেন। কেননা, সম্পদ কম হোক অথবা বেশী হোক তা خير (সম্পদ)-এর অন্তর্ভুক্ত। আর তাতে আল্লাহ্ তা'আলা কোন সীমারেখা বর্ণনা করেননি, এবং কোন কিছু নির্দিষ্ট ও করে দেননি। কাজেই বাহ্যিক অবস্থা থেকে অভ্যন্তরীণ অবস্থার দিকে প্রত্যাবর্তন বৈধ। যে কোন সম্পদশালী ব্যক্তির মৃত্যু উপস্থিত হলে তা কম হোক অথবা বেশী হোক তা থেকে এক অংশ তার পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজন যারা উত্তরাধিকারী নয় তাদের জন্য ওসীয়ত করা তার উপর কর্তব্য। যেমন, এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখ করেছেন এবং নির্দেশ প্রদান করেছেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী-

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَاِنَّمَا اِثْمُهُ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهُ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ –

অর্থ ঃ "তারপর যে কেউ তা শুনার পরও ওসীয়ত পরিবর্তন করে, তবে ওসীয়ত পরিবর্তনকারীর প্রতিই পাপ বর্তাবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্পাক সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" (সূরা বাকারা ঃ ১৮১)

মহান আল্লাহ্ উল্লিখিত আয়াতের মর্মার্থ হল আপন পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজন, যাঁরা উত্তরাধিকারী নয় তাদের জন্য ওসীয়তকারীর ওসীয়ত করার পর যে ব্যক্তি ওসীয়তের কথা শ্রবণ করার পরও তা পরিবর্তন করে, তবে যে ব্যক্তি ওসীয়ত পরিবর্তন করল, সেই গুনাহ্গার হবে। যদি কেউ আমাদেরকে জিজ্ঞেস করে যে, فَمَنْ بَدَّلَهُ এর মধ্যে অবস্থিত "ها" সর্বনাম (ضمير) টি কোন দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে ? তবে এর জবাবে বলা হবে যে, তা একটি (كلام محذوف) উহ্য বাক্যের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে, যা বাহ্যিক ظاهر এর অর্থ প্রমাণ করে। আর তা হল اَمْرُ الْمَيِّت মৃত ব্যক্তির নির্দেশ এবং তার ওসীয়ত, যার নিকট যে বিষয়ে যার জন্যে করেছে। কাজেই উপরিউক্ত অর্থ হল- "যখন তোমাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন যদি সে ধন-সম্পদ রেখে যায়, তবে পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য বৈধভাবে ওসীয়ত করা তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করা হল।" তা হল ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিগণের প্রতি কর্তব্য। কাজেই তোমরা তাদের জন্য ওসীয়ত কর। তারপর তোমরা তাদের জন্য যা কিছু ওসীয়ত করলে তা শ্রবণ করার পর যদি কেউ তা পরিবর্তন করে, তবে এজন্য সে পরিবর্তনকারীই গুনাহ্গার হবে, তোমরা দায়ী হবে না। আর আমরা মহান আল্লাহ্র বাণী-فمن بدله এর মধ্যে অবস্থিত "ها" (সর্বনাম) এর প্রত্যাবর্তন স্থল (كلام محذوف) উহ্য বাক্যের দিকে হওয়ার কথা বললাম, যা এর বাহ্যিক অর্থ প্রকাশ করে ; এর কারণ হল- كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرَاِ الْوَصِيَّةُ– তা মহান আল্লাহ্র কালাম। আর পরিবর্তনকারীর পরিবর্তন হল-ওসীয়তকারীর ওসীয়তের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অতএব ওসীয়ত সম্পর্কে আল্লাহ্র নির্দেশ পরিবর্তনে

তার এবং অন্য কারো কোন ক্ষমতা নেই। অতএব, **فمن بدله** এর মধ্যে "**ها**" সর্বনামটি **وصية** এর দিকে প্রত্যাবর্তন হওয়া **جائز** বৈধ। মহান আল্লাহ্‌র বাণী–**بعد ما سمعه** এর মধ্যে "**ه**" সর্বনামটি প্রত্যাবর্তিত হয়েছে–**فمن بدله** এর মধ্যে বর্ণিত প্রথম "**ها**" এর দিকে। আর মহান আল্লাহ্‌র বাণী–**فانما اثمه** এর মধ্যে অবস্থিত "**ه**" সর্বনামটি উহ্য **تبديل** শব্দের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে। যেন তিনি বলেছেন, **فَاِنَّمَا اِثْمُ مَا بَدَّلَ مِنْ ذٰلِكَ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهٗ** তা পরিবর্তনের পাপ তাদের উপরই বর্তাবে যারা পরিবর্তন করে। এ সম্পর্কে আমরা যা বললাম, অন্যান্য মুফাসসীরগণও অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন। যারা এ ব্যাখ্যা পেশ করেছেন, তাদের সপক্ষেই নিম্নের হাদীস বর্ণিত হল।

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে– **فَمَنْ بَدَّلَهٗ بَعْدَ مَا سَمِعَهٗ** সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, এর মর্মার্থ **اَلْوصية** ওসীয়ত।

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে মহান আল্লাহ্‌র বাণী **فَمَنْ بَدَّلَهٗ بَعْدَ مَا سَمِعَهٗ** সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, নিশ্চয়ই এর পাপ তাদের উপর বর্তিবে যারা তা পরিবর্তন করে। আর ওসীয়তকারী মহান আল্লাহ্‌র নিকট পুরস্কার প্রাপ্ত হবে এবং গুনাহ্ থেকে পবিত্র থাকবে। যদি কোন ব্যক্তি কোন ক্ষতিকর বিষয়ে ওসীয়ত করে, তবে তার ওসীয়ত **جائز** (বৈধ) হবে না। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–**غَيْرَ مُضَارٍّ** 'ওসীয়ত যেন ক্ষতিকর।'

কাতাদা (র.) থেকে মহান আল্লাহ্‌র বাণী– **فَمَنْ بَدَّلَهٗ بَعْدَ مَا سَمِعَهٗ** সম্পর্কে বর্ণিত, যে ব্যক্তি ওসীয়তের কথা শ্রবণ করার পর তা পরিবর্তন করে, তার উপরেই তার পাপ বর্তাবে।

হযরত সুদ্দী (র.) থেকে– **فَمَنْ بَدَّلَهٗ بَعْدَ مَا سَمِعَهٗ** সম্পর্কে বর্ণিত, ওসীয়তকৃত বিষয় যারা পরিবর্তন করল, এর পাপ তাদের উপরই বর্তিবে। কেননা, পরিবর্তনকারী নিশ্চয়ই **ظلم** অবিচার করল।

হযরত আতা ইবনে আবূ রিবাহ্ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি মহান আল্লাহ্‌র বাণী– **فَمَنْ بَدَّلَهٗ بَعْدَ مَا سَمِعَهٗ** সম্পর্কে বলেন যে, নিশ্চয়ই এর পাপ তাদের উপরই বর্তিবে যারা তা পরিবর্তন করে।

হযরত হাসান (র.) থেকে– **فَمَنْ بَدَّلَهٗ بَعْدَ مَا سَمِعَهٗ** সম্পর্কে বর্ণিত, যে ব্যক্তি ওসীয়তের কথা শ্রবণ করার পর তা পরিবর্তন করে এর পাপ তার উপরই বর্তিবে।

হযরত হাসান (র.) থেকে এ আয়াত– **فَمَنْ بَدَّلَهٗ بَعْدَ مَا سَمِعَهٗ** সম্পর্কে বর্ণিত, নিশ্চয়ই এর পাপ তাদের উপরই বর্তাবে যারা তা পরিবর্তন করল। তিনি বলেন, তা ওসীয়ত সম্পর্কেই বর্ণিত হয়েছে।

যে ব্যক্তি ওসীয়ত শ্রবণ করার পর তা পরিবর্তন করে নিশ্চয়ই এর পাপ পরিবর্তনকাররী উপরই বর্তিবে।

হযরত সুলায়মান ইবনে ইয়াসার (র.) থেকে বর্ণিত যে, এ হাদীসের বর্ণনাকারী সকলই বলেছেন, যার জন্য যা ওসীয়ত করা হয় তা কার্যকর হবে। এখানে ইবনে মুসান্না (র.)–এর হাদীস শেষ হলো। ইবনে বাশ্‌শার (র.) আবদুল্লাহ্ ইবনে মা'মার (র.) সূত্রে তাঁর বর্ণিত হাদীসে কিছু সংযোগ করে বলেছেন যে, আমার নিকট পসন্দনীয় বিষয় হল, যদি কেউ তাঁর আত্মীয়–স্বজনদের জন্য ওসীয়ত করে। আর আমাকে আনন্দিত করে না যদি কেউ ওসীয়তকৃত ব্যক্তির নিকট হতে ওসীয়তকৃত বস্তু ছিনিয়ে নিয়ে আসে। হযরত কাতাদা (র.) বলেন, তাও আমার নিকট আমাদের বিষয় যদি কারো জন্যে কোন কিছু ওসীয়ত করা হয়। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, যদি কেউ ওসীয়তের বিষয় শ্রবণ করার পর তা পরিবর্তন করে, তবে এর পাপ হবে তাদের উপর যারা তা পরিবর্তন করল।

মহান আল্লাহ্র বাণী–اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞানী।' এ বাণীর মর্মার্থ হল, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের ওসীয়ত, যা তোমরা তোমাদের পিতা–মাতা এবং আত্মীয়–স্বজনদের জন্য করে থাক, তা শুনেন। তিনি অবগত রয়েছেন যে, তোমাদেরকে বৈধভাবে যা করার জন্য অনুমতি দিয়েছেন, তাতে তোমরা ন্যায় বিচার কর কি না? তোমরা অত্যাচার কর কি না, এবং সত্য পথ থেকে ফিরে যাও কিনা ; এবং তোমাদের অন্তরের গোপন ইচ্ছা অনুযায়ী অত্যাচার করে সত্য ও ন্যায়ের পথ থেকে বিমুখ হও কিনা কিংবা অত্যাচার ও জুলুমের পথ ধর কিনা ?

মহান আল্লাহ্র বাণী–

فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَاۤ اِثْمَ عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ –

অর্থ ঃ "তবে যদি কেউ ওসীয়তকারীর পক্ষপাতিত্ব কিংবা অন্যায়ের আশংকা করে, তারপর সে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়, তবে তার কোন অপরাধ নেই ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ পরম দয়ালু।" (সূরা বাকারা ঃ ১৮২)

তাফসীরকারগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় একাধিক মত পোষণ করেছেন। তাঁদের কেউ কেউ বলেন যে, আয়াতের ব্যাখ্যা হল যে ব্যক্তি রুগ্ন অবস্থায় মৃত্যুর সম্মুখীন হয় এবং তার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সামনে ওসীয়ত করতে মনস্থ করে, এমতাবস্থায় সে যদি ওসীয়তে ভুলের আশংকা করে এবং মনে করে যে, সে এমন কাজ করে বসবে–যা তার জন্য সমীচীন হবে না, কিংবা সে হয়ত এ ব্যাপারে মিথ্যার আশ্রয় নেয়ার চেষ্টা করবে, তখন হয়ত সে এ ব্যাপারে এমন নির্দেশ প্রদান করে বসবে–যে আদেশ তার জন্য উচিত হবে না। তখন যে ব্যক্তি উপস্থিত থাকে এবং তার নিকট হতে যে তা শ্রবণ করে তার জন্য রুগ্ন ব্যক্তি এবং তার উত্তরাধিকারীর মধ্যে ন্যায়–সঙ্গতভাবে ওসীয়তের ব্যাপারে (صلح) মীমাংসা করে দেয়া কোন অন্যায় হবে না। আর তার জন্য নিষিদ্ধ কাজসমূহ থেকে তাকে বাধা

প্রদান করা এবং এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য যা অনুমতি প্রদান করেছেন এবং যা কিছু বৈধ করে দিয়েছেন, সে বিষয়ে নিষ্পত্তি করে দেয়ার মধ্যে কোন অপরাধ নেই। যারা এমত পোষণ করেন ঃ

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে মহান আল্লাহ্র বাণী- فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, তা সে সময়ের কথা যখন কোন ব্যক্তির মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়, তখন সে যদি (ওসীয়তের ব্যাপারে) অতিরিক্ত প্রদান করার কথা বলে, তবে তারা (উপস্থিত গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ) তাকে ন্যায় বিচারের নির্দেশ দেবে। আর যদি সে এ ব্যাপারে কম করে, তবে তারা বলবে এমন এমনভাবে বন্টন কর এবং অমুক ব্যক্তিকে এত এত প্রদান কর।

মুজাহিদ (র.) থেকে আল্লাহ্র বাণী-فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, তা সেই সময়ের নির্দেশ যখন কোন ব্যক্তির মৃত্যুকাল উপস্থিত হয় তখন উপস্থিত গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ তাকে ন্যায় বিচারের নির্দেশ প্রদান করবে। আর যদি ন্যায় বিচার থেকে কিছু কম করে, তবে তারা তাকে বলবে-তুমি এমন এমন কাজ কর এবং অমুক ব্যক্তিকে এত এত প্রদান কর-।

আর অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন যে, বরং এ আয়াতাংশে ব্যাখ্যা হল-যদি কেউ মৃত ব্যক্তির কোন ওসীয়তের ব্যাপারে ভয় করে কিংবা মুসলমানদের কোন শাসক যদি ওসীয়তকারীর ওসীয়তকৃত বিষয়ে পক্ষপাতিত্বের আশংকা করে তখন ওসীয়তকারী এবং তার উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে ওসীয়তকৃত বিষয়ে মীমাংসাকল্পে ন্যায়বিচার ও সত্য প্রতিষ্ঠা করে, তবে তাতে কোন ক্ষতি নেই। যারা এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন-তাদের সপক্ষে নিম্নের বর্ণনা উল্লেখ করা হল।

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে আল্লাহ্র বাণী-فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, এর মর্মার্থ হল যদি মৃতব্যক্তি তাঁর মৃত্যুকালে ওসীয়তের ব্যাপারে ভুল করে থাকে কিংবা অন্যায় কিছু করে থাকে, তবে তার উত্তরাধিকারিগণের জন্যে তার ঐ ভুলকে সঠিক পন্থায় রূপান্তরিত করার মধ্যে কোন ক্ষতি বা পাপ নেই।

কাতাদা (র.) থেকে আল্লাহ্র বাণী-فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, তা হল সে ব্যক্তি সম্পর্কে-যে নিজের ওসীয়তকৃত বিষয়ে অন্যায় কিছু করে, তখন তার অবিভাবকগণ তাকে ন্যায় ও সত্যে রূপান্তরিত করে দেবে।

কাতাদা (র.) থেকে আল্লাহ্র বাণী- فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, কাতাদা (র.) বলতেন, যদি কেউ অন্যায়ভাবে ওসীয়ত করে, তখন মৃতব্যক্তির অভিভাবক কিংবা মুসলমানদের ইমাম বা প্রশাসক তাকে আল্লাহ্র কিতাব এবং ন্যায়বিচারের দিকে প্রত্যাবর্তন করে দেবে। তাই হবে তার জন্য সঠিক।

রবী (র.) থেকে–فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, যদি কেউ অন্যায়ভাবে ওসীয়ত করে, তবে তার মৃত্যুর পর তার ওসীয়ত ন্যায়ের দিকে প্রত্যাবর্তন করে দেবে। তখন এতে তার কোন পাপ হবে না। আবদুর রহমান (রা.) তাঁর হাদীসে বর্ণনা করেছেন যে, তাদের মধ্যে এ ব্যাপারে মীমাংসা করে দেবে। তিনি বলতেন, তাঁর মৃত্যুর পর ওসীয়তকে ন্যায়ের দিকে প্রত্যাবর্তন করে দেবে। এতে তার কোন পাপ হবে না।

ইবরাহীম (র.) থেকে উক্ত আয়াতাংশ– فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, এর অর্থ–তাকে ন্যায়ের দিকে প্রত্যাবর্তন করে দেবে।

ইবরাহীম (র.) থেকে বর্ণিত, আমি তাঁকে জনৈক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, যে ব্যক্তি এক–তৃতীয়াংশের অধিক ওসীয়ত করেছিল। তখন তিনি প্রতি উত্তরে বললেন, তা বাতিল করে দাও। তারপর তিনি– فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا এই আয়াতাংশ পাঠ করে শুনান।

রবী ইবনে আনাস (র.) থেকে বলেন– فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, ওসীয়তকারীর মৃত্যুর পর তার ওসীয়তকে ন্যায়ের দিকে প্রত্যাবর্তন করে দেবে। এতে ওসীয়তকারীর কোন পাপ হবে না। কোন কোন মুফাসসীর বলেন যে, বরং এই আয়াত–فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا এর মর্মার্থ হল, কোন ব্যক্তির মৃত্যুকালে তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে কাউকে বাদ দিয়ে কয়েকজনকে দান করা। এতে ঐ ব্যক্তির কোন পাপ হবে না, যে তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে এ ব্যাপারে মীমাংসা করে দেয়–।

যাঁরা এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন :

ইবনে জুরাইজ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আতা (র.)–কে আল্লাহ্‌র বাণী– فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি বললেন,এর মর্মার্থ হল, কোন ব্যক্তির মৃত্যুকালে তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে কয়েকজনকে বাদ দিয়ে কয়েকজনের জন্য অন্যায়ভাবে সম্পদ বন্টন করে দেয়া। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন, এমতাবস্থায় তাদের মধ্যে মীমাংসাকারীর মীমাংসা করে দেয়ার মধ্যে কোন পাপ নেই। আমি আতা (র.)–কে জিজ্ঞেস করলাম, কারো মৃত্যুকালে তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে কিছু প্রদান করতে পারি কি ? এটাই কি ওসীয়ত ? আর উত্তরাধিকারীদের জন্য তো কোন প্রকার ওসীয়ত করা ঠিক নয়। তখন তিনি বললেন, তা হলো তাদের মধ্যে সম্পদ বন্টন করে দেয়া।

আর অন্যান্য মুফাসসীরগণ বলেন যে– فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا এই আয়াতাংশের অর্থ হলো, কেউ কেউ যদি নিজের স্বার্থে উত্তরাধিকারী নয় এমন ব্যক্তির জন্য ওসীয়ত করে যায়, যাতে

তার (প্রকৃত) উত্তরাধিকারীর ক্ষতি হয় সেক্ষেত্রে যদি কেউ এ ওসীয়তকে সংশোধন করে দেয়, তবে সংশোধনকারীর কোন অপরাধ হবে না।

যারা এ মত পোষণ করেন :

হযরত ইবনে তাউস (র.)–এর পিতা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলতেন, অপরাধ এবং পাপের বিষয় হল যে, কোন ব্যক্তি তার পুত্রের সন্তান বা নাতি নাতনীর জন্য ওসীয়ত করা। কেননা, সম্পদের হকদার হল তাদের পিতা আর কোন মহিলা তার স্বামীর (অন্য স্ত্রীর) সন্তানদের জন্য ওসীয়ত করাও অন্যায়। কেননা, সম্পদের হকদার হল তার ঔরসের সন্তান। অধিক সংখ্যক উত্তরাধিকারী হলে এবং সম্পদ কম হলে ওসীয়তকারী তার সম্পদের এক–তৃতীয়াংশ সকলের জন্য ওসীয়ত করতে পারে। এমতাবস্থায় ঝগড়ার সূত্রপাত হলে ওসীয়তকৃত ব্যক্তি কিংবা আমীর বা প্রশাসক তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবেন। আমি বললাম, তা কি জীবদ্দশায় কার্যকরী হবে, না মৃত্যুর পরে ? তিনি বললেন, আমরা কাউকে মৃত্যুর পূর্বে তা কার্যকরী হওয়ার কথা বলতে শুনিনি। অবশ্য সে মৃত্যুকালে উপদেশ প্রদান করবে।

হযরত তাউস (র.)–এর পিতা থেকে মহান আল্লাহ্র বাণী–فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, ব্যাপারটি হল–ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে যে নিজ পুত্রের সন্তানের জন্য ওসীয়ত করে।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, বরং এ আয়াত– فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ – الاية এর মর্মার্থ হল তার আত্মীয়–স্বজনদের মধ্যে কাউকে বাদ দিয়ে কারুর জন্য অন্যায়ভাবে ওসীয়ত করা। এমতাবস্থায় পিতা–মাতা এবং আত্মীয়–স্বজনদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়ার মধ্যে কোন পাপ নেই। যাঁরা এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তাদের সপক্ষে নিম্নের হাদীস বর্ণিত হল।

হযরত সূদ্দী (র.) থেকে–فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, এর অর্থ হল–ওসীয়তের ব্যাপারে ভুল করা বা অন্যায় করা। اِثْمًا আর এর অর্থ হল–ইচ্ছাকৃতভাবে ওসীয়ত ব্যাপারে অন্যায় করা। সুতরাং তা কার্যকরী না করাই হল উত্তম কাজ। বরং কাউকে বেশী এবং কাউকে কম না করে তার বিবেচনায় যা ন্যায়সঙ্গত সেই অনুসারে মীমাংসা করে দেয়াই হল কর্তব্য কাজ। তিনি বলেন যে, এ আয়াত পিতা–মাতা এবং আত্মীয়–স্বজনদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

ইবনে যায়েদ (রা.) থেকে আল্লাহ্র বাণী– فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, اَلْجَنَفُ শব্দের অর্থ হল ওসীয়তের ব্যাপারে কতককে কতকের উপর অন্যায়ভাবে (সম্পদ) বন্টন করা। আর اَلْاِثْمُ শব্দের অর্থ হল পিতা–মাতার মধ্যে

কাউকে কারো উপর অন্যায় আচরণ (পাপ) করা। অতএব, ওসীয়তকৃত ব্যক্তি পিতা–মাতা, আত্মীয়–স্বজন এবং সন্তান–সন্ততিগণ যারা নিকটাত্মীয়ের অধিকারী তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে। এতে তার কোন পাপ হবে না। এই সেই ওসীয়তকৃত ব্যক্তি, যার জন্য ওসীয়ত করা হলো এবং সম্পদ প্রদান করা হলো, সে দেখল যে, এতে অন্যান্যদের উপর অন্যায় করা হয়েছে। সুতরাং সে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিল। তাতে তার কোন পাপ হবে না। অতএব, ওসীয়তকারী আল্লাহ্র নির্দেশ মত ওসীয়ত করতে এবং ওসীয়তকৃত ব্যক্তির মীমাংসা করতে অপারগ হওয়ায় আল্লাহ্ তা'আলা তাদের থেকে উল্লেখিত ওসীয়তের অধিকার ছিনিয়ে নিয়ে ফরায়েয বা শরীয়ত কর্তৃক বন্টন ব্যবস্থা ধার্য করে দেন। উল্লেখিত আয়াত–فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا সম্পর্কে বর্ণিত ব্যাখ্যাসমূহের মধ্যে উত্তম ব্যাখ্যা হল, ওসীয়তের ব্যাপারে ভুলবশত অন্যায়ের দিকে ধাবিত হওয়া, কিংবা নিজের ওসীয়তের বিষয় ইচ্ছাকৃতভাবে এমনভাবে পাপ কার্য করা যে, পিতা–মাতা ও আত্মীয়–স্বজন যারা উত্তরাধীকারী হয় না তাদেরকে স্বীয় সম্পদ থেকে বৈধভাবে প্রাপ্য অংশ ব্যতীত অধিক প্রদান করা এবং এ ব্যাপারে আল্লাহ্ যতটুকু অনুমতি প্রদান করেছেন–অর্থাৎ এক–তৃতীয়াংশ থেকে অতিক্রম করে যাওয়া কিংবা এক–তৃতীয়াংশসহ সমস্ত সম্পদই দান করা এবং কম সম্পদে অধিক উত্তরাধিকারী হওয়ার বিষয়ে ওসীয়তকারীর মৃত্যুকালে উপস্থিত গণ্যমান্য ব্যক্তি কর্তৃক ওসীয়তকৃত ব্যক্তিবর্গ এবং মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে বৈধভাবে মীমাংসা করে দেয়ার মধ্যে কোন ক্ষতি নেই। তিনি তাকে এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা যা হালাল করেছেন, তা বুঝিয়ে দেবেন এবং তার সম্পদে কতটুকু ওসীয়ত করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা অনুমতি প্রদান করেছেন–তাও তিনি অবগত করে দেবে। আর বৈধভাবে ওসীয়ত করার সীমারেখা অতিক্রম করতে তিনি তাকে নিষেধ করবেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা তার কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে–كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَ حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرَا ِنالْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ তাই হল সংশোধন, যা আল্লাহ্ তা'আলা পরবর্তী আয়াতে উল্লেখ করেছেন যে, – فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ (এরপর সে যদি তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়, তবে তার কোন পাপ নেই)। এমনিভাবে যার ধন–সম্পদ অধিক এবং উত্তরাধিকারীর সংখ্যা কম, এমতাবস্থায় যদি সে পিতা–মাতা এবং আত্মীয়–স্বজনদের জন্য এক–তৃতীয়াংশ থেকে কম ওসীয়ত করতে মনস্থ করে তখন উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ মীমাংসার উদ্দেশ্যে ওসীয়তকারী ও তার উত্তরাধিকারী, পিতা–মাতা এবং ঐ সব আত্মীয়–স্বজন, যাদেরকে ওসীয়ত করতে সে মনস্থ করেছে, অর্থাৎ তিনি রুগ্ন ব্যক্তিকে তাদের জন্য তার ওসীয়তের পরিমাণ বর্ধিত করার নির্দেশ প্রদান করবেন, যেন আল্লাহ্ তা'আলা এ ব্যাপারে এক–তৃতীয়াংশ ওসীয়ত করার যে অনুমতি দিয়েছেন, তা পূর্ণ হয়। এরূপ করাও তাদের মধ্যে বৈধভাবে (اصلاح) মীমাংসা করার অন্তর্ভুক্ত। আমরা এই বক্তব্যটিই গ্রহণ করলাম, কারণ আল্লাহ্ তা'আলা–فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا اَوْ

اِثْمًا এর উল্লেখপূর্বক যা বলেছেন, তা মর্মার্থ হল–যে ব্যক্তি ওসীয়তকারী থেকে অন্যায় কিংবা পাপের ভয় করে। এতে বুঝা গেল যে, ওসীয়তকারী থেকে অন্যায় এবং পাপের ভয় করাটা অন্যায় এবং পাপ কার্য সংঘটিত হওয়ার পূর্বের কথা। আর যদি ওসীয়তকারী হতে তা সংঘটিত হওয়ার পরে হতো, তবে তার থেকে অন্যায় এবং পাপ কার্যের ভয় করার কোন কারণই হতো না। বরং ঐ অবস্থাটা হল–যে অন্যায় করেছে কিংবা পাপ করেছে। যদি তাই এর অর্থ হয় তবে অবশ্যই বলা হবে যে, কোন ব্যক্তি ওসীয়তকারী থেকে অন্যায় কিংবা পাপের বিষয় প্রকাশ করতে পারবে ? কিংবা কিভাবে এ ব্যাপারে বিশ্বাস করতে পারবে বা জানতে পাবে? আর এভাবে তো বলা হয় নি যে–فَمَنْ خَافَ مِنْهُ جَنَفًا (যে ব্যক্তি তার থেকে অন্যায়ের ভয় করেছে।) ঐ ব্যাপারে আমরা যা বললাম, যদি কোন ব্যক্তির সন্দেহের উদ্রেক হয় এবং বলে যে, তখন মীমাংসার প্রয়োজনটা কি ? মীমাংসা তো করতে হয়–যখন দু'দলের মধ্যে কোন বিষয়ে বিরোধ হয়। তখন এর প্রতি উত্তরে বলা হবে যে, যদিও ইসলাহ্ শব্দের অর্থ বিবাদমান দু'দলের মধ্যে মীমাংসা করা বুঝায়, তথাপি যদি তাদের মধ্যে এ ব্যাপারে ঝগড়ার সূত্রপাত হওয়ার ভয় হয় এবং এ কথা বিশ্বাস করার সঙ্গত কারণ থাকে যে, তাদের মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত হতে পারে, তবে তা করা চলে। কেননা, মীমাংসা করা তো এমন একটি কর্ম যার উদ্দেশ্য একেবারে প্রকাশ। এ বিরোধ সংঘটিত হওয়ার পূর্বে কিংবা পরে যে কোন সময়েই হতে পারে।

এমন যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, কিভাবে فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ কথাটি বলা হল ? এখানে তো উত্তরাধিকারী, বিবাদমান ব্যক্তিবর্গ, কিংবা তাদের মধ্যে বিরোধের বিষয় উল্লেখ নেই। এর প্রতি–উত্তরে বলা হবে, তাদের কথা উল্লেখ না থাকলেও ঐ সব ব্যক্তিগণের কথা উল্লেখ আছে–যাদেরকে ওসীয়ত করার বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ প্রদান করেছেন। তাঁরা হলেন ওসীয়তকারীর পিতা–মাতা এবং তার আত্মীয়–স্বজন। যাদেরকে আল্লাহ্র এই বাণী–كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرًا اِِنِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ এর মধ্যে ওসীয়ত করার নির্দেশ করা হয়েছে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা এর উল্লেখপূর্বক বলেছেন, فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ অর্থাৎ যাকে আমি ওসীয়তের নির্দেশ দিয়েছি তার কাছ হতে যদি কেউ অন্যায় কিংবা পাপ কার্যের ভয় করে, তবে তাদের মধ্যে এবং যাকে আমি ওসীয়তের নির্দেশ দিয়েছি তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়, তবে তার কোন পাপ হবে না। অর্থাৎ তাদের মধ্যে এবং ওসীয়তকারীর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়ার মধ্যে কোন পাপ নেই।

মহান আল্লাহ্র কালাম– فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ এর মধ্যে ص অক্ষরে تخفيف (সহজ) করে এবং واو অক্ষরে ساكن করে তিলাওয়াত করা হয়। আর واو অক্ষরে تحريك (হরকত) দিয়ে এবং " ص "

অক্ষরে تشد يد (তাশদীদ) দিয়েও তিলাওয়াত করা হয়। যারা " ص " এর মধ্যে تخفيف (তাখফীফ) করে এবং واو কে ساكن (সাকিন) করে পড়েছেন, তারা আরবীয় ঐ পরিভাষা অনুযায়ী পড়েছেন, যিনি বলেছেন, أوصيت فلانا بكذا আর যারা واو অক্ষরকে (تحريك) হরকত দিয়ে এবং "ص" অক্ষরকে تشديد তাশদীদ দিয়ে পড়েছেন, তিনি তা ঐ ব্যক্তির পরিভাষা অনুযায়ী পড়েছেন, যিনি বলেন, وصَّيت فلانا بكذا (আমি অমুক ব্যক্তিকে এ পরিমাণ ওসীয়ত করেছি)। وصَّيتك এবং أوصيتك উভয় পাঠরীতিই আরব দেশে প্রচলিত। الجنف শব্দের অর্থ "الجو ر" অন্যায় বা অত্যাচার এবং "العدول عن الحق" সত্য থেকে বিমুখ হওয়া বুঝায়– আরবী ভাষায় এরূপ অর্থ প্রচলিত আছে। এ সম্প্রর্কে জনৈক কবির কবিতার দু'টি পংক্তি নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

هم المولى وان جنفوا علينا + و انا من لقائهم لزو ر

(তারা আমাদের চাচা তো ভাই। যদিও তারা আমাদের উপর অত্যাচার করে– তথাপি আমরা তাদের সাথে দেখা সাক্ষাতের উদ্দেশ্য অবশ্যই গমন করবো।) এর পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়– جنف الرجل على صاحبه (লোকটি তার সঙ্গীর উপর অন্যায় করল)। يجنف এর অর্থ হল–যখন সে তার দিকে ঝুকে যায় এবং অত্যাচার করতে শুরু করে। কাজেই من خاف من موص এ বাক্যের অর্থ হল যে ব্যক্তি ওসীয়তকারী থেকে ওসীয়তের ব্যাপারে অন্যায়ের ভয় করে এবং এ ব্যাপারে সঠিকপন্থা থেকে দূরে সরে যাওয়ার এবং ইচ্ছাকৃত অন্যায় ও পাপের আশংকা করে। তা তার থেকে ইচ্ছাকৃত ভুল ধরে নিতে হবে। সুতরাং এমতাবস্থায় যে কেউ তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়, তার কোন পাপ হবে না। আমরা الجنف এবং الاثم শব্দদ্বয়ের অর্থের ব্যাপারে যা বললাম,– অনুরূপ অর্থ অন্যান্য মুফাসসীরগণও বলেছেন। যারা এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তাঁদের সপক্ষে নিম্নের হাদীস বর্ণিত হলঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে মহান আল্লাহ্র বাণী–فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, এর মর্মার্থ হল অনিচ্ছাকৃত অপরাধ।

হযরত আতা (র.) থেকে–فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, جَنَفًا এর অর্থ হল مَيْلًا অর্থাৎ আগ্রহভরে ঝুঁকে যাওয়া–।

হযরত আতা (র.) থেকেও উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। অন্য এক সূত্রে হযরত আতা (র.) থেকেও উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

হযরত যাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, اَلْجَنَفُ এর অর্থ হল اَلْخَطَاءُ ভুলবশত অন্যায়। আর وَالْاِثْمِ এর অর্থ হল (اَلْعَمَدُ) ইচ্ছাকৃত অপরাধ।

হযরত আতা (র.) থেকেও উল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

হযরত সূদ্দী (র.) থেকে فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, جَنَفًا এর অর্থ হল–خَطَاء فِى وَصِيَّتِهٗ তার ওসীয়তে অনিচ্ছাকৃত অপরাধ। আর اِثْمًا এর অর্থ হল তার ওসীয়তের ব্যাপারে ইচ্ছাকৃত অপরাধ করা।

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে আল্লাহ্র বাণী– فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, جَنَفًا এবং اِثْمًا সম–অর্থবোধক।

হযরত রবী (র.) থেকে–فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, اَلْجَنَفُ এর অর্থ ভুলবশত অন্যায় করা এবং اَلْاِثْمُ এর অর্থ ইচ্ছাকৃত অপরাধ করা।

হযরত রবী ইবনে আনাস (র.) থেকে উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

হযরত ইবরাহীম (র.) থেকে–فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, اَلْجَنَفُ এর অর্থ (اَلْخَطَاءُ) ভুলবশত অপরাধ করা এবং اَلْاِثْمُ এর অর্থ (اَلْعَمَدُ) ইচ্ছাকৃত অপরাধ করা।

হযরত আতিয়া (র.) থেকে–فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, خَطَاءً অর্থ ভুলবশত অন্যায় করা কিংবা اِثْمًا مُتَعَمِّدًا ইচ্ছাকৃত অপরাধ করা।

হযরত তাউস (র.)–এর পিতা থেকে–فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, جَنَفًا এর অর্থ ميلاً অর্থাৎ আগ্রহভরে ঝুঁকে গিয়ে অপরাধে লিপ্ত হওয়া।

হযরত ইবনে যায়দ (রা.) থেকে মহান আল্লাহ্র বাণী, جنفًا সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, এর অর্থ হল حيفًا অত্যাচার, জুলুম। والاثم এর অর্থ হল ميله لبعض على بعض কিছু লোককে বাদ দিয়ে কিছু লোকের প্রতি ঝুঁকে যাওয়া এবং সকলেরই একই পর্যায়ভুক্ত হওয়া। যেমন عفوا غفورا এবং غفورا رحيما সম–অর্থবোধক।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, الجنف এর অর্থ (الخطاء) ভুলবশত অপরাধ এবং الاثم এর অর্থ (العمد) ইচ্ছাকৃত অপরাধ।

হযরত যাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, **الجنف** এর অর্থ **(الخطاء)** ভুলবশত অপরাধ এবং **الاثم** এর অর্থ **(العمد)** ইচ্ছাকৃত অপরাধ। আর মহান আল্লাহ্র বাণী- **اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ** এর অর্থ হল ওসীয়তকারীর হৃদয়ে উদিত অন্যায় এবং পাপের বিষয় যখন সে ওসীয়তকালে তা পরিহার করে, তখন আল্লাহ্র তা'আলা ওসীয়তকারীর জন্য ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহশীল হন। কাজেই যখন তার অন্তরে অন্যায়ের সূত্রপাত হয় এবং তা কার্যকরী না করে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা এর জন্য তাকে পাকড়াও করা হতে বিরত থাকেন। আর তিনি **رحيم** অনুগ্রহশীল হন, মীমাংসাকারীর প্রতি,যিনি ওসীয়তকারীর মধ্যে এবং প্রতি সে অন্যায় করতে মনস্থ করেছে এবং যে বিষয়ে অন্যায়ের সূত্রপাত হয়েছে তদ্বিষয়ে মীমাংসা করে দেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ -

অর্থ ঃ "হে মু'মিনগণ ! তোমাদের প্রতি সওম ফরয করা হয়েছে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের প্রতি ফরয করা হয়েছিলো, যাতে তোমরা পরহিযগারী অবলম্বন করবে।" (সূরা বাকারা ঃ ১৮৩)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার এ বাণীর মর্ম হলো, হে যেসব লোক তোমারা যারা আল্লাহ্পাক ও তাঁর রাসূল (সা.) প্রতি ঈমান এনেছো এবং আল্লাহ্র রাসূলের সত্যতায় বিশ্বাস করেছো, এবং আল্লাহ্পাক ও তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছো তোমাদের প্রতি সওম ফরয করা হলো। **صيام** শব্দটির মূল উৎস **صوم** যথা। **صمت عن كذا** (আমি অমুক কাজ থেকে বিরত রয়েছি) **اصوم عند** (আমি অমুক কাজ থেকে বিরত থাকবো) আর **صيام** শব্দটির অর্থ হলো যে, কাজ থেকে আল্লাহ্ বিরত থাকার আদেশ দিয়েছেন, তা থেকে বিরত থাকা। এ অর্থেই বলা হয় **صَامَتِ الْخَيْلُ** (ঘোড়া যখন ভ্রমণে বিরত হয়। তখন বলা হয়, ঘোড়া বিরত হয়েছে)। বনী যুবইয়ানের কবি নাবেগার কবিতাতে এ অর্থই ব্যবহৃত হয়েছে।

خَيْلٌ صِيَامٌ وَ خَيْلٌ غَيْرُ صَائِمَةٍ - تَحْتَ الْعَجَاجِ وَ اُخْرٰى تَعْلُكُ اللُّجُمَا

অর্থাৎ কোনো ঘোড়া পরিভ্রমণে রত আর কোনো ঘোড়া পরিভ্রমণ থেকে বিরত। কবি এখানে **صوم** শব্দকে বিরত থাকার অর্থে ব্যবহার করেছেন।

আর কুরআনুল করীমেও অন্যত্রে **صوم** শব্দটি অনুরূপ অর্থ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, **اِنِّىْ نَذَرْتُ**

لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا (নিশ্চয় আমি মানত করেছি যে, আমি পরম করুণাময় আল্লাহ্ পাকের জন্য কথা বলা থেকে বিরত থাকবো) (সূরা মারয়াম ঃ ২৬)

অর্থাৎ সওম তোমাদের প্রতি এভাবে ফরয হয়েছে যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তিগণের জন্য ফরয করা হয়েছিল।

উপরোক্ত আয়াতে করীমার ব্যাখ্যায় বিশেষজ্ঞগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। পূর্ববর্তিগণের প্রতি রোযা ফরয হওয়া ও আমাদের প্রতি রোযা ফরয হওয়া নিয়ে এখানে তুলনা করা হয়েছে। তাঁদের কেউ কেউ বলেছেন, নাসারাদের প্রতি যেরূপভাবে রোযা ফরয করা হয়েছিলো, তেমনিভাবে আমাদের প্রতিও রোযা ফরয বলে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা দিয়েছেন। আর তারা বলেছেন, তুলনা করা হয়েছে সময় এবং পরিমাণ নিয়ে। যা উভয়ের ক্ষেত্রেই এক ও অভিন্ন। আজ আমাদের প্রতিও তা অবশ্য কর্তব্য। এ মতের সমর্থনে উল্লেখ্য যে, হযরত শা'বী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি আমি সারা বছর ও রোযা রাখি তবুও অবশ্যই আমি يوم الشك (সন্দেহের দিনে) রোযা রাখবো না। শা'বান হোক বা রমযানেই হোক, সন্দেহের দিন হলে রোযা রাখবো না। এর কারণ হলো, নাসারাদের প্রতিও রমযান মাসে রোযা ফরয ছিলো, যেমন আমাদের প্রতি ফরয। তারপর তারা তা পরিবর্তন করেছে সুবিধা মত সময়ের দিকে। তারা অনেক সময় রোযা রাখতো গ্রীষ্মকালে এবং ত্রিশ দিন গুণে শুমার করতো। তারপর এমন এক সময় আসলো যে তারা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিলো এবং রোযা রাখলো ত্রিশ দিনের আগে একদিন এবং পরে একদিন। শেষ পর্যন্ত এ পদ্ধতিই অব্যাহত থাকলো, যা পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত পৌছালো। আর তাই আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন–يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ – ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে কয়েকজন বলেছেন, নাসারাদের রোযা ছিলো আগের রাতের এশার পর থেকে পরবর্তী এশার পর পর্যন্ত। আর তা মু'মিনগণের প্রতি ফরয করেছেন আল্লাহ্ তা'আলা, যেমন ফরয করেছিলেন পূর্ববর্তীদের প্রতি। তাদের বক্তব্যের সপক্ষে তারা প্রথম কথা বলেছেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা তার মহান বাণী–كُتِبَ كَمَا عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ দ্বারা নাসারাদের বুঝিয়েছেন।

এ বক্তব্যের সমর্থনে আলোচনা ঃ

হযরত সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, উপরোক্ত আয়াতে কারীমার ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, এখানে নাসারাদেরকে বুঝানো হয়েছে। নাসারাদের উপর রমযান মাসের রোযা ফরয করা হয়েছিলো। নিদ্রার পর তাদের প্রতি পানাহার নিষেধ করা হয়েছিলো। রমযানে তাদের প্রতি বিয়ে–শাদী নিষিদ্ধ ছিলো। নাসারাদের প্রতি রমযানের রোযা কষ্টদায়ক হয়ে পড়েছিলো। শীত ও গ্রীষ্মে তাদের প্রতি রোযা পরিবর্তিত হতো। এমতাবস্থায় তাদের রোযার শীত ও গ্রীষ্মের মাঝামাঝি মওসুমে নিয়ে যেতে তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং তারা বলতো আমাদের অপকর্মের কাফ্ফারাস্বরূপ আমরা বিশবাড়িয়ে

দিয়েছি। তারা তাদের রোযাকে পঞ্চাশ দিনে পৌঁছে দেয়। নাসারা সম্প্রদায় যেরূপ অপকর্ম করতো, কিছু কিছু মুসলমান থেকেও অনুরূপ ভুলত্রুটি প্রকাশ পায়। হযরত আবূ কায়স ইবনে সিরমা (রা.) ও হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রা.) থেকে কিছু প্রকাশ পায়। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য সুবহে সাদিক পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রীগমন হালাল ঘোষণা করেন।

হযরত রবী (র.) থেকে বর্ণিত, উপরোক্ত আয়াতে কারীমার অর্থে তিনি বলেন, রাতের প্রথম প্রহর থেকে (পরবর্তী রাতে) প্রথম প্রহর পর্যন্ত।

অন্যান্য মুফাসসীরগণ বলেন, মহান আল্লাহ্‌র উপরোক্ত আয়াতে কারীমার মমার্থে আহলে কিতাবকে বুঝানো হয়েছে।

যারা এমত পোষণ করেন ঃ

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, তারা আহলে কিতাব।

কোন কোন তাফসীরকার বলেন, বরং তা পূর্ববর্তী সমস্ত মানুষের উপর ফরয ছিলো। এ মতের সমর্থকগণের বর্ণনা ঃ

হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, রমযান মাসের রোযা সকল মানুষের প্রতি ফরয করা হয়েছে যেমন পূর্ববর্তী সকল মানুষের প্রতি ফরয করা হয়েছিলো। রমযানের রোযার বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বে আল্লাহ্ পাক পূর্ববর্তী মানুষের জন্য প্রতি মাসে তিন দিন রোযা ফরয করেছিলেন। হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, রমযানকেই আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ববর্তীদের উপর নিদিষ্ট করে দিয়েছেন।

এসব বক্তব্যের মধ্যে বিশুদ্ধতার দিক থেকে উত্তম তাদের কথা, যারা বলেছেন আয়াতের অর্থ হলো, হে মু'মিনগণ ! তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেয়া হলো যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তিগণকে দেয়া হয়েছিল–'নিদিষ্ট কয়েক দিন'। আর তা হলো, পুরো রমাযান মাস, কারণ হযরত ইবরাহীম (আ.)–এর পরবর্তিগণের উপর হযরত ইবরাহীম (আ.)–কে অনুসরণের নির্দেশ ছিল। আর এটা এ জন্য ছিল যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে সকল মানুষের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ (ইমাম) বানিয়ে ছিলেন। আল্লাহ্ পাক আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন যে, তার দীন ছিল একেবারে বিশুদ্ধ ইসলাম। কাজেই আমাদের নবী করীম (সা.)–কে সে বিষয়ের নির্দেশ দিলেন যেরূপ বিষয়ের নির্দেশ তার পূর্ববর্তী আম্বিয়া (আ.)–কে দিয়েছেন।

আর উপমাটি হলো সময় বুঝাতে। অর্থাৎ আমাদের আগে যারা ছিল তাদের প্রতিও রমযান মাসই ফরয ছিল ঠিক যেমনি আমাদের উপর রমযান ফরয করা হয়েছে –একই সময়। আল্লাহ্ পাকের বাণী– لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ 'যাতে তোমরা সংযমী হতে পার'–এর ব্যাখ্যাঃ যাতে তোমরা এ সময় পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে সংযমী থাক। কেননা আল্লাহ্ পাক বলেন–তোমাদের প্রতি সওম এবং এমন কাজ থেকে বিরত থাকা ফরয করা হয়েছে যা তোমরা অন্য সময় করে থাক। আর তা সওম পালনকালীন সময় করলে সওমকে নষ্ট করে দেয়।

এ বিষয়ে আমরা যা বলেছি, কিছু সংখ্যক ব্যাখ্যাকারগণও অনুরূপ বলেছেন।

এ অভিমতের সমর্থনে যারা রয়েছেন ঃ

হযরত সূদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি لعلكم تتقون এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, তোমরা (সওম পালনকালে) পানাহার ও নারী সম্ভোগ থেকে সাবধান হয়ে চলবে, যেমনি তোমাদের পূর্ববর্তী খ্রীস্টানরা সংযত ও সাবধান ছিল।

أَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا أَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ-وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ - فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ - وَأَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ -

অর্থ ঃ **"নির্দিষ্ট কয়েকদিনের জন্য। তোমাদের মধ্যে কেউ পীড়িত হলে বা সফরে থাকলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করে নিতে হবে। তা যাদেরকে অতিশয় কষ্ট দেয় তাদের কর্তব্য–এর পরিবর্তে ফিদ্‌ইয়া–একজন অভাবগ্রস্তকে অনুদান করা। যদি কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে কিছু অধিক সৎকাজ করে, তবে তা তার পক্ষে অধিক কল্যাণকর। যদি তোমার উপলব্ধি করতে তবে বুঝতে সিয়াম পালন করাই তোমাদের জন্য অধিকতর কল্যাণপ্রসূ।"** (সূরা বাকারা ঃ ১৮৪)

ব্যাখ্যা : হে মু'মিনগণ ! নির্দিষ্ট কয়েকদিনের জন্য তোমাদের সিয়ামের বিধান দেয়া হল। উহ্য ফেল (فعل) এর কারণে أَيَّامًا শব্দে নসব দেয়া হয়েছে। পূর্ণ বাক্যটি হল : "كتب عليكم الصيام ، كما كتب على الذين من قبلكم ان تصوموا اياما معدودات যেমন বলা হয়, اعجبنى الضرب زيدا ব্যাখ্যাকারগণ "أَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ" সম্পর্কে একাধিক মত পোষণ করেন। তাদের কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ ঃ প্রতিমাসে তিন দিন সওম পালন করা। আর তা ছিল রমযানের সওম ফরয হওয়ার আগে।

এ বক্তব্যের সমর্থনে আলোচনা ঃ

হযরত আতা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রমযানের সওম ফরয হওয়ার পূর্বে মানুষের উপর প্রতিমাসে তিনদিন সওম পালন করা ফরয ছিল ; রোযার মাসকে ايَّام معدودات হিসাবে উল্লেখ করা হয়নি। বরং আগে এ তিন দিনই মানুষের সিয়াম ছিল। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের উপর পুরো রমযান মাসের সওম ফরয করে দিলেন।

আয়াত প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, পূর্বে প্রতি মাসে তিনদিন সওম ফরয ছিল। এরপর রমযানের সিয়াম সম্পর্কিত আয়াত দ্বারা তা রহিত করা হয়। আর ঐ রোযা আরম্ভ হতো এশার সময় থেকে।

হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,– রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মদীনায় এসে

আশুরার দিন (১০ই মুহররম) ও প্রতি মাসের তিনদিন সওম পালন করতেন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা রমাযান মাসের রোযা ফরয করলেন। আর উপরোক্ত আয়াতের শুরু থেকে– وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ পর্যন্ত নাযিল করেন।

হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের প্রতি রমযানের সওম ফরয হওয়ার পূর্বে প্রতিমাসে তিনদিন সওম পালন করা ফরয ছিল। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) প্রতিমাসে যে তিনদিন রোযা রাখতেন তা ছিল নফল। কাজেই আয়াতে উল্লেখিত 'নির্দিষ্ট কয়েকটি দিন' (ايامًا معدودات) বলতে রমযান মাসের দিনগুলোকেই বুঝানো হয়েছে–পূর্ববর্তীগুলো নয়।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন :

হযরত আমর ইবন মুররাহ্ (র.) বলেন, হযরত সাহাবায়েকিরাম (রা.) বলেছেন যে, যখন হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁদের কাছে এলেন, তখন তিনি প্রতি মাসে তিনটি রোযা পালনের জন্য বললেন, নফল হিসাবে ফরয হিসাবে নয়। তারপর রমযানের রোযার বিধান নাযিল হয়।

আমরা ইতিপূর্বে সে সব উলামায়ে কিরামের উল্লেখ করেছি যারা উপরোক্ত আয়াতের 'সিয়াম' অর্থে রমযান মাসের রোযা বুঝিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে বিশুদ্ধ অভিমত হলো, আল্লাহ্ তা'আলা "ايامًا معدودات" (নির্দিষ্ট কয়েকটি দিন) বলে মাহে রমাযানের দিনগুলোহৈ বুঝিয়েছেন। কারণ এ ব্যাপারে এমন কোন প্রামাণ্য হাদীস নেই যে, মুসলমানগণের উপর মাহে রমাদানের রোযা ব্যতীত কোন রোযা ফরয ছিল, যা পরবর্তীতে রমযানের রোযা দ্বারা মানসূখ হয়ে যায়। তাছাড়া আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে পরপরই বর্ণনা করেছেন যে, তিনি যে রোযা আমাদের উপর ফরয় করেছেন, তা মাহে রমাদানের রোযা অন্য সময়ের নয়। কারণ, সেসব দিনের বর্ণনা তিনি দিয়ে দিয়েছেন, যেগুলোতে আমাদের উপর রোযা পালন ফরয করে দেন। আর সে আয়াত– شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ মাহে রমাদান, যাতে কুরআন নাযিল হয়েছে।

এখন যদি কেউ এ দাবী করেন যে, মাহে রমাদানের রোযা ভিন্ন অন্য কোন রোযা মুসলমানদের উপর ফরয ছিল–যে রোযা ফরয হওয়ার ব্যাপারে তারা একমত–তারপর তা মানসূখ হয়ে যায়। তাহলে তাদেরকে তা প্রমাণের জন্য এমন একটি তথ্য বা হাদীস উপস্থাপন করতে বলব যা দ্বারা অকাট্যভাবে বিষয়টি প্রমাণিত হয়–কারণ এটা এমন হাদীস ব্যতীত জানা যায় না, যা দ্বারা ওজর বা অজ্ঞানতা দূর হয়। আর যখন প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি এমন যা আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি (অর্থাৎ প্রামাণ্য দলীল নেই)। তখন আয়াতের ব্যাখ্যা হবে তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হলো যেমনি ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর–যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার, اَيَّامًا مَّعْدُوْدَاتٍ (নির্দিষ্ট কয়েকটি দিন) আর তা হল, রমযান মাস। এর অর্থ এভাবে হওয়াও সম্ভব যে–তোমাদের

উপর সিয়াম ফরয বা নির্ধারিত করা হলো–অর্থাৎ তোমাদের উপর মাহে রমাযানকে নির্ধারিত করা হল। আর معدودات নির্দিষ্ট কয়েকটি বলতে বুঝানো হয়েছে–যার সংখ্যা ও সময়ের প্রহরগুলো গণনা করা যায়। কাজেই معدودات অর্থ পরিসংখ্যা।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী– فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْ نَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ – অর্থাৎ 'তোমাদের মধ্যে কেউ পীড়িত হলে বা সফরে থাকলে অন্য সময় এ সংখ্যা পূরণ করে নিতে হবে। তা যাদের সাতিশয় কষ্ট দেয়–তাদের কর্তব্য তার পরিবর্তে ফিদ্ইয়া বা একজন, অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদান করা।' এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে–উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বুঝাতে চেয়েছেন–তোমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ–অথচ তাদের উপর রোযার হুকুম হয়েছিল অথবা এমন ব্যক্তি যে সুস্থ তবে সে এখন সফরে আছে, তারাই অন্য দিনগুলোতে রোযা কাযা করে নিতে পারবে–যখন তারা অসুস্থ বা সফরে থাকবে না।

মহান আল্লাহ্র বাণী– فعدةٌ من ايام اخرى এর উপর رفع হয়েছে তাঁর বাণী– فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ এর অনুরূপ। যথাস্থানে তা বর্ণনা করা হয়েছে। এজন্য পুনরাবৃত্তির দরকার নেই।

মহান আল্লাহর বাণী– وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْ نَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ এখানে সকল মুসলমানের কিরাআত وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْ نَهٗ এবং এভাবেই তাদের নিকট রক্ষিত কুরআন মজীদের কপিগুলোতে লেখা রয়েছে। এমন একটি কিরআত যার সাথে ভিন্নতা পোষণ করা কোন মুসলমানের জন্য জায়েয নয়। কারণ, তারা সবাই যুগযুগ ধরে সে পাঠ পদ্ধতিকেই শুদ্ধ বলে লিখেছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এভাবে পড়তেন–وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْ نَهٗ যা হোক, যারা وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْ نَهٗ পড়েন, তাঁরা তার অর্থের ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁদের কেউ কেউ বলেন–তা ছিল রোযা ফরয হবার প্রথম দিকে, তখন মুকীমের মধ্যে সক্ষম ব্যক্তিরা ইচ্ছা করলে রোযা রাখতেন, ইচ্ছা করলে তা ভেঙেও ফেলতে পারতেন। অবশ্য এর জন্য ফিদ্ইয়াস্বরূপ প্রতি ভঙ্গের দিনের জন্য একজন মিসকীনকে খাওয়াতেন। তারপর এ সুবিধা মানসূখ হয়ে যায়।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা.) মদীনায় আগমন করে আশুরার দিন ও প্রতি মাসের তিনদিন করে রোযা পালন করতেন। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা মাহে রমাদানকে ফরয করে আয়াত নাযিল করলেন– يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ ..وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ তখন যে ইচ্ছা করত রোযা রাখত, আবার ইচ্ছা করলে রোযা না রেখে একজন মিসকীনকে খাওয়াতো। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা সুস্থ মুকীমের জন্য রোযা

অবশ্য কর্তব্য করে দিলেন, আর খাওয়ানোর সুবিধাটি রোযা রাখতে অক্ষম বৃদ্ধের জন্য নির্দিষ্ট করে দিলেন এবং নাযিল করলেন- فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ এ পূর্ণ আয়াত।

হযরত আমর ইবনে মুররাহ্ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের সাহাবিগণ বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদের কাছে (মদীনায়) এসে প্রতিমাসের তিনটি করে সওম নফল হিসাবে রাখার জন্য বলেন। এরপর রমযানের সিয়াম নাযিল হলো। তারা তো সিয়ামে অভ্যস্ত ছিল না, তাই সিয়াম পালন তাদের কাছে কঠিন মনে হলো, তখন যে সওম পালন করতো না সে একজন মিসকীনকে খাওয়াতো। এরপর এ আয়াতে নাযিল হলো- فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ (তোমাদের মধ্যে যে এই মাসে উপস্থিত থাকবে তাকে অবশ্য রোযা রাখতে হবে। আর যে অসুস্থ, অথবা সফরে থাকবে সে অন্য দিনগুলোতে কাযা করে নিবে' ।) কাজেই এ আয়াত দ্বারা ভাঙ্গার অনুমতি রুগ্ন ও মুসাফির ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট হয়ে গেল এবং আমাদেরকে সিয়ামের নির্দেশ দিলেন। বর্ণনাকারী মুহাম্মদ ইবন মুসান্না বলেন সাহাবিগণ থেকে এ হাদীসটি প্রকৃতপক্ষে ইবনে আবূ লায়লা (র.) বর্ণনা করেন- আমার (র.) নন। অন্য এক সূত্রে এটা প্রমাণিত। হযরত আলকামা (র.) থেকে- وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ এ আয়াত প্রসঙ্গে বর্ণিত, তখন যার ইচ্ছা রাখত, যার ইচ্ছা না রেখে তখন একজন মিসকীনকে অর্ধ সা' খাবার দিত। এরপর মাহে রমাদান তা রহিত করে দিল। পড়তে পড়তে এখানে এসে থামলেন- فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

হযরত ইবরাহীম (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। তবে তার বর্ণনাতে এতটুকু বাড়তি আছে যে, এ আয়াতটি প্রথম আয়াতকে মানসূখ করে। ফলত সেটি সওমে অক্ষম বৃদ্ধের ক্ষেত্রে আরোপিত হয়। বৃদ্ধরা প্রতি সওমের পরিবর্তে একজন মিসকীনকে অর্ধ সা' সাদ্‌কা দিতেন।

এ আয়াত সম্পর্কে হযরত ইকরামা ও হাসান বসরী (র.) বলেন সে সময় কেউ ইচ্ছা করলে সওম না রেখে তার পরিবর্তে একজন মিসকীনকে ফিদ্ইয়া হিসাবে খাবার দিলেও চলতো, এতেই তার সওম হয়ে যেতো। পরে এ আয়াতে (فمن شهد منكم الخ) সকল মুকীমের উপর সওম ফরয ঘোষণা করা হয়। এরপর এ নির্দেশের আওতা থেকে নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তিকে বাইরে রাখার অনুমতি সম্বলিত আয়াত নাযিল হয় : وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ

('আর যে অসুস্থ অথবা সফরে থাকবে সে অন্য সময় সম-সংখ্যক রোযা পূরণ করবে।')

হযরত 'আলকামা (র.) বলেন- فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الخ এ আয়াতটি وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ الخ এ আয়াতটিকে মানসূখ করে দিয়েছে।

হযরত শাবী (র.) বলেন- وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ এ আয়াতটি নাযিল হলে লোকে সওম না রেখে প্রতিদিনের জন্য একজন মিসকীনকে খাবার সাদ্‌কা দিত। তারপর এ আয়াত নাযিল

হয়। وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ তখন অসুস্থ ও মুসাফির ছাড়া কারো জন্য সওম না রাখার অনুমতি রইল না।

শা'বী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এ আয়াতটি ব্যাপকভাবে সকল মানুষের জন্য নাযিল হয়েছে- وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ তখন লোকে সওম না রেখে তার খাবার কোন মিসকীনকে সাদ্কা করত। এরপর এ আয়াতটি নাযিল হয়- وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ তিনি বলেন-কাজেই রুগ্ন ও মুসাফির ছাড়া কারো জন্য অনুমতি রোযা না রাখার নাযিল হয়নি।

হযরত ইবনে আবূ লায়লা (র.) বলেন, আমি 'আতা (র.)-এর কাছে গিয়ে দেখি তিনি রমযান মাসে (দিনের বেলায়) খাচ্ছেন। তখন তিনি (আমাকে) বললেন-আমি বয়ঃবৃদ্ধ লোক। সওম-এর আয়াত যখন নাযিল হলো তখন কেউ চাইলে সওম পালন করত, কেউ ইচ্ছা করলে রোযা না রেখে মিসকীন খাওয়াত। শেষ পর্যন্ত এ আয়াত নাযিল হয়-فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ الخ

তখন সওম সকলের উপর ফরয হলো, শুধু রুগ্ন, মুসাফির ও আমার মত অধিক বৃদ্ধরা ফিদ্ইয়া দিতো।

ইবনে শিহাব বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা-يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ এ আয়াত দ্বারা আমাদের উপর সিয়াম ফরয করলেন। তখন কেউ রোযা রাখতে কষ্ট হলে ইচ্ছা করলে সে ফিদ্ইয়া দিত পারতে-চাই সে সুস্থ হোক বা অসুস্থ অথবা মুসাফির। ফিদ্ইয়া ছাড়া তার উপর কিছুই ছিল না। আল্লাহ্ তা'আলা যখন এ মাস প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের উপর রোযা ফরয করে দিলেন, তখন সুস্থ ব্যক্তির কষ্ট হলেও ফিদ্ইয়ার সুবিধা রহিত হয়ে যায় এবং মুসাফির ও অসুস্থ ব্যক্তিকে অন্য দিনগুলোতে আদায়ের অনুমতি দেয়া হয়। তিনি আরো বলেন, এভাবে ফিদ্ইয়া শুধু আগের বৃদ্ধদের বেলাতেই-যারা রোযা রাখায় অপারগ,-পিপাসায় কাতর হয়ে যায় অথবা এমন রোগ দেখা দেয় যার ফলে রোযা রাখা সম্ভব নয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্ তা'আলা প্রথম রোযাতে মিসকীনকে খাবারের ফিদ্ইয়া দেয়ার সুবিধা রেখেছিলেন, কাজেই মুসাফিরের বা মুকীমদের যে কেউ ইচ্ছা করলে মিসকীনকে খাবার দিয়ে রোযা ভাঙতে পারত। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা পরবর্তী রোযায় নাযিল করলেন-'অন্যদিনগুলোতে আদায় করে নিবে-(فِدْيَةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ) পরবর্তী রোযায় এটা উল্লেখ করলেন না, فدية طَعَام مِسْكِيْنٍ-মিসকীনকে খাবার ফিদ্ইয়া দিবে। এতে করে ফিদ্ইয়া মানসূখ হয়ে যায় এবং পরবর্তী রোযাতে জুড়ে দেয়া হয় -يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ আল্লাহ্ তোমাদের

জন্য সহজটাই চান–কঠিনটা চান না' – আর তা হলো সফরকালীন রোযা না রাখাও অন্য সময় তা আদায় করে নেবার সুবিধা।

হযরত সালামা ইবনে আক্ওয়া (রা.) থেকে বর্ণিত, আমরা হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর সময় ইচ্ছা করলে রোযা পালন করতাম আবার না চাইলে রোযা না রেখে একজন মিসকীনকে ফিদ্ইয়া–স্বরূপ খাবার দিতাম। এ সময় নাযিল হয় – فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

হযরত শা'বী (র.) থেকে বর্ণিত–وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ এ আয়াত সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য ছিল ; যখন নাযিল হলো– فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ তখন রোযা ও কাযা উভয়ের নির্দেশ দিয়ে ইরশাদ করলেন–وَ فَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ যে ব্যক্তি রুগ্ন বা মুসাফির হবে সে অন্যদিনগুলোতে কাযা করে নিবে।

হযরত ইবরাহীম (র.) থেকে বর্ণিত–وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ এই প্রথম আয়াতখানা তার পরবর্তী আয়াত মানসূখ করে। তা হলো–وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ তবে রোযা রাখা তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে।

হযরত উবায়দা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, উল্লেখিত আয়াতকে পরবর্তী আয়াত মানসূখ করে দেয়।

হযরত দাহ্হাক (র.) থেকে "....كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ" এ আয়াতটি সম্পর্কে বর্ণনা আছে যে, সওম ফরয হলো এক এশার সময় থেকে পরবর্তী এশার সময় পর্যন্ত। কাজেই কোন ব্যক্তি এশার সালাতে আদায়ের পরে তার উপর পরবর্তী এশা পর্যন্ত খাবার ও স্ত্রী সহবাস হারাম হয়ে যেত। এরপর অপর সওমটি নাযিল হলো। এতে সারা রাত পানাহার ও স্ত্রী সহবাসকে হালাল করা হলো। সে আয়াতটি হচ্ছে–

وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ؛ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ۔

"আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ রাত্রের কালো রেখা থেকে ঊষার শুভ্র রেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়। তারপর নিশাগমন পর্যন্ত সিয়ামপূর্ণ কর।" এ ছাড়া স্ত্রী সহবাসকেও হালাল করা হলো। এ প্রসঙ্গে আয়াত নাযিল হলো–اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَائِكُمْ '(সিয়ামের রাতে তোমাদের জন্য স্ত্রীসম্ভোগ হালাল করা হলো।)' তখন প্রথম সওমের সময় ফিদ্ইয়া ছিল, কাজেই মুসাফির অথবা মুকীম যে চেতো একজন মিসকীনকে খাবার দিয়ে সওম ভেঙ্গে ফেলতে পারত। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা দ্বিতীয় সওমে ফিদ্ইয়ার উল্লেখ করেননি,

বলেছেন–فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ 'অন্য দিনগুলোতে নির্দিষ্ট সংখ্যা কাযা করতে হবে।' কাজেই এ দ্বিতীয় সওম ফিদ্ইয়াকে মানসূখ করে দিল।

আর অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন–বরং আল্লাহ্র বাণী–وَ عَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ এটা বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার জন্য একটি বিশেষ হুকুম ছিল, যারা রোযা পালনে অক্ষম তাদেরকেই অনুমতি দেয়া হয়েছিল রোযা না রেখে মিসকীনকে খাবার দেয়ার জন্য। তারপর তা– فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ এ আয়াত দ্বারা মানসূখ হয়ে যায়। তখন যুবকদের মত তাদের উপরও রোযা ফরয হয়ে যায়। হাঁ, তারা যদি রোযা পালনে অক্ষম হয়ে পড়ে তা হলে তাদের বেলায় মানসূখ–পূর্ব হুকুমটিই বহাল থাকবে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা রোযা পালনে অক্ষম হওয়ায় তাদের অনুমতি দেয়া হয়েছিল যে চাইলে তারা রোযা না রেখে প্রতি দিনের জন্য একজন মিসকীনকে খাওয়াবে। তারপর– فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ এ আয়াত দ্বারা তা মানসূখ করা হয়। তারপর এ অনুমতি প্রযোজ্য হয় সে সব বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার বেলায় যারা রোযা পালনে অক্ষম এবং গর্ভবতী ও স্তন্যদান–দায়িনীর বেলায় যদি তারা স্বাস্থ্যহানির ভয় করে।

হযরত মুসান্না (র.) অন্যসূত্রে অনুরূপ একটি বর্ণনা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে উল্লেখ করেন।

হযরত ইকরামা (রা.) থেকে বর্ণিত, বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার জন্য রোযা না রেখে খাওয়ানোর অনুমতি ছিল। এ আয়াত দ্বারা– وَ عَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ তিনি বলেন, এভাবে তাদের জন্য অনুমতি থাকল তারপর তা মানসূখ হয়ে যায়। এ আয়াত দ্বারা فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ এতে বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার বেলায়ও অনুমতি প্রত্যাহার হয়ে যায়–যদি তারা রোযা রাখায় সক্ষম হয়। বাকী থাকে গর্ভবতী ও স্তন্যদায়িনী, এ দু'জন রোযা না রেখে মিসকীন খাওয়াবে।

হযরত মুসান্না (র.) বলেন, আমি কাতাদা (র.)–কে وَ عَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ এ আয়াত সম্পর্কে বলতে শুনেছি যে এতে বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার জন্য রোযা না রাখার অনুমতি ছিল, কাজেই তারা প্রতি দিনের বদলে একজন মিসকীন খাওয়াতে পারত, কারণ, তারা রোযা রাখতে অক্ষম ছিল। পরবর্তী আয়াত দ্বারা তা মানসূখ হয়ে যায়। সে আয়াতটি–شَهْرُ رَمَضَانَ......فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ মানসূখ হবার পর আলিমগণ অভিমত দিলেন এবং আশা করলেন যে অক্ষম হওয়ার প্রেক্ষিতে বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার জন্য রোযা না রাখার অনুমতি বহাল থাকবে ; প্রতি দিনের জন্য একজন মিসকীন খাওয়াবে। এমনি

করে গর্ভবতী যদি তার উদরের সন্তানের ব্যাপারে আশঙ্কা করে এবং দুগ্ধবতী তার সন্তানের অনিষ্ট আশঙ্কা করে তাহলে তাদের বেলায়ও এ বিধান বহাল থাকবে।

وَ عَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ الخ এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা সম্পর্কে হযরত বরী (র.) থেকে বর্ণিত, বৃদ্ধ ও বৃদ্ধারা রমযানের সওম পালনে সক্ষম অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য রোযা না রাখার অনুমতি দেন। ইচ্ছা করলে তারা তা ছেড়ে দিতে পারবে। তবে প্রতিদিনের জন্য একজন মিসকীনকে খাওয়াতে হবে। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ ......فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ –

যারা وَ عَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ তিলাওয়াত করেন তাদের কেউ কেউ এ মত পোষণ করেন যে, এ আয়াত বা আয়াতের বিধান রহিত হয়নি ; বরং নাযিল হবার পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত এ আয়াতের বিধান বলবত থাকবে। তাঁরা বলেন–এ আয়াতের ব্যাখ্যা হবে, "যারা তাদের যৌবন ও কম বয়সে এবং তাদের স্বাস্থ্য শক্তি থাকা অবস্থায় যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং কোন বৃদ্ধ যদি বার্ধক্যের কারণে রোযা পালনে অক্ষম হয়ে পড়ে, তাহলে মিসকীন খাওয়ায়ে ফিদ্ইয়া দিবে। কারণ, তখন রোযা রাখার সক্ষম ব্যক্তিদেরকে ফিদ্ইয়া আদায় সাপেক্ষে রোযা না রাখার অনুমতি দেয়া হয়েছিল।

এ অভিমতের পক্ষে আলোচনা ঃ

হযরত সুদ্দী (র.) থেকে এ আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবে বর্ণিত, যারা রোযা পালনে অক্ষম ছিল তাদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও ছিল যার রোযা পালনে কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও রোযা রাখা আরম্ভ করল। তারপর তীব্র ব্যথা ক্ষুৎ–পিপাসা ও দীর্ঘস্থায়ী রোগের সম্মুখীন হল। এ অক্ষমদের মধ্যে স্তন্যদায়ী মায়েরাও শামিল। এ ধরনের অক্ষম ব্যক্তিদের উপর প্রতিটি রোযার পরিবর্তে একজন মিসকীন (হত দরিদ্র)–কে খাওয়ানো কর্তব্য। কাজেই, যদি সে মিসকীন খাওয়ায় এটা তার জন্য ভাল, আর যদি কষ্ট করে রোযা পালন করে যায় তাও উত্তম।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যদি গর্ভবতী নিজের জানের আশঙ্কা করে, অথবা স্তন্যদায়ী মা এ আশঙ্কা করে যে রোযা পালন করলে তার শিশুর স্বাস্থ্যহানি হতে পারে তাহলে তারা রোযা রাখবে না এবং প্রতিদিনের বদলে একজন মিসকীনকে খাওয়াবে। তারপর আর কাযা করবে না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি তার একজন বাঁদীকে গর্ভবতী বা দুগ্ধবতী অবস্থায় দেখে তাকে বলেন, তুমি হলে সে ব্যক্তির পর্যায়ে যাকে রোযা পালনে সাতিশয় কষ্ট দেয়। তোমার কর্তব্য হলো প্রতিদিনের বদলে একজন মিসকীনকে খাওয়ানো। তারপর কাযা করতে হবে না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে গর্ভবতী ও স্তন্যদায়িনীর বেলায়, ভিন্ন আরেকটি সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি তার একজন গর্ভবতী বা স্তন্যদায়িনী বাঁদীকে বলেন, তুমি হলে রোযা রাখায় প্রায় অক্ষম ব্যক্তির পর্যায়ভুক্ত। তোমার উপর কর্তব্য হলো, ফিদ্ইয়া দেয়া, রোযা তোমার উপর ফরয নয়। তা ঐ সময় প্রযোজ্য যখন সে নিজের উপর আশঙ্কা করবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে وَ عَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَ আয়াত প্রসঙ্গে একটি বর্ণনা আছে যে, সে অক্ষম ব্যক্তি হলো ঐ বৃদ্ধলোক যে যৌবনে রোযা পালন করত। তারপর বার্ধক্যে উপনীত হলো, এখন রোযা পালনে তার সাতিশয় কষ্ট হয় তার কর্তব্য হলো রোযা না রেখে ইফতার ও সাহ্রীর সময় প্রতিদিন একজন মিসকীনকে খাওয়ানো।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) অনুরূপ আরেকটি বর্ণনা দেন। তবে সেখানে 'ইফতার ও সাহ্রীর সময় একথাটি বলেননি।

হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ এ আয়াতে অক্ষম ব্যক্তি বলতে সেই বৃদ্ধ ব্যক্তিকে বলা হয়েছে যে রোযা পালন করতো ,তার বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ায় তাতে অক্ষম হয়ে পড়ে এবং গর্ভবতীও অক্ষম, তার উপর রোযা নেই। এ দু'জনের উপর মিসকীন খাওয়ানো কর্তব্য রমযান অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত প্রতিদিন এক মুদ্দ (সাড়ে একত্রিশ মিসরীয় আউন্স) পরিমাণ আটা দিবে।

অন্যান্য কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ আয়াতকে এভাবে পাঠ করেন-وَ عَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ তারা বলেন-আয়াতে অক্ষম ব্যক্তি বলতে বুঝানো হয়েছে- বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা যারা এত দূর বার্ধক্যে উপনীত হয়েছে, যে রোযা পালনে তাদের সাতিশয় কষ্ট হয়-বরং বলা যায় অক্ষম, তারা রোযা না রেখে প্রতিদিনের জন্য একজন মিসকীন খাওয়াবে। তারা এ অভিমত ও ব্যক্ত করেন যে, এ আয়াত তার হুকুমসমূহ নাযিল হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত বলবত রয়েছে-মানসূখ হয়নি এবং তারা মানসূখ হয়ে যাবার কথাটি অস্বীকার (ও প্রত্যাখ্যান) করেন।

এ মতের সমর্থনে আলোচনা ঃ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি এটাকে يُطِيْقُوْنَهٗ পড়তেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি يُطِيْقُوْنَهٗ পড়তেন এবং বলতেন এ আয়াত মানুষের জন্য আজও প্রযোজ্য।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আয়াতকে এভাবে পড়তেন- وَ عَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ তিনি এও বলতেন-মানুষের জন্য আজও প্রযোজ্য।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতে يُطَيِّقُوْنَهٗ পড়তেন এবং বলতেন সে (অক্ষম ব্যক্তি) হল বৃদ্ধলোক। সে রোযা না রেখে তার পরিবর্তে মিসকীন খাওয়াবে।

হযরত ইকরামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতে يُطَيِّقُوْنَهٗ পড়তেন এবং বলতেন-'এ আয়াত মানসূখ হয়নি, বরং বৃদ্ধদের বেলায় রোযা না রেখে প্রতি রোযার বদলে একজন মিসকীনকে খাওয়াবার বিধান দেয়া হয়েছে।

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়র (রা.) এ আয়াত এভাবে পড়তেন-وَ عَلَى الَّذِيْنَ يُطَيِّقُوْنَهٗ

হযরত ইকরামা (রা.) বলেন-يطيقونه অর্থ যারা রোযা রাখতে সক্ষম , কিন্তু يُطَيِّقُوْنَهٗ অর্থ যারা তাতে অক্ষম।

হযরত আয়েশা (রা.) يُطَيِّقُوْنَهٗ পড়তেন। হযরত মুজাহিদ (র.) এরূপভাবেই পড়তেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন- যারা তাতে বেশী কষ্ট পান বলতে অতি বৃদ্ধলোকদের বুঝানো হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে আরো বর্ণিত যে, যারা রোযা পালনে বেশী কষ্ট পান এর অর্থ যারা তাকে গুরুভার মনে করেন এবং এতে খুবই কষ্ট অনুভব করেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত, যারা এতে খুব বেশী কষ্ট অনুভব করেন' তাঁদের উপর এক মিসকীন খাওয়নোর ফিদ্ইয়া এর অর্থ সেই অতি বৃদ্ধলোক যিনি অক্ষমতার কারণে সওম ভাঙ্গেন এবং প্রতিদিন একজন মিসকীন খাওয়ান।

অন্য সূত্রে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত,-وَ عَلَى الَّذِيْنَ يُطَيِّقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ এ আয়াত মানসূখ (প্রত্যাহারকৃত)। এতে রোযা পালনে অক্ষম বৃদ্ধলোক ও দুরারোগ্য রোগী ছাড়া কাউকে অব্যাহতি দেয়া হয়নি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে অপর একটি সূত্রে বর্ণিত, যারা তীব্র কষ্ট অনুভব করেন, তারা এক মিসকীন খাওয়াবার অর্থে ফিদ্ইয়া দিবেন। এতে রোযা রাখার অক্ষম বৃদ্ধ অথবা দুরারোগ্য অসুস্থ ব্যক্তি ছাড়া কাউকে অব্যাহতি দেয়া হয়নি। হযরত মুজাহিদ (র.) হতেও বর্ণিত।

অপর এক সূত্রে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি প্রায়ই বলতেন-''এ আয়াত মানসূখ হয়নি।'' হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, এ আয়াতে তাদেরকেই অব্যাহতি দেয়া হয়েছে যারা খুব কষ্ট ছাড়া রোযা পালন করতে পারেন না ; তাদের রোযা ভাঙ্গা ও তার বদলে প্রতিদিন একজন মিসকীন খাওয়ানোর সুযোগ হয়েছে। তা ছাড়া গর্ভবতী স্তন্যদায়িনী, বৃদ্ধ ও দুরারোগ্য রোগীর ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবে বর্ণিত আছে যে, সে হলো বৃদ্ধব্যক্তি-যে তার যৌবনে রোযা পালন করত। কিন্তু যখন বার্ধক্যে উপনীত হলো, তখন মৃত্যুর কিছু দিন আগ থেকে রোয পালনে অক্ষম হয়ে

পড়লো–এ ধরনের ব্যক্তি প্রত্যেক দিনের রোযার বদলে একজন মিসকীন খাওয়াবে। হযরত মানসূর (র.)–কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, প্রতিদিনের জন্যই কি অর্ধ–সা' (পৌনে দুই সের) খাদ্য দিতে হবে ? তিনি বললেন, হাঁ। হযরত উসমান ইবনে আস্ওয়াদ (র.) বলেন, আমি হযরত মুজাহিদ (র.)–কে আমার একজন স্ত্রী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি, যার গর্ভ নবম মাস অতিক্রম করার সময় রমযান এসে পড়ে। তখন গরমও ছিল খুব প্রচন্ড। (এ অবস্থায় আমার স্ত্রীর রোযা পালন কি ফরয?) তখন তিনি ফতোয়া দেন যে, সে রোযা ভাঙতে পারবে তবে মিসকীন খাওয়াবে। সাথে এ কথাও বলে দেন যে, এ অনুমতি মুসাফির ও অসুস্থ ব্যক্তির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা–وَ عَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ –

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন গর্ভবতী স্তন্যদায়ী ও অতিবৃদ্ধলোক (যে রোযা পালনে অক্ষম) রমযানের রোযা ভাঙতে পারবে এবং প্রতিদিনের বদলে একজন মিসকীন খাওয়াবে। এরপর তিনি প্রমাণস্বরূপ আলোচ্য আয়াত তিলাওয়াত করেন।

হযরত আলী (রা.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন অক্ষম বৃদ্ধলোক রোযা ভাঙতে পারবে। তবে, প্রতিদিনের জন্য একজন মিসকীন খাওয়াতে হবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রোযা রাখায় অক্ষম ব্যক্তি এক মিসকীন খাওয়াবার ফিদ্ইয়া দিবেন এর দ্বারা সে সব বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাকে বুঝানো হয়েছে, যারা রোযা পালনে অত্যন্ত কষ্ট পান।

হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–অনুমতি প্রাপ্তরা হচ্ছেন বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাগণ।

হযরত ইকরামা (রা.) আয়াতটিকে এভাবে পড়তেন–وَ عَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فَأَفْطِرُوْا (যাদের রোযা রাখতে নিদারুণ কষ্ট হওয়াতে ভেঙে ফেলে তাদের উপর (.....) ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে এ আয়াতটি বৃদ্ধা, স্তন্যদায়ী গর্ভবর্তী এবং যারা রোযায় খুব কষ্ট পান। তাদের জন্য রোযা থেকে অব্যাহতি প্রমাণ করে।

হযরত আতা (র.)–কে এ আয়াত সম্পর্কে তার অভিমত জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাব দেন–আমাদের কাছে এ হাদীস পৌঁছেছে যে, বৃদ্ধ ব্যক্তি যদি রোযা পালন অক্ষম হয়, তাহলে সে প্রত্যেক দিনের বদলে একজন মিসকীনকে খেতে দিবে। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, বৃদ্ধ বলতে কি রোযাপালনে একেবারে অক্ষম ব্যক্তিকে বুঝাবে, না কি সে বৃদ্ধ ও এর অন্তর্ভুক্ত হবে যে খুব কষ্টের সাথে পালন করতে পারে। তিনি উত্তর করলেন ঃ "বরং সেই বৃদ্ধ যে কষ্ট করেও রোযা পালন করতে পারে না। কাজেই কষ্ট হলেও যে বৃদ্ধ সওম পালন করতে পারে, তাকে অবশ্যই রোযা রাখেতে হবে ; রোযা ব্যতীত কোন ওযর গৃহীত হবে না।

ইবনে জুরায়িজ (র.) বলেন,–আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবূ ইয়াযীদ (র.) যেন উপরোক্ত আয়াতে অধিক

বৃদ্ধকে বুঝিয়েছেন। ইবনে জুরাইজ (র.) বলেন, হযরত ইবনে তাউস (র.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে তিনি বলতেন– আয়াতটি সেই বৃদ্ধর ব্যাপারে নাযিল হয়েছে যে রমযানের সিয়াম পালনে অক্ষম, কাজেই সে প্রত্যেক দিনের বদলে মিসকীন খাওযাবে। আমি প্রশ্ন করলাম ঃ তার খাবার কতটুকু ? উত্তরে তিনি বলেন– তা তো জানি না! তবে তা একদিনের খাবার।

হযরত দাহ্হাক (র.) বলেন–এ আয়াতেঐ বৃদ্ধের কথা বলা হয়েছে যিনি অক্ষমতার কারণে সওম ভাঙ্গেন এবং প্রত্যেক দিনের জন্য একজন মিসকীন খাওয়ান।

এ প্রসঙ্গে উত্তম মত ঃ

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় উত্তম অভিমত হলো وَ عَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ আয়াতখানা মানসূখ হয় فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ (যে এ মাসে মুকীম অবস্থায় হাযির থাকবে সে যেন অবশ্যই সওম রাখে।) কারণ প্রাসঙ্গিক আয়াতে يطيقونه (তা অতিশয় কষ্টে পালন করে) এ বাক্যে "ة " (তা) অব্যয় দ্বারা "সওম"কে বুঝানো হয়েছে। এর অর্থ হলো ঃ যারা খুব কষ্টে সওম পালন করে তাদের উপর ফিদ্ইয়াস্বরূপ একজন মিসকীনকে খাবার দেয়া আবশ্যক। বিষয়টি যখন এরূপ, তদুপরি মুসলমানগণ সবাই যখন এ ব্যাপারে একমত যে সুস্থ ও মুকীম পুরুষদের মধ্যে যে রমযানের রোযা পালনে সক্ষম (চাই কষ্টের সাথেই হোক) তার জন্য রোযা না রেখে এক মিসকীন খাওয়াবার ফিদ্ইয়া দেয়া জায়েয নেই, কাজেই বুঝা গেল, এ আয়াত মানসূখ। এ ছাড়া ইতিপূর্বে উল্লেখিত হাদীসগুলো এ অভিমতকেই সমর্থন করে। যেমন হযরত মুআয ইবনে জাবাল, হযরত ইবনে উমার ও হযরত সালামা ইবনে আকওয়া (রা.)–এর হাদীস–তারা হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমলে এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রমযানের রোযার ব্যাপারে দু'টির যে কোন একটিকে গ্রহণের অনুমতি পেয়েছিলেন ; হয় রোযা পালন করে ফিদ্ইয়া থেকে অব্যাহতি লাভ, নয়তো রোযা ভেঙে এজন্য প্রত্যেক দিনের বদলে একজন মিসকীনের খাবার ফিদ্ইয়াস্বরূপ দেয়া। আর তারা এ ধরনের আমল– فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার আগে পর্যন্ত আমল করতেছিলেন। যখন এ আয়াত নাযিল হয়, তারা রোয পালনে বাধ্য হলেন। রোযা না রেখে ফিদ্ইয়া আদায় করার স্বাধীনতা আর থাকলো না।

এখন যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে, এই দাবী কিভাবে করছেন যে, আহলে ইসলাম এ ব্যাপারে ঐক্যমতে পৌছেছে যে, যে ব্যক্তি সওম পালনে আতিশয় কষ্ট ভোগ করে–যেভাবে আমি তার বর্ণনা দিলাম–তার সওম পালন ছাড়া গত্যন্তর নেই, অথচ আপনি তাদের অভিমতও অবগত হয়েছেন। যারা বলেছেন, গর্ভবতী ও দুগ্ধদায়ী মহিলা যদি তাদের সন্তানের স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা করেন তাহলে তাদের জন্য সওম ভাঙ্গা জায়েয আছে। যদিও তারা তাদের সেই শরীর নিয়ে সওম পালনে সক্ষম বটে। আর এই প্রসঙ্গে হযরত আনাস (রা.) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত আছে, তিনি বলেন–আমি

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর নিকট এসে দেখি তিনি দুপুরের খাবার গ্রহণ করছেন। তখন আমাকে ডেকে বললেন এসো, তোমাকে বলি, আল্লাহ্ তা'আলা মুসাফির, গর্ভবতী ও দুগ্ধদায়ীকে সওম ও অর্ধেক সালাত থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন।

এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলব যে, আমরা তো গর্ভবতী ও দুগ্ধদায়িনীর ব্যাপারে ইজমা বা নিরঙ্কুশ ঐক্যমত দাবী করিনি বরং আমরা এটা সে সব পুরুষের বেলায় দাবী করেছি যাদের গুণ–বৈশিষ্ট্য আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। গর্ভবতী ও দুগ্ধদায়ী মহিলাদের বেলায় তো আমরা জানলাম যে– وَ عَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ الخ এ আয়াত দ্বারা তাদের বুঝানো হয়নি। শুধু পুরুষদের বুঝানো হয়েছে। কারণ যদি পুরুষ ছাড়া কেবল মহিলাদের বুঝানো হতো তাহলে স্ত্রীবাচক শব্দ ব্যবহার করে বলা হতো و على اللواتى يطقنه فدية طعام مسكين কারণ এটাই আরবী ভাষার নিয়ম যে, পুরুষদের বাদ দিয়ে শুধুমাত্র মহিলাদের বুঝানোর ক্ষেত্রে স্ত্রীবাচক শব্দ ব্যবহৃত হয়। কাজেই এখানে وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ দ্বারা বুঝা গেল যে এখানে শুধু পুরুষ অথবা পুরুষ ও মহিলা উভয়কে বুঝানো হয়েছে। আর যখন ইজমা দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, পুরুষ মুকীম স্বাস্থ্যবান– রমযানের সওম পালনে সক্ষম তার জন্য সওম ভাঙ্গা ও ফিদ্ইয়া দেয়া জায়েয নেই। কাজেই এ আয়াত দ্বারা (শুধু) পুরুষদের বুঝানো হয়নি, এটাই সাব্যস্থ হলো। আর এ দ্বারা যে শুধু নারীদেরও বুঝানো হয়নি তাও ইতিপূর্বে ব্যাখ্যাসহ বর্ণনা করেছি যে, কেবলমাত্র মহিলাদের বুঝালে و على اللّواتى يطقنه হতো অথচ আয়াত সেভাবে নাযিল হয়নি।

আর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে তা যদি সহীহ্ বা বিশুদ্ধ বলেও ধরে নেই, তাহলেও তার অর্থ হচ্ছে– যতক্ষণ পর্যন্ত গর্ভবতী ও দুগ্ধদায়ী মহিলা সওম পালনে অক্ষম থাকে ততক্ষণ তারা সওম পালন থেকে অব্যাহতি পাবে। হাঁ সুস্থ্য হয়ে উঠলে তার কাযা আদায় করে নিতে হবে। যেমনি মুসাফির মুকীম না হওয়া পর্যন্ত তার উপর সওম রাখা ফরয নয়। মুকীম হলেই কাযা করে নিতে হবে। আয়তে এটা বলা হয়নি যে ফিদ্ইয়া দিয়ে, সওম ভাঙবে, আর এর কাযা আদায় করতে হবে না। যদি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর বাণী–"আল্লাহ্ তা'আলা মুসাফির দুগ্ধদায়ী মা ও গর্ভবতীকে সওম থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন''–এর মধ্যে এই প্রমাণ থাকতো যে তিনি (সা.) وعلى الذين يطيقونه الخ এ আয়াতের উপর ভিত্তি করেই এ কথা বলেছেন যে আল্লাহ্ তাদেরকে অব্যাহতি দিয়েছেন তাহলে মুসাফিরে উপর সফরের অবস্থায় ভাঙ্গা সওমের কাযা আদায় করতে হতো না। শুধু ফিদ্ইয়াই ওয়াজিব হতো। কেননা এখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মুসাফিরের হুকূমের সাথে গর্ভবতী ও স্তন্যদায়ী মায়ের হুকূমও একই সাথে বর্ণনা করেন। কাজেই সেটি এমন একটি অভিমত যা পবিত্র কুরআনের দ্ব্যর্থহীন অর্থ ও মুসলমানদের ইজমার বিপরীত।

বসরার কিছু আরবী ব্যাকরণবিদের ধারণা হলো যে, আল্লাহ্র বাণী-وَ عَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ الخ- এর অর্থ হলো-وَ عَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ الخ (যারা খাবার দিতে অক্ষম তাদের উপর.....) তবে এ ব্যাখ্যাটি পন্ডিত ব্যাক্তিদের ব্যাখ্যার বিপরীত।

আর যারা আয়াতকে এভাবে পড়েছেন-وَ عَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ তাঁদের এ পাঠ পদ্ধতি বিশ্ব মুসলমানের মাসাহেফ বা কুরআনের মূল নুসখার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ। তা ছাড়া কোন মুসলমানের জন্য তা জায়েয নেই যে, নিজের মত দিয়ে এমন দলীলের বিরোধিতা করা। মুসলমানগণ তাদের প্রিয় নবী (সা.) থেকে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে বংশানুক্রমিক বর্ণনা করে আসছে। কারণ দীনের যে বিষয়টি দ্ব্যর্থহীন দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত তা এমনি এক সত্য যা মহান আল্লাহ্র তরফ হতে এসেছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কাজেই, যা মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এসেছে বলে নিখুঁতভাবে প্রমাণিত এবং মজবুত দলীলের উপর ভিত্তিশীল। সে বিষয়ে নিজের খেয়ালী মতামত, সন্দেহ ও বিচ্ছিন্ন কিছু বক্তব্য দিয়ে প্রশ্ন তোলা যায় না।

ফিদ্ইয়া অর্থ বিনিময় বা বদলা যা প্রতি ফরয রোযা ভাঙ্গার জন্য একজন মিসকীনকে খাদ্য-স্বরূপ দেয়া হয়ে থাকে।

আর মহান আল্লাহ্র বাণী-فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ এ আয়াতের পাঠরীত সম্পর্কে কিরাআত বিশেষজ্ঞগণের মতানৈক্য রয়েছে। কোন কোন কিরাআত বিশেষজ্ঞ পড়েন 'ফিদ্ইয়া' কে طعام শব্দের দিকে اضافت বা সম্বন্ধ করে। অর্থাৎ فِدْيَةٌ طَعَامِ (মীমের যের দিয়ে) আর এ পাঠরীতি অধিকাংশ মদীনাবাসীর পাঠপদ্ধতি। তা হলে এর অর্থ দাঁড়ায়-'যারা তাতে খুব কষ্ট পান, তাদের উপর 'খাবারের ফিদ্ইয়া'। কাজেই, যখন ان يفديه এর স্থলে فدية ব্যবহার করা হয়েছে তখন طعام এর দিকে اضافت করা হয়েছে। যেমন বলা হয়ে থাকে لزمى غرامة درهم لك অর্থাৎ لزمى ان اغرم لك درهما

অন্যান্য কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ এভাবে পড়েছেন-"فِدْيَةٌ"-তানবীন সহকারে ; طعام শব্দটিকে رفعى দিয়ে। আয়াতে কারীমাকে পড়তে হবে এভাবে-وَ عَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ তখন طعام (খাবার) শব্দটি 'ফিদ্ইয়ার' অর্থ ব্যাখ্যাকারী হিসাবে ধরে নেয়া হবে-যে ফিদ্ইয়া ফরয রোযা ভাঙ্গলে ওয়াজিব হয়। যেমন, বলা হয়ে থাকে-لزمى غرامة درهم لك তোমাকে আমার জরিমানা (স্বরূপ) এক দিরহাম দিতে হবে।" এখানে "দিরহাম" শব্দটি জরিমানা (غرامة) এর ব্যাখ্যা করেছে যে, জরিমানা কি এবং তার পরিমাণ কতটুকু।

উপরোক্ত পাঠ পদ্ধতি অধিকাংশ ইরাকবাসী কিরাআত বিশেষজ্ঞের উল্লেখিত কিরাআত দুটির

মধ্যে বিশুদ্ধতার দিক থেকে উত্তম হলো–فدية طعام : فدية শব্দটিকে "طعام"–এর দিকে اضافت করে পড়া। যার অর্থ–'খাবারের ফিদ্ইয়া। কারণ, 'ফিদ্ইয়া (فدية) শব্দটি একটি ক্রিয়া–বিশেষ্য তা طعام (খাবার) শব্দ থেকে ভিন্ন। কারণ فـديـة শব্দ আসলে একটি ক্রিয়া বিশেষ্য (مصدر) যেমন, ফিদ্ইয়া একটি ক্রিয়া যার উৎস (مصدر) আরবদের ব্যবহার রীতি থেকেই। কাজেই তা আসলে ক্রিয়াই। অথচ (খাবার) শব্দটি তা থেকে ভিন্ন (এটি বিশেষ্য)। কাজেই যখন দু'টি শব্দের পরিচয় ভিন্ন – ক্রিয়া একটি ক্রিয়া অপরটি বিশেষ্য, সুতরাং আরবী ব্যাকারণের দৃষ্টিকোণ থেকে দু'টি পাঠ পদ্ধতির মধ্যে فديه এর اضافت (সম্বন্ধ) طعام এর দিকে করে (فدية طعام) পড়াই অধিক শুদ্ধ।

আর এ বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাদের ভুলও ধরা পড়ল যারা বলেছেন –فدية এর সম্বন্ধ طعام এর দিকে না করাটাই অর্থের দিক থেকে বিশুদ্ধতর। কারণ, তাদের ধারণা মতে طعام খাবারটাই 'ফিদ্ইয়া।

উপরোক্ত ধারণাকারীদের জবাবে বলা যায় যে, আমরা জানি যে, 'ফিদ্ইয়া সম্পন্ন হতে তিন জিনিষের দরকার হয় ঃ (১) ফিদ্ইয়া দাতা (২) ফিদ্ইয়ার কারণ (৩) ফিদ্ইয়ার বস্তু। এখন 'খাবার' ফিদ্ইয়ার বস্তু, রোযা হলো ফিদ্ইয়ার কারণ। তাহলে اسم فعل (ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য) বা 'ফিদ্ইয়া দেয়া' অর্থবোধক শব্দটি কোথায়? কাজেই সহজেই বুঝা গেল–'উক্ত ধারণাকারীদের মতটি আদৌ সঠিক নয়।

উল্লেখ্য, طعام শব্দটি مسكين শব্দটির مضاف বটে। فدية طعام مسكين এ আয়াতাংশটুকু তিলাওয়াতের ব্যাপারে কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেন।

কোন কোন কিরাআত বিশেষজ্ঞ مسكين শব্দটিকে একবচন পড়েছেন। তখন এর অর্থ –যারা রোযাতে খুব কষ্ট অনুভব করবে, তাদের উপর প্রতি রোয ভাঙার জন্য একজন মিসকীন খাওয়ানোর ফিদ্ইয়া ওয়াজিব হবে।

এ মতের সমর্থনে আলোচনা ঃ

হযরত আবূ আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি ফিদ্ইয়ার আয়াতটিকে পড়েছেন فِدْيَةٌ (দু পেশ দিয়ে) এবং طعام কে এক পেশ দিয়ে এবং مسكين কে একবচনে। আর বলেছেন যে, প্রতিদিনের বদলে একজন মিসকীনকে খাওয়াবে। অধিকাংশ ইরাকী কিরাআত বিশেষজ্ঞেগণও এ মতই।

অন্যান্য কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ مساكين বহুবচনে পড়েছেন فِدْيَةُ طَعَامُ مَسَاكِيْنِ এর অর্থ

.... পুরো মাসের জন্য মিসকীনদের খাওয়াবে, যদি পুরো মাসই রোযা ভাঙে। এর সমর্থনে হযরত হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, طَعَامُ مَسَاكِيْنٍ عَنِ الشَّهْرِ كُلِّهٖ-পুরো মাসের বদলে মিসকীনদের খাওয়ানো।

হযরত ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন- উক্ত কিরাআতদ্বয়ের মধ্যে আমার কাছে বেশী গ্রহণযোগ্য হলো-طَعَامُ مِسْكِيْنٍ এক বচনে যার অর্থ- প্রতি দিনের বদলে 'একজন মিসকীন' খাওয়াবে। কারণ, একদিন রোযা ভাঙার হুকুম জানার মাধ্যমে পুরো মাসের রোযা ভাঙার হুকুমও জানা যায়। অপর দিকে পুরো মাসের হুকুম বর্ণনা করলে একদিন বা (পূর্ণমাসের কম) কয়েক দিনের হুকুম কি হবে....... তা স্পষ্ট বুঝা যায় না। "প্রত্যেক শব্দ 'বহু' –এর স্থলে ব্যবহার করা যায়, কিন্তু এক এর স্থলে বহু ব্যবহৃত হয় না। এ জন্যই আমরা এক বচনের পাঠরীতি বেশী পসন্দ করেছি। রোযার ফিদ্ইয়াস্বরূপ তখনকার দিনে যে খাবার দেয়া হতো, তার পরিমাণ সম্পর্কে আলিমগণ একাধিক মত পোষণ করেন।

কেউ বলেছেন একদিন রোযা ভাঙার পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাওয়ানোর পরিমাণ ছিল অর্ধ সা' গম। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে তার পরিমাণ এক মুদ্দ পরিমাণ গম বা তাদের অন্যান্য সব ধরনের খাদ্য।

আবার কেউ কেউ বলেছেন–তার পরিমাণ ছিল অর্ধ সা' গম (বা আটা) অথবা এক সা' খেজুর বা কিসমিস।

আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, রোযা ভঙ্গকারী সে দিন যে খাবার গ্রহণ করতো সে ধরনের খাবার দিবে।

কেউ কেউ বলেছেন, ভঙ্গকারী সাহ্রী ও রাতের খাবারস্বরূপ যা গ্রহণ করবে তা–ই মিসকীনকে দিবে। যেহেতু এ ধরনের অভিমত ইতিপূর্বে আমরা কিছু বর্ণনা করেছি, এখানে তার পুনরাবৃত্তি করা সঙ্গত মনে করছি না।

মহান আল্লাহ্র বাণী–فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ '(যে স্বেচ্ছায় কোন ভাল কাজ করবে তা তার জন্য উত্তম)' –এ আয়াতে কারীমার ব্যাখ্যায় আলোচনা।

ব্যাখ্যাকারগণ এ আয়াতে কারীমার ব্যাখ্যায় একাধিক মত পোষণ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন–যা মুহাম্মদ ইবনে আমর (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, যে স্বেচ্ছায় কিছু ভাল কাজ করার নিমিত্তে আরেকজন মিসকীনের খাবার বাড়িয়ে দেয় তা তার জন্য উত্তম। আর রোযা রাখাও তোদের জন্য ভাল।

হযরত মুসান্না (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে অনরূপ বর্ণনা করেন।

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত–'যে স্বেচ্ছায় কোন ভাল কাজ করল' অর্থাৎ "যে মিসকীনকে পূর্ণ এক সা' পরিমাণ খাবার দিল।''

হযরত তাউস (র.) থেকে বর্ণিত 'যে, 'স্বেচ্ছায় কোন ভাল কাজ করল,' অর্থাৎ 'প্রতিদিনের জন্য কিছু সংখ্যক মিসকীন খাওয়াল তা তার জন্য উত্তম।'

হযরত তাউস (র.) থেকে বর্ণিত যে, فمن تطوع خيرا (অর্থ যে স্বেচ্ছায় কোন ভাল কাজ করল) -এর অর্থ মিসকীন খাওয়ানো।

অন্য একটি সনদে তাউস (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার(র.) তাউস (র.) থেকে বর্ণনা করেন- فمن تطوع خيرا আয়াতাংশের অর্থ মিসকীনকে খাওয়ানো।

মুসান্না (র.) অন্য সনদে তাউস (র.) অনুরূপ বর্ণনা করেন।

হযরত আতা (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আয়াতাংশ এভাবে পড়েন فمن تطوع خيرا তাশদীদ ছাড়া تاء দিয়ে। তিনি বলেন-এর অর্থ যে একজন মিসকীনের উপর বাড়ালো। (একাধিক মিসকীন খাওয়ালো)।

হযরত সূদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত যে, فمن تطوع خيرا এ আয়াতাংশের অর্থ, যে স্বেচ্ছায় এক জনের স্থলে দু'জন মিসকীনকে খাওয়াবে, তা তার জন্য উত্তম'।

হযরত তাউস (র.) থেকে বর্ণিত, فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ অর্থ-যে আরেকজন মিসকীনও খাওয়ায়।

অন্যান্য আলিমগণ বলেন, এর অর্থ যে স্বেচ্ছায় ফিদ্‌ইয়া আদায় করার সাথে সাথে নিজে রোযাও পালন করল।

— এ অভিমতের পক্ষে বর্ণনা ঃ

হযরত ইবনে শিহাব (র.) থেকে বর্ণিত, فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ এর অর্থ, যে ব্যক্তি ফিদ্‌ইয়ার সাথে রোযাও পালন করে তা তার জন্য উত্তম।

আবার কেউ কেউ অভিমত রাখেন যে এর অর্থ যে স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হয়ে মিসকীনকে তার খাবারের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয় (তা তার জন্য) উত্তম)।

যারা এমত পোষণ করেন ঃ

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, যে স্বেচ্ছায় নেক আমল করার লক্ষ্যে খাবার বাড়িয়ে দেয় তা তার জন্য উত্তম।

আমাদের কাছে এ প্রসঙ্গে শুদ্ধ অভিমত হলো-আল্লাহ্ তা'আলা বিষয়টিকে ব্যাপক عام

রেখেছেন। তিনি বলেছেন-**فمن تطوع خيرا** যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোন ভাল কাজ করে।' এখানে তিনি কোন ভাল কাজকে নির্দিষ্ট করে দেননি। কাজেই ফিদ্ইয়ার সাথে রোযাকে একত্রিত করাও যেমন ভাল, তেমনি ফিদ্ইয়া প্রতিদানকে কিছু বাড়িয়ে মিসকীনকে দেয়াও ভাল কাজ, কাজেই, এসকল ভাল কাজের যে কোনটিই আল্লাহ্ তা'আলা উদ্দেশ্য হতে পারে। কারণ, সবগুলোই নফল ও ফযীলতের কাজ।

মহান আল্লাহ্র বাণী-**وَ اَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ** "রোযা পালন তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে।" এ আয়াতে কারীমার ব্যাখ্যায় আলোচনা।

এ আয়াত কারীমা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-তোমাদের জন্য মাহে রমযানের নির্ধারিত-ফরয রোযা রাখা ফিদ্ইয়া দিয়ে রোযা ভাঙ্গা থেকে উত্তম।

হযরত সূদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, **و ان تصوموا خير لكم** এর অর্থ যে কষ্ট করে হলেও রোযা রাখেন। তা তার জন্য উত্তম।

হযরত ইবনে শিহাব (র.) থেকে বর্ণিত, **و ان تصوموا خير لكم** রোযা রাখাই উত্তম এর অর্থ রোয না রেখে ফিদ্ইয়া আদায় করা থেকে উত্তম।

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, রোযা পালনই উত্তম। আর মহান আল্লাহ্র বাণী-**و ان تصوموا خير لكم** মহান আল্লাহ্র আদেশ মুতাবিক রোযা রাখা অথবা রোযা ভেঙ্গে-ফিদ্ইয়া দেয়া, এ উভয় বিধানের মাঝে কোনটি উত্তম তা যদি তোমরা জানতে !

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ - يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدَاكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ -

অর্থ ঃ "রমযান মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে বিশ্বমানবের পথপ্রদর্শক কুরআন, যা সত্য পথ ও সত্য মিথ্যার মধ্যে প্রভেদকারী নিদর্শনে ভরা। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তিই এমাস পাবে সে যেন এ রোযা রাখে। কেউ পীড়িত হলে অথবা সফরে থাকলে অন্যান্য দিনে এ সংখ্যা পূরণ করে নেবে। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সহজটাই চান এবং তোমাদের বেলায় কঠিনটা চান না, আর তা এজন্য যে তোমরা যেন সংখ্যা পূর্ণ করে নাও। তোমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করার কারণে তোমরা যেন তার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করতে থাকো এবং তোমরা যেন শোকরগুজার বান্দা হয়ে যাও।" (সূরা বাকারা ১৮৫)

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন–الشهر (মাস) শব্দটি الشهرة থেকে উৎসারিত। যেমন বলা হয় قد شهر فلان سيفه (অমুক ব্যক্তি তার তরবারিকে কোষমুক্ত করেছে) যখন কেউ তার তরবারিকে খাপ থেকে বের করে কাউকে আঘাত করার উদ্দেশ্য উদ্ধত হয়, তখন একথাটি বলা হয়। তেমনি যখন নতুন মাসের চাঁদ উদিত হয় তখন বলা হয়–شهر الشهر (মাস এসেছে)। আরো বলা হয় اشهرنا نحن (আমরা মাসে প্রবেশ করেছি) যখন মাস আসে।

আর رمضان (রমযান) শব্দটির বিশ্লেষণ সম্পর্কে কোন কোন আরবী ভাষাবিদ ধারণা করেন যে, رمضان (দগ্ধ করা)–কে এ নামে এ আখ্যায়িত করার কারণ এ সময়ে প্রচন্ড গরম অনুভূত হয়, এমনকি শরীরের হাঁড় পর্যন্ত দগ্ধ হতে থাকে। যেমনি হজ্জের মাসকে বলা হয় ذو الحجة যিল হাজ্জ। যে মাসে ঘাসও পত্রপল্লব হয় এবং অবসর বিনোদন যাপন করে, তাকেই বলে রবিউল আউয়াল (ربيع الاول) ও রবিউল আখের (وبيع الاخر)।

তবে হযরত মুজাহিদ (র.) رمضان বলা পসন্দ করতেন না তিনি বলতেন, সম্ভবত 'রমযান' শব্দ আল্লাহ্ তা'আলার একটি নাম।

হযরত মুজাহিদ (র.) 'রমযান' শব্দটিকে এভাবে বলা পসন্দ করতেন না ; তিনি বলতেন–সম্ভবত তা মহান আল্লাহ্র এক নাম। বরং সেভাবে বলাই উত্তম যেভাবে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন অর্থাৎ شهر رمضان (মাহে রমাদান)।

ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি যে شَهرٌ শব্দ مرفوع অর্থাৎ আয়াতে–اياما معدودات (নির্দিষ্ট সংখ্যক দিন) কথারই ব্যাখ্যাস্বরূপ বলা হয়েছে هن شهر رمضان (সে দিনগুলো মাহে রমাদান। (কাজেই ব্যাকরণ অনুযায়ী 'খবর' বিধেয় হওয়ার কারণে বা 'পেশ' বিশিষ্ট হয়েছে)।

مرفوع হওয়ার অন্য কারণ হওয়াও সম্ভব। তা হলো–যদি মনে করা হয় যে বাক্যটি এভাবে হয়ে ذالك شهر رمضان (তা হলো মাহে রমাদান) অথবা এ অর্থে–كُتب عليكم شهر رمضان (তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে–মাহে রমাদান)।

কোন কোন কিরাআত বিশেষজ্ঞ উক্ত আয়াতে شهر শব্দটিকে نصب (যবর) দিয়ে পড়েছেন। এ অর্থে যে–كتب عليكم الصيام ان تصوموا شهر رمضان (তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে–রোযা রাখবে মাহে রমাদান) অর্থাৎ ان تصوموا এ فعل এর مفعول হিসাবে।

আবার কেউ তো نصب দিয়ে পড়েছেন এ অর্থে-ان تصوموا شهر رمضان خيرا لكم ان كنتم تعلمون (মাহে রমাদানে রোযা রাখা তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে)।

আবার এভাবেও نصب দেয়া সম্ভব যে, রোযার নির্দেশ (امر) থেকে مامور به হয়েছে। যেন বলা হয়েছে,- شهر رمضان فصوموه

شهر (মাস) শব্দটিকে ওয়াক্ত ধরে নিয়েও نصب দেয়া যায়। যেন বলা হয়েছে- كتب عليكم الصيام فى شهر رمضان

মহান আল্লাহ্র বাণীর- اَلَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ (যাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে)

বর্ণিত আছে যে এ পবিত্র কুরআন মাহে রমযানের লায়লাতুল কদরে লওহে মাহ্ফুয থেকে দুনিয়ার নিকটতম আসমানে অবতীর্ণ হয়েছিল। তারপর এ কুরআন মজীদ হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর উপর আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা মাফিক অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন-

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, কুরআন "যিক্র" (লওহে মাহ্ফুয) থেকে একই সঙ্গে রমযানের চব্বিশ তারিখে নাযিল করে 'বায়তুল ইজ্জতে' রাখা হয়েছিল।

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়র (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রমযান মাসে কদরের রাতে কুরআন শরীফ একই সঙ্গে নাযিল করে দুনিয়ার নিকটতম আসমানে রাখা হয়েছিল।

হযরত ওয়াসিলা (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রতি সহীফাসমূহ নাযিল হয়েছিল মাহে রমদানের প্রথম রাতে। তাওরাত শরীফ নাযিল হয়েছিল রমাদানের ৬ষ্ঠ তারিখে, ইনজীল শরীফ নাযিল হয়েছিল তের তারিখে আর কুরআন শরীফ নাযিল হয়েছিল রমাদানের চব্বিশ তারিখে।

হযরত সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ এ আয়াতে 'যাতে কুরআন শরীফ নাযিল হয়েছিল তা হলে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে, রমযান মাস ও বরকতময় রাত-লায়লাতুল কদর কারণ লায়লাতুল কদরই লায়লাতুল-মুবারাকা আর এটি ছিল রমযান-মাসেই। কুরআনুল করীম একই সঙ্গে যাবুর" (الزبر) থেকে বায়তুল মা'মূরে অবতীর্ণ হয়। আর এ স্থানটি হলো নিকটতম আকাশে-তারকারাজীর অবস্থানস্থল (مواقع النجوم)। এখানেই কুরআন রক্ষিত হয়েছে (وقع القران)। তারপর হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর আদেশ-নিষেধ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি উপলক্ষ্যে কিছু কিছু করে অবতীর্ণ হয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনকে লায়লাতুল কদরে নিকটতম আকাশে অবতীর্ণ করেন। সেখান থেকে আল্লাহ্ তা'আলা যখন যতটুকু ইচ্ছা ওহীর মাধ্যমে

নাযিল করতেন। তাই তিনি ইরশাদ করেছেন–إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ 'আমি কদর–রাতে তা অবতীর্ণ করেছি।'

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত, তবে এটুকু বেশী যে, কুরআন শরীফ অবতীর্ণ হওয়ার শুরু ও শেষের মধ্যে বিশ বছর ছিল।

হযরত ইবনে মুসান্না (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে অন্য এক বর্ণনা করেন–পূর্ণ কুরআন শরীফ রমযান মাসের কদরের রাতে একই সাথে দুনিয়ার আকাশে অবতীর্ণ হয়। এরপর যখন আল্লাহ্ তা'আলা যমীনে কোন কিছু করতে চাইতেন তা থেকে কেছু অংশ নাযিল করতেন। এমনি করে পূর্ণ কুরআন মজীদ একত্রিত হয়।

হযরত ইয়াকূব (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, কুরআন শরীফ উচ্চতম আসমান থেকে (নিকটতম) আসমানে কদরের রাতে একই সংগে নাযিল হয়েছে। এরপর কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন উপলক্ষে অবতীর্ণ হতে থাকে। বর্ণনাকারী বলেন–এ প্রসংঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন–فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ (আমি নক্ষত্রসমূহের পতনের স্থানের শপথ করছি) তিনি বলেন–কিছু কিছু করে অবতীর্ণ হয়েছে।

হযরত শাবী (র.) থেকে বর্ণিত, পবিত্র কুরআন নিকটতম আসমানে এক সঙ্গে অবতীর্ণ হয়।

হযরত ইবনে জুরায়জ (রা.) এ আয়াত তিলাওয়াত করেন شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

তারপর বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন–কদরের রাতে পবিত্র কুরআন হযরত জিবরাঈল (আ.)–এর প্রতি একই সঙ্গে নাযিল হয়, এরপর আদেশ ছাড়া তার কিছুই নাযিল হতো না। হযরত ইবনে জুরায়জ (রা.) বলেন–লায়লাতুল কদরে পুরো কুরআন সপ্তম আসমান থেকে দুনিয়ার আসমানে হযরত জিবরাঈল (আ.)–এর উপর অবতীর্ণ হয়। তারপর হযরত জিবরাঈল (আ.) তার প্রভুর আদেশ ব্যতীত হযরত মুহাম্মদ (সা.)–এর নিকট কিছুই নাযিল করতে না। এর উদাহরণ হচ্ছে–انا انزلناه فى ليلة القدر (আমি তাকে নাযিল করেছি কদরের রাতে) ও انا انزلناه فى ليلة مباركة (আমি তা নাযিল করেছি এক অতি বরকতময় রাতে)।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত এক ব্যক্তি তাঁকে বলল ঃ এ আয়াত সম্পর্কে আমার মনে একটি সন্দেহ দেখা দিল। شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ আর এ আয়াত إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ (আমি তা এক বরকতময় রাতে অবতীর্ণ করেছি) ও এ আয়াত–إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (আমি তা কদরের রাতে অবতীর্ণ করেছি) অথচ আল্লাহ্ তা'আলা এ কুরআন মজীদ শাওয়াল, যিলকাদ ইত্যাদি মাসে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি উত্তরে বললেন–আসলে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে রমযান মাসে,

কদরের রাতে–বরকতময় রাতে একই সঙ্গে। এরপর অবতীর্ণ করা হয়েছে নক্ষত্ররাজির অবস্থান স্থলে (مواقع النجوم) কিছু কিছু করে অনেক মাস ও দিন ধরে।

আর আল্লাহ্ তা'আলার বাণী هُــدًى لِّلنَّــاسِ (মানুষের জন্য হিদায়েত স্বরূপ) এর অর্থ মানুষের জন্য সত্য পথের প্রদর্শক ও উদ্দিষ্ট সিলেবাস নির্দেশকস্বরূপ।

আর আল্লাহ্ আয়াতাংশ بَيِّنَاتٍ (দলীল প্রমাণাদি)–এর অর্থ হিদায়েত বা দিক নির্দেশনাকে স্পষ্টভাবে প্রতিভাতকারী। আরো স্পষ্টকরে বলতে গেলে আল্লাহ্ তা'আলা বিধানসমূহ ফরয–ওয়াজিব, হালাল–হারাম ইত্যাকার বিষয়াদির সুস্পষ্টকারী বর্ণনাস্বরূপ।

আয়াতে الفرقان (পার্থক্যকারী) শব্দে অর্থ সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী।

যেমন হযরত সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত وَ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَ الْفُرْقَانِ সৎপথের নিদর্শনাবলী ও সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী) অর্থাৎ হালাল হারামের পার্থক্যকারী।

আল্লাহ্র বাণী–فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ('তোমাদের মধ্যে যে এ মাস পাবে সে যেন এমাসে রোযা রাখে') ব্যাখ্যাকারগণ একাধিক মাস পাওয়া এর অর্থ সম্পর্কে একাধিক পোষণ করেন।

কেউ কেউ বলেছেন–এর অর্থ, কোন ব্যক্তির নিজের বাসস্থানে অবস্থান করা। কাজেই কোন ব্যক্তি নিজের বাসস্থানে মুকীম থাকা অবস্থায় এ মাসের আগমন হলে তার উপর পুরোমাসে রোযা ফরয। চাই পরবর্তীতে অনুপস্থিত বা মুসাফির হোক এ অভিমত যারা পোষণ করেন ঃ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, আয়াতে অর্থ–ব্যক্তি তার বাসস্থানে মুকীম থাকা অবস্থায় নতুন চাঁদ উদিত হওয়া।

হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, আয়াতে অর্থ–মুকীম অবস্থায় এ মাসে হলে তার উপর সওম ফরয–চাই সে মুকীম হোক বা মুসাফির। আর যদি মুসাফির অবস্থায় এ মাস উপস্থিত হয় তাহলে চাইলে সওম পালন করবে না হয় ভাঙ্গবে।

হযরত উবায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত, রমযান মাস উপস্থিত হবার পর এক ব্যক্তি সফরে বের হলে তার সম্পর্কে তিনি বলেন–যদি মাসের প্রথমেই মুকীম থেকে থাকো, তাহলে শেষ পর্যন্ত রোযা রেখে যাবে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–'তোমাদের মধ্যে যে এ মাস পাবে অবশ্যই তাকে তার রোযা রাখতে হবে'।

হযরত উবায়দ (র.) থেকে অন্য সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

হযরত সুদ্দী (র.) বলেন–فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ এ আয়াতটির অর্থ হলো 'কোন ব্যক্তি তার পরিবারে মুকীম আছে, এসময় যদি রমযান উপস্থিত হয়, তাহলে তাকে এ মাসের রোযা অবশ্যই পালন করতে হবে।

যদি এ মাসে সে বের হয় তাহলেও রোযা রাখতে হবে, কারণ মাস তো এমন সময় তার কাছে এসেছে, যখন সে তার পরিবারে। নিজ গৃহে অবস্থান করছিল।

হযরত হাম্মাদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে, মাহে রমাদানকে এমন সময় পাবে যখন সে মুকীম সফরে বের হয়নি ; তার উপর রোযা অবশ্য কর্তব্য, কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ "তোমাদের যে কেউ এ মাস পাবে, তাকে অবশ্যই তার রোযা পালন করতে হবে।" হযরত মুহাম্মদ ইবনে সিরীন (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি উবায়দা সালমানী (র.)–কে এ আয়াতাংশ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জবাবে বলেন যে, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ –যে মুকীম সে যেন রোযা রাখে এবং যেই সে মাস পেয়েছে, তারপর সফরে বেরিয়েছে সে যেন রোযা রাখে।

হযরত উবায়দা (র.) থেকে বর্ণিত, যে রমযানের প্রথমাংশে পেলো, তাকে শেষ পর্যন্ত রোযা পালন করে যেতে হবে।

হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত যে, আলী (রা.) বলতেন–মুকীম অবস্থায় রমযান উপস্থিত হওয়ার পর যদি কেউ সফর করে তার উপরও রোযা ফরয।

হযরত ইবরাহীম (র.) থেকে বর্ণিত তিনি বলতেন, যদি রমযান এসে পড়ে তাহলে এমাসে আর সফরে বের হয়ো না। যদি দু'একদিন রোযা পালনের পর সফর কর তাহলেও রোযা ভাঙবে না, পালন করে যাবে।

হযরত আবুল বাখতারী (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন ঃ আমরা উবায়দার (র.) কাছে ছিলাম। فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ তিনি আয়াতখানি পাঠ করেন। তিনি বললেন, যদি কেউ রমযান মাসের কিছু রোযা মুকীম অবস্থায় পালন করে তাকে অবশ্যই বাকী রোযাগুলোও পালন করতে হবে, যদিও সে সফরে বের হয়। তিনি বলেন–ইবনে আব্বাস (রা.) বলতেন–এমন ব্যক্তি সাওম পালন করা অথবা ছেড়ে দেয়া তার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।

হযরত উম্মে যাররাহ্ (র.) বলেন, আমি মাহে রমাদানে হযরত আয়েশা (রা.)–এর কাছে গেলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ কোথেকে এসেছো ? আমি উত্তর করলাম ঃ আমার ভাই হুনায়নের কাছ থেকে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ সে কি অবস্থায় আছে ? বললাম তাকে বিদায় দিয়েছি, সে হালাল হতে চায়। তিনি বললেনঃ তাকে আমার সালাম বল, আর তাকে সেখানেই অবস্থান করতে বলে দাও। কারণ যদি আমি সফরের পথে থাকতে রমযান এসে পড়ে তাহলে আমি সেখানেই অবস্থান করব।

হযরত ইবরাহীম ইবনে তালহা হযরত আয়েশা (রা.)–এর কাছে সালাম দিতে এল তিনি জিজ্ঞেস করলেন–কোথায় যাবার মনস্থ করেছো, তিনি বললেন–'উমরা করার ইচ্ছা করেছি। হযরত আয়েশা (রা.) বললেন–এতদিন বসে থাকলে, যখন রমযান এসে পড়ল এ সময় বের হলে ? তিনি বললেন আমার আসবাবপত্র তো চলে গিয়েছে ।

হযরত আয়েশা (রা.) বললেন-তবু বসো, আমি ইফতার করার পর বের হবে। অর্থাৎ রমযান মাসে।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, এর অর্থ হলো ঃ তোমাদের যে কেউ এ মাস পায় তাকে অবশ্যই রোযা রাখতে হবে-যতটুকু সে পাবে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

হযরত আবূ ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত যে, আবূ মায়সারা রমযানে বের হলেন। যখন তিনি পুলের নিকট পৌছলেন, পানি চেয়ে নিলেন ও পান করলেন।

হযরত মুগীরা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, আবূ মায়সারা (রা.) রমযানে সফরে বের হলেন। যখন সওম অবস্থায় ফুরাতের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন নদী থেকে অঞ্জলী দিয়ে পানি পান করে রোযা ভেঙে ফেললেন।

হযরত মারসাদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রমযানে সফরে বের হয়েছিলেন। যখন পুলের গেইটে পৌছলেন তখন রোযা ভেঙে ফেললেন।

হযরত মারসাদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি আবূ মায়সারা (রা.)-সহ রমযান সফর করলেন। যখন পুলের নিকট পৌছলেন রোযা ভেঙে ফেললেন।

হযরত আবূ সা'দ (র.) থেকে বর্ণিত, আমি আলী (রা.)-এর সাথে তার নিম্নভূমিতে ছিলাম ; যা মদীনা থেকে তিন মাইল দূরে ছিল। তখন আমরা মদীনার উদ্দেশ্যে রমযান মাসে রওয়ানা হলাম। আলী (রা.) বাহনে উপবিষ্ট ছিলেন, আমি পদব্রজে। তিনি তখন রোযা রেখেছিলেন, হান্নাদ বলেন, আমি রোযা ভেঙেছিলাম। আবূ হিশাম (র.) বলেন-আমাকে নির্দেশ দিলে আমিও রোযা ভাঙলাম।

হযরত সা'দ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-আমি আলী ইবনে আবূ তালিব (রা.)-এর সাথে ছিলাম। তিনি তাঁর একটি জমির কাছ থেকে এসেছেন, তিনি তখন রোযা রাখা অবস্থায় ছিলেন, আর আমাকে নির্দেশ দিলেন আমি রোযা ভাঙলাম। তখন তিনি রাতে মদীনা প্রবেশ করলেন। তিনি সওয়ার হয়ে পথ অতিক্রম করলেন, আমি পায়ে হেঁটে ।

হযরত শা'বী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি রমযান মাসে সফর করেছিলেন, তখন পুলের নিকটে রোযা ভাঙলেন।

হযরত আবদুর রহমান (র.) থেকে বর্ণিত, আমাকে হযরত সুফিয়ান (র.) বলেছেন ঃ আমার কাছে রোযা পূর্ণ করাই বেশী পসন্দীয়।

হযরত সুবাহ্ (র.) বলেন, আমি রমযানে সফরে বের হওয়ার মনস্থ করে এ সম্পর্কে হাকাম ও হাম্মাদ (র.)-কে মাস্আলা জিজ্ঞেস করলাম। তখন তারা আমাকে উত্তর দিলেন, 'বের হও, (অসুবিধা নাই)। হযরত হাম্মাদ (র.) বললেন যে, হযরত ইবরাহীম (র.) বলেন ঃ যদি দশটি অতিবাহিত হয়ে যায় তাহলে মুকীম থাকাই আমার কাছে বেশী পসন্দনীয়।

হযরত হাসান ও হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব (র.) বলেন–কেউ মুকীম থাকা অবস্থায় যদি রমযান এসে পড়ে তারপর সফর করে তাহলে সে চাইলে রোযা ভাঙতে পারে।

অন্যান্য মুফাসসীরগণ বলেন–যে এ মাস পাবে তার উপর রোযা ফরয' এর অর্থ–যে ব্যক্তি বুদ্ধিমান, প্রাপ্তবয়স্ক ও দায়িত্বশীল সে যদি রমযান মাস পায়, তবে তার উপর রোযা রাখা ফরয।

এ মর্তের সমর্থনে আলোচনা ঃ

হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও তাঁর সমসাময়িক অনুগামিগণ বলতেন–কেউ যদি এমন অবস্থায় রমযানকে পায় যে সে সুস্থ, সজ্ঞান ও প্রাপ্তবয়স্ক–তাহলে তার উপর রোযা ফরয। মাহে রমাদানের আগমনের পর যদি সে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে ; পাগল হয়ে যায় এবং এ অবস্থায় পুরো মাস অতিবাহিত হয়ে যাবার পর যদি সে আবার মানসিকভাবে সুস্থ হয়ে উঠে, তাহলে রমযানের যতদিন ঐ অবস্থায় ছিল, তার কাযা করতে হবে। কারণ, সে তো ঐমাস পেয়েছিল এবং এমন অবস্থায় ছিল যাতে রোযা ফরয হয়।' তাঁরা আরো বলেন–সে ব্যক্তি পাগল থাকা অবস্থায় যদি রমযান এসে পড়ে এবং মাসের দুএকদিন থাকতেই সে সুস্থ হয়ে উঠে, তাহলে তার উপর পুরো রমযানের রোযাই ফরয, কারণ, সে তো রমযান মাস প্রাপ্তদের একজন। হাঁ সুস্থ হওয়ার পর মাসের যে কয়টি রোযা রেখেছে তার কাযা করতে হবে না।

(আমার মতে) তা একটি অর্থহীন ও অসঙ্গত ব্যাখ্যা। কেননা, যদি শুধু পাগল হওয়ার করণে কোন ব্যক্তির উপর থেকে পুরো মাসের রোযা ফরয হওয়া প্রত্যাহার হয়, তাহলে তা ঐসব ব্যক্তির উপরও সমভাবে প্রযোজ্য হওয়ার কথা যারা গোটা মাস জ্ঞানহারা অবস্থায় থাকে।অথচ, সবাই এ ব্যাপারে ইজমা বা নিরঙ্কুশ ঐক্যমত পোষণ করেন যে, যে ব্যক্তি পুরো রমযান মাসব্যাপী বেহুঁস ও মানসিক পক্ষাঘাতের কারণে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে এবং মাস অতিবাহিত হওয়ার পর চেতনা ফিরে পায়, তাহলে তার উপর পুরো মাসের কাযা ওয়াজিব। এ ব্যাপারে কেউ ভিন্নমত পোষণ করেননি যা দ্বারা এ উম্মাহ্‌র উপর কোন প্রশ্ন তোলা যায়। যখন এ বিষয়ে ইজমা প্রমাণিত হলো, তখন স্বভাবতঃই যে ব্যক্তি পুরো মাস ধরে "বিগত আকল (জ্ঞানহারা) অবস্থায় থাকবে তার বিষয়টি বেহুঁশ ব্যক্তির মতই গণ্য হবে। উভয়েরই একই হুকুম হতে বাধ্য। এ বাস্তবতার প্রেক্ষিতে তা সুস্পষ্ট যে, এ আয়াতের এ ব্যাখ্যা সঠিক নয়। রমযান মাস পুরো বা আংশিক পাওয়া সে মাসের রোযা ফরয হওয়ার কারণ।

আর এ মতটিই যখন টিকল না তখন এ ধারণা তো আরো আগেই বাতিল হয়ে যায় যে, আয়াতের অর্থ–থাকা কালীন রমযান মাস এসে পড়লে তার উপর পুরো মাসের রোযা ফরয। কারণ, হযরত রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.)–এর অনেকগুলো হাদীস এব্যাপারে সুস্পষ্ট যে তিনি মক্কা বিজয়ের বছর মদীনা শরীফ থেকে রমযান মাসে কয়েকটি রোযা রাখার পর মক্কাভিমুখে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে নিজে রোযা ভাঙলেন এবং সাহাবিগণকেও ভাঙার জন্য বলেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন–হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) রমাযান মাসে মদীনা শরীফ থেকে মক্কা শরীফের উদ্দেশ্যে সফর শুরু করেন। 'উসফান' নামক স্থানে পৌঁছলে যাত্রা বিরতি করেন এবং এক গ্লাস পানি চেয়ে নিয়ে তাঁর হাতে এমনভাবে রাখলেন যাতে সবাই তা দেখতে পায়। তারপর তিনি তা থেকে পান করেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে অন্যান্য সূত্রে আরো অনেক অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে আরো বর্ণিত–হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মক্কা শরীফ বিজয়ের দশ বছর রোযা অতিবাহিত হওয়ার পর মক্কা শরীফের পথে সফর শুরু করেন এ সময় হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও তাঁর সাহাবায়ে কিরাম রোযা রেখেছিলেন যখন 'কাদীদ' নামক স্থানে উপনীত হলেন তখন রোজা ভাঙলেন কাদীদ হলো উসফান ও 'আমাজ্জ' – এর মধ্যবর্তী একটি স্থান।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে আরেকটি বর্ণনা আছে–হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মক্কা শরীফ বিজয়ের বছর রমযানের দশ কি বিশ তারিখে বের হলেন। 'কাদীদে' পৌঁছে রোযা ভাংলেন।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত–তিনি বলেন– আমরা রমযানের আঠারো তারিখে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর সঙ্গে রওয়ানা হলাম। আমাদের কেউ তো রোযা রেখেছিলেন, আবার কেউ রোযা রাখেননি। তখন যারা রোযা রেখেছেন এবং রোযা রাখেননি, তাদের কাউকেও কোনরূপ কিছু বলা হয়নি। এতক্ষণের আলোচনায় যখন প্রমাণিত হলো যে, এ দু'টি ব্যাখ্যা সঠিক নয়, কাজেই তা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, তৃতীয় ব্যাখ্যাটাই সঠিক। আর তা হলো–'যে ব্যক্তি পুরো মাস মুকীম থেকেছে, তার উপর রোযা ফরয। আর যে ব্যক্তি অসুস্থ অথবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে সে অন্য দিনগুলোতে তা পূর্ণ করে নেবে।'

মহান আল্লাহর বাণী– وَ مَنْ كَانَ مَرِيْضًا أَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ 'আর যারা অসুস্থ অথবা সফরে থাকবে তারা অন্য সময় সে দিনগুলো পূরণ করে নেবে।

এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আলোচনা ঃ

এ আয়াতের মর্ম হলো–কোন ব্যক্তি রমযান মাসে অসুস্থ অথবা সফরে থাকাকালীন যে কয়দিন রোযা ভাঙ্গবে, তার উপর ততদিনের রোযা, রমযান ব্যতীত অন্য সময় আদায় করা ফরয।

তারপর আলিমগণ এ ব্যাপারে একাধিক মত পোষণ করেন যে, কোন রোগ বা কি ধরনের অসুস্থতার কারণে রোযা ভাঙ্গা আল্লাহ্ তা'আলা জায়েয করে, এর বদলে সমসংখ্যক সওম অন্য সময় আদায় করা ফরয করেছেন।

কোন কোন মুফাসসীর অভিমত পোষণ করেন যে, তা এমন অসুস্থতা যার কারণে অসুস্থ ব্যক্তি সালাতে দাঁড়াতে পারে না। যারা এমত পোষণ করেন–হযরত হাসান (র.) বলেন, কেউ যদি এতটুকু অসুস্থ হয়ে পড়ে যে, দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে পারে না তাহলে এজন্য রোযাও ভাঙতে পারবে।

হযরত ইবরাহীম (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন উল্লিখিত অসুস্থতা مرض বলতে এতটুকু বুঝায়

যে, যদি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে সক্ষম না হয় তাহলে এ অবস্থায় রমযানের রোযাও ভাঙতে পারবে।

হযরত ইসমাঈল (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত হাসান (র.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রোযাদার কখন রোযা ভাঙতে পারবে ? তিনি জবাবে বললেন, যখন সে রোযার কারণে অতিশয় কষ্ট পাবে ; যখন ফরয নামায আদায় করতেও অক্ষম হয়ে পড়বে।

আবার কোন কোন আলিমের অভিমত হলো, আয়াতে সুস্থতা বলতে ঐ সব রোগকে বুঝানো হয়েছে যা থাকাবস্থায় রোযা রাখলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোগ অসহনীয়ভাবে বেড়ে যায়। হযরত ইমাম শাফিঈ (র.)-এর অভিমতও এই। হযরত রবী (র.) ও তাঁর থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। কোন কোন আলিম বলেছেন যে, আয়াতে রোগ বলতে যে কোন রোগ বা অসুস্থতাকেই বুঝায়।

যারা এ অভিমত পোষণ করেন ঃ

হযরত তারীফ ইবনে তামাম উতারদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (র.)-এর কাছে এক রমযানে গিয়ে দেখতে পেলেন যে, তিনি খানা খেতেছেন, তাই তিনি কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। অবসর হয়ে তিনি নিজেই বললেন-আমার আঙ্গুলে ব্যথা পেয়েছি।

গ্রন্থকার ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ প্রসঙ্গে আমাদের কাছে শুদ্ধমত হলো,- যে রোগ বা অসুস্থতার জন্য আল্লাহ্ পাক রমযান মাসে রোযা না রাখার অনুমতি দিয়েছেন, তা এমন রোগ যা থাকা অবস্থায় রোযা রাখা অসহনীয় কষ্ট হয়। কাজেই যার অবস্থাই এরকম হবে, তার জন্য রোযা না রাখার অনুমতি রয়েছে। তবে অন্য সময় তা কাযা করে নিতে হবে। আর এ সুযোগটা এজন্য যে, যদি অবস্থা ঐ পর্যন্ত পৌঁছার পরও তাকে রোযা না রাখার অনুমতি যদি না থাকে, তবে তা তার জন্য দুঃসাধ্য ব্যাপার হবে। সহজ স্বাভাবিকভাবে তা পালন করা সম্ভব হবে না। যা আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে করীমে ঘোষিত নীতির বিপরীত হবে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা এ প্রসঙ্গে ইরশাদ করেছেন- يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ "আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য যা সহজ তা চান এবং যা তোমাদের জন্য কষ্টকর তা তিনি চান না।"

তবে যদি রোগ এমন হয় যে, তার কারণে রোযা রাখা কষ্টকর না হয়, তাহলে সে সুস্থ ব্যক্তির পর্যায়ে বিবেচিত হবে এবং তার জন্য রোযা রাখা ফরয।

মহান আল্লাহ্র বাণী- فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ এ অর্থ-অন্য সময় এ সংখ্যা পূরণ করতে হবে। اُخر শব্দটি اُخرى শব্দের বহুবচন। যেমন كُبَرٌ শব্দটি كبرى শব্দের এবং قُرَبٌ শব্দটি قربى শব্দের বহুবচন। হাঁ, যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে, اُخَر শব্দটি কি ايام শব্দটির বিশেষণ (صفة) নয় ? উত্তরে বলা হবে হাঁ। যদি প্রশ্ন করা হয় যে اَيَّام শব্দটির একবচন হচ্ছে يوم এবং এটি তো পুরুষবাচক শব্দ ! উত্তরে বলা হবে হাঁ। এখন যদি প্রশ্ন করা হয় যে তাহলে اُخَر শব্দের একবচনে اُخَر (পুং) না হয়ে اُخرى

(স্ত্রী) হওয়া কিভাবে সম্ভব, অথচ সেটি يوم এর বিশেষণ ? উত্তরে বলা যায় যে, أيام এর একবচন যদিও বিশেষিত হওয়া উচিত أخر এর একবচন "اخر" দ্বারা তবুও এখানে أيّام বহুবচন হওয়ার কারণে স্ত্রী বাচক এর হুকুম বর্তিয়েছে। কারণ আরবী ভাষায় পুরুষবাচক বহুবচন শব্দকে স্ত্রীবাচক রূপেও গণ্য করা হয়ে থাকে। কাজেই أيّام এর বিশেষণগুলো স্ত্রীবাচক শব্দের বিশেষণগণের অনুরূপভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন বলা হয় "فضت الأيّام جمع" অথচ جمع এর স্থলে "أجمعون" অথচ أيّام اخرون ব্যবহৃত হয় না।

যদি কেউ আমাদের এ প্রশ্ন করেন যে, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ (তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে বা সফরে থাকলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করে নিতে হবে।) এ আয়াতের অর্থ আপনারা করলেন–'তার উপর অন্যান্য দিনে সওম পালন ফরয' যা ইতিপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। আর এটাই যদি আপনাদের ব্যাখ্যা হয়ে থাকে তাহলে ঐ ব্যক্তির বেলায় আপনার বক্তব্য কি হবে, যে ব্যক্তি অসুস্থ অথবা সফরে থাকা অবস্থায় রমযানের সওম পালন করল,অথচ সে ঐ অবস্থায় সওম না রাখলেও পারতো। তার এ সওম পালন কি রমযান পরবর্তী সময়ে পালন (فعدّة من أيام أخر) থেকে অব্যাহতি দিবে ? নাকি তাকে আবার পরবর্তীতে অনুরূপভাবে সম–সংখ্যক সওম পালন তার উপর ফরয হবে – চাই পুরো মাস ধরেই সে সওম পালন করে থাকুক না কেন। আর এটাও একটা প্রশ্ন যে, যে ব্যক্তি অসুস্থ অথবা সফরে আছে তার উপর কি মাহে রমযানের সিয়াম ফরয ? নাকি এটা তার জন্য নিষিদ্ধ –বরং সওম না রাখাই তার উপর ওয়াজিব যতক্ষণ পর্যন্ত না এই লোকটি মুকীম হয় বা ঐ ব্যক্তি সুস্থ হয়ে যায়। এ ব্যাপারে আলিমগণের বিভিন্ন মতামতের উল্লেখ রয়েছে। আমরা সেগুলো তুলে ধরার পর শুদ্ধ মতটি বর্ণনা করার প্রয়াস পাব ইন্‌শা আল্লাহ্।

কিছু সংখ্যক আলিম বলেছেন, অসুস্থ অবস্থায় রোযা না রাখা ওয়াজিব। আর তা হলো আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে দৃঢ়তাব্যঞ্জক নির্দেশ ; কোন রুখসত বা অনুমতি মাত্র নয়।

যারা এ মত পোষণ করেন ঃ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, সফরে রোযা না রাখা উত্তম।

হযরত ইউসুফ ইবনে হাকাম (র.) বলেন, আমি হযরত ইবনে উমার (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম অথবা তাঁকে সফরে সওম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তরে বলেন, মনে কর তুমি কাউকে কিছু দান করলে কিন্তু সে তা প্রত্যাখ্যান করল, এতে কি তুমি মনক্ষুন্ন হবে না? সফরে রোযা রাখার অনুমতিটাও আল্লাহ্পাকের একটি বিশেষ উপহার–তিনি তোমাদের দান করেছেন, (কাজেই তা প্রত্যাখ্যান করা উচিত নয়)।

হযরত আবূ জা'ফর (র.) বলেছেন যে, আমার আব্বা সফরে রোযা পালন করতেন না এবং তা থেকে নিষেধ করতেন।

ইবনে হুমাইদ (র.) বর্ণনা করেন যে, দাহ্হাক (র.) সফরে সওম পালন করাকে অপসন্দ করতেন।

এ মত পোষণকারীরা বলেছেন যে, যে ব্যক্তি সফরের সময় রোযা রাখবে তার উপর ইকামতের সময় পুনরায় এর কাযা আদায় করা ওয়াজিব।

যারা এ মত পোষণ করেন ঃ

নসর ইবনে আলী খাস্'আমী (র.) এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন যে, উমার (রা.) সফরে রোযা পালনকারী এক ব্যক্তিকে পুনরায় রোযা পালনের (রোযা করার) কাযা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না (র.) বর্ণনা করেন যে, উমার (রা.) সফরে রোযা পালনকারী এক ব্যক্তিকে আবার তার রোযা রাখার (কাযা করার) নির্দেশ দিয়েছিলেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর পুত্র মুহার্বের (র.) বলেন, আমি এক রমযানে আমার পিতার সফর সঙ্গী ছিলাম, তখন আমি রোযা পালন করতাম আর তিনি রমযানে রোযা রাখতেন না। আমার পিতা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি যখন মুকীম হবে তখন কি এর কাযা করে নিবে না?" হযরত আসিম (র.) বলেছেন, আমি 'উরওয়া (র.)-কে এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিতে শুনেছি, সে সফরে রোযা রেখেছিল, তাকে উরওয়া (র.) কাযা করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

হযরত কুলসূম (রা.) বলেন, কিছু লোক উমার (রা.)-এর কাছে এসেছিল-তারা রমযান মাসের সফরে রোযা রেখেছিলেন, তখন তিনি তাদের বলেন, "আল্লাহ্র কসম, তোমাদের দেখে মনে হয় যেন সফর অবস্থায় তোমরা রোযা রেখেছো, তারা জবাব দিলো, আল্লাহ্র কসম ঃ হে আমীরুল মু'মিনীন! ঠিকই আমরা রোযাদার। তিনি বললেন, তাহলে তো তোমরা খুব কষ্ট করছো ! তারা বল ঃ জী-হাঁ ! তিনি-বললেন, তাহলে তার কাযা করে নাও, কাযা করে নাও, কাযা করে নাও।

এ অভিমত পোষণের কারণ হলো-আল্লাহ্ তা'আলা- فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ এ আয়াত দ্বারা ঐ ব্যক্তির উপর রোযা ফরয করেছেন যে এ মাস পাবে মুকীম অবস্থায়-মুসাফির অবস্থায় নয়। আর যারা মুসাফির ও অসুস্থ তাদের উপর ফরয হলো মাহে রমযান ভিন্ন অন্য মাসে ঐ দিনগুলোর রোযা কাযা করে নেয়া। আর এ বিধান সম্বলিত আয়াত-فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا أَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ (মুসাফির অথবা অসুস্থ ব্যক্তি অন্য দিন তা পালন করবে)। কাজেই , তারা বলেন, যেমনি করে মুকীমের জন্য মাহে রমযানের দিনগুলোতে রোযা না রেখে পরবর্তীতে কাযা করা জায়েয নেই, কারণ রমযানে উপস্থিতির কারণে আল্লাহ্ যা ফরয় করেছেন তা হলো ঐ

মাহে রমাযানের রোযা অন্যটা নয়। কাজেই তেমনি করে যারা এ মাস পাবে না, যেমন মুসাফির, তার উপর ঐ মাসের রোযা ফরয নয়। তার উপর ফরয –অন্য দিনে সে দিনগুলো গুণে গুণে রোযা রাখা।

এ অভিমত পোষণকারিগণ হাদীস শরীফ থেকেও একটি প্রমাণ বের করেছেন। নিম্নে বর্ণিত হাদীসগুলোতে তার উল্লেখ রয়েছে।

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) বর্ণনা করেন যে, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন, সফরে রোযা রাখা মুকীম অবস্থায় রোযা না রাখার ন্যায়।"

হযরত আবদুর রহমান (রা.) অন্য সূত্রে থেকে বর্ণিত যে, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন, "সফরে রোয়া রাখা মুকীম অবস্থায় রোযা না রাখার মত।

অন্যান্য আলিমগণ বলেন, সফরে রোযা না রাখা মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বিশেষ একটি অনুমতি মাত্র, যা তিনি তার বান্দাদের ইচ্ছাধীন রেখে দিয়েছেন। ফরয তো ছিল রোযা রাখা। কাজেই, যে তার ফরয রোযা পালন করল, সে তার দায়িত্ব পালন করল। আর যে ব্যক্তি রোযা রাখলো না সে মহান আল্লাহ্র অনুমতি সাপেক্ষেই তা করল। তারা আরো বলেন, যদি কেউ সফরে রোযা রাখে, সে পরে মুকীম হলেও তার তা কাযা করতে হবে না।

যারা এ অভিমত পোষণ করেন ঃ

হযরত উরওয়া ও সালেম (র.) বর্ণনা করেন যে, তারা দু'জন উমার ইবনে আবদুল আযীয (র.)–এর কাছে ছিলেন, তখন তিনি মদীনার আমীর ছিলেন–এ সময় লোকেরা সফর অবস্থায় রোযা রাখা সম্পর্কে আলোচনা করেন ; তখন সালিম বললেন ইবনে উমার (রা.) সফর সওম পালন করতেন না। উরওয়া বললেন–'আর আয়েশা (রা.) সওম পালন করতেন।' তখন সালিম (র.) বললেন, আমি তো এ হাদীস ইবনে উমার (রা.) থেকেই সংগ্রহ করেছি।" উরওয়া বললেন–আমিও তো এ হাদীস আয়েশা (রা.) থেকে জেনেছি। এভাবে আলোচনা ও বিতর্ক যখন তুঙ্গে উঠল। তাদের উভয়ের আওয়াজ খুব বড় হয়ে গেল। তখন উমার ইবনে আবদুল আযীয বললেন, হে আল্লাহ্! ক্ষমা কর। মূল কথা হলো যদি সফর অবস্থায় সহজ হয় তাহলে রোযা রাখ, আর কষ্ট হলে ছেড়ে দিও।

আইয়ূব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আমার নিকট বর্ণনা করেন যে উমার ইবনে আবদুল আযীযের নিকট সফরে সওম সম্পর্কে আলোচনা হলে তিনি উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

হযরত সালিম ইবনে আবদুল্লাহ্ (র.) থেকে বর্ণিত। হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রা.) রমযানের শেষের দিকে কোন এক সফরে বের হলেন। তখন তিনি বলেছিলেন মাসটি তো আমাদের অনুকূলেই আছে। যদি আমরা সওম পালন করতাম ! তখন তিনিও রোযা রাখলেন, লোকেরাও তার সাথে রাখল। এরপর একবার কাফিলার সাথে রওয়ানা হলেন, যখন 'রাওহা' নামক স্থানে পৌছলেন তখন রমযানের নতুন চাঁদ উদিত হলো, তিনি বললেন–আল্লাহ্ পাক তো আমাদের জন্য সফর নির্ধারণ

করেছেন তবুও যদি রোযা রাখি ; আমাদের এ মাসকে না ছাড়ি তাহলে ভাল হয় না ? তখন তিনি রোযা রাখেন আর লোকেরাও তার সাথে রোযা রাখেন।

হযরত খায়সামা (র.) থেকে বর্ণিত , আমি আনাস বিন মালেক (র.)-কে সফর রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি উত্তরে বললেন-আমি আমার গোলামকে রোযা রাখার আদেশ করলাম কিন্তু সে অমান্য করল। আমি বললাম- তাহলে এ আয়াত রইল কোথায়-وَ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ- তিনি বললেন, এ আয়াত যখন নাযিল হয়েছিল তখন তো আমরা ক্ষুধার্ত অবস্থায় সফর করতাম, ফিরেও আসতাম আধ-পেটা অবস্থায়। আর এখন তো আমরা তৃপ্ত অবস্থায় সফর করছি, আবার পরিতৃপ্ত অবস্থায় ফিরে আসছি।

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল-সফরে রোযা পালন করা সম্পর্কে। তিনি জবাব দিয়েছিলন যে রোযা ছেড়ে দেবে আল্লাহ্‌র অনুমতিতে ছাড়বে আর যে রাখবে, বস্তুত রোযা রাখাই উত্তম।

হযরত মুহাম্মদ ইবনে উসমান বিন আবুল 'আস (রা.) বলেন, সফরে রোযা না রাখা হলো-রুখসত। তবে রোযা রাখা হল উত্তম।

হযরত আবুল ফায়দ (র.) বলেন, হযরত আলী (রা.) শামে আমাদের আমীর ছিলেন, তখন তিনি আমাদেরকে সফরে রোযা রাখতে নিষেধ করেন। আমি বনী লাইসের আবূ কিরসাকা নামক একজন সাহাবীকে জিজ্ঞেস করলাম (তার নাম-ওয়াসেলা ইবনে আস্‌কা) তিনি বলেন-রোযা রাখলে কাযা আদায় করবে না।

হযরত আতা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি রোযা রাখ তাহলে তোমাদের রোযা আদায় হয়ে যাবে আর যদি না রাখ তাহলে তারও অনুমতি আছে।

হযরত কাহ্‌মাস (র.) থেকে বর্ণিত আছে; তিনি বলেন আমি হযরত সালিম ইবনে আবদুল্লাহ্‌কে সফরে সওমের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন-যদি তোমরা রোযা রাখ তাহলে তা আদায় হয়ে যাবে, আর যদি না রাখ তাহলে তার অনুমতি আছে।

হযরত আতা (র.) থেকে বর্ণিত আছে, যে সওম পালন করল তার তা আদায় হয়ে গেল আর যে ভাঙ্গলো সে অনুমতি সাপেক্ষেই করল।

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়র (র.) থেকে বর্ণিত, সফরে রোযা ভাঙ্গা রুখসত তবে সওম পালন করাই উত্তম।

হযরত আতা (র.) বলেন, তা একটি অনুমতি দৃঢ়তাব্যঞ্জক নির্দেশ নয়। অর্থাৎ-فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ- চাইলে রোযা রাখতে পারে ইচ্ছা করলে নাও রাখতে পারে।

হযরত হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি রমযানে সফর করে সে ইচ্ছা করলে রোযা রাখতে পারে, নাও রাখতে পারে।

হযরত মুজাহিদ (র.)–কে সফরের সওম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এ সময় রোযা রাখতেন, আবার কখনো কখনো ছেড়েও দিতেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হল–এর মধ্যে কোনটি উত্তম ! তিনি বলেন, রোযা না রাখা হলো একটা অনুমতি, রোযা রাখাটাই আমার নিকট অতি উত্তম?

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়র, ইবরাহীম ও হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তারা সবাই বলেছেন –সফরের রোযা রাখতে পারে, আবার নাও রাখতে পারে। তবে রোযা রাখাই উত্তম। হযরত আবূ ইসহাক (র.) বলেন, আমাকে মুজাহিদ (র.) সফরে রমযানের রোযা সম্পর্কে বলেন,–আল্লাহ্র কসম, সফরে রোযা রাখা না রাখা দুটোই বৈধ। তবে আল্লাহ্ তা'আলা রোযা না রাখার অনুমতি দিয়েছেন বান্দাগণের সুবিধার জন্য।

হযরত আস'আস ইবন সালিম (র.) বর্ণনা করেন– আমি আমার পিতা এবং আবুল আস্ওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ 'আমর ইবনে মায়মূন ও আবূ ওয়ায়েলের সাথে পবিত্র মক্কা সফর করি ; তাঁরা রমযান ও অন্যান্য সময় সফরে রোযা রাখতেন।

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়র (র.) বলেন, সফরে রোযা না রাখার ইজাযত আছে, তবে রোযা রাখাই উত্তম।

হযরত সালিহ্ (র.) থেকে বর্ণিত, আমি কাসিম ইবনে মুহাম্মদ (র.)–কে বললাম : আমরা শীতকালে রমযান মাসে সফরে বের হবো, যদি এ সফরে রোযা রাখি, তা গরমের সময় কাযা করার চেয়ে সহজতর। উত্তরে তিনি বললেন– আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ– "আলাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য যা সহজ তা চান এবং যা তোমাদের জন্য কষ্টকর তা তিনি চান না।"

কাজেই, যা তোমার জন্য সহজতর তাই কর। আর এ অভিমত আমাদের নিকট শুদ্ধতম মত। কারণ, এ বিষয়ে ঐক্যমত (اجماع الجميع) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, যদি এমন রোগী রোযা রাখে, যার রোগের কারণে তার রোযা না রাখা জায়েয হয়, তা হলে তার রোযা আদায় হয়ে যাবে। রোগমুক্তির পর আর এ দিনগুলো কাযা করতে হবে না। এতে করে বুঝা গেল যে, মুসাফিরের বিধানও অনুরূপ হবে–তার আর কাযা করতে হবে না, যদি সে সফর অবস্থায় রোযা রেখে থাকে। কারণ, পরবর্তীতে কাযা করা সাপেক্ষে মুসাফিরের রোযা না রাখা রোগীর হুকুমের মতই। এ সম্পর্কিত আয়াত এতই স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন যে এর প্রমাণের জন্য অন্য কোন দলীলের দরকার নেই। আর তা হলো, মহান আল্লাহ্র বাণী– يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যা সহজ তাই চান এবং তিনি তোমাদের জন্য যা কষ্টকর তা চান না)। এর চেয়ে বেশী কষ্ট কি হতে

পারে যে, একজন লোক সফর অবস্থায় রোযা রাখবে তাকে আবার গুণে গুণে এর কাযা করতে হবে, অথচ সে কঠিনতর সময়ে তা আদায় করেছিল। (এরপরও তার কাযা করতে হলে তো এটা বিরাট কষ্টের ব্যাপার, যা আল্লাহ্ তা'আলা চান না)।

এরপরও যদি কোন সরল লোক ধারণা করে যে, সে ব্যক্তি যে সফরে রোযা রেখেছিল– তা তো তার উপর ফরয ছিল না, তাহলে এর উত্তরে বলব–আল্লাহ্ তা'আলা বিধান দিয়েছেন– يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ– 'হে ম'ুমিনগণ ! তোমাদের উপর রোযার বিধান জারী করা হলো বা তার বাণী– شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ 'রমযান, যে মাসে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে।' এ আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে– বার মাসের মধ্যে যে মাসে প্রতিজন ম'ুমিনের উপর রোযা রাখা ফরয, তা রমাযান; চাই সে মুকীম হোক বা মুসাফির। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যাপকভাবে মু'মিনদের সম্বোধন করেছেন। যেন তিনি বলেছেন–হে মু'মিনগণ ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হলো রমযান মাসে। মহান আল্লাহ্র বাণী–وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ–যে ব্যক্তি অসুস্থ অথবা সফরে থাকবে সে অন্য সময় এ দিনগুলোর কাযা আদায় করবে। এর অর্থ, যে ব্যক্তি অসুস্থ অথবা সফরে থাকবে এবং এমতাবস্থায় মহান আল্লাহ্র অনুমতি বলে রোযা ত্যাগ করলো তার উপর এ দিনগুলো হিসাব করে অন্য সময় রোযা রাখা ফরয।

হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে এ হাদীস বহুলভাবে প্রচারিত যে, তাঁকে সফরে রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন, ইচ্ছা করলে রোযা রাখতে পার, ইচ্ছা করলে রোযা নাও রাখতে পার'' । এ হাদীসটিও আমাদের উপরোক্ত অভিমতের সপক্ষে এত জোরালো দলীল যে, প্রমাণের জন্য তাই যথেষ্ট।

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, হযরত হামযা (রা.) হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–কে সফরের রোযা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন–তিনি বিরতিহীনভাবে রোযা রাখতেন–তখন জবাবে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন 'ইচ্ছা হলে রোযা রাখো, আর ইচ্ছা না হলে রোযা না রাখো।

আবূ কুরায়ব ও উবায়দ ইবনে ইসমাঈল আল্ হাবারী (র.) বর্ণনা করেন যে হামযা (রা.) হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি অনুরূপ জবাব দেন।

হযরত আবুল আসাদ (র.) বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর সাহাবী হামযা আসলামী (রা.) সম্পর্কে আবূ মারাবেহ্ (র.)–এর কাছে উরওয়া ইবনে যুবায়র (রা.)–কে আলোচনা করতে শুনেছেন যে, তিনি বলেছিলেন–হে আল্লাহ্র রাসূল (সা.) আমি তো বিরতিহীনভাবে রোযা রাখি। কাজেই, সফরেও কি রোযা রাখবো ? আমার কি হুকুম ? তখন হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন–তা তো মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তার বান্দাদের জন্য বিশেষভাবে অব্যাহতি। কাজেই যে এ অবস্থায় রোযা রাখবে তা উত্তম এবং সুন্দর ; আর যে ব্যক্তি তা না রাখবে তার কোন গুনাহ্ হবে না। তখন হযরত হাম্যা (রা.) অনবরত রোযা রাখতেন। কাজেই, সফরে ও মুকীম অবস্থায়–সব

সময় রোযা রাখতেন। এমনি করে হযরত উরওয়া ইবনে যুবায়র (রা.) সফরে ও মুকীম অবস্থায় সব সময় অনবরত রোযা রাখতেন। এ হাদীস এবং এরূপ অসংখ্য হাদীস –যা এ কিতাবের সীমিত পরিসরে বর্ণনা করা সম্ভব নয়–এগুলো সুস্পষ্টভাবে আমাদের অভিমত প্রমাণ করে যে, রোযা না রাখার অনুমতি আছে, তা রুখসত। তবে রাখাটাই আযীমত বা উত্তম দৃঢ়তা। আমাদের সপক্ষে সবচেয়ে স্পষ্ট দলীল হচ্ছে মহান আল্লাহ্র বাণী– مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ– কেউ যদি প্রশ্ন করেন যে, যদিও আপনাদের উল্লিখিত হাদীসগুলো বহুল প্রচারিত, তবে এ হাদীসওতো প্রচারিত যে, 'সফরে সওম রাখা পুণ্যের কাজ নয়'। এ প্রশ্নের উত্তরে বলা হবে যে, তা তো, যখন সওম এমন অবস্থায় হবে, যে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর হাদীস এসেছে। হযরত জাবির (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এক ব্যক্তিকে সফর অবস্থায় দেখলেন যে, তার উপরে ছায়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং তার কাছে একদল লোক জড়ো হয়ে আছে। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এই লোকটি কে ? তারা উত্তর দিলেন 'সায়েম' (রোযাদার)। তিনি বললেন, 'সফরে সওম রাখা ভাল নয়।'

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, তার কাছে লোকজন জড়ো হয়ে আছে এবং তার উপর ছায়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তারা বললেন, ইনি একজন রোযাদার ব্যক্তি। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন–"সফরে সওম কোন পুণ্যের কাজ নয়''।

কাজেই যার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) উপরোক্ত কথা বলেছেন, তার মত অবস্থা হলে ঠিকই রোযা রাখা ভাল নয়। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা ঐ ব্যক্তির নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়া হারাম করেছেন যার বাঁচার অন্য উপায় আছে। পুণ্য তো সে সব কাজেই তালাশ করতে হবে যা আল্লাহ্ তা'আলা জায়েয করেছেন এবং তার প্রতি উৎসাহিত করেছেন– সে সব কাজে নয়, যা তিনি নিষেধ করেছেন।

আর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে যে সব হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, সফরে 'রোযা রাখা, বাড়ীতে রোযা না রাখার মত।' তা যদি হাদীস হয় তা হলে সম্ভবত বলেছেন এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে যে ঐ ছায়ার নীচের লোকটির মত অতিশয় কষ্ট করে রোযা রেখেছিল।

তাছাড়া রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এমন কথা বলেছেন, তা বলাও ঠিক নয়। কারণ এ সম্পর্কে যে সব হাদীস বর্ণিত আছে সেগুলোর সনদ এতই দুর্বল। যাদ্বারা দীনের কোন বিষয় প্রমাণ করা যায় না।

যদি কেউ ব্যাকরণগত দিক থেকে প্রশ্ন করেন যে, مَرِيض (অসুস্থ) এর উপর কিভাবে عطف করা হলো অথচ তা হচ্ছে اسم (বিশেষ্য) কারণ আল্লাহ্র বাণী– اَوْ عَلٰى سَفَرٍ এ عَلٰى তো হচ্ছে صفة (বিশেষণ) اسم নয়?

এর উত্তরে বলা হবে যে, فَرِيضٍ এর উপর عَلٰى কে এ ভাবে সমন্বয় করা হয়েছে যে, عَلٰى আসলে فعل (ক্রিয়া) এর অর্থ প্রকাশ করে। অর্থাৎ '' أو مسفراً '' হবে। যেমনি অন্য এক স্থানে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন-" دعانا لجنبة أو قاعداً أو قائماً "এখানে قاعد ও قائم কে " جنبة " এর لام এর উপর عطف করা হয়েছে। কারণ এটি আসলে فعل এর অর্থ প্রকাশ করছে। যেমন তিনি এভাবে বলতে চেয়েছেন- دعانا مضطجعاً أو قاعداً أو قائماً ("আমাকে শুয়ে, বসে ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ডেকেছেন।")

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ -(আল্লাহ্পাক তোমাদের জন্য সহজ করেন; তিনি তোমাদের কষ্ট চান না।") এ আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে আলোচনা ঃ

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, হে ম'ুমিনগণ ! তোমাদের অসুস্থতা ও সফর অবস্থায় রোযা না রেখে অন্য সময় সেগুলো কাযা করে নেয়ার অনুমতির মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা এটাই চেয়েছেন, যেন তোমাদের জন্য সহজ হয়, কারণ তিনি জানেন ঐ অবস্থায় রোযা পালন তোমাদের জন্য কষ্টকর। তিনি তোমাদের কষ্ট দিতে চান না, সে জন্যই এরূপ কঠিন অবস্থায় তোমাদের উপর রোযা ফরয করে কষ্টের বোঝা চাপিয়ে দিতে চাননি।

এ সমর্থনে যে সব হাদীস রয়েছে ঃ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে আল্লাহ্র বাণী- يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ এ আয়াতে 'সহজতা' বলতে সফরে রোযা না রাখা আর কঠিন বা কষ্ট বলতে সফরে রোযা রাখাকে বুঝানো হয়েছে।

হযরত আবূ হামযা (র.) বলেন, আমি সফরে রোযা সম্পর্কে হযরত ইবনে 'আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন- সহজ ও কঠিন দুটোই আছে, আল্লাহ্র দেয়া সহজটিকেই গ্রহণ কর।

হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন- يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ বলতে সফরে রোযা না রাখা ও পরবর্তীতে তা কাযা করাকেই বুঝানো হয়েছে। 'আর তিনি তোমাদের জন্য কঠিন হোক তা চান না'।

হযরত কাতাদা (র.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন- يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ কাজেই তোমরা তোমাদের নিজেদের জন্য সেটাই চাও, যা আল্লাহ্ তোমাদের জন্য চেয়েছেন।

মুসান্না (র.) ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন- যে রোযা রাখল তারও কোন কষ্ট নেই আর যে রোযা না রাখল তারও কোন কষ্ট নেই-অর্থাৎ রমযানে সফরে রোযা না রাখলে। "আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সহজ হওয়া চান, কঠিন হওয়া চান না।"

হযরত যাহ্হাক ইবনে মুযাহিম (র.) বলেন-আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সহজ হওয়া চান, এর অর্থ সফরে রোযা না রাখা। আর "তিনি তোমাদের কষ্ট হওয়া চান না।"-এর অর্থ সফরে রোযা পালন (তিনি কামনা করেন না)।

وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ "আর যাতে তোমরা মেয়াদ পূর্ণ করতে পার" এর ব্যাখ্যাঃ 'এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, যাতে পরবর্তীতে তোমরা সে সব দিনের মেয়াদ পূর্ণ করতে পার, যে সব দিনে তোমরা রোযা রাখোনি। তোমাদের রোগ থেকে মুক্তি লাভ বা সফর থেকে বাড়ীতে ফেরার পর সে সব দিনের রোযা কাযা করে নিবে, যে দিনগুলোতে ঐ অবস্থায় তোমরা রোযা রাখোনি। এ সম্পর্কে হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে।

হযরত দাহ্হাক (র.) উক্ত আয়াতাংশ সম্পর্কে বলেন, মেয়াদ বলতে ঐ সময়টুকু বুঝায় যখন অসুস্থ ও মুসাফির ব্যক্তি রোযা রাখতে পারেনি।

হযরত ইবনে যায়দ (র.) বলেন, 'মেয়াদের পূর্ণতা' বলতে ঐ দিনগুলোর কাযা করাকে বুঝায়, রমযানের যে দিনগুলোতে সফর অথবা অসুস্থার কারণে রোযা রাখেনি। যখন তা পূরণ করল, তখনই সে মেয়াদ পূর্ণ করল।

যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ এ বাক্যের প্রথমে و او দ্বারা কি আত্ফ (عطف) বা সম্বন্ধ বুঝাবার জন্য ? এর উত্তরে আরবগণের বিভিন্ন মত রয়েছে ঃ

কেউ বলেছেন, এ و او দ্বারা তার পূর্বের বক্তব্যের উপর 'আত্ফ' করা হয়েছে (তা পূর্বের বক্তব্যের অংশ হিসাবে 'সংযুক্ত' করা হয়েছে)। যেন বলা হয়েছে– "এবং আল্লাহ্ তা'আলা চান যেন তোমরা সময়পূর্ণ কর এবং আল্লাহ্কে বড় বলে প্রকাশ কর (আল্লাহু আকবার বল)। কূফার কোন কোন আরবী ব্যাকরণবিদ বলেছেন– وَ لِتُكْمِلُوا এর 'লাম' হলো لام كى '(যাতে করে' অর্থ প্রকাশক)' এটা ফেলে দিলেও বাক্য শুদ্ধ থাকবে। তারা আরো বলেন, আরবগণ তা তাদের ভাষায় ব্যবহার করেন এর পরের ক্রিয়াস্থ সর্বনাম (اضمار) এর উপর ভিত্তি করে। এবং তখন এটি তার পূর্বস্থিত ক্রিয়ার শর্ত হবে না। 'লক্ষ্যণীয় এই لام كى এর আগে একটি و او রয়েছে। দেখুন না, আপনিও তো বলেন– جئتك لتحسن الى "তোমার কাছে এলাম, 'যাতে' তুমি একটু উপকার কর।" তা তো বলেন না যে– جئتك و لتحسن الى হাঁ যদি এভাবে বলেই থাকেন তাহলে প্রকৃতপক্ষে আপনি বলতে চাচ্ছেন– و لتحسن جئتك "যাতে একটু উপকার কর সেজন্যই তোমার কাছে এলাম"। প্রকাশের এ ভঙ্গী পবিত্র কুরআনে দেদার রয়েছে। যেমন – وَ لِتَصْغَى اِلَيْهِ أَفْئِدَةٌ (এখানে و او এর সাথে লাম প্রথমেই এসেছে)। এমনি করে আয়াত– وَ كَذَالِكَ نُرِى اِبرَاهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ لِيَكُوْنَ এমনি করে আমি ইবরাহীমকে আসমান যমীনের নিদর্শনাবলী দেখাই, যাতে সে হতে পারে............।' যদি এখানে لام এর আগে و او হয় তাহলে তার পরে সর্বনাম বিশিষ্ট ক্রিয়ার প্রয়োজন হবে। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন– وَ لِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ أَرَيْنَاهُ (যাতে সে স্থির বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে সে জন্য আমি

তাকে দেখালাম)। (এখানে و او এসেছে বলেই পরে أريناه এসেছে অনিবার্যভাবে) আর এই অভিমতটি আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী শুদ্ধতম মত।কারণ وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ বাক্যের মধ্যে لام টি যে অর্থে ব্যবহৃত, তার আগে অনুরূপ لام নেই যে তার উপর عطف করা যায়। ঐ বাক্যে লামটির সাথে و او এর অবস্থান নির্দেশ করে যে তা আসলে তার পরবর্তী فعل এর شرط কারণ, و او উহ্য থাকলে বাক্যটি এর পূর্ববর্তী فعل এরই شرط রূপে গণ্য হতো।

আল্লাহ্‌র বাণী- وَ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰاكُمْ (আর যেনো আল্লাহ্‌ তা'আলা প্রদত্ত হিদায়েতের নিয়ামত লাভের জন্য তোমরা তাঁকে বড় করে প্রকাশ করতে পারো)-এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন অভিমতঃ এ আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, "আর যাতে করে তোমরা মহান আল্লাহ্‌র যিকির দ্বারা তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে পার। যিকির করা এজন্য যে, যার কারণে হিদায়েত-এর নিয়ামত তিনি দান করেছেন, ফলে পূর্ববর্তী উম্মতগণের অনুতাপের কারণ হয়েছে। তাদের উপরও মাহে রমযানের রোযা ফরয ছিল, যেমনি তোমাদের উপর ফরয করা হলো। আল্লাহ্‌ তা'আলার হিদায়েত থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছে। আর তোমরা সম্মানিত হয়েছ এবং রোযা রাখার জন্য তোমাদেরকে হিদায়েত করেছেন এবং যেভাবে আদেশ দিয়েছেন তদ্রূপ তা পালনের জন্য তাওফীকও দিয়েছেন। কাজেই, তাঁর ইবাদত করে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা ঈদুল ফিতরের দিন আল্লাহ্‌ পাকের মহাত্ম্য বর্ণনার মাধ্যমে মাহাত্ম্য বর্ণনা হলো-তাকবীর" ('আল্লাহু আকবার' বলা)। এভাবেই এক শ্রেণীর ব্যাখ্যাকারগণ এর ব্যাখ্যা করেছেন।

যাদের এ অভিমতঃ

হযরত মুসান্না (র.), যায়দ ইবনে আসলাম (রা.) থেকে বর্ণনা করেন- وَ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰاكُمْ -এর ব্যাখ্যা, যখন নয়াচাঁদ দেখা দেয় ,তখন থেকে তাকবীর পাঠ করবে। ঈদের নামাযের জন্য ইমাম সাহেব মসজিদে উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত ; যখন ইমাম সাহেব তাকবীর বলবেন, তখন তার সাথে ব্যতীত ; তখন তার তাকবীরের সঙ্গে ছাড়া নিজে তাকবীর বলবে না।

হযরত সুফিয়ান (র.) থেকে বর্ণিত করেন, উক্ত আয়াতের "তাকবীর" অর্থ,-যা আমাদের কাছে পৌঁছেছে,- 'ঈদুল ফিতরের দিন তাকবীর বলা' ।

হযরত ইবনে যায়দ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, ইবনে আব্বাস (রা.) বলতেন--মুসলমাদের কর্তব্য হলো, যখন শাওয়াল মাসের নতুন চাঁদ দেখবে, সে মুহূর্তে থেকে ঈদের নামায থেকে ফিরা পর্যন্ত মহান আল্লাহ্‌র তাকবীর বলা। কারণ, আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন-وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰاكُمْ এ আয়াত প্রসঙ্গে হযরত ইবনে যায়দ (র.) বলেন- মুসল্লীরা যখন তারা ভোরে ঈদগাহের দিকে যাবে, তখন যেন তাকবীর পাঠ করে, আবার যখন তারা নামাযের স্থানে বসবে,

তখনও তাকবীর পাঠ করতে থাকবে, আর যখন ইমাম সাহেব আগমন করবেন, তখন চুপ থাকবে, যখন ইমাম সাহেব তাকবীর পাঠ করবেন সাথে সাথে সবাই তাকবীর পাঠ করবে। ইমাম সাহেব আসার পর তাঁর তাকবীরের অনুসরণ ব্যতীত অন্য আর কারো তাকবীরের প্রতিধ্বনি করবেন না। যখন নামায সুসম্পন্ন হবে তখন ঈদ পর্ব পালন হয়ে গেল।

হযরত ইউনুস (র.) বললেন– আবদুর রহমানও তত্ত্বজ্ঞানিগণের এক জমাআতের মতে এর অর্থ, ঈদগাহের দিকে তাকবীর বলতে বলতে অগ্রসর হওয়া।

وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ এর ব্যাখ্যা অর্থঃ যাতে তোমরা আল্লাহ্র শোকর আদায় করতে পার, ব্যাখ্যাঃ কেননা তিনি তোমাদেরকে রোযা রাখার হিদায়েত ও তাওফীক দিয়েছেন এবং অনুগ্রহ করে বিষয়টি তোমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন ; তিনি চাইলে তা, কঠিনও করে দিতে পারতেন। لَعَلَّ হয়তো এ শব্দটির অর্থ এখানে كَى (যাতে করে)। এজন্য وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوْا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدَاكُمْ এর উপর عطف করা হয়েছে।

আল্লাহ্র বাণী–

وَ اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ وَلْيُؤْمِنُوْابِىْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ –

অর্থঃ "যখন আপনাকে (হে রাসূল!) আমার সম্পর্কে আমার বান্দারা জিজ্ঞেস করে (আপনি বলে দিন) নিশ্চয়ই আমি অতি নিকটে রয়েছি, যখনই আহ্বানকারী আমাকে আহ্বান করে, আমি তার ডাকে সাড়া দেই। কাজেই তারা যেন আমার ডাকে সাড়া দেয়, আমার প্রতি ঈমান আনে, যাতে তারা সুপথ পায়। (সূরা বাকারাঃ ১৮৬)

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে যা যা বলেছেন তার ভাবার্থ 'হলো'– 'হে মুহাম্মাদ! (সা.) যখন আমার বান্দাগণ আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে আমি কোথায় ? তখন এর উত্তরে বলুন আমি তাদের নিকটেই রয়েছি, তাদের ডাক আমি শুনতে পাই এবং তাদের যে কেউ যখনই ডাকে, আমি তখনই তার ডাকে সাড়া দিয়ে থাকি।'

এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ সম্পর্কে আলিমগণের একাধিক মত রয়েছে। কেউ বলেছেন, তা এক প্রশ্নকারীর সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। সে ব্যক্তি হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–কে জিজ্ঞেস করলঃ হে মুহাম্মাদ (সা.) আমাদের প্রভু কি খুব কাছেই যে, তাকে আস্তে করে ডাকব, না কি দূরে ; তাই উচ্চস্বরে ডাকব? তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন।

হযরত ইবনে হুমায়দ (র.) অনুরূপ বর্ণনা করেন। হযরত হাসান (র.) থেকে বর্ণিত যে, হযরত সাহাবায়ে কিরাম (রা.) রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–কে একবার জিজ্ঞেস করলেন যে, আমাদের প্রতিপালক

কোথায় ? তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন। অন্যান্য আলিমগণ বলেন–যে, এ আয়াত নাযিল হয়েছে একজন লোকের প্রশ্নের জবাবে তারা জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, কোন সময় তারা মহান আল্লাহ্‌কে ডাকবে।

যাদের এ অভিমত ঃ

হযরত আতা (র.) বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হলো– وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ (তোমাদের বলেন, আমাকে ডাকো, তোমাদের সাড়া ডাকে দিব) তখন সাহাবায়ে কিরাম (রা.) আরয করলেন 'কোন মুহূর্তে ? তখন এর জবাবে এ আয়াত নাযিল হলো وَ إِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ .... لَعَلَّكُمْ يَرْشُدُوْنَ –

হযরত আতা (র.) থেকে বর্ণিত লোকেরা যখন জিজ্ঞেস করল, কোন্ প্রহরে আমরা আল্লাহ্‌কে ডাকবো ? তখন নাযিল হলো–وَ إِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّ الاية হযরত 'আতা ইবনে আবূ রিবাহ্ এর ধারণা যে, তার কাছে এ খবর পৌঁছেছে যে, যখন নাযিল হলো–وَ قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ (আমাকে ডাক, সাড়া দিব) লোকেরা বললঃ কোন সময় ডাকব ? তখন এ আয়াত নাযিল হলো ঃ

وَ إِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَ لْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ –

হযরত সূদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা উপরোক্ত আয়াতটি নাযিল করার পর এটাই বুঝা যায় যে, এমন কোন মু'মিন বান্দা্ নেই যে আল্লাহ্‌কে ডাকলে তিনি সাড়া দেন না। যদি তার প্রার্থনার বস্তুটি তার দুনিয়ার রিযিক হয় তাহলে দুনিয়াতেই আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তা দান করেন, আর যদি দুনিয়াতে সেটি তার রিযিকে রাখা না হয়, তবে কিয়ামতের দিনের জন্য তা সংরক্ষিত হয় এবং এর দ্বারা তার যে কোন একটি মুসীবত দূর করা হয়।

হযরত ইবনে সালিহ্ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এক ব্যাক্তির মাধ্যমে জেনেছেন যে, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন– আল্লাহ্ তা'আলা এমন কাউকে দু'আ করার তাওফীক দেন না যার দু'আ প্রত্যাখ্যাত হয়। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–'আমাকে ডাক, সাড়া দিব।' এ ব্যাখ্যার আলোকে আয়াতটির অর্থ হচ্ছে–"যখন আপনার কাছে আমার বান্দারা জিজ্ঞেস করে যে কোন সময় আমাকে ডাকবে, আপনি তাদের বলে দিন, আমি তো সর্বক্ষণ তাদের অতি নিকটেই রয়েছি ; প্রার্থনাকারীর ডাকে আমি সাড়া দেই, যখন সে আমাকে ডাকে।"

অন্যান্য মুফাসসীরগণ বলেন– বরং আয়াতটি এক শ্রেণীর লোকের প্রশ্নের জবাবে নাযিল হয়। যখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের বললেন– আমাকে ডাকো , সাড়া দিব। তখন তারা বললো ; 'তাকে কোথায় গিয়ে ডাকব ?

যারা এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন ঃ

আল্লাহ্ পাকের বাণীঃ হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, 'আমাকে ডাকো, সাড়া দিব' এ শুনে তারা বলে উঠল; 'কোথায়?' তখন নাযিল হলো– اَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ (তোমরা যেদিকেই মুখ ফেরাও না কেন সেদিকেই আল্লাহ্ রয়েছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ প্রশস্তকারী মহাজ্ঞানী) কিছু সংখ্যক মুফাসসীর বলেন, বরং আয়াতটি নাযিল হয়েছে, ঐ লোকদের জবাবে যারা বলেছিল, 'কিভাবে ডাকব'? যাদের এ অভিমতঃ হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত যে, আমাদের কাছে আলোচনা হয়েছে যে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন– اُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْلَكُمْ (আমাকে ডাকো, আমি সাড়া দিব?) তখন কিছু লোক বলল; কিভাবে ডাকব, হে আল্লাহ্র নবী ! তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন– وَ إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَإِنِّىْ قَرِيْبٌ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ وَ لْيُؤْمِنُوْابِىْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ – আর আয়াতে–فَلْيَسْتَجِيْبُوْالِىْ এর অর্থ হলো–আনুগত্য তথা নেক 'আমল দ্বারা আমার ডাকে সাড়া দাও। আরবী ভাষায়–أَسْتَجِبْتُ لَهُ ও استجبته দুটির অর্থই– أجبته (তার ডাকে সাড়া দিলাম)। যেমন কবি কা'ব ইবনে সা'দ আল্–খানাবীর কবিতায় এর প্রমাণ রয়েছে ঃ

وَ دَاعٍ دَعَا يَا مَنْ يُجِيْبُ اِلَى النَّدَى + فَلَمْ يَسْتَجِبْهُ عِنْدَ ذٰلِكَ مُجِيْبُ

"এক আহ্বানকারী আহ্বান জানালো, কে আছ ঐ আহবানে সাড়া দিবার ! তখন কেউই সাড়া দিল না। (এ কবিতাংশ يستجيب ও يجيب একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে–'সাড়া দেয়া')

হযরত মুজাহিদ (র.)–সহ একদল আলিম এ সম্পর্কে আমাদের উল্লিখিত অভিমতটির অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, فلتستجيبوالى অর্থ, আমার অনুগত হও, তিনি বলেন استجابة অর্থ আনুগত্য।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মুবারক (র.)–কে "فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ" এ আয়াতে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তরে বলেন, এর অর্থ ঃ আল্লাহ্র আনুগত্য'। কোন কোন ব্যাখ্যাকারী এমত পোষণ করেন যে, فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ অর্থ فليدعونى (কাজেই তোমরা আমাকে ডাকো।')

যাঁদের এ অভিমত ঃ

আবূ রাজা খুরাসানী (র.) থেকে বর্ণিত, فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ অর্থ فَلْيَدْعُوْنِىْ যেন, (তারা আমাকে ডাকে)।

আর মহান আল্লাহ্র বাণী– وَ لْيُؤْمِنُوْا بِىْ (তারা যেন, আমার প্রতি ঈমান রাখে) এর অর্থ তারা

যেনো অবশ্যই আমাকে সত্য বলে মানে –ঈমান রাখবে যে, যখন তারা আমার আনুগত্যের মাধ্যমে আমাকে ডাকে আমি তাদের আনুগত্যের জন্য তাদেরকে সওয়াব ও সম্মান দিয়ে থাকি।

আর যারা فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ এর অর্থ করেছেন فَلْيَدْعُوْنِىْ ('আমাকে যেন ডাকে') তারা وَ لْيُؤْمِنُوْا بِىْ এর ব্যাখ্যা করেছেন ঃ 'তারা যেন ঈমান রাখে যে আমি তাদের ডাকে সাড়া দেই।'

যাঁদের এ অভিমত ঃ

হযরত আবূ রাজা খুরাসানী (র.) থেকে 'তারা যেন আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে যে, আমি তাদের ডাকে সাড়া দেই।'

মহান আল্লাহর বাণী– لَعَلَّكُمْ يَرْشُدُوْ نَ (যাতে তারা সুপথ পায়) এর দ্বারা বুঝায় যে,–তারা যেন আমার প্রতি আনুগত্য পোষণ করে, নেক আমলের মাধ্যমে আমাকে ডাকে, এবং আমার প্রতি ঈমান রাখে আর একথা সত্য বলে বিশ্বাস করে যে, আমি তাদের আনুগত্যের বিনিময়ে সওয়াব দিয়ে থাকি এবং তারা তাদের এ কাজের মাধ্যমে সঠিক পথের দিক নির্দেশনা লাভ করবে, হিদায়েত পাবে। যেমন– হযরত রবী (র.) বলেন, لَعَلَّكُمْ يَرْشُدُوْ نَ এর অর্থ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْ نَ (অর্থাৎ হিদায়েত লাভ করবে)। কেউ যদি প্রশ্ন করে যে, মহান আল্লাহ্র এ বাণীর কি অর্থ হতে পারে ? কারণ, বহু লোককে দেখা যায়, মহান আল্লাহ্র কাছে দু'আ করে অথচ তাদের দু'আ কবূল হয় না, যদিও মহান আল্লাহ্ ইরশাদ –আবেদনকারীর আবেদন আমি কবূল করি, যখনই সে নিবেদন করে–জবাবে দু'ভাবে বলা যেতে পারে, এক হতে পারে, দু'আ বা ডাক অর্থ ফরয, ওয়াজিব ও মুস্তাহাবে আমল করা। তখন আয়াতে অর্থ দাঁড়াবে–'যখন আপনাকে আমার বান্দারা আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, আমি তো তার নিকটেই রয়েছি। যে আমার অনুগত্য ও আমার নির্দেশ মেনে চলে, তার বন্দেগীর জন্য আমি সওয়াব দিয়ে তার ডাকে সাড়া দেই। তখন দু'আর অর্থ হবে প্রতিপালকের কাছে বান্দাহ্ সেই দু'আ যার প্রতিশ্রুতি তিনি তাঁর বন্ধুদের বন্দেগীর জন্য দিয়েছেন, তখন তাঁর ডাকে মহান আল্লাহ্র সাড়া দেয়ার অর্থ আল্লাহ্পাকের ওয়াদা পূর্ণ করা যা তিনি তার নির্দেশিত কাজের জন্য ওয়াদা করেছেন। যেমন, হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বর্ণিত আছে–'দু'আই ইবাদত।' اِنَّ الدُّ عَاءَ هُوَ الْعِبَادَةَ

হযরত নু'মান ইবনে বশীর (রা.) থেকে বর্ণিত হযরত রাসূলুল্লাহ্ (স.) ইরশাদ করেছেন, দু'আই ইবাদত। তারপর তিনি তিলাওয়াত করলেন– وَ قَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادِىْ سَيَدْ خُلُوْنَ جهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ. (তোমাদের প্রতিপালক ইরশাদ করলেন,–আমার কাছে দু'আ কর, আমি কবূল করব। যারা আমার ইবাদত থেকে অহংকার করে ফিরে থাকে তাদেরকে লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে ঢুকানো হবে) তখন হযরত নবী করীম (সা.) ইরশাদ করলেন, মহান আল্লাহ্কে ডাকা– তার কাছে চাওয়া এসবই ইবাদত। তার আমল ও আনুগত্যের জন্য প্রার্থনা করাও ইবাদত। হাসান (র.) ও উল্লেখিত ব্যাখ্যাটি বলে থাকতেন ঃ

হযরত হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াত সম্পর্কে বলতেন–মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন, –'আমার কাছে দু'আ কর, আমি কবূল করব' কাজেই, আমল করতে থাক, আর সুসংবাদ গ্রহণ কর। কারণ, মহান আল্লাহ্র উপর বান্দার হক যে, তিনি তাদের ডাকে সাড়া দিবেন –যারা ঈমান এনেছে, নেক আমল করেছে। আল্লাহ্ তার অনুগ্রহে তাদেরকেই বাড়িয়েও দেন।

দ্বিতীয়ত ঃ আয়াতের অর্থ এও হতে পারে, যে দু'আ করে আমি তার দু'আ কবূল করি–যদি আমি চাই।' তখন এ আয়াত তিলাওয়াতের দিক থেকে ব্যাপক হলেও অর্থের দিক থেকে সুনির্দিষ্ট হবে।

মহান আল্লাহ্র বাণী–

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلٰى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَ اَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَ عَفَا عَنْكُمْ فَالْئٰنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَ ابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَ كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوْهُنَّ وَ اَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ فِى الْمَسٰجِدِ - تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلاَ تَقْرَبُوْهَا - كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ -

অর্থ ঃ "রোযার রাতে তোমাদের জন্য দাম্পত্যসুলভ আচরণ বৈধ করা হয়েছে। তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ। আল্লাহ্ জানেন যে, তোমরা নিজেদের প্রতি অবিচার করছিলে। তারপর তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হিসাবে তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করেন। কাজেই এখন তোমরা তাদের সাথে দাম্পত্যসুলভ আচরণ করো এবং আল্লাহ্ যা তোমাদের জন্য লিখে রেখেছেন তা চাও। আর তোমরা পানাহার করো, যতক্ষণ রাতের কালো রেখা হতে ঊষার সাদা রেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রকাশিত না হয়। তারপর রাতের আগমন পর্যন্ত রোযা পূর্ণ করো। তোমরা মসজিদে ই'তিকাফরত অবস্থায় তাদের সাথে দাম্পত্যসুলভ আচরণ করো না। এ হলো আল্লাহ্র আইনের সীমারেখা, কাজেই এগুলোর নিকটবর্তী হয়ো না। এভাবে আল্লাহ্ তাঁর নিদর্শনাবলী মানবজাতির জন্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাতে তারা সাবধান হয়ে চলতে পারে। (সূরা বাকারা ঃ ১৮৭)

আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গ ঃ

أُحِلَّ لَكُم অর্থঃ তোমাদের জন্য অবাধ করে দেয়া হলো, তোমাদের জন্য জায়েয করা হলো। لَيْلَةَ

الصِّيَامُ অর্থ–সিয়ামের রাত। رفث আর শব্দটি দ্বারা এখানে স্ত্রী–সম্ভোগ এর ইঙ্গিত করা হয়েছে ও বলা যায়। হযরত আবদুল্লাহ্ (র.)–এর কিরআত হলো ঃ أحَلّ لكم ليلة الصيام الرفوث إلى نسائكم

رفث এর ব্যাখ্যায় আমরা যা উল্লেখ করলাম তা অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণও বলেছেন। যারা এমত পোষণ করেনঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, رفث অর্থ, جماع (স্বামী–স্ত্রীর মিলন) কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা মহাসম্মানিত তাই ইঙ্গিতে বলেছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, رفث অর্থ রতিক্রিয়া। হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত رفث অর্থ স্ত্রীদের লুপে নেয়া। হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন, এ আয়াতে 'মিলন' এর কথা বলা হয়েছে।

মুসান্না (র.) সালিম ইবনে আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন– এর অর্থ মিলন। رفث শব্দটির অর্থ এস্থান ছাড়া অন্যস্থানে –অশালীন কথাকে বলে। যেমন উজাজ বলেন– عَنِ اللّغَل و رَ فَثَ التَّكَلّمِ অশালীন কথাবার্তা থেকে।' هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَ أَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ (তারা তোমাদের পরিচ্ছদ আর তোমরা তাদের (স্ত্রীদের পরিচ্ছদ), আয়াতের ব্যাখ্যা ঃ

কেউ যদি বলেন–আমাদের স্ত্রীগণ কিভাবে আমাদের পোশাক আর আমরাই বা কিভাবে তাদের পোশাক হতে পারি' অথচ পোশাক তো যা পরা হয়। এর উত্তর দু'ভাবে দেয়া যেতে পারে, প্রথমতঃ হতে পারে তাদের উভয়ই একে অন্যের জন্য ঘুমাবার সময় পোশাকস্বরূপ হলো, তারা একই কাপড়ের মধ্যে মিলিত হলো তখন একজনের শরীরের সাথে অপরের শরীর লেপ্টে থাকল, এটা যেন কাপড়ের পোশাকের মতই। এ প্রেক্ষিতে একজনকে অন্য জনের পোশাক বলে অভিহিত করা হয়েছে।

যেমন কবি নাবেগা বলেন ঃ

إذا ما الضجيع من عطفها + تداعت فكانت عليه لباسا

এ পদ্যাংশে কবি "পোশাক দ্বারা উভয়ের একই বিছানায় খালি গায়ে শোয়াকে বুঝিয়েছেন। যেমনি কাপড় (ثياب) দ্বারা মানুষের শরীরকে বুঝানো হয়–কবি লায়লা একটি উটের, যার উপর লোকেরা আরোহণ করেছিল, তার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন–

رموها بأثواب خفاف فلا ترى + لها شبها الا النعام المنرا

"যে উষ্ট্রীর উপর কিছু হালকা কাপড় রাখা হলো, তখন পলায়নপর জন্তুছাড়া তার কোন সাদৃশ্য

খুঁজে পাবে না।" এখানে হালকা কাপড় দ্বারা নিজেদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা তার পিঠে সওয়ার হয়েছিল। কবি হুজালী বলেন–

تبرأ من رم القتيل و و تره + و قد علقت دم القتيل ازارها

"নিহতের খুন আর তীর থেকে নিজের সংযমের ছাফাই গাইছে অথচ খোদ তার লুঙ্গীতে নিহতের খুন লেগে আছে"। হযরত রবী (র.) ও তাই বলতেন।

হযরত রবী (র.) থেকে বর্ণিত, هن لباس لكم و انتم لباس لهن এর অর্থ 'স্ত্রীরা তোমাদের লেপ, আর তোমরা তাদের লেপ।'

দ্বিতীয়তঃ হতে পারে, একে অপরের পোশাক এভাবে যে, তারা একসাথে বাস করে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا 'তিনি রাতকে তোমাদের জন্য পরিচ্ছদস্বরূপ বানিয়েছেন' –অর্থাৎ তোমাদের বাস করার জন্য একটি সময় বানিয়েছেন (বা তোমাদের স্থিরতা ও প্রশান্তি লাভের একটি সময় নির্ধারণ করেছেন, তেমনি স্বামী–স্ত্রী একে অপরের জন্য স্থিরতা ও প্রশান্তির কারণ) তেমনি স্ত্রী পুরুষের জন্য একটি আবাস, যেখানে সে বাস করে। যেমনটি আল্লাহ্ তা'আলাও ইরশাদ করেছেন, وَ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا (আর তার থেকে বানিয়েছেন তার স্বামীকে যাতে সে (পুঃ) তারগাম করে প্রশান্তি পেতে পারে। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই তারা পরস্পরের পোশাক, এ অর্থে যে, একে অন্যের সাথে বাস করে। হযরত মুজাহিদ (র.) ও অন্যান্যগণ এ মতই পোষণ করতেন।

যা কোন কিছুকে তার দিকে দৃষ্টিপাতকারীর নজর থেকে ঢেকে বা আড়াল করে রাখে, তাকেও তার "লেবাস" বা পর্দা বলা হয়ে থাকে। সে দৃষ্টিকোণ থেকে একে অপরের 'লেবাস' হতে পারে। প্রত্যেকে তার সাথীর পর্দাস্বরূপ, কারণ মিলনের সময় এক অপরকে লোকের নজর থেকে আড়াল করে রাখে। হযরত মুজাহিদ (র.) প্রমুখ আলিমগণ এক্ষেত্রে বলতেন যে, একে অপরের পোশাক মানে বাসস্থান।

হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, এর অর্থ তারা তোমাদের জন্য বাসস্থান, আর তোমরা তাদের জন্য বাসস্থান।' হযরত সূদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, এর অর্থ–'তারা তোমাদের বাসস্থান আর তোমরা তাদের বাসস্থান।

হযরত আবদুর রহমান ইবনে যায়দ (র.) থেকে বর্ণিত, যে, উভয়ে একে অন্যের অঙ্গাবরণ হওয়া অর্থ পরস্পরের দাম্পত্যসুলভ আচরণ করা।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তারা তোমাদের অঙ্গাবরণ, তোমরা তাদের অঙ্গাবরণ' অর্থাৎ তারা তোমাদের বাসস্থান (বা, প্রশান্তি) তোমরা তাদের বাসস্থান (বা প্রশান্তি) عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَ عَفَا عَنْكُمْ فَالْئٰنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَ ابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ –

"আল্লাহ্ তা'আলা জানেন, তোমরা নিজেদের প্রতি খিয়ানত করতে ছিলে, তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের তাওবা কবূল করেছেন এবং তোমাদের গুনাহ্ মাফ করে দিয়েছেন। কাজেই এখন তোমরা তাদের সাথে মেলামেশা করতে পার। আর আল্লাহ্ যা তোমাদের জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন তা অন্বেষণ কর।"

এ আয়াতের ব্যাখ্যা ঃ যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে আয়াতে উল্লেখিত খিয়ানতটি কি ছিল, এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, তাদের নিজেদের প্রতি খিয়ানত তথা আত্ম-প্রবঞ্চনা ছিল দ'ুটি বিষয়ে একটি হলো, স্ত্রী সহবাস অপরটি নিষিদ্ধ সময়ে পানাহার। যেমন, এ প্রসঙ্গে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত ইবনে আবূ লায়লা (র.) থেকে বর্ণিত, প্রথম দিকে এমন ছিল যে, কেউ ইফতার করার পর শুইলে আর স্ত্রী সহবাস, ও পানাহার করত না। এ সময় একবার হযরত উমার (রা.) তাঁর স্ত্রীকে কাছে পেতে চাইলেন। তখন তাঁর স্ত্রী বললেন-আপনি তো ঘুমিয়েছিলেন, তখন হযরত উমার (রা.) ভাবলেন যে, তিনি তাঁর সাথে রসিকতা করছেন তাই তিনি তাঁর সাথে মিলিত হলেন। বর্ণনাকারী আরো বলেন যে, একজন আনসারী এসে কিছু খেতে চেলেন, তখন কেউ কেউ বললেন-আপনার জন্য কি কিছু গরম করব ? (অর্থাৎ খাওয়ার প্রস্তুতি নিব ?) (এদিকে তার ঘুম এসে গেল) তারপর এ আয়াতটি নাযিল হলো।-اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَائِكُمْ الاية- (রোযার রাতে তোমাদের জন্য স্ত্রী সহবাসকে হালাল করা হলো।)

হযরত ইবনে আবূ লায়লা (র.) থেকে বর্ণিত, সাহাবায়ে কিরাম প্রতি মাসের তিন দিন রোযা রাখতেন। যখন রমযান এলো, রোযা রাখতে শুরু করলেন। এ সময় ঘুমের আগে ইফতারের সাথে কিছু না খেলে পরবর্তী ইফতার পর্যন্ত আর কিছু খেতেন না ; আর যদি সে বা তার স্ত্রী ঘুমিয়ে পড়তো তাহলে তারা আর মিলন করতেন না।

এ সময় সিরমাহ্ ইবনে মালিক (রা.) নামক এক বৃদ্ধ আনসার তাঁর স্ত্রীর কাছে এসে বললেন- 'কিছু খেতে দাও' তিনি বললেন ঃ একটু অপেক্ষা করুন, আমি কিছু গরম করে নিয়ে আসি। এর মধ্যে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। এরপর অনুরূপ আরেকটি ঘটনা ঘটল, হযরত উমার (রা.) তার স্ত্রীর কাছে আসলে তিনি বললেন-আমি তো ঘুমিয়েছি। কিন্তু একথা হযরত উমার (রা.) মানলেন না, তিনি ভেবেছেন যে উনি বুঝি রসিকতা করছেন, তিনি তাঁর সাথে মিলিত হলেন। এরপর দু'জনেই রাতভর এপিঠ ওপিঠ করে বিছানায় গড়াগড়ি করলেন। তখন এ উপলক্ষ্যে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন- وَ كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ-"আর খাও, পান কর,

যতক্ষণ না ফজরের কালো রেখা থেকে সাদা রেখা তোমাদের কাছে স্পষ্ট হয়।'' আল্লাহ্ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন- فَالْاٰنَ بَاشِرُوْهُنَّ 'এখন তাদের সাথে মেলামেশা করতে পার।' এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তা থেকে মুক্তি দিলেন এবং তাই সুন্নত হয়ে গেল।

হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত , তখনকার লোকেরা নিদ্রা যাবার আগ পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সহবাস করত ; ঘুমিয়ে পড়লে এরপর (জাগলেও) পানাহার ও স্ত্রী সহবাস করত না। এসময় সিরমাহ্ নামক একজন সাহাবী তাঁর জমিতে কাজ করত। যদি তিনি ইফতারের সময় ঘুমিয়ে পড়তেন, এভাবেই কিছু না খেয়ে পরদিন অতি কষ্টে রোযা রাখতেন।, হযরত নবী করীম (সা.) তাকে দেখে বললেন, তোমাকে এত দুর্বল দেখায় কেন ? তখন তাঁকে তার বিষয়টি খুলে বললেন। লোকটি তার স্ত্রী ব্যাপারে নিজেকে প্রবঞ্চিত করেছে। তখন নাযিল হলো- اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَائِكُمْ الاية

হযরত ইবনে আবূ লায়লা (র.) থেকে বর্ণিত সাহাবায়ে কিরাম রোযা রাখতেন এর মধ্যে যদি কেউ কিছু না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়তেন, তাহলে পরদিন খুব কষ্ট করে রোযা রাখতে হতো। এ সময় একজন সাহাবী তার জমীনে কাজ শেষে শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে বাড়ী ফিরলে কিছুক্ষণের মধ্যেই তার চোখ জুড়ে ঘুম চলে এল, কাজেই কিছুই না খেয়ে পরদিন অতি কষ্টে রোযা রাখল। তখন এ আয়াত নাযিল হয়- وَ كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

হযরত বারা (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত নবী করীম (সা.)-এর সাহাবায়ে কিরামের কেউ যদি রোযা রাখা অবস্থায় ইফতারের আগে ঘুমিয়ে পড়তেন, তাহলে পরদিনও না খেয়েই রোয়া রাখতেন। হযরত কায়স ইবনে সিরমাহ্ আনসারী (রা.) রোযা রেখে তাঁর মাঠে কাজ-কর্ম করলেন। ইফতারের সময় তাঁর স্ত্রীর কাছে এসে বললেন, তোমাদের কাছে কি কিছু খাবার আছে ? তিনি বললেন-'না' তবে আমি যাই আপনার জন্য দেখি কিছু পাই কি না।' এদিকে আনসারী (রা.)-এর চোখ জুড়ে ঘুম নেমে এলো। স্ত্রী এসে বললেন, একি ঘুমিয়ে পড়লেন যে, পরদিন মধ্যাহ্নের আগেই তিনি বেহুঁশ হয়ে গেলেন। হযরত নবী করীম (সা.)-কে তাঁর অবস্থাটি জানানো হলো। তখন এ আয়াত নাযিল হয়- اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَائِكُمْ الايۃ এতে সবাই খুব খুশী হলেন। এ আয়াত সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, সে সময় রমযান মাসে মুসলমানগণ এশার নামায আদায়ের পর পরবর্তী দিন তাদের উপর নারী ও পানাহার হারাম ছিল। পরে কয়েকজন মুসলমান রমযান মাসে এশার নামাযের পর পনাহার ও নারী সংস্পর্শে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে হযরত উমার (রা.)ও ছিলেন। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে এ অভিযোগ পৌছল। এ সময় নাযিল হয়- عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَ عَفَا عَنْكُمْ فَالْئٰنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَ ابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ (অর্থাৎ পানাহারে ইত্যাদির অনুমোদন সম্বলিত আয়াত)।

হযরত কা'ব ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত তখন রমযান মাসে লোকেরা রোযা রাখলে যদি সন্ধ্যা হওয়ার পর ঘুমিয়ে পড়তো, তাহলে তার উপর পানাহার ও নারী হারাম হয়ে যেত। এরপর পরবর্তী দিনের ইফতারের পর ছাড়া এগুলো আর জায়েয ছিল না। এ সময় এক রাতে হযরত উমার (রা.)–এর কাছে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর কাছ থেকে বাড়ী ফিরলেন। রাতে খোশ–গল্প শেষে স্ত্রীর কাছে গিয়ে দেখেন যে, তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। তিনি তাকে জাগিয়ে মিলিত হতে চেলে, তিনি উত্তর দিলেন ঃ আমি তো ঘুমিয়ে পড়েছি। তিনি বললেন – না, তুমি ঘুমাওনি। এরপর তিনি দাম্পত্য–সুলভ আচরণ করলেন। হযরত কা'ব ইবনে মালিক (রা.)ও অনুরূপ কাজ করেছিলেন। পরদিন সকালে হযরত উমর (রা.) হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর কাছে গিয়ে ঘটনা ব্যক্ত করলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন –

عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَ عَفَا عَنْكُمْ فَالْئٰنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَ ابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ –

হযরত সাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত, রমযানের এক রাতে হযরত উমার (রা.) তাঁর স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়েছিলেন, পরে বিষয়টি তাঁর কাছে খুবই আনুশোচনার কারণ হয়েছিল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন– اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَائِكُمْ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَائِكُمْ وَ عَفَا عَنْكُمْ থেকে هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَ اَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ এ আয়াত নাযিলের কারণ ইসলামের প্রথম দিকে মুসলমানগণ পুরোদিন রোযা রাখার পর সন্ধ্যা ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে খাবার গ্রহণ করত। এশার নামাযের পর পরবর্তী রাত পর্যন্ত তাদের উপর খাবার হারাম হয়ে যেতো। একবার হযরত উমার (রা.) ঘুমিয়ে ছিলেন,এ সময় তাঁর নিদ্রাভঙ্গ হলে, তিনি স্ত্রীর কাছে প্রয়োজনে আসলেন। কাজ শেষে যখন গোসল করলেন, তখন নিজেকে ধিক্কার দিতে দিতে কাঁদতে লাগলেন এবং তিনি সবচেয়ে বেশী দুঃখিত হলেন। এরপর হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর কাছে এসে বললেন –ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি এ ভুলের জন্য আমার পক্ষ থেকে মহান আল্লাহ্র কাছে এবং আপনার কাছে ওজরখাহী করছি – আমার কাছে খুবই সৌন্দর্যমন্ডিত করে তুলে ধরা হয়েছিল, আর তাই আমি আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে ফেলেছি। আমার জন্য এটার কোন অনুমতি খুঁজে পান কি, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! তিনি বললেন, উমার ! তা তুমি ভাল করনি। পরে উমার (রা.) বাড়ী পৌছার পর একজন লোক পাঠিয়ে হযরত নবী করীম (সা.) তাঁর ওজরের কথাটি পাক কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলকে নির্দেশ দিলেন যেন তিনি এ আয়াতকে সূরা বাকারার মাধ্যাংশে স্থান দেন।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন– اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَائِكُمْ ....عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ –

এখানে 'তোমরা নিজেদের উপর খিয়ানত করতেছিলে তা আল্লাহ্ তা'আলা জানেন'–তার দ্বারা

হযরত উমার (রা.)–এর কৃতকর্মের কথাই বুঝাতে চেয়েছেন। কাজেই, তিনি তাঁকে ক্ষমা ঘোষণা করে আয়াত নাযিল করেন – فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَ عَفَا عَنْكُمْ فَالْئٰنَ بَاشِرُوْهُنَّ এ আয়াত দ্বারা প্রভাত সুস্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী সহবাস ও পানাহারকে জায়েয করা হয়েছে।

হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন, أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَائِكُمْ এর শানে নুযূল হলো হযরত মুহাম্মদ (সা.)–এর সাহাবিগণ সারাদিন রোযা রাখার পর সন্ধ্যা হলে পানাহার ও স্ত্রী সহবাস করতেন। রাতে শুয়ে পড়লে আগামী সন্ধ্যার আগ পর্যন্ত এসব তাদের উপর হারাম হয়ে যেত। এদের মধ্যে কিছু লোক এ ব্যাপারে নিজের সাথে খিয়ানত করে বসত। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মাফ করে দেন এবং তাদের জন্য পুরো রাত চাই ঘুমের আগে হোক বা পরে, এসব কাজ জায়েয করে দেন।

হযরত ইকরামা (র.) থেকে বর্ণিত, একজন আনসার সাহাবী রোযা রাখা অবস্থায় বিকাল বেলায় বাড়ী ফিরলে তাঁর স্ত্রী বললেন– আপনার জন্য কিছুখানা পাকিয়ে আনার আগে ঘুমিয়ে পড়বেন না যেন। স্ত্রী ফিরে এসে বললেন ঃ আল্লাহ্র কসম ! আপনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। তিনি বললেন না, আল্লাহ্র কসম ! আমি ঘুমাইনি। স্ত্রী বললেনঃ অবশ্যই আল্লাহ্র কসম আপনি ঘুমিয়ে ছিলেন। এরপর তিনি সে রাতে আর কিছু না খেয়ে পরদিন রোয়া রাখলেন। এরপর তিনি বেহুশ হয়ে পড়লেন। তখন এ ব্যাপারে অনুমতির আয়াত নাযিল হয়।

হযরত কাতাদা (র.)–عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ এ আয়াত নাযিল হওয়ার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বলেন– রোযার বিধানের প্রারম্ভ কালীন এই নির্দেশ ছিল যে, প্রতি মাসে যেন তিনটি রোযা রাখেন, আর সকাল–সন্ধ্যায় দু'রাকআত নামায আদায় করে। তিন দিন রোযা পালন এবং রোযা ফরয হওয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে আল্লাহ্ তা'আলা ইফতারের সময় পানাহার ও স্ত্রী সম্ভোগ হালাল করেছিলেন, যতক্ষণ না সে ঘুমিয়ে পড়ে, ঘুমিয়ে পড়ার পর তাদের উপর পরবর্তী বিকাল পর্যন্ত এসব হারাম ছিল। এ সময় লোকেরা খিয়ানত করে বসত ; তারা শুয়ে পড়ার পরও পানাহার ও স্ত্রী সহবাস করে বসত। এটাকেই 'নিজের উপর খিয়ানত ' বলা হয়েছে। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা পানাহার ও স্ত্রী সহবাসকে ভোর পর্যন্ত হালাল করে দিয়েছেন।

হযরত কাতাদা (র.) أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَائِكُمْ এ আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে বলেন–এ আয়াত নাযিল হওয়ার আগে যদি লোকেরা রাতে একটু শয়ন করতো তাহলে তাদের জন্য পরবর্তী ইফতারের সময় পর্যন্ত পানাহার হারাম হয়ে যেত। এ সময় দাম্পত্যসুলভ আচরণ করতে পারত না। তখন কিছু মুসলমান এ কাজগুলো করে বসতেন। তাদের কেউ তো একটু ঘুমিয়ে নিয়ে আবার খেত বা পান করত আবার কেউ তো মহিলাদের উপর উপগত হয়ে বসতো। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ঐ সময় এসব কাজের অনুমতি দিয়ে দিলেন।

হযরত সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, নাসারাদের উপর রোযা ফরয ছিল এবং তাও ফরয ছিল যে,

তারা মাহে রমাদানে ঘুম যাবার পর আর পানাহার ও দাম্পত্যসুলভ আচরণ করতে পারবে না। কাজেই মু'মিনদের উপরও তাদের মতই ফরয হয়। মুসলমানগণ সেভাবেই আমল করতে ছিলেন, যেমনটি খ্রীস্টানরা করে থাকে। এ সময় আবূ কায়স ইবনে সিরমাহ্ নামক একজন আনসার সাহাবী সেখানে তাশরীফ আনলেন, তিনি মদীনার বাগানে কাজ করতেন– কিছু খেজুর নিয়ে নিজের বাড়ী এসে স্ত্রীকে বললেন, এই খেজুরগুলোর বিনিময়ে আমাকে কিছু আটা পিষা দিয়ে রুটি সেঁকে দাও তো, যাতে আমি খেতে পারি। খেজুর আমার জন্য অসহনীয় হয়ে পড়ছে। তখন তিনি তাই করলেন, তবে ফিরতে একটু দেরী করেই। দেখলেন, তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। জাগানো হলো কিন্তু তিনি মহান আল্লাহ্ ও তাঁর পিয়ারা রাসূলের নাফরমানী করা অপসন্দ করলেন। তিনি খেতে অস্বীকার করলেন। এভাবেই রোযা রাখলেন। রাতে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে দেখলেন। তখন তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবূ কায়স ! তোমার কি হয়েছে ? রাতের বেলায় তুমি ক্ষুধায়–মলিন কেন ? তিনি ঘটনাটি খুলে বললেন। এ দিকে হযরত উমার (রা.) তাঁর বাঁদীর সাথে মিলিত হয়েছিলেন। তিনি ও সে সকল মুসলমানের মতই ছিলেন, যারা নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেননি। যখন হযরত উমার (রা.) আবূ কায়সের কথা শুনলেন, আশংকা করলেন যে, আবূ কায়সের ব্যাপারে কোন আয়াত নাযিল হয়ে যেতে পারে, এসময় তাঁর নিজের ঘটনাটিও মনে পড়ে গেল। তখন তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর কাছে ওজরখাহী করতে লাগলেন–ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি মহান আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই, আমি যে আমার বাঁদীর সাথে মিলিত হয়েছিলাম, গতরাতে নিজেকে সম্বরণ করতে পারিনি। যখন হযরত উমার (রা.) এ কথা বললেন, তখন অন্য লোকেরাও এরূপ বলে উঠলেন। তখন নবী করীম (সা.) ইরশাদ করলেন, ইবনে খাত্তাব ! এ কাজ তোমার দ্বারা সমীচীন হয়নি। তারপর তাদের উপর থেকেও সে বিধান রহিত হয়ে গেল। তারপর তিনি তিলাওয়াত করলেন–

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَائِكُمْ ..... مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ অর্থাৎ তোমরা এখন যার যার স্ত্রীগণের সাথে মিলতে পার।

তারপর হযরত আবূ কায়স (রা.)–এর দিকে ফিরে ইরশাদ করলেন–وَ كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ–

হযরত আতা (র.) থেকে বর্ণিত, أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَائِكُمْ এর প্রেক্ষাপট হলো– সাহাবাগণ রমযান মাসে নারীদের স্পর্শ করতেন না এবং রাতে একবার ঘুমাবার পর আর পরবর্তী সন্ধ্যা পর্যন্ত পানাহার করতেন না। তবে হাঁ, ঘুমাবার আগে নারীদের স্পর্শ করাকে তারা খারাপ মনে করতেন না। এ সময় একজন আনসার সাহাবী ঘুমাবার পর স্ত্রীর সাথে মিলিত হলেন। পরক্ষণেই তিনি ব্যাপার বুঝতে পেরে অনুশোচনা করে বললেন–আমিতো নিজেকে অপরাধী করে ফেললাম!

তখন আয়াত নাযিল হলো, এবং তাদের জন্য ভোরের সাদা রেখা থেকে কালো রেখা প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়া হালাল হয়ে গেল।

হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন, সাহাবাগণ রমযানের রোযা রাখতেন। সূর্যাস্তের পর তারা পানাহার করতেন ও স্ত্রীগণের সাথে দাম্পত্যসুলভ আচরণ করতেন। যদি ঘুমিয়ে পড়তেন তাহলে পরবর্তী ইফতারের সময় পর্যন্ত এগুলো হারাম হয়ে যেতো। এ ব্যাপারে কেউ কেউ খিয়ানত করে বসতেন। তখন আল্লাহ্ পাক তাদেরকে ক্ষমা করে দেন এবং ঘুমানোর আগে পরে এ সব হালাল করে দেন। আয়াত নাযিল হয়- أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَائِكُمْ

হযরত ইকরামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি উপরোক্ত আয়াতে শানে নুযূল মুজাহিদ (র.)-এর বর্ণনার মতেই বলছেন। তবে এ বর্ণনায় এতটুকু বাড়তি ছিল যে, হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রা.) তাঁর স্ত্রীকে বলেছিলেন, আমি হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছ থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়ো না যেন। কিন্তু তিনি তাঁর ফিরে আসার আগেই ঘুমিয়ে পড়েন। ফিরে এসে তিনি বলেন, "তুমি তো আসলে নিদ্রিত নও।" এরপর তিনি তার সাথে মিলন করলেন। পরে তিনি হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর কাছে এসে এ ঘটনা বর্ণনা করেন। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। হযরত ইকরামা (রা.) বলেন, وَ كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا الاية এ আয়াত বনী খাজরাজ গোত্রীয় আবূ কায়স ইবনে সিরমাহ্ সম্পর্কে নাযিল হয়-তিনি ঘুমানোর পর জেগে উঠে খাওয়া দাওয়া করেন।

হযরত ইয়াহ্ইয়া ইবনে হিব্বান (র.) থেকে বর্ণিত, হযরত সিরমাহ্ ইবনে আনাস (রা.) বৃদ্ধ লোক ছিলেন, তবুও রোযা রাখলেন। এমতাবস্থায় একরাতে তিনি তাঁর পরিবারে ফিরে এসে দেখেন যে, এখনো তার খাবার প্রস্তুত হয়নি। তিনি মাথা হেলান দিলে কিছুক্ষণের মধ্যেই তার ঘুম এসে গেল। ইতিমধ্যেই তাঁর স্ত্রী তাঁর জন্য খাবার নিয়ে এসে বললেন-'খান'। তিনি উত্তর দিলেন-আমি তো ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তিনি বললেন-না, আপনি ঘুমাননি।' তবুও তিনি অতিকষ্টে ক্ষুধার্ত অবস্থায়ই রয়ে গেলেন-পরবর্তী রোযা রাখলেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন-وَ كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ - (-'খাও, পানকর যতক্ষণ পর্যন্ত ফজরের কালো রশ্মি থেকে সাদা রশ্মি সুস্পষ্ট হয়ে না উঠে'))।

আয়াতে বলা হয়েছে-فَالْئٰنَ بَاشِرُوْهُنَّ আরবী ভাষায় মুবাশারাহ্ (مباشرة) শব্দের অর্থ খালি চামড়ার সাথে চামড়ার মিলন। কোন লোকের بشرة হলো তার বাহ্যিক চামড়া। তবে আল্লাহ্ তা'আলা مباشرة বলতে সহবাসের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। অর্থাৎ তিনি ইরশাদ করেছেন যে, এখন তোমাদের জন্য স্ত্রী সহবাস হালাল করে দেয়া হলো, তোমরা রমযানের রাতেও স্ত্রীদের সাথে মিলিত হও-ভোর হওয়ার আগ পর্যন্ত ; তাই বলা হয়েছে ফজরের কালো রশ্মি সাদা রশ্মি থেকে স্পষ্ট হওয়া।

মুবাশারাহ্ (مباشرة) এর অর্থ আমরা যা বললাম, কিছু সংখ্যক ব্যাখ্যাকারও এর সাথে ঐক্যমত পোষণ করেন।

যাদের এ অভিমতঃ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, 'মুবাশারাহ্' অর্থ হলো মিলন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত ভদ্র, তাই এ সব বিষয়কে ইঙ্গিতে বলে থাকেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে ভিন্ন সূত্রে বর্ণিত, فَالْئٰنَ بَاشِرُوْهُنَّ এর অর্থ এখন দাম্পত্যসুলভ আচরণ কর।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে অন্যসূত্রে বর্ণিত, 'মুবাশারাহ্' অর্থ সঙ্গম।

হযরত ইবনে জুরায়িজ (র.) থেকে বর্ণিত, আমি আতা(র.)-কে فَالْئٰنَ بَاشِرُوْهُنَّ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন- এর অর্থ মিলন ; কুরআনে প্রত্যেক 'মুবাশারাহ্' শব্দই মিলন অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে কাছীর (র.) হযরত আতা (র.)-এর পানাহার ও নারী সম্পর্কিত অভিমতের অনুরূপ অভিমত রাখেন।

হযরত শু'বা ও হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, "মুবাশারাহ্" মানে মিলন। তবে আল্লাহ্ তা'আলা ইঙ্গিতে ইশারায় যা পসন্দ করেছেন, তাই ইরশাদ করেছেন।

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্র কিতাবে "মুবাশারাহ্" অর্থ 'মিলন'।

হযরত সূদ্দী (র.), হযরত মুজাহিদ (র.) ও হযরত আতা (র.) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

মুফাসসীরগণ- وَ ابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে একাধিক মত পোষণ করেন। কেউ কেউ বলেন- "আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন তা অন্বেষণ কর" এর অর্থ "সন্তান চাও।"

যাঁদের এ অভিমতঃ

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত,- وَ ابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ অর্থ "সন্তান চাও"।

হযরত সূদ্দী(র.) বলেন, আমি হযরত হাকাম (র.)-কে বলতে শুনেছি যে-- وَ ابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ মানে 'সন্তান' চাও।

হযরত ইকরামা (রা.) হযরত হাসান (রা.) থেকে ভিন্ন ভিন্ন সনদে অনুরূপ ব্যাখ্যা করেন।

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত,- وَ ابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ এর অর্থ সন্তান চাও ; যদি এ (স্ত্রী) গর্ভধারণ না করে তাহলে এ আয়াতই অর্থাৎ একাধিক বিবাহের মাধ্যমে হলেও 'সন্তান চাও'।

হযরত মুজাহিদ (র.) ও হযরত মামার (র.) এবং হযরত রবী (র.) থেকে ভিন্ন ভিন্ন সনদে অনুরূপ বর্ণনা আছে।

হযরত ইবনে যায়দ (র.) বলেন,–وَ ابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ অর্থ হচ্ছে–'সহবাস কর।'

হযরত দাহ্হাক ইবনে মুজাহিম (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ আয়াতের অর্থ 'সন্তান' চাও।

কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন–'লায়লাতুকদর।

যাদের এ অভিমতঃ

হযরত ইবনে আববাস (রা.) বলেন, –وَ ابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ অর্থাৎ– লায়লাতুল কদরকে অন্বেষণ কর। আবূ হিশাম বলেন– হযরত মু'আয (রা.) এ ভাবেই কুরআন পড়তেন। (অর্থাৎ-وَ ابْتَغُوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ)

হযরত ইবনে আববাস (রা.) থেকে বর্ণিত, এ আয়াতের অর্থ লায়লাতুল কদর (শবেকদর)।

আবার অন্যান্য তাফসীরকার বলেন, বরং এ আয়াতের অর্থ –অন্বেষণ কর –যা আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য হালাল করেছেন এবং করার অনুমতি দিয়েছেন।

যাদের এ অভিমত ঃ

হযরত কাতাদা (র.)বলেন অন্বেষণ কর –যা আল্লাহ্ তোমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন। অর্থাৎ যা আল্লাহ্ তোমাদের জন্য হালাল করে দিয়েছেন।

হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত আল্লাহ্ যে অনুমতি তোমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন তা অন্বেষণ কর। কোন কোন কিরাআত বিশেষজ্ঞের পাঠ পদ্ধতি হলো–وَ ابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ

যাদের এ কিরাআত ঃ

হযরত আতা ইবনে আবূ রিবাহ্ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)–কে জিজ্ঞেস করেন– আপনি এ আয়াতকে কিভাবে পড়েন–কি وَابْتَغُوْا না কি وَ اتَّبِعُوْا তিনি বললেন এর যেটাই মনে চায়। তিনি বললেন– আপনার প্রথমটাই নিয়মেই পড়া উচিত।

আমার কাছে এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত অভিমতগুলোর মধ্যে শুদ্ধ হলো,– আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, ابتغوا اطلبوا অর্থাৎ 'চাও আল্লাহ্ তোমাদের জন্য নির্ধারিত করেছেন। অর্থাৎ তোমাদের জন্য তাকদীরে রেখেছেন। আল্লাহ্ তো বলতে চেয়েছেন– তোমরা অন্বেষণ কর, যা তোমাদের জন্য লওহে মাহ্ফুজে (সংরক্ষিত বোর্ডে) লেখা আছে যে তা মুবাহ্ (বৈধ)। কাজেই, তা গ্রহণে তোমরা স্বাধীন। এমনি করে সন্তান চাওয়াও হতে পারে। আর সে চাওয়া হলো– দাম্পত্যসুলভ আচরণের মাধ্যমে কোন পুরুষের সন্তান কামনা করা–যা আল্লাহ্ তা'আলা লওহে মাহ্ফুজে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। এ ভাবে و ابتغوا অর্থ 'লায়লাতুল কদর ' অণ্বেষণ করাও হতে পারে –যা আল্লাহ্ তা'আলা

তার জন্য লিখে রেখেছেন। এমনি করে মহান আল্লাহ্ কর্তৃক হালাল এ জায়েয ঘোষিত বিষয়ও অণ্বেষণ করা হতে পারে। কারণ, তাও লওহে মাহ্ফুজে লিখিত আছে। এতদ্ব্যতীত – وَ ابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ এ আয়াতে সব রকমের কল্যাণ কমনাই শামিল হতে পারে। তবে এর মধ্যে আয়াতের বাহ্যিক অর্থের সাথে এ অর্থ সবচেয়ে বেশী সামঞ্জস্যপূর্ণ–যারা বলেছেন যে এর অর্থ মহান আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যে সন্তান নির্ধারণ করেছেন, তা অণ্বেষণ কর কারণ, এ আয়াতংশ فَالْاٰنَ بَاشِرُوْهُنَّ (এখন তাদের সাথে মিলতে পর) এর অব্যাহতি পরেই এসেছে।কাজেই অর্থ দাঁড়ায়– তাদের সাথে মিলনের ফলে মহান আল্লাহ্ তোমাদের সন্তান ও বংশবৃদ্ধির যে ভাগ্য লিপিবদ্ধ করেছেন, তা তোমরা তালাশ করে নেও। কজেই এ ব্যাখ্যা আয়াতের প্রসংগের দিক দিয়ে সবচেয়ে বেশী সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা , অন্যান্য ব্যাখ্যা সঠিক হওয়ার পক্ষে না তো বাহ্যিক আয়াতের কোন সমর্থন আছে, আর না তো হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে সমর্থক হাদীস আছে।

মহান আল্লাহর বাণী–

وَ كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ – ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ

ব্যাখ্যা ঃ ব্যাখ্যাকারগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় একাধিক মত পোষণ করেন-. যা কেউ কেউ বলে–সাদা রেখা (الخيط الابيض) অর্থ দিনের আলোকচ্ছটা আর কালো রেখা (الخيط الاسود) অর্থ রাতের আঁধারে।

এ অভিমত পোষণকারিগণের ভাষ্য মতে এর অর্থ–তোমরা রোযার মাসে রাতে পানাহার করতে পার এবং তোমাদের নারীদের সাথে দাম্পত্যসূলভ আচরণ করতে পারো। তখন তোমরা আল্লাহ্ রাতের প্রথমাংশে যা নির্দিষ্ট করেছেন সে সন্তান কামনা করবে যতক্ষণ না রাতের আধাঁরে থেকে ভোরের আগমনে তোমাদের উপর আলো পতিত হয়।

যাঁদের এ অভিমত ঃ

হযরত হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, মহান আল্লাহ্র বাণী–حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ (ভোরের কালো রেখা থেকে সাদা রেখা স্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত) এর অর্থ– দিন থেকে রাত পর্যন্ত।

হযরত সূদ্দী (র.) বলেন,–এর অর্থ–রাত থেকে দিন স্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত; এরপর রাত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর।

হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, আয়াতে এ দু'টি চিহ্নও শরীয়তের সুস্পষ্ট সীমা। কাজেই, রিয়াকারী বা কম আকল মুয়ায্যিনের আযান তোমাদেরকে যেন সাহ্রী খাওয়াতে বিরত না করে।

তারা তো রাতে কিছু একটু ঘুমিয়েই আযান দিয়ে বসে। সাহ্রীর সময় ঈষৎ শুভ্র একটি আভা প্রতিয়মান হয়, তা হলো সুবহে কাযিব–'অপ্রকৃত ভোর'। আরবরা তাকে এ নামেই অভিহত করত। তা যেন তোমাদেরকে সাহ্রী গ্রহণে বিরত না রাখে। কারণ, ভোর তো হলো দিকচক্রবালে আড়া আড়িভাবে একটি সুস্পষ্ট আলোর রেখা। ভোর সুস্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত পানাহার করো। যখন তা স্পষ্ট দেখবে, তখন বিরত থাকবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, (খাও, পানকর, যতক্ষণ পর্যন্ত ভোরের কালো রেখা থেকে সাদা রেখা সুস্পষ্ট না হয়,) এ আয়াতের অর্থ– দিন থেকে রাত স্পষ্ট হওয়া। কাজেই, তিনি তোমাদের জন্য দাম্পত্যসুলভ আচরণ ও পানাহার হালাল করে দিয়েছেন–যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কাছে ভোর সুস্পষ্ট না হয়। যখন ভোর প্রকাশ পাবে, তাদের ওপর দাম্পত্যসুলভ আচরণ ও পানাহার হারাম হয়ে যাবে এবং এভাবে রাত পর্যন্ত রোযা পালন করে যাবে। কাজেই রাত পর্যন্ত দিনের রোযা আর রাতে ইফতারের নিদের্শ দেয়া হলো।

হযরত আবূ বাকর ইবনে আইয়্যাশ (র.) থেকে বর্ণিত তাকে কেউ প্রশ্ন করেছিল যে, আপনি কি এ আয়াত লক্ষ্য করেছেন ? তিনি জবাবে বললেন– তুমি হলে মোটা বুদ্ধির লোক ! তা তো হলো রাতের প্রস্থান আর দিনের আগমন।

হযরত আদী ইবনে হাতিম (রা.) থেকে বর্ণিত, আমি হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর কাছে এলে, তিনি আমাকে ইসলাম শিক্ষা দেন এবং নামাযের নিয়মাবলী বলেন–কিভাবে প্রতিটি নামায যথা সময়ে আদায় করব। তারপর বললেন, 'যখন রমযান আসবে তখন ভোরের সাদা রেখা থেকে কালো রেখা স্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত পানাহার কর। তারপর রাত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর'। কিন্তু আমি তা বুঝে উঠতে পারিনি। তাই সাদা কালো দু'টি দড়ি পাকালাম এবং ফজরে উভয়টির প্রতি ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম দুটোকে একই রকম দেখা যায়। তখন আমি হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর কাছে এসে আরয করলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনি যা যা বলেছেন সবই বুঝেছি। কিন্তু সাদা রেখাও কালো রেখা এটা বুঝতে পারিনি। তিনি মুচকি হেসে ইরশাদ করলেন, হে হাতিমের ছেলে ! বুঝলে না কেন ? যেন আমি যা করেছি তিনি তা জেনে ফেলেছেন। আমি বললাম, সাদা ও কালো দু'টি রেখা পাকিয়ে রাতে উভয়টিকে ফরখ করে দেখলাম, কিন্তু আমার কাছে দুটো একরকমই লাগল। এ শুনে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এমনভাবে হেসে উঠলেন যে, তার ভিতরের দাঁতগুলোও দেখা গেল। তারপর বললেন –আমি কি তোমাকে বলেনি **من الفجر** (ফজরের) ? সেটা হলো দিনের আলো আর রাতের আঁধারে।

হযরত আদী ইবনে হাতিম (রা.) থেকে বর্ণিত আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর নিকট আরয করলাম যে, সাদা রেখা ও কালো রেখা কি? এগুলো কি সাদা সূতা আর কালো সূতা ? তিনি বললেন, তুমি একজন মোটা বুদ্ধির লোক (**انك لعريض القفا**) ! তুমি বুঝি দু'টি সূতা দেখছিলেন! আর তিনি বললেন, না, তা হলো রাতের আধাঁরে আর দিনের আলো।

হযরত সাহ্ল ইবনে সা'দ (রা.) বলেন, আয়াতটি প্রথমে وَ كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ পর্যন্ত নাযিল হয়। তখনো مِنَ الْفَجْرِ এ কথাটি নাযিল হয়নি তখন লোকেরা সওম পালন করতে চাইলে তার পায়ে সাদা সূতা ও কালো সূতা বেঁধে নিত। তারপর তাদের কাছে তা স্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত খানা-পিনা করত। তখন আল্লাহ্ তা'আলা "من الفجر" কথাটি নাযিল করেন। তখন তারা বুঝতে পারল যে, আল্লাহ্ তা'আলা এখানে রাত আর দিনকে বুঝিয়েছেন।

যে সব তাফসীরকারগণ এ আয়াতের অর্থ দিনের আলো আর রাতের 'আঁধার' বলেছেন তাদের সে দিনের আলোর ধরন হলো যে তা আকাশে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে থাকবে। তার আলো ও শুভ্রতা পথঘাট ভরে দেবে। হাঁ, 'সাদা রশি ও কালো রশি' দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা আকাশের উঁচু আলোকে বুঝিয়েছেন।

যাদের এ অভিমত ঃ

হযরত আবূ মুজলিয (রা.) থেকে বর্ণিত আকাশের উজ্জ্বল আলোকে ভোর (الصبح) হয় না। সেটা তো অপ্রকৃত ভোর। সুবহে হলো সেই আলো যা দিকক্রাবলকে উজ্জ্বল করে দেয়। হযরত মুসলিম (র.) বর্ণনা করেন- তখনকার লোকেরা তোমাদের এ ফজরকে ফজর বলে গণ্য করতেন না। তারা সে ফজরকে গণ্য করতেন যা ঘর-দোর, রাস্তাঘাটকে আলোকিত করে দিত।

হযরত মুসলিম (র.) থেকে বর্ণিত , তখনকার লোকেরা তো শুধু সেই ফজরকেই গণ্য করতেন যা আকাশে উদ্ভাসিত হতো।

হযরত ইবনে 'আব্বাস (রা.) বলেন, ও দুটো আসলে দুটো আলাদা আলাদা ভোর ; যে ফজর আকাশের উপরে দিকে থাকে সেটা কোন হারাম-হালাল করে না। বরং যে ফজর পাহাড়ের চূড়ায় উজ্জ্বল হয়ে উঠে সেটাই পানাহারকে হারাম করে।

হযরত আবদুর রহমান ইবনে সাওবান (রা.) বলেন, ফজর হলো দু'টি-যেটি ঘোড়ার লেজের মত তা কিছু হারাম করে না। তবে যেটি আড়াআড়িভাবে পুরো দিকচক্রবালে উদ্ভাসিত হয়, সেটাই সালাতের প্রারম্ভ ঘোষণা করে আর সওমের সূচনায় পানাহার হারাম করে দেয়।

হযরত সামুরা ইবনে জুনদাব (রা.) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন- বিলালের আজান শুনে যেন তোমরা সাহ্রী খাওয়া বন্ধ না করো। অথবা 'লম্বালম্বি ফজর দেখেও নয়, বরং যে ফজর সারা পূর্বের আকাশেকে উদ্ভাসিত করে ফেলে-(সেটাই প্রকৃত ভোর)।

হযরত সামুরা ইবনে জুনদাব (রা.) নবী করীম (সা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, বিলালের আযান এবং আকাশের শুভ্রতা তোমাদেরকে যেন ধোঁকায় না ফেলে যে পর্যন্ত না ফজর স্পষ্টভাবে প্রকাশিত না হয় (অর্থাৎ এ আযান শুনে তোমরা সাহ্রী খাওয়া বন্ধ করবে না। কারণ, হযরত বিলাল (রা.) তাহাজ্জুদের আজান দিতেন)।

অন্যান্য তাফসীরকারকগণ বলেছেন, **الخيط الابيض** এর অর্থ সূর্যের আলো এবং **الخيط الاسود** এর অর্থ হল রাতের অন্ধকার।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন তাদের বক্তব্য ঃ

হযরত হিশাম ইব্ন সারী (রা.) ------ ইবরাহীম তায়মী (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আমার পিতা হুযায়ফা (রা.)–এর সাথে ভ্রমণ করেছেন। তিনি (হযরত হুযায়ফা (রা.)] পথ চলতেছিলেন। এমতবস্থায় আমরা ফজর প্রকাশিত হওয়ার আশংকা করলে, তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে পানাহার করার কেউ আছে কি ? এ কথা শুনে আমি বললাম, রোযা রাখতে ইচ্ছুক এমন কোন ব্যক্তি নেই। হুযায়ফা (রা.) বললেন, হ্যাঁ এ কথাই ঠিক। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তিনি পুনরায় পথ চলতে থাকেন। এতে আমরা নামায দেরী করে ফেলেছি এ কথা ভেবে তিনি সওয়ারী থেকে অবতরণ করেন এবং সাহ্‌রী খেয়ে নেন।

হযরত ইবরাহীম তায়মী (র.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, কোন এক রমযানে মাদায়ন শহরের উদ্দেশ্যে আমি হযরত হুযায়ফা (রা.)–এর (বাড়ী থেকে) যাত্রা করলাম। পথিমধ্যে ফজর উদিত হলে তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে পানাহার করার মত কেউ আছে কি ? আমি বললাম, যিনি রোযা রাখতে ইচ্ছুক তিনি এখন খাবেন না। তবে আমার ব্যাপারটি স্বতন্ত্র। (বর্ণনাকারী বলেন) এরপর আমরা আরো চলতে থাকি। এতে আমাদের নামায বিলম্ব হয়ে যায়। এ সময় তিনি পুনরায় বললেন, সাহ্‌রী খেতে ইচ্ছুক এমন কোন ব্যক্তি তোমাদের থেকে আছে কি ? বর্ণনাকারী বলেন, আমরা বললাম, যিনি রোযা রাখতে ইচ্ছুক তিনি এখন খাবেন না। তবে আমার ব্যাপারটি স্বতন্ত্র। তারপর তিনি সওয়ারী থেকে অবতরণ করে সাহ্‌রী খেলেন এবং নামায আদায় করলেন।

হযরত ইবরাহীম তায়মী (র.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, কোন এক রাত্রে হযরত হুযায়ফা (রা.)–এর সাথে আমি ভ্রমণ করতেছিলাম। চলার পথে তিনি বললেন, এখন তোমাদের কেউ সাহ্‌রী খাবে কি? বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা বলে তিনি পুনরায় চলতে থাকেন। এরপর পুনরায় হযরত হুযায়ফা বললেন,এখন তোমাদের কেউ সাহ্‌রী খাবে কি ? বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তিনি আবারও পথ চলতে আরম্ভ করেন। এমন করে আমরা নামায বিলম্ব করে ফেলি। বর্ণনাকারী বলেন, এবার তিনি সওয়ারী থেকে অবতরণ করেন এবং সাহ্‌রী খান।

হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, একবার তিনি ফজরের নামায আদায় করে বললেন, পূর্বাকাশে রাতের কালো রেখা থেকে প্রভাতের সাদা রেখা সুস্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হবার পর ফজরের নামায আদায় করার সময়।

হযরত বারা (রা.) থেকে বর্ণিত, রমযান মাসে একদিন সাহ্‌রী খেয়ে আমি বাড়ী থেকে রওয়ানা হলাম এবং হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)–এর নিকট আসলাম, তিনি আমাকে দেখে বললেন, কিছু

পান করুন, আমি বললাম, সাহ্‌রী খেয়েছি। তিনি পুনরায় বললেন, কিছু পান করুন। আমি পান করে সেখান থেকে চলে এলাম। এ সময় লোকজন (ফজরের) নামায আদায় করছিলেন।

হযরত আমির ইবনে মাতার (রা.) থেকে বর্ণিত, একবার আমি আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর নিকট তাঁর বাড়ীতে গেলাম। তিনি সাহ্‌রীর অবশিষ্টাংশ (বাড়ীর ভেতর থেকে) নিয়ে আসলে আমি তাঁর সাথে খেলাম। এরপর নামাযে দাঁড়ালে আমরা বেরিয়ে আসলাম এবং নামায আদায় করলাম। হযরত আবূ হুযায়ফা (রা.)-এর কর্মচারী সালিম থেকে বর্ণিত, কোন এক রমযানে আমি এবং হযরত আবূ বাকর সিদ্দীক (রা.) একই ছাদে অবস্থান করছিলাম। কোন এক রাতে আমি তাঁর নিকট এসে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)-এর খলীফা আপনি সাহ্‌রী খাবেন না ? তিনি হাতে ইশারা করে বললেন, চুপ থাক। তারপর পুনরায় আমি তাঁর নিকট এসে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)-এর খলীফা ! আপনি সাহ্‌রী খাবেন না ? এবারও তিনি হাতের ইশারায় আমাকে বললেন, চুপ থাক। এরপর আমি আবারও তাঁর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)-এর খলীফা। আপনি সাহ্‌রী খাবেন না? এবার তিনি ফজরের সময়ের প্রতি লক্ষ্য করলেন এবং হাতের ইশারায় বললেন, চুপ থাক, এরপর পুনরায় আমি তাঁর নিকটে এসে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)-এর খলীফা ! আপনি সাহ্‌রী খাবেন না ? তিনি বললেন, তুমি তোমার খানা নিয়ে আস। আমি খানা নিয়ে আসলে তিনি তা খেলেন এবং দুই রাক'আত নামায আদায় করে জামা'আতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন।

হযরত ইবরাহীম (র.) থেকে বর্ণিত, বিত্‌রে নামায ও সাহ্‌রী রাতের মাঝেই সম্পন্ন করে নিতে হবে।

হযরত ইবরাহীম (র.) থেকে বর্ণিত, তাসবীব[১] ও ইকামতের মাঝে বিত্‌রের নামায ও সাহ্‌রী খাওয়া সম্পন্ন করে নিতে হবে।

হযরত হাব্বান (র.) থেকে বর্ণিত, একবার হযরত আলী (রা.)-এর সাথে সাহ্‌রী খেয়ে আমরা বের হলাম। এ সময় ফজরের নামাযের ইকামত হলে আমরা সকলেই নামায আদায় করলাম।

হযরত হাব্বান ইবনে হারিস (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন একবার আমি হযরত আলী (রা.)-এর নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলাম। এ সময় তিনি হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা.)-এর বাড়ীতে সাহ্‌রী খেতে ছিলেন। যেতে যেতে আমি মসজিদের নিকট গিয়ে পৌঁছলে নামাযের ইকামত হল।

---

১. তাসবীবের আভিধানিক অর্থ اعلام بعد الاعلام ফিকাহ্ শাস্ত্রের পারিভাষায় শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়, একঃ الصلواة خير من النوم বলা। এ বাক্যটি ফজরের আযানের জন্য নির্ধারিত। অন্য নামাযের আযানের ক্ষেত্রে এ বাক্যটি বলা জায়েয নেই। দুইঃ আযান ও ইকামতের মাঝে الصلواة جامعة-حى على الصلواة বা এর সমার্থবোধক কোন বাক্য ব্যবহার করা, এ তাসবীবকে অধিকাংশ 'উলামায়ে কিরাম বিদ'আত এবং মাকরূহ্ বলে অভিহিত করেছেন। কারণ, এ ধরনের তাসবীব হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যামানায় ছিল না। উল্লিখিত হাদীসে তাসবীব বলে প্রথমোক্ত তাসবীব তথা الصلواة خير من النوم কেই বুঝানো হয়েছে।

হযরত আবুস্ সফ্র (রা.) থেকে বর্ণিত একবার হযরত আলী (রা.) ফজরের নামায আদায় করে বললেন, এ নামায আদায়ের সময় হলো, রাতের কালো রেখা হতে ভোরের সাদা রেখা সুস্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হলে। যারা বলেন, রোযা রাখার সময় দিনের বেলা, রাতে নয়,তারা বলেন, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দিন। তারা এ কথাও বলেন, ফজর প্রকাশিত হতেই যদি দিন আরম্ভ তা হলে শফক অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত দিন বিলম্বিত হওয়া অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। অথচ সূর্যাস্তের সাথে সাথেই দিনের পরিসমাপ্তির বিষয়ে ইজমা (উলামায়ে কিরামের অভিন্ন মত) প্রকাশিত। এতে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, সূর্যোদয়ের সাথে সাথেই দিন আরম্ভ হয়ে যায়। তাই তারা বলেন, হযরত নবী করীম (সা.) ফজর প্রকাশিত হওয়ার পর সাহ্রী খেয়েছেন[১] উপরোক্ত হাদীসে আমাদের মতামতের বিশুদ্ধ তার সুস্পষ্ট দলীল বিদ্যমান রয়েছে। তারপর তাঁরা নবী করীম (সা.)–এর এ বিষয়ের হাদীসগুলো উল্লেখ করেছেন।

হযরত হুযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, আমাকে প্রশ্ন করা হল, আপনি রাসূল (সা.)–এর সাথে সাহ্রী খেয়েছেন ? তখন তিনি বললেন, হাঁ খেয়েছি। তিনি বলেন,আমি ইচ্ছা করলে এ সময়টাকে দিনও বলতে পারি। তবে (আমি তা বলছি না, কারণ) তখনও সূর্য উদিত হয়নি।

হযরত আবূ বাকর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, 'আসিম, যির (রা.)–এর উপর মিথ্যা আরোপ করেননি এবং যির (রা.) ও হুযায়ফা (রা.)–এর উপর মিথ্যা আরোপ করেননি। যির (রা.) বলেন, আমি হুযায়ফা (রা.)–কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আবূ আবদুল্লাহ্ আপনি রাসূল (সা.)–এর সাথে সাহ্রী খেয়েছেন কি? তিনি বললেন হাঁ খেয়েছি। এ সময়টি ছিল দিন সাদৃশ্য। তবে তখন ও পর্যন্ত সূর্য উদিত হয়নি।

হযরত হুযায়ফা থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, নবী করীম (সা.) এমন সময় সাহ্রী খেতেন যে, আমি তাঁর তীর পতিত হওয়ার স্থানটি পর্যন্ত দেখতে পেতাম। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, তা হলে কি তিনি ভোর হওয়ার পর সাহ্রী খেতেন ? তিনি বললেন, হাঁ তিনি সকালেই সাহ্রী খেতেন, তবে তখনও সূর্য উদিত হত না।

যির ইব্ন হুবায়শ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, একদা প্রত্যুষে আমি মসজিদের দিকে রওয়ানা করলাম। যেতে যেতে হুযায়ফা (রা.)–এর বাড়ীর দরজার নিকট পৌছলে তিনি আমার জন্য দরজা খুলে দেন। আমি ঘরে প্রবেশ করে দেখলাম, তাঁর জন্য খানা গরম করা হচ্ছে, তিনি আমাকে বললেন, বসুন কিছু খেয়ে নিন। আমি বললাম, আমি রোযা রাখার ইচ্ছা করছি। তারপর খানা পরিবেশন করা হলে তিনি এবং আমি উভয়ই খানা খেয়ে নিলাম, এরপর তিনি বাড়ীতে রাখা একটি দুধেল উষ্ট্রির কাছে উঠে গেলেন এবং তিনি একদিকে থেকে দুগ্ধ দোহন করতে লাগলেন আর

---

১. 'ফজর' শব্দ দ্বারা সুব্হে কাযিব ও সুব্হে সাদিক উভয় অর্থ বুঝায়। হযরত নবী করীম (সা.) হয় তো সুব্হে কাযিবে সাহ্রী খেয়েছেন।

আমি দোহন করতে লাগলাম অপর দিক থেকে। তারপর তিনি তা আমার হাতে দিলেন। আমি তাঁকে বললাম, ভোর হয়ে গিয়েছে, আপনি কি তা দেখতে পাচ্ছেন না ? একথা বলা সত্ত্বেও তিনি আমাকে বললেন, পান করুন। আমি পান করলাম। তারপর আমি–মসজিদের ফটকের দিকে এগিয়ে এলে নামাযের ইকামত হল। আমি তাকে বললাম, আপনি যে রাসূল (সা.)–এর সাথে সাহ্‌রী খেয়েছেন এর শেষ সময়টি সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন। তিনি বললেন, রাসূল (সা.) ভোর বেলাতেই সাহ্‌রী খেতেন। তবে তখনও সূর্য উদিত হত না।

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, হযরত নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন, হাতে খানার বরতন–এমতাবস্থায় যদি তোমাদের কেউ আযান শুনতে পায় তাহলে সে যেন নিজের প্রয়োজন না মিটিয়ে খানার বরতন রেখে না দেয়।

আবূ হুরায়রা (রা.) হযরত নবী করীম (সা.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদীসে এতটুকু অতিরিক্ত আছে যে, তৎকালে সূর্য উদ্ভাসিত হওয়ার পর মুআযিযন আযান দিতেন।

আবূ উসামা থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, হযরত উমার (রা.)–এর হাতে একখানা পান–পাত্র এমতবস্থায় নামাযের ইকামত হলে তিনি হযরত রাসূল (সা.)–কে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আমি কি তা পান করতে পারি ? রাসূল (সা.) বললেন, হ্যাঁ তুমি তা পান করে নাও। তারপর তিনি তা পান করে নিলেন।

আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত যে, তিনি বিলাল (রা.) বললেন, নামাযের ব্যাপারে অবহিত করার জন্য একবার আমি রাসূল সা.)–এর নিকট গেলাম। রোযা রাখার ইচ্ছা ছিল তাঁর। এসময় তিনি একটি পান পাত্র নিয়ে আসার জন্য ডেকে পাঠালেন এবং তা পান করে আমাকে দিলে আমিও তা পান করলাম। তারপর তিনি নামাযের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন।

হযরত বিলাল (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ফজরের নামাযের খবর ও দেয়ার জন্য এক রাত আমি নবী করীম (সা.)–এর নিকট গেলাম। তিনি রোযা রাখার ইচ্ছা করছিলেন, এসময় তিনি একটি বাটি নিয়ে আসার জন্য ডেকে পাঠালেন এবং তা পান করে আমাকে দিলে আমিও তা পান করলাম, এরপর আমরা নামাযের জন্য রওয়ানা করলাম।

এ আয়াতের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা তাই, যা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বর্ণিত, তিনি ইরশাদ করেছেন الخيط الابيض এর অর্থ দিনের আলো এবং الخيط الاسود এর অর্থ রাতের আঁধার। আরবী ভাষায় এ ব্যাখ্যাটিই অধিক প্রসিদ্ধ । যেমন আরব কবি আবূ দুওয়াদ আয়াদী বলেছেন,

فلما اضاءت لنا سدفة + و لاح من الصبح خيط انارا

কবিতার দ্বিতীয় পংক্তিতে خيط শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সম্পর্কে এমর্মে যে সমস্ত হাদীস বর্ণিত আছে যে, "তিনি কিছু পান করে অথবা সাহ্‌রী খেয়ে নামাযের জন্য রওয়ানা করেছেন" প্রকৃতপক্ষে এ সমস্ত হাদীস আমাদের মতামতের বিশুদ্ধতার পরিপন্থী নয়। কেননা, "রাসূলুল্লাহ্ (সা.) পানাহার করে নামাযের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেছেন" একথা কোন অসম্ভব কিছু নয়। কারণ, ফজরের নামায রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যুগে ফজর উদিত হওয়া এবং সুস্পষ্টভাবে উদ্ভাসিত হওয়ার পরই আদায় করা হত। আর নামাযের জন্য ফজর উদিত হওয়ার পূর্বেই খবর দেয়া হতো।

হযরত হুযায়ফা (রা.) যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যে, "নবী করীম (সা.) এমন সময় সাহ্‌রী খেতেন যে, আমি তখন তীর নিক্ষেপের স্থানটি পর্যন্ত দেখতে পেতাম।" বস্তুত সাহ্‌রীর সময় নির্ধারণের ক্ষেত্রে এ হাদীস নিতান্তই অস্পষ্ট। করণ, তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কি সুব্‌হে হওয়ার পর সাহ্‌রী খেয়েছেন ? উত্তরে তিনি "সুব্‌হে হওয়ার পর" না বলে বলেছেন, "সুব্‌হের সময়ই শব্দটিতে এ অর্থ গ্রহণের সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ, এর অর্থ এ কথাও হতে পারে যে, ভোর অতি নিকটবর্তী যদি ও পূর্ণাঙ্গভাবে এখনও ভোর হয়নি। যেমন আরবরা এক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে অপর ব্যক্তির প্রতি ইংগিত করে বলেন যে, هٰذَا فَالَنَّ شِبْهًا অর্থাৎ অমুক অমুকের মত তখন আরবরা বলে হাঁ, ঠিকই, ঠিকই পক্ষান্তরে হযরত হুযায়ফার (রা.) কথাটি ও অনুরূপ অর্থাৎ هُوَ الصُّبْحُ এর অর্থ হচ্ছে هُوَ الصُّبْحُ شِبْهًا بِهٖ وَ قُرْبًا مِّنْهُ -অর্থাৎ সে সময় সুব্‌হের মতই, কারণ, সুব্‌হে অতি নিকটবর্তী ।

হযরত ইবনে যায়দ (র.)-এর থেকে বর্ণিত, حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ আয়াতাংশে বর্ণিত الخيط الابيض এর অর্থ, ঐ সাদা রেখা যা রাতের গভীরতা থেকে রাত ও তার উপর জড়িয়ে থাকা কালো অন্ধকারের বুক চিরে আকাশের পূর্বাংশে দেখা দেয়।

হযরত ইবনে যায়দ (র.)-এর মতানুসারে حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ আয়াতাংশে বর্ণিত الفجر দ্বারা ফজরের সমুদয় ওয়াক্ত বুঝানো উদ্দেশ্য নয়। তাই উপরোক্ত আয়াতের অর্থ হে মু'মিনগণ, ফজর উদিত হওয়ার ফলে যখন তোমাদের সামানে ভোরের সাদা রেখা প্রকাশিত হবে, রাতের গভীর অন্ধকারকে পিছনে ফেলে, তখন থেকে তোমরা রোযা শুরু করবে। তারপর এ সময় থেকে রাতের আগমন পর্যন্ত তোমরা সিয়াম পূর্ণ করবে। এপর্যায়ের আমি যা-উল্লেখ করেছি, হযরত ইবনে যায়দ (র.) থেকেও অনুরূপই বর্ণিত হয়েছে।

হযরত ইবনে যায়দ (র.) থেকে মহান আল্লাহ্‌র বাণী مِنَ الْفَجْرِ সম্পর্কে বর্ণিত এর ব্যাখ্যা হলো, ذالك الخيط الابيض هو من الفحر نسبة اليه -অর্থাৎ ঐ সাদা রেখাটি সুব্‌হে সাদিক হওয়ার

কারণেই উদ্ভাসিত হয়। তবে সাদা রেখাটি ফজরের সমুদয় ওয়াক্তের মাঝে পরিব্যাপ্ত নয়। বরং ঐ রেখাটি গগনকোণে উদ্ভাসিত হওয়ার সাথে সাথেই ফজরের নামাযের ওয়াক্ত আরম্ভ হয়ে যায় এবং রোযাদার ব্যক্তির জন্য পানাহার হারাম হয়ে যায়। "তোমরা পানাহার কর-যতক্ষণ না রাত্রির কালো রেখা হতে ভোরের সাদা রেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত হয়। তারপর তোমরা রোযা পূর্ণ কর সূর্যাস্ত পর্যন্ত।" যাঁরা বলেন যে, সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত পানাহার বৈধ, এ আয়াতাংশ দ্বারা তাদের মতের বাতুলতা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। কারণ ভোরের সাদা রেখা সুব্হে সাদিকের প্রথম মুহূর্তেই প্রকাশ পায়। তাই আল্লাহ্ পাক রোযাদারের জন্য ঐ সময়টকেই পানাহার ও কামাচারের বেলায় সর্বশেষ সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এ সীমা অতিক্রম করা কারো জন্য বৈধ নয়। কিন্তু রোযা রাখতে ইচ্ছুক ব্যক্তির জন্য এ সীমা অতিক্রম করা যদি কেউ বৈধ মনে করেন, তাহলে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, সকাল অথবা দুপুরে রোযাদার ব্যক্তির জন্য পানাহার আপনি বৈধ মনে করেন কি ? এ প্রশ্নের উত্তরে যদি তিনি বলেন যে, এহেন মত ও সিদ্ধান্ত মুসলিম উম্মাহ্র সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তাহলে তাকে বলা হবে যে, আপনার মত ও আল-কুরআন এবং মুসলিম উম্মাহ্র সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। সুতরাং বলুন, কুরআন, সুন্নাহ্ এবং কিয়াসের আলোকে আপনারও তার মাঝে পার্থক্য কি যদি তিনি বলেন যে, আমার ও তার মাঝে পার্থক্য হলো, আল্লাহ্ তা'আলা দিনের বেলা রোযা রাখার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন, রাতের বেলায় নয়। আর দিনের আগমন ঘটে সূর্য উদিত হওয়ার পরই। তাই সূর্য উদিত হওয়ার পর খানা খাওয়া বৈধ নয়। এবার তাকে বলা হবে যে, আপনার বিরোধী লোকেরা তো এ কথাই বলছে। কারণ, তাদের নিকট দিন আরম্ভ হয় ফজর প্রকাশিত হবার পর। তবে ফজর প্রকাশিত হওয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে উদয় পূর্ণাঙ্গ হয় না, উদয় পূর্ণাঙ্গ হয় সূর্যের কিরণ ছড়ানোর পর। যেমন সূর্য অস্তমিত হওয়ার শুরুতেই দিনের পরিসমাপ্তি-ঘটে। তবে, এ সময় অস্ত যাওয়া পূর্ণাঙ্গভাবে সম্পন্ন হয় না। এ মত পোষণকারী লোকদেরকে বলা হবে যে, আপনাদের মতানুসারে দিন যদি রাতের সমুদয় অন্ধকার বিদূরিত হওয়া, সূর্য পূর্ণাঙ্গরূপে প্রকাশমান হওয়া এবং ঊর্ধ্বাকাশে উঠে যাওয়ার পর সাব্যস্ত হয়, তাহলে-সূর্য অস্তমিত হওয়া, সূর্যের কিরণ বিদূরিত হওয়া এবং রাতের অন্ধকার পরিব্যাপ্ত হবার পরই রাত সাব্যস্ত হওয়া উচিত। যদি তারা বলেন, যে, হাঁ বিষয়টি এমনই, তাহলে তাদরেকে বলা হবে যে, তবে তো পশ্চিমাকাশের শুভ্রতা সাদা ভাব সূর্যের আলোর প্রভাব মিটে যাওয়া পর্যন্ত রোযা দীর্ঘায়িত হওয়া ওয়াজিব হয়ে যাবে। যদি তারা বলেন, পশ্চিম আকাশের শুভ্রতা অদৃশ্য হয়ে যাওয়া পর্যন্ত রোযাকে বিলম্ব করে রাখাই ওয়াজিব। এ কথা এমনই একটি কথা যা যুক্তি প্রমাণাদির দ্বারা

সম্পূর্ণরূপে নাকচ হয়ে যায় এবং যার ভ্রান্তি অত্যন্ত সুস্পষ্ট। এরপরও যদি তাঁরা বলেন যে, সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর রাতের অন্ধকার আপতিত হওয়ার প্রথম ভাগ হতেই মূলত রাত আরম্ভ হয়। তাহলে তাদেরকে বলা হবে, তবে তো রাতের অন্ধকার কেটে সূর্যের আলো বিকীর্ণ হওয়ার পরই দিন শুরু হওয়া চাই,অথচ এ কথা মেনে নিলে তাদের নিজেদের উক্তির মাঝে চরম বৈপরীত্য দাঁড়ায়, কিন্তু এ বৈপরীত্য কেন ? কেন এই পার্থক্য ? এ কথার উত্তরে তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তাদের কোন গত্যন্তর নেই।

فجر শব্দের ব্যাখ্যাঃ **فجر** শব্দটি **مصدر** বর্ণিত আছে যে, **تفجر الماء تبفجر فجرا** মূলত সুপ্ত স্থান থেকে প্রকাশিত হয়ে পানি যখন প্রবাহিত হতে থাকে তখন আরবগণ এ বাক্যটি ব্যবহার করে থাকেন। এমনিভাবে পূর্ব আকাশে উদয়োন্মুখ সূর্যের আলো বিচ্ছুরণের প্রাথমিক অবস্থাকেও **فجر** বলা হয়। কারণ এখানেও সুপ্ত স্থান থেকে আলো মানুষের সামনে প্রকাশিত হচ্ছে, যেমন প্রবহমান পানি তার উৎস হতে প্রবাহিত ও প্রকাশিত হয়।

ثم اتموا الصيام الى اليل 'এরপর রাতের আগমন পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর।' এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক রোযার সীমা নির্ধারণ করে দিয়ে বলেছেন যে, রাতের আগমন পর্যন্ত হল, রোযার শেষ সময়, যেমনিভাবে তিনি ইফ্তার করা, পানাহার বৈধ হওয়া, কামাচার জায়েয হওয়া এবং রোযা আরম্ভ হওয়ার প্রথম সময়টিকে দিনের আবির্ভাব ও রাতের শেষাংশের পরিসমাপ্তি ঘটার সাথে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অতএব, এ আয়াত থেকে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, রাতে কোন রোযা নেই। যেমন, রোযার দিনগুলোতে দিনে কোন ইফতার নেই, অধিকন্তু এর থেকে এ কথাও বোঝা যায় যে, সওমে-বিসাল (অব্যাহত সিয়াম সাধনাকারী) ব্যক্তি মূলত অভুক্তই থাকছে। এতে তার কোন ইবাদত আদায় হয় না। এ মর্মে হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন,যখন রাত্রি আগমন করে ও দিন বিদায় নেয় এবং যখন সূর্য অস্ত যায় তখন রোযাদারের ইফতারের সময় হয়ে যায়।।

আবদুল্লাহ্ ইবনে আবূ আওফা থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, কোন এক সফরে আমি রাসূল (সা.)-এর সঙ্গী ছিলাম, তিনি রোযা অবস্থায় ছিলেন। সূর্য ডুবে গেলে তিনি একজন লোককে ডেকে বললেন, তুমি সওয়ারী থেকে নেমে আমার জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা.) সন্ধ্যা হতে দিন। রাসূল (সা.) পুনরায় বললেন, তুমি সওয়ারী থেকে অবতরণ করে ছাতু গুলিয়ে নিয়ে আস। লোকটি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা.) সন্ধ্যা হতে দিন। রাসূল (সা.) আবারও বললেন, তুমি সওয়ারী থেকে নেমে আমার জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। তখন লোকটি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা.), এখনো তো দিন অবশিষ্ট আছে। এ কথা তৃতীয় বার বলে তিনি সওয়ারী থেকে অবতরণ করে রাসূল (সা.)-এর জন্য ছাতু গুলিয়ে আনলেন। এরপর রাসূল (সা.), বললেন, যখন তোমরা দেখবে রাতের অন্ধকারে এদিক (পূর্বদিক) থেকে ঘনিয়ে আসছে তখন জানবে যে,

রোযাদারের ইফতারের সময় হয়ে গিয়েছে। রফী (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা রোযাকে রাত পর্যন্ত ফরয করেছেন। রাত হওয়ার সাথে ইফতার করবে।এখন তুমি ইচ্ছা করলে খেতে পার এবং ইচ্ছা করলে নাও খেতে পার। আবুল আলীয়া (র.) থেকে বর্ণিত যে, একদা তিনি সওমে-বিসাল বা বিরতিহীনভাবে (রাত দিন না খেয়ে) রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবার পর তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা এ উম্মতের উপর দিনের বেলায় রোযা রাখা ফরয করেছেন।রাত আগমনের পর সে ইচ্ছা করলে খেতে পারে এবং ইচ্ছা করলে নাও খেতে পারে। অন্য এক সূত্রে বর্ণিত যে, আবুল আলীয়া (র.) সওমে-বিসাল সম্পর্কে বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, "এরপর নিশাগম পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর।" তাই রাত হলে রোযাদারের জন্য ইফতার জায়েয হয়ে যায়। এখন সে ইচ্ছা করলে খেতে পারে এবং নাও খেতে পারে। কাতাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, বলেছেন, 'আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেছেন, তোমরা রাত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, সওমে-বিসাল তথা বিরতিহীন রোযা রাখাকে তিনি পসন্দ করেননি।

যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে, তাহলে যারা সওমে-বিসাল করেছেন তাঁরা কিভাবে সওমে-বিসাল করলেন ? যেমন, হিশাম ইবনে 'উরওয়া থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়র (রা.) সাত দিন বিরতিহীনভাবে সওমে-বিসাল করতেন। বার্ধক্যে উপনীত হবার পর তিনি পাঁচ দিন সওমে-বিসাল করেছেন। এরপর চরম বার্ধক্যে উপনীত হবার পর তিন দিন বিরতিহীনভাবে সওমে-বিসাল করেছেন।

আবদুল মালিক থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, ইবনে আবূ ইয়ামুর প্রতি মাসে একবার ইফতার করতেন। মালিক থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলতেন, হযরত 'আমর ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়র রমযানের ষোল ও সতের তারিখে বিরতিহীনভাবে সওমে-বিসাল পালন করতেন। মাঝে তিনি কোন ইফতার করতেন না। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আমি একদিন তার সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং বললাম, হে আবুল হারিস, আপনার এ সওমে-বিসাল তথা বিরতিহীনভাবে রোযা রাখার পেছনে কোন্ জিনিষে আপনাকে শক্তির যোগান দিচ্ছে ? তিনি বললেন, আমার খাবারে ঘি থাকে এবং তা আমার শরীরে আদ্রতা আনে। আর পানি আমার শরীর থেকে বের হয়ে যায় (এতেই আমি সওমে-বিসালের শক্তি পেয়ে থাকি)। অনুরূপ আরো বহু বর্ণনা রয়েছে, কিতাবের কলেবর বড় হয়ে যাওয়ার আশংকায় এখানে আর ঐগুলোকে উল্লেখ করলাম না।

কেউ কেউ বলেন, মূলত সওমে-বিসাল ইবাদত হিসাবে ছিল না, বরং এ আত্মাকে দমন এবং আধ্যাত্মিক সাধনা হিসাবে ছিল। পক্ষান্তরে সওমে-বিসালকারীদের এ সাধনা ছিল হযরত উমার (রা.)-এর নিম্নবর্ণিত বাণীর অন্যতম নজীর। তিনি বলেছেন- **اخشو شبوا و تمعد دوا و انزوا على الخيل نزوًا و اقطعوا الركب و امشوا حفاةً** অর্থাৎ তোমরা শক্ত হও,- যুবক হও, ঘোড়ার পৃষ্ঠে লাফিয়ে ওঠ, ভ্রমণ কর এবং খালি পায়ে হাঁট। তার এ নির্দেশ দেয়ার মূল কারণ হল, জনগণ যাতে বিলাসপ্রবণ হয়ে সৌখিন জীবন-যাপনের প্রতি আকৃষ্ট না হয় এবং যাতে তারা বিলাসিতার প্রতি

ধাবিত না হয়ে যায়। কারণ যদি মুসলমানদের মাঝে এহেন অবস্থা ঘটে তাহলে তারা প্রত্যক্ষ সমরে শত্রুদেরকে ছেড়ে পলায়ন করতে বাধ্য হবে এবং পরিণামে নিজেদের জন্য ধ্বংস ডেকে আনবে। এ কারণে পরবর্তীকালে বহু জ্ঞানী লোকেরা সওমে-বিসাল তথা বিরতিহীনভাবে রোযা রাখাকে এড়িয়ে চলেছেন।

হযরত আবূ ইস্‌হাক (র.) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন। ইবনে আবূ নাঈম (র.) কয়েক দিন সওমে-বিসাল করার পর দাঁড়াতে পারছিলেন না। এ দেখে 'আমর ইবনে মায়মূন (র.) বললেন, এ লোককে যদি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর সাহাবিগণ পেতেন, তাহলে অবশ্যই তাঁর প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করতেন। সওমে-বিসাল না জায়েয হওয়া সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে মুতাওয়াতির হাদীসের মধ্যে বহু রিওয়ায়েত বিদ্যমান রয়েছে যেগুলোর সব কটিকে উল্লেখ করলে কিতাব বড় হয়ে যাবে। তাই সবগুলো হাদীস উল্লেখ না করে এখানে কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করলাম। কারণ সওমে-বিসাল না-জায়েয ব্যাপারে একটি হাদীসই যথেষ্ট। হযরত ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সওমে-বিসাল করতে নিষেধ করেছেন। এতে সাহাবিগণ সবাই বলেছিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূলুল্লাহ্ (সা.), আপনি তো সওমে-বিসাল করে থাকেন। তিনি বলেছিলেন, আমি তো তোমাদের কারো মত নই। আমি এমনভাবে রাত্রি যাপন করি যে, আমাকে খাওয়ানো ও পান করানো হয়। নবী করীম (সা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক সাহ্‌রী থেকে অপর সাহ্‌রী পর্যন্ত সওমে-বিসাল করার অনুমতি আছে। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (সা.)-কে বলতে শুনেছেন, তোমরা সওমে-বিসাল করো না। তোমাদের কেউ সওমে-বিসাল করতে চাইলে সাহ্‌রী সময় পর্যন্ত বিসাল কর। সাহাবিগণ আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি তো সওমে-বিসালা করে থাকেন। তিনি বললেন, আমার অবস্থা তোমাদের মত নয়। আমি রাত্রি যাপন করি, আমার রিযিকদাতা খাওয়ান এবং আমাকে পান করান।

হযরত আবূ বাকর ইবনে হাফস (র.) হাতিব ইবনে আবূ বাল্‌তাআর (র.) উম্মে ওয়ালাদ থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁকে সাহ্‌রী খেতে দেখেন। তারপর তিনি তাঁকে খাওয়ার জন্য ডাকলেন। তিনি বললেন, আমি রোযাদার। একথা শুনে নবী করীম (সা.) বললেন, তুমি কিভাবে রোযাদার ? তিনি তখন তাঁর নিকট সকল বৃত্তান্ত খুলে বললেন, সব কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, কোথায় এবং মুহাম্মাদ (সা.)-এর পরিবার পরিজনরা কোথায় ? তারা তো এক সাহ্‌রী হতে অপর সাহ্‌রী পর্যন্ত সওমে-বিসাল করতেন। এতে এ কথাই বোঝা যায় যে, ثُمَّ اَتِمُّوْا এর ব্যাখ্যা হল, রাতের কালো রেখা হতে ঊষার সাদা রেখা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হওয়া থেকে রাত্র পর্যন্ত ঐ সমস্ত থেকে বিরত থাকা যা থেকে আল্লাহ্ পাক বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। এরপর পানাহার, স্ত্রীগমন সব কিছুই বৈধ হয়ে যায়। যেমন রমযান ব্যতীত অন্য সময়ে বৈধ ছিল। যেমন হাদীস আছে, হযরত ইবনে যায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি মহান আল্লাহ্‌র বাণী- ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ (এরপর তোমরা রাতের আগমন পর্যন্ত রোযা পূর্ণ

কর) সম্বন্ধে বলেছেন, উক্ত আয়াতে রমযানের যে চতুর্সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে–এ আয়াতাংশতে–এর একটি প্রতি নির্দেশনা বিদ্যমান রয়েছে। এ বলে তিনি তা তিলাওয়াত করলেন, "সিয়ামের রাতে তোমাদের জন্য স্ত্রীগমন বৈধ করা হয়েছে তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ। মহান আল্লাহ্ জানতেন যে, তোমরা নিজেদের প্রতি অবিচার করতেছিলে। তারপর তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হয়েছেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করেছেন। কাজেই এখন তোমরা তাদের সাথে সংগত হও এবং আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যা বিধিবদ্ধ করেছেন তা কামনা কর। আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ রাত্রির কালো রেখা হতে ভোরের সাদা রেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়। তারপর রাতের আগমন পর্যন্ত তোমরা সিয়াম পূর্ণ কর।" বর্ণনাকারী বলেন, আমার আব্বা এবং আমার উস্তাদ মহাদয়গণ একথা বলে আমাদের নিকট এ আয়াতেই তিলাওয়াত করতেন।

আল্লাহর বাণী– وَ لاَ تُبَاشِرُوْ هُنَّ وَاَنْتُمْ عَاكِفُوْنَ فِي الْمَسْجِدِ –"তোমরা মসজিদে ই'তিকাফ অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করো না।"

ব্যাখ্যা ঃ উল্লেখিত আয়াতাংশে لاَتُبَاشِرُوْهُنَّ এর অর্থ হলো– لاتجامعوا نساءكم অর্থাৎ তোমরা স্ত্রী সহবাস করো না। এবং وانتم عاكفون فى المساجد এর অর্থ হলো মসজিদে মহান আল্লাহ্ ইবাদতে নিজেকে ব্যাপৃত রাখা। عكوف এর আভিধানিক অর্থেও এ বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়। কারণ عكوف এর আভিধানিক অর্থ, অবস্থান করা এবং কোন বস্তুর উপর নিজেকে নিমগ্ন রাখা। যেমন কবি তারমাহ্ ইবনে হাকীম বলেছেনঃ

فبات بنات اليل حولى عكفا + عكوف البواكي بينهن صريع

উপরোক্ত কবিতায় বর্ণিত عُكَّفاً এর অর্থ হচ্ছে مقيمة অর্থাৎ অবস্থানকারী। অনুরূপভাবে কবি ফারাযদাক বলেছেন,

ترى حولهن المعتفين كانهم + على صنم فى الجاهلية عكف

অনুরূপ অর্থে কবি ফারাযাকও عكف শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তাফসীরকারগণের মাঝে مباشرة কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ, স্ত্রী সহবাস। এ অর্থ ব্যতীত এখানে مباشره এর অন্য কোন অর্থ হতে পারে না যারা এ মত পোষণ করেন তাদের আলোচনা ঃ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা হলো, তোমরা স্ত্রী সহবাস করবে না, রমযানে হোক বা রমযান ব্যতীত অন্য সময়ে। তাই আল্লাহ্ পাক দিনে রাতে স্ত্রী সহবাসকে হারাম করেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত ই'তিকাফ শেষ না হয়।

হযরত ইবনে জুরায়জ (র.) থেকে বর্ণিত, আমাকে আতা (র.) বলেছেন যে, উক্ত আয়াতাংশে مباشره এর অর্থ, الجماع অর্থাৎ স্ত্রীর সাথে মিলন।

হযরত যাহ্হাক (র.) থেকে মহান আল্লাহ্র বাণী এ আয়াতাংশ সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, পূর্বে মানুষ ই'তিকাফরত অবস্থায় মসজিদ থেকে বের হয়ে ইচ্ছা করলে স্ত্রী সহবাস করতে পারত। মানুষের এ কার্যকলাপকে বন্ধ করার জন্য আল্লাহ্ বিধান নাযিল করলেন, ولا تباشرو هن و انتم عاكفون فى المساجد অর্থাৎ ই'তিকাফরত অবস্থায় তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের নিকটেও যেতে পারবে না। চাই ই'তিকাফ মসজিদে হোক অথবা অন্য কোন স্থানে হোক, হযরত যাহ্হাক (র.) থেকে অনুরূপ আরেকটি বর্ণনা করেছেন।

হযরত রবী (র.) থেকে বর্ণিত, মানুষ ই'তিকাফের অবস্থাতেও স্ত্রী সহবাস করত। পরে আল্লাহ্ পাক এ কাজকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। হযরত কাতাদা (র.) থেকে মহান আল্লাহ্র বাণী ولا تباشرو هن و انتم عاكفون فى المساجد সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, পূর্বে মানুষ ই'তিকাফরত অবস্থায় মসজিদ থেকে বের হয়ে নিজ স্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ হলে পর- ইচ্ছা হলে তার সাথে সহবাস করে নিত। কিন্তু পরে আল্লাহ্ পাক এ কাজকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং তাদেরকে জানিয়ে দেন যে, ই'তিকাফ পূর্ণ না করে এ কাজ কখনো সমীচীন নয়।

হযরত সূদ্দী (র.) থেকে মহান আল্লাহ্র বাণী- ولا تباشروهن و انتم عاكفون فى المساجد সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলতেন, যিনি ই'তিকাফ করবেন তিনি অবশ্যই রোযা রাখবেন। তাই ই'তিকাফকারীর জন্য ই'তিকাফরত অবস্থায় কোনক্রমেই স্ত্রী সহবাস সংগত নয়।

মুজাহিদ (র.) থেকে মহান আল্লাহ্র বাণী- ولا تباشرو هن و انتم عاكفون فى المساجد সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, عاكفون المساجد এর অর্থ মসজিদের পড়শী সুতরাং আয়াতাংশের অর্থ হবে, যখন তোমাদের কেউ নিজ বাড়ী ছেড়ে মহান আল্লাহ্র ঘরের দিকে রওয়ানা করবে তখন সে আর তার স্ত্রীর নিকটবর্তী হতে পারবে না।

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলতেন,-যে ব্যক্তি নিজ বাড়ী ছেড়ে মহান আল্লাহ্র ঘরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করবে সে তার স্ত্রীর নিকটেও যেতে পারবে না।

হযরত কাতাদা (র.) থেকে মহান আল্লাহ্র বাণী- ولا تباشرو هن و انتم عاكفون فى المساجد সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, পূর্ব যুগে লোকেরা ই'তিকাফ অবস্থায় মসজিদ থেকে বের হয়ে নিজ স্ত্রীর সাথে সহবাস করে পুনরায় মসজিদে চলে আসত। এরপর আল্লাহ্পাক এ কাজ নিষেধ করেছেন।

হযরত ইবনে জুরায়জ (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, পূর্বেকার লোকেরা ই'তিকাফের অবস্থায় মলত্যাগ করার উদ্দেশ্যে বের হয়ে নিজ স্ত্রীর সাথে সহবাস করত, এরপর গোসল করে ই'তিকাফস্থলে চলে আসত। পরে একাজ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। হযরত ইবনে জুরায়জ (র.) বলেন, হযরত মুজাহিদ (র.) বলেছেন, আনসারগণ ই'তিকাফের অবস্থায় নিজ স্ত্রীর সাথে সহবাস করত ; তাই আল্লাহ্পাক মসজিদে নিজ স্ত্রীর সাথে সহবাস করা হারাম ঘোষণা করে নাযিল করেছেন– ولا تباشرو هن و انتم عاكفون অর্থাৎ ই'তিকাফ অবস্থায় তোমরা নিজ স্ত্রীর সাথে সহবাস করবে না। হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন, عاكفون এর অর্থ الجوار হযরত ইবনে জুরায়জ (র.) বলেন, আমি হযরত আতা (র.)-কে বললাম, مباشرت এর অর্থ সহবাস। তিনি বললেন, হাঁ, তাই অন্য কিছু নয়। আমি বললাম, মসজিদে চুম্বন করা এবং স্পর্শ করা ও এ হুকুমের মধ্যে শামিল। এ কথা শুনে তিনি বললেন, মসজিদে যে কাজটি হারাম তা স্ত্রী সহবাস। তবে এর সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য কার্যকলাপকেও আমি مكر و ه অপসন্দ বলে মনে করি।

হযরত যাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, مباشرت এর অর্থ স্ত্রী সহবাস। অন্যান্য মুফাসসীরগণ مباشرت এর অর্থ স্ত্রীর সাথে মিলন, চুম্বন, আলিঙ্গন ইত্যাদি বর্ণনা করেছেন। এ মতের সমর্থনে নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ পেশ করেছেন।

হযরত মালিক ইবনে আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, ই'তিকাফরত ব্যক্তি তার স্ত্রীকে স্পর্শ করতে পারবে না, তার সাথে সহবাস করতে পারবে না এবং চুম্বন করে বা অন্য কোন উপায়ে উপভোগ করতে পারবে না। হযরত ইবনে যায়দ থেকে মহান আল্লাহ্র বাণী– ولا تباشرو هن و انتم عاكفون في المساجد সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, আয়াতাংশে বর্ণিত مباشرت এর মধ্যে মিলন এবং মিলন এবং অন্য উপায়ে আনন্দলাভ বুঝায়। কাজেই উভয় প্রকার مباشرت ই'তিকাফরত ব্যক্তির জন্য হারাম। মিলন ব্যতীত সহবাস অর্থ চামড়ার সাথে চামড়ার মিলন। এর বেশী কিছু নয়। উপরোক্ত মতামত পোষণকারী লোকদের এমত পোষণ করার কারণ, উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ব্যাপক ভিত্তিকভাবে مباشرت কে নিষেধ করেছেন। বিশেষ কোন পদ্ধতির সাথে তা নির্দিষ্ট করেননি। তাই مباشرت এর সব পদ্ধতির প্রক্রিয়া ولا تباشرو هن আয়াতাংশর মধ্যে শামিল। বিশেষ কোন প্রক্রিয়া এখানে উদ্দেশ্যে নয়। উভয় মতামতের মধ্যে ঐ সমস্ত লোকের মতটিই আমার নিকট অধিকতর বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য–যারা বলেন, مباشرت এর অর্থ স্ত্রীর সাথে মিলন এবং এর স্থলাভিষিক্ত এমন কারণসমূহ যা গোসল করাকে ওয়াজিব করে। কেননা مباشرت এর অর্থ সম্বন্ধে দুই ধরনের মতামতই পাওয়া যায়। কেউতো আয়াতের হুকুমকে ব্যাপক বলে মনে করেন। আর কেউ

তাকে বিশেষ অর্থ মনে করেন। এদিকে হাদীসে বর্ণিত আছে যে, ই'তিকাফরত অবস্থায় নবী করীম (সা.)–কে তার স্ত্রীগণ মাথা আঁচড়িয়ে দিয়েছেন। এতে বুঝা যায় যে, আয়াতে এর সমুদয় অর্থ মুরাদ নয় বরং বিশেষ অর্থ বুঝানোই এখানে উদ্দেশ্য। হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ই'তিকাফরত অবস্থায় আমার দিকে তাঁর মাথা এগিয়ে দিতেন। আমি তাঁর মাথা আঁচড়িয়ে দিতাম।

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, (ই'তিকাফরত অবস্থায়) রাসূল (সা.) মানবিক প্রয়োজন ব্যতীত কখনো ঘরে প্রবেশ করতেন না। তিনি মসজিদে ই'তিকাফরত অবস্থায় আমার প্রতি মাথা এগিয়ে দিতেন আমি তা আঁচড়িয়ে দিতাম।

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মসজিদে ই'তিকাফরত অবস্থায় আমার দিকে মাথা এগিয়ে দিতেন। আমি আমার কামরায় বসে তার মাথা ধুয়ে দিতাম এবং আঁচাড়য়ে দিতাম। অথচ তখন আমি ঋতুমতী ছিলাম।

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, নবী করীম (সা.) ই'তিকাফরত অবস্থায় মসজিদ থেকে মাথা বের করে দিতেন। আমি তা ধুয়ে দিতাম, অথচ তখন আমি ঋতুমতী ছিলাম।

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, নবী করীম (সা.) ই'তিকাফরত অবস্থায় (মসজিদ থেকে) মাথা বের করে দিতেন, আর আমি তা আঁচড়িয়ে দিতাম।

ই'তিকাফরত অবস্থায় হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) রাসূলুল্লাহ্ (সা.) শির মুবারক ধুয়ে দিতেন বিষয়টি যেহেতু বিশুদ্ধতম বর্ণনা সূত্রে প্রমাণিত, তাই, বুঝা যায় যে, মহান আল্লাহ্র বাণী–**ولا تباشرو هن و انتم عاكفون فى المساجد** আয়াতাংশের বর্ণিত **مباشرت** এর সমুদয় অর্থ এখানে উদ্দেশ্য নয়। বরং এখানে **مباشرت** এর আংশিক অর্থ উদ্দেশ্য। আর তা স্বামী–স্ত্রীর মিলন ও তার আনুসাঙ্গিক কাজ।

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا অর্থঃ 'এগুলো আল্লাহ্র সীমা রেখা। সুতরাং এগুলোর নিকটবর্তী হবে না।' ব্যাখ্যাঃ উপরোক্ত আয়াতাংশে **تلك** (এগুলো) বলে ঐ সমস্ত বস্তুর প্রতি ইংগিত করা হয়েছে যা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন রমযান মাসে দিনে ওযর ব্যতীত খানা–পিনা এবং স্ত্রী সহবাস করা এবং মসজিদে ই'তিকাফরত অবস্থায় নিজ স্ত্রীর সাথে সংগম করা। মোট কথা হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করছেন যে, এ হচ্ছে আমার নির্ধারিত সীমা যা আমি তোমাদের জন্য নির্ধারণ করেছি এবং যা নির্ধারিত সময়ের মাঝে তোমাদের জন্য হারাম করেছি এবং যা থেকে বিরত থাকার জন্য তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছি। সুতরাং তোমরা তার নিকটেও যাবে না, বরং এগুলো থেকে অনেক দূরে থাকবে। নচেৎ তোমরাও ঐ শাস্তির উপযোগী হবে যে শাস্তির উপযোগী হয়েছে ঐ সমস্ত

লোকেরা যারা আমার নির্ধারিত সীমাকে লংঘন করেছে, আমার নির্দেশ অমান্য করেছে এবং পাপাচারে লিপ্ত হয়েছে। কোন কোন তাফসীকার বলেছেন যে, حد و د الله (আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা) এর অর্থ, মহান আল্লাহ্র নির্ধারিত শর্তসমূহ। حد و د الله এর এ ব্যাখ্যা পূর্ব বর্ণিত ব্যাখ্যার অনুরূপই। তবে এ ব্যাখ্যাটি حد و د الله শব্দের সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল। কারণ, প্রত্যেক বস্তুর حد (সীমা) ঐ জিনিষকেই বলা হয় যা বস্তুটিকে বেষ্টন করে রাখে এবং ঐ বস্তুটিকে অন্য বস্তু থেকে পৃথক করে। এ প্রেক্ষিতে تِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ مِنْ ذَالِكَ এর অর্থ المحارم التى ميذها من الحلاَ ل المطلق অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ঐ নিষিদ্ধ কাজসমূহ যাকে হালাল কর্ম থেকে পৃথক করে দিয়েছেন। তারপর হালাল হারামের সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, এবং তাঁর বান্দাহ্দের তা চিনিয়ে দিয়েছেন।

এ মতের সমর্থনে আলোচনাঃ

হযরত সূদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, حدود الله এর অর্থ মহান আল্লাহ্র নির্ধারিত শর্তসমূহ। কেউ কেউ বলেন যে, حدود الله এর অর্থ মহান আল্লাহ্র নাফরমানী, যারা এ মত পোষণ করেন তারা নিম্নোক্ত রিওয়ায়েত দলীল হিসাবে পেশ করেন। হযরত যাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত, حدود الله এর অর্থ–মহান আল্লাহ্র নাফরমানী, অর্থাৎ ই'তিকাফরত অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করা।

মহান আল্লাহ্র বাণী– كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ اٰيٰتِه لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ অর্থঃ এভাবে আল্লাহ্ তাঁর নির্দেশনাবলী মানব জাতির জন্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাতে তারা সাবধান হয়ে চলতে পারে। ব্যাখ্যাঃ হে মানব জাতি, যেভাবে আমি তোমাদের জন্য রোযার অপরিহার্যতা, এর সময় সীমা, বাড়ীতে অবস্থান ও রুগ্ন অবস্থায় রোযার বিধানাবলী এবং মসজিদে ই'তিকাফের অবস্থায় তোমাদের জরুরী বিষয়সমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি। অনুরূপভাবে আমি আমার বিধানসমূহ হালাল–হারাম, আদেশ–নিষেধ এবং আমার নির্ধারিত সীমাসমূহ ও আমার কিতাবের মধ্যে এবং আমার রাসূলের মাধ্যমে সমস্ত বিশ্ববাসীর জন্য বর্ণনা করে দিয়েছি, যেন তাঁরা আয়াতে বর্ণিত হারাম এবং নিষিদ্ধ কাজসমূহ বর্জন করে, আমার নাফরমানী, অসন্তুষ্ট এবং গযব থেকে বেঁচে থাকতে পারে এবং পরহিয করতে পারে ফলে তারা যেন আল্লাহ্ ভীরু হতে পারে।

মহান আল্লাহ্র বাণী–

وَ لاَ تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًامِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَ اَ نْتُمْ تَعْلَمُوْنَ –

অর্থঃ "তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ–সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো

না এবং মানুষের ধন–সম্পত্তি জেনে–শুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে তা শাসকদের নিকট পৌঁছে দিয়ো না।" (সূরা বাকারা ঃ ১৮৮)

ব্যাখ্যাঃ তোমরা অন্যায়ভাবে একে অন্যের ধন–সম্পদ গ্রাস করো না। এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক অন্যায়ভাবে কারোও সম্পদ গ্রাস না করার আদেশ দিয়েছেন। তাই আল্লাহ্ পাক বিষয়টিকে এভাবে উল্লেখ করেছেন, যে ব্যক্তি নিজের ভাইয়ের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস, তার দৃষ্টান্ত হলো সে ব্যক্তির ন্যায় যে তার নিজের সম্পদ অন্যায় ভাবে বিনষ্ট করে। এভাবে তুলনা করার বহু নজীর কুরআন পাক বিদ্যমান আছে। যেমন, ইরশাদ হয়েছে। (১)...... وَ لاَ تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ এর ব্যাখ্যা হচ্ছে **لا يلمز بعضكم بعضا** (অর্থাৎ তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না)। (সূরা হুজুরাত ঃ ১১) (২)। وَ لاَ تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ এর ব্যাখ্যা হল, **لا يقتل بعضكم بعضا** (অর্থাৎ তোমরা একে অপরকে হত্যা করো না)। (সূরা নিসাঃ ২৯)। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনগণকে পরস্পর "ভাই ভাই" ঘোষণা করেছেন। কাজেই ভাইকে হত্যাকারী আত্ম হত্যাকারীরই শামিল এবং ভাইয়ের দোষ বর্ণনাকারী নিজের দোষ বর্ণনাকারীরই শামিল। অনুরূপভাবে নিজের **نقس** কে **اخوة** দ্বারা এবং **اخوة** কে **نفس** এর দ্বারা ব্যক্ত করার প্রক্রিয়াও আরবদের মধ্যে প্রচলিত আছে। যেমন তারা বলেন, **اخـى و اخوك اينا ابطش** অর্থাৎ **انا و انت نصطرع فننظرا بينا اشد** আমি এবং তুমি লড়াই করে দেখব আমাদের মধ্যে অধিক শক্তিশালীকে? এখানে বক্তা নিজের নাফ্সকে **اَخٌ** (ভ্রাতা) দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। কেননা ভাই মূলতঃ নিজের মতই জনৈক কবি বলেছেন,

اخي و اخوك ببطن النسبة + و ليس لنا من معد غريب

উল্লেখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা ঃ "তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। অন্যায়ভাবে গ্রাস করার অর্থ, মহান আল্লাহ্‌র বর্ণিত হালাল পদ্ধতি বর্জন করে অন্য কোন পদ্ধতিতে গ্রাস করা। وَ تُدْلُوْا بِهَا اِلَى الْحُكَّامِ এর ব্যাখ্যাঃ "তোমরা অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পত্তি আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্য ক্ষমতাসীনদেরকে সম্পদের দ্বারা প্রভাবিত করো না। بِالْاِثْمِ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ এ বর্ণিত بِالْاِثْمِ এর অর্থ, ঐ হারাম পদ্ধতি যা আমি তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করে দিয়েছি। وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ এর ব্যাখ্যা, তোমরা এ মালগুলোকে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার ইচ্ছা পোষণ করছ, অথচ তোমাদের এ ইচ্ছা আল্লাহ তা'আলার অবৈধ ঘোষিত বস্তুর প্রতি দুঃসাহসিক ইচ্ছা এবং তোমরা জান যে, তোমাদের এ কাজ গর্হিত এবং সর্বতোভাবে অবৈধ। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি– وَ لاَ تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَ تُدْلُوْا بِهَا اِلَى الْحُكَّامِ সম্পর্কে বলেছেন যে, আয়াতটি ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে যার নিকট অপরের

ধন–সম্পদ রয়েছে এবং ঐ হকদার ব্যক্তির নিকট কোন প্রমাণ নেই। তখন ঐ লোকটি অস্বীকার করতঃ বিচারকের নিকট গিয়ে নিজেকে মুক্তরূপে সাব্যস্ত করছে। অথচ, সে জানে যে, ঐ দাবীদারের মাল তার নিকট রয়েছে। সুতরাং সে হারাম খায় এবং নিজেকে পাপীদের অন্তর্ভুক্ত করছে।

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে মহান আল্লাহ্‌র বাণী و تدلوا بها الى الحكام সম্পর্কে বর্ণিত, জুলুমকে বৈধ করার জন্য যুক্তিতর্কে লিপ্ত হয়ো না। হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে অন্যসূত্রে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

হযরত কাতাদা (র.) থেকে মহান আল্লাহ্‌র বাণী– وَ لاَ تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَ تُدْلُوْا بِهَا اِلَى الْحُكَّامِ এর ব্যাখ্যায় বলতেন, "অত্যাচারী হওয়া সত্ত্বেও যে তার প্রতিপক্ষের সাথে অন্যায়ভাবে যুক্তিতর্কে জড়িত হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না সে সত্য ও ন্যায়ের প্রতি ফিরে না আসে। হে মানব সন্তান! তোমরা জেনে রাখ, বিচারকের মীমাংসা তোমার জন্য হালালকে হারাম এবং অন্যায়কে ন্যায় করতে পারে না। কাযী তো নিজের বিবেকের মাধ্যমে সাক্ষীদের সাক্ষ্য অনুসারে বাহ্যিক অবস্থা দেখে বিচারের রায় দিয়ে থাকেন। তা ছাড়া তিনি তো মানুষ, সুতরাং তাঁর দ্বারা ভুল হওয়া সম্ভব এবং তার ভুল থেকে বেঁচে থাকাও সম্ভব, তোমরা স্মরণ রাখবে কাযীর ফয়সালা যদি সত্য ঘটনার উল্টো হয়, তাহলে কাযীর মীমাংসা বলেই ওকে বৈধ বলে মনে করবে না। প্রকৃতপক্ষে, এ বিবাদ থেকেই গেল। কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ্ দ'ুজনকেই একত্র করবেন এবং অন্যায়কারীদের উপর হকদারদেরকে বিজয়ী করে তাদের হক অন্যায়কারীদের নিকট হতে আদায় করিয়ে দেবেন এবং দুনিয়ায় যে মীমাংসা করা হয়েছিল তার বিপরীত মীমাংসা করে তার পুণ্যসমূহ হতে হকদারকে তার বিনিময় দেওয়াইয়া দিবেন।

হযরত কাতাদা (র.) থেকে মহান আল্লাহ্‌র বাণী– و تد لوا بها الى الحكام সম্পর্কে বর্ণিত, তুমি অত্যাচারী এ কথা জানা সত্ত্বেও তুমি তোমার ভাইয়ের ধন–সম্পত্তি বিচারকের নিকট পেশ করিও না। কেননা, বিচারকের মীমাংসা তোমার জন্য হারাম বস্তুকে হালাল করতে পারবে না। হযরত সূদ্দী (র.) থেকে আল্লাহ্‌র বাণী–وَ لاَ تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَ تُدْ لُوْا بِهَا اِلَى الْحُكَّامِ لِتَاْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَ اَ نْتُمْ تَعْلَمُوْنَ সম্পর্কে বর্ণিত এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তির সম্পদ আত্মসাৎ করার লক্ষ্যে তার সঙ্গে ঝগড়া করে, আর সে যে জালিম, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির। এ সম্পর্কে সে অবগত। এ মর্মেই ইরশাদ হয়েছে– و تد لوا بها الى الحكام

হযরত ইকরামা (রা.) থেকে বর্ণিত– ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل আয়াতাংশ ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে প্রযোজ্য যে খরিদ করার পর তা ফিরিয়ে দেয় এবং ফিরিয়ে নেয় তার মূল্য। হযরত ইবনে যায়দ (র.) থেকে বর্ণিত মহান আল্লাহ্‌র বাণী– وَ لاَ تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَ تُدْلُوْا بِهَا اِلَى الْحُكَّامِ

এর ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, কলহ প্রিয় লোকেরা অপরের বির্তকে আত্মসাৎ নিমিত্ত বিচারকের নিকট মুকাদ্দমা দায়ের করতো। এরপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন-- **يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم** '(হে মু'মিনগণ ! তোমারা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না; কিন্তু তোমাদের পরস্পর রাযী হয়ে ব্যবসা করা বৈধ)' এবং বললেন, এও এক প্রকার জুয়া, জাহেলী যুগে লোকেরা এ ধরনের কর্মকান্ড করে থাকত। মূলতঃ **ادلاء** এর অর্থ রশিতে বাঁধা বালতি কূপের মাঝে নিক্ষেপ করা। এ কারণেই প্রমাণকারী ব্যক্তির প্রমাণটি যখন এমন হয় যে, মুকাদ্দমার মাঝে এ তার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে যেমন, কূপ থেকে পানি উত্তোলনকারী ব্যক্তির সাথে বালতিটি জড়িত, যে বালতিটি তিনি রশির মাধ্যমে কূপে নিক্ষেপ করেছেন ; তখন দাবী প্রমাণকারী ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বলা হয়, **ادلى بحجة كيت و كيت** অর্থাৎ তুমি তোমার অমুক অমুক প্রমাণ পেশ কর কাজেই আরবী ভাষাভাষী লোকেরা প্রমাণ পেশ করা এবং রশির মাধ্যমে বালতি কূপে নিক্ষেপ করণের ক্ষেত্রে বলে থাকেন যে,

ادلى فلان بحجتـه فـهـو يد لى بها ادلاء و اد لى د لو ه فى البشر فهـو يـد لبها ادلاء

وَ تُدْ لُوْا بِهَا اِلَى الْحُكَّامِ আয়াতাংশে বর্ণিত **تَد لُوا** শব্দের মাঝে দুই ধরনের **اعراب** (স্বর চিহ্ন) হতে পারে। এক **و تد لوا** কে **وَ لاَ تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ** এর উপর **عطف** করে জযম দেয়া। এ হিসাবে আয়াতায়শের **وَ لاَ تُدْ لُوْا بِهَا اِلَى الْحُكَّامِ** হবে প্রকাশ থাকে যে, হযরত উবায় (রা.)–এর কিরাআতের মধ্যে আয়াতাংশটি **وَلاَ تُدْ لُوْا بِهَا اِلَى الْحُكَّامِ** তথা **تكرار حرف نهى** এর সাথে বিদ্যামান। দুইঃ **و تدلوا** কে **ظرف** এর ভিত্তিতে যবর দেয়া। এ হিসাবে এর অর্থ হবে, **وَ لاَ تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَ تُدْلُوْا بِهَا اِلَى الْحُكَّامِ** যেমন জনৈক কবি বলেছেন, **لاَ تَنْهَ عَنْ خُلُقٍ وَ تَاْتِىَ مِثْلَهُ – عَارٌ عَلَيْكَ اِذَا فَعَلْتَ عَظِيْمٌ** অর্থাৎ **لا تنه عن خلق و انت تاتى مثله** মোট কথা হল, আয়াতাংশে **انتم** শব্দটি উহ্য আছে যেমন কবিতাংশে **انت** শব্দটি উহ্য আছে।

ইমাম তাবারী বলেন, উভয় কিরাআতের মাঝে হযরত উবায় (রা.) কিরাআত অনুপাতে **تد لوا** কে জযম পড়াই হচ্ছে তাকে যবর দিয়ে পড়া থেকে উত্তম।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী–

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ – قُلْ هِىَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَ الْحَجِّ وَ لَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ

تَأْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُرِهَا وَ لٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى - وَ اْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ -

অর্থঃ "হে রাসূল! তারা নতুন চাঁদ সম্বন্ধে আপনাকে প্রশ্ন করছে আপনি বলুন, এ চাঁদ মানুষের জন্য সময় নির্ধারক ও হজ্জের সময় নিরূপক। আর তোমরা ঘরের পিছন দরজা দিয়ে প্রবেশ করো, তাতে কোনো পুণ্য নেই, বরং পুণ্য সে ব্যক্তির, যে পরহিযগারী এখতিয়ার করেছে। আর তোমরা ঘরের দরজা দিয়েই প্রবেশ করো এবং আল্লাহ্কে ভয় করো, তোমরা সফলকাম হতে পারবে।" (সূরা বাকারাঃ ১৮৯)

বর্ণিত আছে যে, চাঁদের বাড়তি-কমতি এবং এর পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়। তখন আল্লাহ্ তা'আলা সে প্রশ্নের জবাবে উক্ত আয়াত নাযিল করেন।

এ সম্পর্কে কতিপয় হাদীস নিম্নে প্রদত্ত হলঃ

হযরত কাতাদা (র.) থেকে মহান আল্লাহ্র বাণী- يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ قُلْ هِىَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ -এর শানে নুযূল সম্পর্কে বর্ণিত, জনগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, চাঁদের অবস্থা এরূপ কেনো করা হয় ? জবাবে আল্লাহ্ পাক এ আয়াত নাযিল করেন এবং ইরশাদ করেন। তা মানুষের জন্য সময় নির্দেশক। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের রোযা, ইফতার, হজ্জ, স্ত্রীদের ইদ্দত এবং ঋণ ইত্যাদির অঙ্গীকারের সময়কাল নিরূপণের জন্য চাঁদ তৈরী করেছেন, আল্লাহ্ পাকই উত্তমরূপে অবগত রয়েছেন যে, তাঁর সৃষ্টির কোন্ সুবিধার জন্য তা সৃষ্টি করা হয়েছে।

হযরত রবী (র.) থেকে বর্ণিত, লোকেরা নবী করীম (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন যে, চাঁদকে কেন সৃষ্টি করা হয়েছে? জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেলন يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ قُلْ هِىَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَ الْحَجِّ লোকে তোমাকে নতুন চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করে, বল তা মানুষ ও হজ্জের সময় নির্দেশক, অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের রোযা, ইফতার, হজ্জ, তাদের স্ত্রীদের ইদ্দত এবং ঋণ পরিশোধের সময়কাল নিরূপণের জন্য তাকে তৈরী করেছেন।

হযরত কাতাদা (র.) থেকে মহান আল্লাহ্র বাণী- **مواقيت للناس و الحج** এ ব্যাখ্যায় বর্ণিত চাঁদ মুসলমানদের হজ্জ রোযা এবং ইফতারের জন্য সময় নির্দেশক।

হযরত ইবনে জুরায়জ (র.) থেকে বর্ণিত লোকেরা বলাবাল করতে লাগল যে, এ চাঁদ কেন সৃষ্টি করা হয়েছে ? আল্লাহ্ তা'আলা এর জবাবে নাযিল করেন- يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ قُلْ هِىَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ অর্থাৎ জনগণ আপনাকে নতুন চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করে, আপনি বলুন তা মানুষের জন্য সময় নির্দেশক, অর্থাৎ তা তাদের রোযা, ইফতার এবং হজ্জের সময় নির্দেশক। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)

বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের হজ্জের সময় স্ত্রীদের ইদ্দত এবং ঋণ আদায়ের সময় নিরূপণের জন্য চাঁদ তৈরী করেছেন।

হযরত সূদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত তিনি يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ قُلْ هِىَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন তা তালাক, হায়েয এবং হজ্জের জন্য সময় নির্দেশক। হযরত যাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত তিনি يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ قُلْ هِىَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন তা মানুষের ঋণ পরিশোধ করা হজ্জ পালন করা এবং মহিলাদের ইদ্দত পালান করার জন্য সময় নির্দেশক।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে চাঁদ সম্বন্ধে প্রশ্ন করার পর- يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ قُلْ هِىَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ- আয়াতখানা নাযিল হয়, এর দ্বারা লোকেরা ঋণ পরিশোধ করার সময়কাল, মহিলাদের ইদ্দত এবং মুসলমানদের হজ্জের সময় সম্পর্কে অবগতি লাভ করত।

হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি মহান আল্লাহ্র বাণী- مواقيت للناس সম্পর্কে জিজ্ঞেসিত হবার পর বলেছেন, তা মাসের সময় কাল-নির্দেশক। মাস কখনো ত্রিশ দিনে যায়, আবার কখনো যায় ঊনত্রিশ দিনে, এ সময় তিনি তার বৃদ্ধাঙ্গুলিটি ঘুটিয়ে ফেলেছিলেন। এরপর তিনি বললেন, তা দেখে রোযা রাখবে এবং তা দেখে ঈদ উদ্যাপন করবে। যদি মেঘের কারণে চাঁদ দেখতে না পাও, তাহলে ত্রিশ দিন পুরা করবে। উল্লিখিত বর্ণনার আলোকে এ আয়াতের ব্যাখ্যাঃ হে মুহাম্মদ (সা.)! তারা আপনাকে নতুন চাঁদ, এর উদয়-অস্ত, বাড়া-কমা এবং পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে এবং তাঁরা প্রশ্ন করে যে, কি কারণে চন্দ্র সূর্যের মাঝে এ ব্যতিক্রম অবস্থা যে, সূর্য সর্বদা এক অবস্থায়ই থাকে, এর মাঝে কোন বাড়তি ও কমতি নেই, অথচ চন্দ্র কখনো বাড়ে আবার কখনো কমে ? হে রাসূল ! আপনি বলুন, চন্দ্র-সূর্যের মাঝে এ ব্যতিক্রম তোমাদের প্রতিপালকই করে দিয়েছেন। কারণ, তিনি তাকে তোমাদের জন্য এবং তোমাদের ব্যতীত সমগ্র মানব জাতির জন্য সময় নির্দেশক বানিয়েছেন। এর উদয়-অস্ত এবং বাড়া কমা এর ভিত্তিতে তোমরা জীবিকার্জনের পথ অবলম্বন কর এবং নতুন চাঁদ উদয়ের দ্বারা তোমরা ঋণ পরিশোধের, ইজারার, তোমাদের স্ত্রীদের ইদ্দতের, রোযার এবং ইফতারের সময় সম্পর্কে অবগতি লাভ করতে পার। তাই তা মানুষের জন্য সময় নির্দেশক।

মহান আল্লাহ্র বাণী و الحج এর ব্যাখ্যা এর অর্থ তোমাদের হজ্জের সময়ের জন্যও চাঁদকে আল্লাহ্ তা'আলা সময় নির্দেশক বানিয়েছেন। তাই তোমরা এর দ্বারা হজ্জ ও হজ্জের অনুষ্ঠানাদির সময়কাল সম্পর্কে জানতে পারো। মহান আল্লাহ্র বাণী- وَ لَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَأْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَ لٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى - وَ اْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ - এর ব্যাখ্যাঃ পিছনের দরজা দিয়ে তোমাদের গৃহে প্রবেশ করাতে কোন কল্যাণ নেই। কিন্তু কল্যাণ ঐ ব্যক্তির জন্য যে

পরহিযগারী অবলম্বন করে, তোমরা সম্মুখ দরজা দিয়ে গৃহে প্রবেশ কর। তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর, হয়তো তোমরা সফলকাম হতে পারবে। কথিত আছে যে, এ আয়াত ঐ সমস্ত লোকদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে, যারা ইহ্‌রাম অবস্থায় সম্মুখ দ্বার দিয়ে গৃহে প্রবেশ করত না।

যাঁরা এমত পোষণ করেন, তাদের আলোচনা ঃ

হযরত বারা (রা.) বর্ণিত মদীনাবাসী আনসারদের মধ্যে প্রাক ইসলামী যুগে এ প্রথা ছিল যে, তাঁরা হজ্জ সমাপনের পর বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করে পিছনের দরজা দিয়েই গৃহে প্রবেশ করত। বর্ণনাকারী বলেন, একদিন একজন আনসারী ব্যক্তি সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে সম্মুখ দ্বার দিয়ে গৃহে প্রবেশ করল। তার এ কর্মের ফলে লোকেরা তাকে উচ্চ–বাচ্য করলে এ আয়াত নাযিল হয়– وَ لَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا "পশ্চাৎ দিক দিয়ে তোমাদের গৃহে প্রবেশ করাতে কোন কল্যাণ নেই"। হযরত বারা (রা.) থেকে বর্ণিত জাহেলী যুগে এ প্রথা ছিল যে,মানুষ ইহ্‌রামের অবস্থায় থাকলে পশ্চাৎ দিক দিয়ে গৃহে প্রবেশ করত সম্মুখে দ্বার দিয়ে গৃহে প্রবেশ করত না, এরই প্রেক্ষিতে নাযিল হয়– وَ لَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا 'পিছন দরজা দিয়ে তোমাদের গৃহে প্রবেশ করাতে কোন কল্যাণ নেই।' হযরত কায়সা ইবনে যুবায়র (রা.) থেকে বর্ণিত, অজ্ঞতার যুগে এ প্রথা ছিল যে, লোকেরা ইহ্‌রামরত অবস্থায় বাড়ীতে এবং ঘরে মূল গেইট দিয়ে প্রবেশ করত না। একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও তাঁর সাহাবিগণ একটি বাড়ীতে প্রবেশ করলেন। এ সময় হযরত রিফ'আ ইবনে তাবূত (রা.) নামক এক আনসারী ব্যাক্তি প্রাচীর ডিংগিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর নিকট গমন করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বাড়ী অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) ঘরের দরজা দিয়ে বের হলে রিফা'আ ও তাঁর সাথে বের হলেন। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর রিফা'আকে প্রশ্ন করলেন, কেন তুমি এরূপ করলে? জবাবে তিনি বললেন, আপানাকে বের হতে দেখে আমি ও বের হয়ে গিয়েছি, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, আমি তো এক সাহসী পুরুষ। এ কথা শুনে তিনি বললেন, যদি আপনিও সাহসী পুরুষ হন, তাতে কোন অসুবিধা নেই। কারণ, আমাদের ধর্ম তো একই। তারপর আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন নাযিল করলেন,– وَ لَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَ لٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى وَ اْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا (পিছনের দরজা দিয়ে গৃহে প্রবেশ করাতে তোমাদের জন্য কোনো কল্যাণ নেই। কিন্তু কল্যাণ তার জন্য যে তাকওয়া অবলম্বন করে)। কাজেই তোমরা সামনের দরজা দিয়ে গৃহে প্রবেশ করো। হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে মহান আলাহ্‌র বাণী– وَ لَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا সম্পর্কে বর্ণিত তিনি বলতেন, পিছনের দিক থেকে ঘরে আলো আসার ছিদ্র পথে তোমাদের গৃহে প্রবেশ করাতে কোন কল্যাণ নেই। অজ্ঞতার যুগে লোকেরা ঘরের পেছনের দিকে এরূপ দরজার ব্যবস্থা রাখত। ইসলাম এ ধরনের প্রবেশ পদ্ধতিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে সামনের

দরজা দিয়ে গৃহে প্রবেশ করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেয়। হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে অনরূপ বর্ণনা রয়েছে। হযরত ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণিত হিজাজবাসী লোকেরা ইহ্রাম অবস্থায় নিজেদের ঘরে সামনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করত না বরং পিছনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করত। তাই নাযিল হয়– **ولكن البر من اتقى** বরং কল্যাণ হলো তার জন্য যে তাকওয়া অবলম্বন করে।

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে আল্লাহ্র বাণী– **وَ لَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَ لٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى وَ اْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا** – সম্পর্কে বর্ণিত মুশরিকদের এ প্রথা ছিল যে, তাদের কোন ব্যক্তি যখন ইহ্রামের অবস্থায় থাকত, তখন সে তার নিজগৃহের পশ্চাৎ দিক দিয়ে আলো প্রবেশের জন্য একটি ছিদ্র করে নিত এবং পরে একটি সিঁড়ি বানিয়ে তার মাধ্যমে ঘরে প্রবেশ করত। এ সময় একবার জনৈক মুশরিক ব্যক্তিকে সাথে নিয়ে রাসূল (সা.) তাশরীফ আনলেন এবং দরজা দিয়ে প্রবেশ করার উদ্দেশ্যে দরজার কাছে গেলেন এবং দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন। তারপর আগন্তক লোকটি আলো আসার পথ দিয়ে গৃহে প্রবেশ করার উদ্দেশ্যে সামনের দিকে চলতে লাগাল। রাসূল (সা.) বললেন, তোমার কি হলো ? তিনি বললেন, আমি এক সাহসী পুরুষ। তখন রাসূল (সা.) বললেন, আমিও তো এক সাহসী পুরুষ।

হযরত যুহরী (র.) থেকে বর্ণিত, আনসারী লোকেরা 'উমরার ইহ্রাম বাধার পর তাদের এবং আকাশের মধ্যবর্তী কোন বস্তুকেই আর হালাল মনে করত না, এতে তাদের বেশ অসুবিধা হতো। তাদের মধ্যে একটি রেওয়ায ছিল যে, কোন ব্যক্তি বিলম্বে উমরার উদ্দেশ্যে বের হবার পর তার কোন প্রয়োজন দেখা দিলে সে বাড়ীতে ফিরে আসত। তবে দ্বার দিয়ে গৃহে প্রবেশ করত না। তাদের এবং আকাশের মাঝে গৃহ দ্বারের ছাদের অন্তরালের কারণে। বরং গৃহের পিছনের দিক দিয়ে দেওয়াল খুলে দেয়া হত। অমনি সে ঘরে প্রবেশ করে নিজের প্রয়োজন মিটানোর জন্য আদেশ করত। সাথে সাথে সে (তার স্ত্রী) ঘর থেকে বের হয়ে তার (স্বামীর) কাছে ছুটে যেত। (প্রয়োজনীয় বস্তু দেয়ার জন্য)। পরবর্তীকালে আমরা জানতে পেলাম যে, হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় রাসূল (সা.) "উমরার ইহ্রাম বেধে হুজরায় প্রবেশ করেছিলেন। এবং তার পেছনে পেছনে প্রবেশ করেছিলেন বনী সালিমার এক আনসারী ব্যক্তি। তখন রাসূল (সা.) তাকে লক্ষ্য করে বললেন, আমিও তো এক সাহসী পুরুষ। (বর্ণনাকারী যুহরী বলেন, হুমুসের অন্তর্ভুক্ত লোকেরা এ সব বিষয়াদির কোন তোয়াক্কা করত না)। তখন আনসারী লোকটি বললেন, আমি ও তো এক সাহসী পুরুষ ; আমি ও তো আপনার দীনের অনুসারী। এরপর আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন নাযিল করলেন– **وَ لَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا** 'পিছনের দিক থেকে তোমাদের গৃহে প্রবেশ করাতে কোন কল্যাণ নেই।'

হযরত কাতাদা (র.) থেকে আল্লাহ্র বাণী– **وَ لَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوْتَ** এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে

বর্ণিত, জাহেলী যুগের আনসারদের এ মহল্লার লোকদের মধ্যে একটি প্রথা ছিল যে, তাঁরা হজ্জ অথবা 'উমরার ইহ্‌রাম বাধার পর কখনো দ্বার দিয়ে গৃহে প্রবেশ করত না। বরং প্রাচীর ডিংগিয়ে তারা গৃহে প্রবেশ করত। পরে তারা ইসলাম গ্রহণ করলেন, কিন্তু তাঁদের প্রাচীনতম প্রথা বন্ধ হল না। তাই মহান আল্লাহ্ এ আয়াত নাযিল করলেন এবং তাদেরকে এ কাজ করে নিষেধ করে দিলেন। আর তাদেরকে জানিয়ে দিলেন যে, তাদের এ কাজে কোন কল্যাণ নেই। সাথে সাথে তাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, তারা যেন দ্বার দিয়ে গৃহে প্রবেশ করে।

হযরত সূদ্দী (র.) থেকে মহান আল্লাহ্‌র বাণী– وَ لَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِ هَا এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত প্রাচীনকালে আরবীয় লোকেরা হজ্জের ইহ্‌রাম বাধার পর নিজেদের গৃহে কখনো সামনে দরজা দিয়ে প্রবেশ করত না। বরং ঘরের পিছনের দরজা দিয়ে ছিদ্রপথ করে তারা নিজেদের গৃহে প্রবেশ করত। পরবর্তীকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বিদায় হজ্জ পালন করে পায়ে হেঁটে বাড়ীর দিকে রওয়ানা করলেন। এ সময় তাঁর সাথে ছিলেন একজন আরবীয় মুসলিম ব্যক্তি, হাঁটতে হাঁটতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বাড়ীর দরজায় পৌছলে লোকটি তাঁর পশ্চাতে থেকে দাঁড়ান এবং গৃহে প্রবেশ করতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করে বলেন যে, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমি তো এক সাহসী পুরুষ আমি তো মুহরিম। তদানীন্তনকালে এ ধরনের আচরণকারী লোকদেরকে আরব দেশীয় লোকের (হুমুস্) সাহসী পুরুষ বলে অভিহিত করত। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, আমিও তো এক সাহসী পুরুষ। এ কথা বলে লোকটিকে গৃহে প্রবেশ করতে বল্লে সে গৃহে প্রবেশ করে। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ পাক নাযিল করেছেন– وَ اْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا 'তোমরা সামনের দরজা দিয়ে গৃহে প্রবেশ কর।'

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে মহান আল্লাহ্‌র বাণী– وَ لَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَ لٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى وَ اْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا – এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত মদীনাবাসী লোকেরা কোন বিষয়ে শত্রু পক্ষ হতে আশংকাগ্রস্ত হলে সংগে ইহ্‌রাম বেধে সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ হয়ে যেত। তাঁরা ইহ্‌রাম বাধার পর সামনের দরজা দিয়ে গৃহে পবেশ না করে পিছনের দিক দিয়ে একটি ছিদ্রপথ করে গৃহে প্রবেশ করত। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন মদীনায় হিজরত করলেন সে সময় সেখানে এক ইহ্‌রাম করা ব্যক্তি ছিলেন। মদীনাবাসী লোকের একটি বাগানকে حش (হুশ) নামকরণ করেছিলেন।. রাসূলুল্লাহ্

(সা.) একটি বাগানে প্রবেশ করলেন। তিনি বাগানের সম্মুখ দ্বার দিয়ে প্রবেশ করলেন। তাঁর সাথে সাথে প্রবেশ করলেন এক ইহ্‌রাম করা ব্যক্তি। এ সময় পেছনের দিক থেকে এক ব্যক্তি তাকে সম্বোধন করে বলতে লাগল হে অমুক ! মুহ্‌রিম হওয়া সত্ত্বেও তুমি এভাবে প্রবেশ করলে ? জবাবে সে বলল, আমি তো এক সাহসী পুরুষ। একথা বলার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে সম্বোধন করে তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আপনি মুহ্‌রিম হলে আমিও মুহ্‌রিম। আপনি সাহসী পুরুষ হলে আমিও সাহসী পুরুষ। এ ঘটনার পর আল্লাহ্ পাক এ আয়াত নাযিল করে মু'মিনদের জন্য সামনের দরজা দিয়ে গৃহে প্রবেশ করাকে বিধিসম্মত করে দেন।

হযরত রবী (র.) থেকে মহান আল্লাহ্‌র- **و ليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها و لكن البر من اتقى و اتوا البيوت من ابوابها** এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত, প্রাচীনকালে মদীনাবাসী এবং অন্যান্য লোকেরা ইহ্‌রাম বাধার পর পিছনের দরজা দিয়ে গৃহে প্রবেশ করত। অর্থাৎ ইহ্‌রাম বাধার পর তারা পিছনের দিক দিয়ে প্রাচীর ডিংগিয়ে গৃহে প্রবেশ করত। এ ছিল তাদের অভ্যাস, একবার নবী করীম (সা.) এক আনসারী ব্যক্তির গৃহে প্রবেশ করলেন। এ সময় এক মুহ্‌রিম ব্যক্তি ও তার পেছনে উক্ত গৃহে প্রবেশ করলেন, উপস্থিত লোকেরা তার এ কাজকে পসন্দ করল না। তাই তারা বলাবলি করতে লাগল যে, এ লোকটি পাপাচারী। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ঐ লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন যে, কেন তুমি দরজা দিয়ে গৃহে প্রবেশ করলে ? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আপনাকে প্রবেশ করতে দেখে আপনার পেছনে পেছনে আমিও প্রবেশ করেছি। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, আমি তো এক সাহসী পুরুষ। বর্ণনাকারী বলেন, তৎকালে কুরায়শ গোত্রীয় লোকেরা নিজেদের বীরত্বের কথা দাবী করতো। নবী করীম (সা.)-এর কথা শুনে-আনসারী লোকটি বললেন, আপনার দীনই তো আমার দীন। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন, **و ليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها** 'পিছন দিক দিয়ে তোমাদের গৃহে প্রবেশ করাতে কোন পুণ্য নেই।'

হযরত ইবনে জুরায়জ (র.) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি 'আতা (র.)-কে-মহান আল্লাহ্‌র বাণী-**و ليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها** এর শানে নুযূল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার পর তিনি বললেন, জাহেলী যুগে লোকেরা পিছন দিক দিয়ে গৃহে প্রবেশ করতো এবং এটকে সওয়াবের কাজ বলে মনে করতো। তাদের এহেন ভ্রান্ত ধারণাকে নাকচ করে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন, তারা যেন সম্মুখ দ্বার দিয়ে গৃহে প্রবেশ করে। হযরত ইবনে জুরায়জ (র.) বলেন, আমাকে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে কাছীর (র.) জানিয়েছেন যে, তিনি হযরত মুজাহিদ (র.)-কে একথা বলতে শুনেছেন যে, এ আয়াত ঐ আনসারী লোকদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা পিছন দিক দিয়ে গৃহে প্রবেশ করত এবং তা সওয়াবের কাজ বলে ধারণা করত।

উল্লেখিত হাদীস ও রিওয়াতেসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা "হে লোক সকল, ইহ্‌রাম অবস্থায় পিছন দিক দিয়ে তোমাদের গৃহে প্রবেশ করাতে কোন কল্যাণ নেই। কিন্তু কল্যাণ আছে তাকওয়া অবলম্বন করাতে। যার ফলশ্রুতিতে সে আল্লাহ্‌কে ভয় করবে, হারাম কাজ থেকে বেঁচে থাকবে এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশিত ফারায়েয আদায় করতঃ তার আনুগত্য প্রকাশ করবে। পক্ষান্তরে পিছন দিক দিয়ে গৃহে প্রবেশ করাতে কোন সওয়াব নেই। সুতরাং তোমরা যেভাবে ইচ্ছা গৃহে প্রবেশ কর। চাই সম্মুখ দরজা দিয়ে হোক অথবা অন্য কোন রাস্তা দিয়ে হোক। যতক্ষণ পর্যন্ত না সে সম্মুখ দ্বার দিয়ে গৃহে প্রবেশ করাকে অবৈধ বলে বিশ্বাস করবে। কেননা, এ হেন চিন্তা-চেতনা তোমাদের জন্য জায়েয নেই। কারণ, এ কাজকে আমি তোমাদের জন্য অবৈধ করে দিয়েছি।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী-و اتقوا الله لعلكم تفلحون এর ব্যাখ্যাঃ "হে লোক সকল ! তোমরা আল্লাহ্‌র নির্দেশিত দায়িত্বে আঞ্জাম দিয়ে ও তার নিষেধকৃত কর্মকান্ড থেকে বেঁচে থেকো তাঁর পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করার মাধ্যমে তাঁকে ভয় কর। তাহলেই তোমরা সফলকাম হবে এবং তোমাদের দীনি চাহিদা পুরণ হবে। ফলে তোমরা জান্নাতে অনন্ত জীবন লাভ করবে এবং চিরস্থায়ী নিয়ামত লাভে ধন্য হবে। فَلَاحٌ শব্দের ব্যাখ্যা সম্পর্কে পূর্বে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

আল্লাহ্‌র বাণী-

وَ قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَ لاَ تَعْتَدُوْا اِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ -

অর্থঃ "যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তোমরাও আল্লাহ্‌র পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। কিন্তু সীমা লংঘন করো না। আল্লাহ্ সীমালংঘনকারিগণকে ভাল বাসেন না।" (সূরা বাকারাঃ ১৯০)

এ আয়াত নাযিল হবার কারণ সম্পর্কে ব্যাখ্যাকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ বলেন, মুশারিকদের সাথে মুসলমানদের লড়াই করার ব্যাপারে এ আয়াতই মদীনাতে সর্ব প্রথম নাযিল হয়েছে। তাদের ধারণা যে, এ আয়াতেই মুশরিকদের যারা মুসলমানদের সাথে লড়াই করে তাদের সাথে লড়াই করার নির্দেশ এবং যারা লড়াই করে না তাদের সাথে লড়াই না করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তারপর সূরা বারাআতের একটি আয়াত দ্বারা এ হুকুমটি রহিত হয়ে যায়। এ মতের সমর্থনে যাঁদের বর্ণনা রয়েছে ঃ

হযরত রবী (র.) থেকে মহান আল্লাহ্‌র বাণী- وَ قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَ لاَ تَعْتَدُوْا اِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ সম্পর্কে বর্ণিত, যুদ্ধ সম্পর্কে এ আয়াতই সব প্রথম মদীনাতে অবতীর্ণ হয়েছে। এ আয়াত অবতীর্ণ হবার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) শুধু মাত্র ঐ সমস্ত লোকদের সাথে যুদ্ধ করতেন, যারা তার সাথে যুদ্ধ করতে আসতো এবং যারা তার সাথে যুদ্ধ করতো না তিনিও তাদের সাথে যুদ্ধ

করতেন না। এরপর সূরা বারাআত নাযিল হয়। বর্ণনাকারী আবদুর রহমান মদীনা তয়্যিবার কথা উল্লেখ করেননি।

হযরত ইবনে যায়দ (র.) থেকে মহান আল্লাহ্র বাণী– و قاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم সম্পর্কে বর্ণিত, এ আয়াত নিম্নের দু' টি আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গিয়েছে। আয়াত দু' টি হলো,

و قاتلوا المشركين كافة يقاتلونكم كافة অর্থাৎ তোমরা মুশরিকদের সাথে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করবে, যেমন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করে।

بَرَاءَةٌ مِنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ............اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ এ হলো আল্লাহ্ ও তার রাসূলের পক্ষ হতে সম্পর্কচ্ছেদ ....আল্লাহ্ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। (সূরা বারাআত ঃ ১–৫)

অন্যান্য মুফাসসীরগণ বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক মুসলমানদেরকে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন। তবে এ নির্দেশ রহিত হয়নি। শুধু কেবল মহিলা এবং নাবালেগ সন্তানদেরকে হত্যা না করার ব্যাপারে মুসলমানদের প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। বাকী অন্যদের বেলায় বিধান পূর্ববৎ বহাল আছে, কোন আয়াতের দ্বারা এ আয়াতের হুকুম মানসূখ হয়ে যায়নি। তাদের প্রামাণাদি নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

হযরত ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইয়াহ্ইয়া আল গাস্সানী থেকে বর্ণিত, আমি উমার ইবনে আবদুল আযীয (র.)–এর নিকট এ আয়াতের মর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার পর তিনি জবাবে লিখেছেন যে, এ আয়াতের নিষেধাজ্ঞা শিশু এবং মহিলাদের ব্যাপারে প্রযোজ্য। তাই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা তোমার জন্য সমীচীন নয়।

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে আল্লাহ্র বাণী و قاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم সম্পর্কে বর্ণিত, এ আয়াতে হযরত মুহাম্মদ (সা.)–এর সাহাবায়ে কিরাম কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে– و قاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلوا كم و لا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين সম্পর্কে বর্ণিত, যে তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, তোমরা মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ এবং ঐ সমস্ত লোকদেরকে হত্যা করতে পারবে না যারা তোমাদেরকে সালাম করে এবং নিজেদের হাত গুটিয়ে নেয়। যদি তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর তাহলে অবশ্যই তোমরা সীমালংঘন করলে।

হযরত সাঈদ ইবন আবদুল আযীয থেকে বর্ণিত, হযরত উমার ইবনে আবদুল আযীয (র.) আদী ইবনে আরতাত এর নিকট এ মর্মে একটি পত্র লিখলেন যে, আমি কুরআন শরীফের একটি আয়াত পেয়েছি, আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন যে, و قاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم و لا تعتدوا ان الله لا

يحب المعتدين উক্ত আয়াতের মর্ম "যারা তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না, তুমিও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না। অর্থাৎ মহিলা, শিশু এবং ধর্মযাজক লোকদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করবে না।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, উপরোক্ত দুই ধরনের ব্যাখ্যার মাঝে হযরত উমার ইবনে আবদুল আযীয (র.)–এর ব্যাখ্যাটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ। কেননা যে আয়াতের আদেশ রহিত না হবার সম্ভাবনা রয়েছে তা কেউ যদি রহিত হওয়ার দাবী উত্থাপন করে, যে দাবী সহীহ্ হওয়ার উপর কোন প্রমাণ নেই, তবে এ ধরনের দাবী স্বেচ্ছাচার ব্যতীত আর কিছুই নয়। আর স্বেচ্ছাচারিতা গ্রহণযোগ্য নয়। পূর্বে نسخ এর অর্থ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে এর পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন বলে মনে করি।

উপরোল্লিখিত ব্যাখ্যার আলোকে এ আয়াতের অর্থ এই যে, হে মু'মিনগণ তোমরা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ কর। আল্লাহ্র পথ তাই যা তিনি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন এবং আল্লাহ্র দীন তাই যা তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ বান্দাদেরকে লক্ষ্য করে বলতে চাচ্ছেন যে, তোমরা আমার আনুগত্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে এবং যে দীন আমি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করে দিয়েছি তার জন্য যুদ্ধ কর। যারা এ দীন থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে এবং হাতে মুখে যারা এ দীনের সাথে দাম্ভিকতা দেখায় তাদের যদি তারা কিতাবী হয়, তবে এ দীনের প্রতি এমনভাবে তাদেরকে ডাক যাতে তারা আমার ইবাদত করে অথবা জিযয়া প্রদান করে আনুগত্য স্বীকার করে। এ আয়াতে আল্লাহ্ তাদেরকে এ কথারও নির্দেশ দিয়েছেন যে, তারা যেন ঐ সমস্ত লোকদের সাথে যুদ্ধ করে যারা যুদ্ধ সক্ষম, ঐ সমস্ত মহিলা ও শিশুদের সাথে নয় যারা যুদ্ধ করতে সক্ষম নয়। কেননা মুসলিম যুদ্ধাগণ যখন জয়লাভ করবে তখন এরাতো তাদেরই সম্পদ এবং খাদিম হিসাবে থাকবে। মহান রাব্বুল আলামীন– وَ قَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ বলে এ দিকেই ইংগিত করেছেন। কেননা এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক যারা যুদ্ধ করছে না তাদের সাথে যুদ্ধ না করার অনুমতি দিয়েছেন। এ আয়াতের নির্দেশের প্রেক্ষিতেই রাসূল (সা.) মূর্তিপূজারী মুশরিকদের সাথে এবং আনুগত্য স্বীকার জিযয়া প্রদান করার শর্তে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করা হতে বিরত কিতাবীদের সাথে কখনো যুদ্ধে লিপ্ত হননি।

মহান আল্লাহ্র বাণী وَ لَا تَعْتَدُوْا এর অর্থ ঃ হে মু'মিনগণ ! যারা শিশু, মহিলা, কিতাবী ও অগ্নিপূজক, যারা তোমাদেরকে জিযিয়া (নিরাপত্তা কর) প্রদান করেছে তোমরা তাদেরকে হত্যা করো না। আল্লাহ্ পাক ঐ সমস্ত সীমালংঘনকারিগণকে ভাল বাসেন না, যারা মহান আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করে এবং আল্লাহ্ পাক যা তাদের উপর হারাম করেছেন তাকে হালাল মনে করে। অর্থাৎ মুশরিক মহিলাও শিশুদেরকে অবৈধভাবে হত্যা করে।

মহান আল্লাহর বাণী–

وَ اقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَ اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ وَ الْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ – وَ لاَ تُقَاتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقَاتِلُوْكُمْ فِيْهِ – فَاِنْ قٰتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ – كَذٰلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِيْنَ –

অর্থঃ "আর যেখানে তাদেরকে পাবে হত্যা করবে এবং যে স্থান হতে তার তোমাদেরকে বহিষ্কৃত করেছে তোমরাও সে স্থান হতে তাদেরকে বহিষ্কার করবে। অশান্তির সৃষ্টি হত্যা অপেক্ষা গুরুতর। মাসজিদুল হারামের নিকট তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে না। যে পর্যন্ত তারা সেখানে তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে, যদি তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তবে তোমরা তাদেরকে হত্যা করবে, এটাই কাফিরদের পরিণাম।" (সূরা বাকারা : ১৯১)

ব্যাখ্যাঃ হে মু'মিনগণ! মুশরিকদের যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে যথায় তোমরা আক্রান্ত হয়েছ, তথাই তাদেরকে হত্যা কর এবং যেখানে তোমাদের জন্য সম্ভব সেখানেই তোমরা তাদেরকে কতল কর, حيث ثقفتموهم বলে এ কথাই বুঝানো হয়েছে। الثقفة بالام এর অর্থ চালাক হওয়া, যেমন বলা হয় انه لثقف لقف আরবগণ এ বাক্যটি ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বলে থাকেন, যিনি লড়াই সম্বন্ধে সতর্ক এবং যুদ্ধ ক্ষেত্র সম্পর্কে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। তবে ثقيف শব্দের অর্থ অন্যটি। আর তা হলো تقويم অর্থাৎ বলিষ্ঠ হওয়া। এ হিসাবে و اقتلوهم حيث ثقفتموهم এর অর্থ, তোমরা তাদেরকে হত্যা কর যথায় তোমাদের সুযোগ হয় তাদেরকে হত্যা করা।

وَ اَخْرِجُوْهُمْ مِنْ اَخْرَجُوْكُمْ–এ আয়াংশে সে সকল মহাজিরগণের কথা উল্লেখ করেছেন। যাদেরকে তাদের মক্কায় অবস্থিত বাড়ী ঘর থেকে জোরপূর্বক বহিষ্কার করে দেয়া হয়েছে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা মুহাজিরগণকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেছেন যে, তোমরা কাফিরদেরকে বের করে দাও, যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ লিপ্ত, তারাই তোমাদেরকে তোমাদের বাড়ী ঘর থেকে বের করে দিয়েছে।

وَ الْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ এর ব্যাখ্যাঃ আয়াতাংশে বর্ণিত فتنة অর্থ মহান আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করা, এ হিসাবে এর অর্থ হবে আল্লাহ্ পাকের সাথে শরীক করা হত্যার চেয়েও গুরুতর অপরাধ। তবে ইতিপূর্বে আমি একথা বর্ণনা করেছি যে, আসলে فتنة হল ابتلاء এবং اختبار অর্থাৎ

পরীক্ষা। এ হিসাবে আয়াতাংশের অর্থ হবে মু'মিনের দীনি পরীক্ষা হলো, ইসলাম গ্রহণের পর পুনরায় এ শাশ্বত দীন থেকে ফিরে গিয়ে মুশরিক হয়ে যাওয়া। মুশরিক হয়ে যাওয়া দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে এবং হক্কের উপর অটল থেকে প্রাণ দেয়ার চেয়েও অতীব জঘন্য অপরাধ। যেমন বর্ণিত আছে যে, হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে মহান আল্লাহ্‌র বাণী- **وَ الْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ** এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত, মু'মিনের ধর্মত্যাগের করে মূর্তিপূজা অবলম্বন করা হত্যার চেয়েও কঠিনতম কাজ।

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে অনুরূপ আরেকটি বর্ণনা রয়েছে।

হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, **وَ الْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ** এর ব্যাখ্যা হচ্ছে, আল্লাহ্‌র সাথে শির্‌ক করা হত্যার চেয়েও গুরুতর অপরাধ।

হযরত কাতাদা (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

হযরত রবী (র.) থেকে বর্ণিত, **وَ الْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ** এর অর্থ আল্লাহ্ সাথে শির্‌ক করা হত্যার চেয়েও জঘন্যতম অপরাধ।

হযরত যাহ্‌হাক (র.) থেকে বর্ণিত, **وَ الْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ** আয়াতাংশে বর্ণিত থেকে শির্‌ক করাকে বুঝানো হয়েছে।

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত- **وَ الْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ** এর মধ্যে **الفتنة** এর অর্থ শির্‌ক।

হযরত যাহ্‌হাক (র.) থেকে- **وَ الْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ** এর অর্থ, মহান আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করা হত্যার চেয়েও মারাত্মক অপরাধ।

হযরত ইবনে যায়দ (র.) থেকে বর্ণিত- **وَ الْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ** এর মাঝে বর্ণিত **فتنة** থেকে কুফরী বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ **وَ لَا تُقَاتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقَاتِلُوْكُمْ فِيْهِ فَاِنْ قٰتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ - كَذٰلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِيْنَ** এর ব্যাখ্যাঃ এ আয়াতের পাঠ পদ্ধতিতে কিরাআত বিশেষজ্ঞগণের একাধিক মত রয়েছে। পবিত্র মক্কা ও মদীনার অধিকাংশ কিরাআত বিশেষজ্ঞের কিরাআত হল, **و لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قتلوكم فاقتلوهم** যার অর্থ হলো, হে মু'মিনগণ ! তোমরা প্রথমে মাসজিদুল হারামের নিকট মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করো না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। যদি তারা মাসজিদুল হারামের নিকট, হারাম শরীফের মধ্যে তোমাদের সাথে যুদ্ধ শুরু করে, তা হলে তোমরাও তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। কেননা, দুনিয়াতে হত্যা এবং আখিরাতে চিরস্থায়ী অবমাননাকেই আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের কুফরী এবং মন্দ কাজের শাস্তি হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। যেমন বর্ণিত আছে যে,

হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত–و لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه এ নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতেই মুসলমানগণ হারাম শরীফের ভেতর কখনো যুদ্ধ আরম্ভ করতেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা প্রথমে আরম্ভ করত। তারপর এ হুকুমটি রহিত হয়ে যায় পরবর্তী আয়াত و قاتلوهم حتى لا يكون فتنة এর দ্বারা। । এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাকবে যতক্ষণ না ফিত্না তথা শির্ক দূরীভূত হয় এবং মহান আল্লাহ্র দীন সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় অর্থাৎ যতক্ষণ না সকলের মুখে উচ্চারিত হতে থাকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্।' এ সত্যের জন্যই মহান আল্লাহ্র প্রিয় নবী লড়াই করেছিলেন এবং এর প্রতি–ই বিশ্বমানবকে আহ্বান করেছেন।

হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি–و لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قتلوكم فاقتلوهم আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ পাক তার প্রিয় নবীকে এ মর্মে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তিনি যেন মুশরিকদের সাথে মাসজিদুল হারামের নিকট যুদ্ধ না করেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা প্রথমে যুদ্ধ আরম্ভ করে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতের নির্দেশকে–

فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم (তারপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদেরকে যেখানে পাবে হত্যা করবে) আয়াতের দ্বারা রহিত করে দেন। এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রিয় নবীকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তিনি যেন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হবার পর মুশরিকদের বিরুদ্ধে অনুমোদিত ও অননুমোদিত স্থান এবং বায়তুল্লাহ্ শরীফের নিকটে লড়াই করেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা "আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মাবূদ নেই এবং নিশ্চয় মুহাম্মদ মুসতাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্র প্রেরিত পুরুষ" এ কথার সাক্ষ্য দেয়।

হযরত রবী (র.) থেকে বর্ণিত– و لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه মহান আল্লাহ্র এ নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানগণ হারাম শরীফের নিকট মুশরিকদের বিরুদ্ধে কখনো কোন যুদ্ধ করতেন না। তারপর আল্লাহ্র নির্দেশ–فاقتلوهم حتى لا تكون فتنة (তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে, যতক্ষণ না ফিত্না দূরীভূত হয়) এর দ্বারা পূর্বোক্ত আদেশ রহিত করে দেয়া হয়েছে। কোন কোন তাফসীরকার বলেন যে, এ আয়াতটি রহিত হয়নি। এ হলো এক মুহ্কাম আয়াত। তারা নিম্নের রিওয়ায়েতগুলোকে নিজেদের প্রমাণ হিসাবে পেশ করেন।

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তারা যদি হারাম শরীফের এলাকায় তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তা হলে তোমরাও তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। কারণ, এটাই কাফিরদের পরিণাম। তবে হারাম শরীফের এলাকায় তোমরা কখনো কাউকে হত্যা করবেন। হাঁ, যদি কেউ তোমার উপর সীমালংঘন

করে, তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাহলে তুমিও তার বিরুদ্ধে কর, যেমন সে তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। এ ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে কূফাবাসী অধিকাংশ কিরাআত বিশেষজ্ঞ আয়াতটিকে এ ভাবে পাঠ করেন– وَلاَ تَقَاتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقَاتِلُوْكُمْ فِيْهِ فَاِنْ قَتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ এ মর্মে যে, তোমরা তাদের প্রতি যুদ্ধ আরম্ভ করবে না, যতক্ষণ না তারা তোমাদের প্রতি যুদ্ধ শুরু করে।

এ মত যারা পোষণ করেন ঃ

হযরত হামযাতুয্যায়্যাত (র.) থেকে বর্ণিত, আমি আমাশ (র.)–কে জিজ্ঞেস করলাম যে, নিম্নোক্ত আয়াত–و لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه – فان قتلوكم فاقتلوهم كذالك جزاء الكفرين – فان انتهوا فان الله غفور رحيم – আপনি এ ভাবে তিলাওয়াত করেন কেন ? কারণ তারা মুসলমানদেরকে হত্যা করার পর মুসলমানগণ কি করে তাদেরকে হত্যা করবে ? জবাবে তিনি বললেন, আরবরা তাদের কোন ব্যক্তি নিহত হলে قُتِلْنَا এবং তাদের কোন ব্যক্তি প্রহৃত হলে ضُرِبْنَا বলে থাকেন। এ হিসাবে উল্লেখিত পাঠ প্রক্রিয়ায় কোন অসুবিধা নেই।

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, উভয় পঠন পদ্ধতির মধ্যে ঐ সমস্ত কিরাআত বিশেষজ্ঞের পঠন সর্বাধিক বিশুদ্ধ যারা وَ لاَ تُقَاتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقَاتِلُوْكُمْ فِيْهِ فَاِنْ قٰتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ পাঠ করেন। কেননা আল্লাহ্ পাক তাঁর নবী ও তাঁর সাহাবিগণকে যুদ্ধ করার অনুমতি প্রদান করার পর নবী করীম (সা.) ও তাঁর সাহাবিগণের সাথে মুশরিকদের যুদ্ধ করার অবস্থায় মুসলমানদেরকে তাদের এমন আনুগত্য করার জন্য নির্দেশ দেননি যে, তারা মুসলমানদের কাউকে হত্যা করার সুযোগ পায়। সুতরাং মুসলমানদের কেউ নিহত হবার পর তাদেরকে হত্যা করার অনুমতি প্রদান সম্বলিত কিরাআতটি ঐ কিরাআত হতে অবশ্যই উত্তম যা এর ব্যতিক্রম। বিষয়টি যেহেতু এমনই তাই এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রতিয়মান হচ্ছে যে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন মুসলমানদেরকে মুশরিক হত্যার যে নির্দেশ দিয়েছেন তা ঐ সময়ই কার্যকর হবে যদি হত্যাকান্ড প্রথমে মুশরিকদের পক্ষ সংগঠিত হয়। চাই তা মুসলমানদের কাউকে হত্যা করার পূর্বে হোক অথবা পরে হোক। তবে এ নির্দেশ আল্লাহ্ পাক নিম্নোক্ত আয়াত–وَ قَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لاَ تَكُوْنَ فِتْنَةٌ (তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যাবত ফিত্না দূরীভূত না হয়) এবং– فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ (মুশরিকদেরকে যেখানে পাবে হত্যা করবে) এবং আরো অন্যান্য আয়াতের দ্বারা আল্লাহ্ পাক এ আয়াতের আদেশ রহিত করে দিয়েছেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, উল্লেখিত আয়াতের আদেশ রহিত হবার কথা যারা বলেন তাদের কতিপয়ের কথা আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। তবে পূর্বে অনুল্লিখিত ব্যক্তি যাদের কথা এখন আমার মনে পড়ল তাদের মতামত নিম্নে উল্লেখ করা হল।

কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন– وَ لاَ تُقَاتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقَاتِلُوْكُمْ فِيْهِ এ বিধানটিকে–فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ (মুশরিকদেরকে যেখানে পাবে হত্যা করবে) আয়াত দ্বারা রহিত করা হয়েছে।

ইবনে যায়দ (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন– حَتّٰى يُقَاتِلُوْكُمْ فِيْهِ এর অর্থ হচ্ছে حتى يبدؤكم অর্থাৎ যতক্ষণ না তারা যুদ্ধ আরম্ভ করে। প্রাথমিক যুগে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ মুসলমানদের জন্য হারাম ছিল। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে তা বৈধ করে দেয়া হয়েছে। অদ্যবধি তা বৈধ আছে।

মহান আল্লাহ্র বাণী–

فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ –

অর্থঃ "যদি তারা বিরত হয়, তবে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।" (সূরা বাকারা ১৯২)

ব্যাখ্যা ঃ যে সমস্ত কাফির তোমাদের সাথে যুদ্ধ করছে,তারা যদি তোমাদের সাথে যুদ্ধ করা থেকে এবং আল্লাহ্কে অস্বীকার করা থেকে বিরত থাকে এবং এ সব কর্মকান্ড বর্জন করে ও তওবা করে, তবে তাদের থেকে যারা ঈমান আনয়ন করবে, শির্ক থেকে তওবা করবে এবং পূর্ববর্তী অতীত গুনাহ্সমূহ বর্জন করে মহান আল্লাহ্র পথে ফিরে আসবে, আল্লাহ্ পাক তাদের সমুদয় গুনাহ্ ক্ষমা করে দিবেন। আর পরকালে অনুগ্রহ দান করে তাদের প্রতি করুণা বর্ষণ করবেন, যেমন, করুণা বর্ষণ করবেন পুণ্যবান লোকদের প্রতি তাদেরকে তাদের গুনাহ্ থেকে হিফাজত করে ভালবাসার কোলে টেনে এনে। যেমন বর্ণিত আছে যে,

হযরত মুজাহিদ (র.) বর্ণনা করেন فان انتهوا অর্থ فَاِنْ تَابُوْا অর্থাৎ যদি তারা তওবা করে।

মহান আল্লাহ্র বাণী–

وَ قَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لاَ تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّ يَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ فَاِنِ انْتَهَوْا فَلاَ عُدْوَانَ اِلاَّ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ –

অর্থ ঃ "তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যাবত ফিত্না দূরীভূত না হয় এবং আল্লাহ্র দীন প্রতিষ্ঠিত না হয়। যদি তারা বিরত হয়, তবে জালিমদের ব্যতীত আর কাউকেও আক্রমণ করা যাবে না।" (সূরা বাকারা ঃ ১৯৩)

ব্যাখ্যা ঃ এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেছেন যে, যে সমস্ত মুশরিক তোমাদের সাথে যুদ্ধ করছে তোমরাও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যাবত ফিত্না দূরীভূত না হয়। অর্থাৎ শির্ক দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত যাতে কেউ আল্লাহ্ পাক ব্যতীত আর কারো ইবাদত না করে এবং যাতে মূর্তি পূজা, প্রতিমা পূজা ও মনগড়া বানানো মা'বূদের পূজাপাট চিরতরে নির্মূল হয়ে ইবাদত ও আনুগত্য একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র জন্যই হয়ে যায়। যার মধ্যে থাকবে না অন্যদের কোন হিস্সা ও শরীকানা। যেমন, হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত ।

হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, وَ قَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ এর অর্থ, তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যাবত না শির্ক দূরীভূত হয়।

হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, وَ قَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ এর অর্থ, তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যাবত না শির্ক দূরীভূত হয়।

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, وَ قَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَ يَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ এর অর্থ, তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যাবত না ফিত্না দূরীভূত হয় এবং আল্লাহ্র দীন সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত না হয়।

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

হযরত সূদ্দী(র.)থেকে বর্ণিত, – وَ قَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ এ বর্ণিত الفتنة এর অর্থ, الشرك শির্ক।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, وَ قَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ এর অর্থ তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাক যাবত না ফিত্না তথা শির্ক দুরীভূত হয়।

হযরত রবী (র.) থেকে বর্ণিত, উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত فتنة এর অর্থ شرك শির্ক।

হযরত ইবনে যায়দ (র.) থেকে বর্ণিত, وَ قَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ এর অর্থ, যাবত কুফর দূরীভূত না হয়। তারপর তিনি পাঠ করলেন تقاتلونهم او يسلمون অর্থাৎ হয়তো তোমাদের সাথে যুদ্ধ করবে অথবা তারা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত উপরোক্ত আয়াতে فتنة এর অর্থ শির্ক। উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত, الدين শব্দের অর্থ ইবাদত এবং আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ পালন করার ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার পরিপূর্ণ আনুগত্য। যেমন কবি আ'শা বলেছেন ঃ

هو دان الرباب اذ مرهو الدين دراكا بغزوة وصال –

উপরোক্ত কবিতার প্রথম পঙক্তিতে বর্ণিত, اذ كرهو الدين এর অর্থ اَذْ كرهو الطاعة অর্থাৎ যখন তারা আনুগত্যকে অপসন্দ করেছে। এ বিষয়ে আমরা যে ব্যাখ্যা দিয়েছি, অন্যান্য মুফাসসীরগণও অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। যাঁরা এমত পোষণ করেছেন ঃ

হযরত রবী (র.) থেকে বর্ণিত, و يكون الدين لله এর অর্থ যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারো ইবাদত না করে , 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র শিক্ষা তাই। তাই দিকে আহবান জানিয়েছেন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এবং একথার উপরই যুদ্ধ করেছেন তিনি। হযরত নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন, আমি আদিষ্ট হয়েছি যে, আমি যেন মানুষের সাথে যুদ্ধ করি যে পর্যন্ত না তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলে নামায কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে। যখন তারা এ কাজ করবে, তখন তারা ইসলামের হক ছাড়া তাদের রক্ত ও সম্পদ আমার থেকে বাঁচিয়ে নিবে এবং তাদের ভেতরের হিসাব আল্লাহ্‌র দায়িত্বে রয়েছে।

হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, و يكون الدين لله অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে আল্লাহ্‌র দীন প্রতিষ্ঠিত হবার অর্থ সকলের মুখে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' জারী থাকা। বর্ণিত আছে নবী করীম (সা.) বলতেন, আমাকে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের সাথে যুদ্ধ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন, যতক্ষণ না তারা 'লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলে। এরপর তিনি রবী (র.)–এর হাদীসের ন্যায় বর্ণনা করেছেন।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী– فَاِنِ انْتَهَوْا فَلاَ عُدْوَانَ اِلاَّ عَلَى الظَّالِمِيْنَ এর ব্যাখ্যা আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন, যে সকল কাফির তোমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল, যদি তারা যুদ্ধ থেকে বিরত হয়, তোমাদের দীনে প্রবেশ করে,আল্লাহ্ তোমাদের উপর যে দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পন করেছেন তা স্বীকার করে নেয় এবং মূর্তি পূজা বর্জন করে তাহলে তোমারা তাদের উপর সীমালংঘন করা এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ও জিহাদ করা থেকে বিরত থাক। কেননা জালিম লোক ব্যতীত অন্য কারো সাথে যুদ্ধ করা তোমাদের জন্য সমীচীন নয়। জালিম হচ্ছে ঐ সমস্ত লোক যারা আল্লাহ্‌র সাথে শির্‌ক করে এবং স্রষ্টার ইবাদত না করে অন্যদের ইবাদত করে।

যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে, জালিমের প্রতি বাড়াবাড়ি করা কি জায়েয ? জবাবে বলা যায় যে, জালিম ব্যতীত আর কারো প্রতি আক্রমণ করা জায়েয নেই। তবে এর কারণ তা নয় –সাধারণত বোধগম্য হয়। বরং এ হলো তার প্রতিবিধানস্বরূপ শাস্তি। কারণ, মুশরিকরাই প্রথমে সীমালংঘন করেছে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, তোমারাও তাদের সাথে অনুরূপ আচরণ কর যেমন তারা তোমাদের সাথে করেছে। যেমন বলা হয়– ان تعاطيت منى ظلما تعاطيته منك অর্থাৎ তুমি আমার প্রতি জুলুম করলে আমি ও করবো। পক্ষান্তরে এ কাজ জুলুম নয়। যেমন, আম্‌র ইবনে শা'স–আল–আসাদী নামক কবি বলেছেন ঃ

جزينا ذوى العدوان بالامس قرضه + قصاصا سواء حذوك الفعل بالنعل

মহান আল্লাহ্‌র বাণী- الله يستهزي بهم (আল্লাহ্ তাদের সাথে তামাসা করেন) এবং و يسخرون منهم سخر الله منهم (সূরা বাকারা ঃ ১৫) কাফিরগণ মুসলমানদের প্রতি বিদ্রূপ করে আল্লাহ্‌ও তাদের প্রতিদান করেন। (সূরা তওবা ঃ ৭৯) এ হলো উপরোক্ত ব্যাখ্যা সুস্পস্থ নজীর। এ সবের কারণ এবং নজীরগুলো আমি পূর্বে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি এবং উল্লেখিত আয়াতে আমি যা ব্যাখ্যা করেছি, অনেক তাফসীরকারও তদ্রূপ ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। যেমন বর্ণিত আছে যে,

হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত,-فلا عدوان الا على الظالمين আয়াতাংশে জালিম ঐ ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', বলতে অস্বীকার করেছে।

হযরত রবী (র.) থেকে বর্ণিত,-فلا عدوان الا على الظالمين আয়াতাংশে ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, তারা মুশরিক।

হযরত উসমান ইবনে গিয়াস (র.) বলেন, আমি শুনেছি হযরত ইকরামা (রা.) থেকে বর্ণিত, মহান আল্লাহ্‌র বাণী-فلا عدوان الا على الظالمين আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, যারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', বলতে অস্বীকার করেছে তারাই জালিম।

অন্যান্য মুফাসসীরগণ বলেছেন, মহান আল্লাহ্‌র বাণী- فلا عدوان الا على الظالمين এর অর্থ, তোমরা যুদ্ধ করো না কারো সাথে তবে যে যুদ্ধ করতে আসে সে ব্যতীত।

এমত যারা পোষণ করেন তাদের বক্তব্য ঃ

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে তাদের ব্যতীত তোমরা আর কারো সাথে যুদ্ধ করো না। হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে আরেকটি অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

হযরত সূদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত তিনি-فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين এর ব্যাখ্যায় বলেছেন যারা অত্যাচারী এবং যারা অত্যাচারী নয়, এদের কারো প্রতি জুলুম করা আল্লাহ্ পাক পসন্দ করেন না। তবে মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশ, যেমন তারা তোমাদের উপর আক্রমণ করে তোমরাও তাদের উপর অনুরূপ আক্রমণ কর। বসরাবাসী আরবগণ মহান আল্লাহ্‌র বাণী- فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين এর ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, ব্যাপকভাবে فان انتهوا তথা যদি তারা বিরত থাকে এ কথা বলা ঠিক নয়। কারণ মুশরিকদের কতিপয় ব্যক্তি ব্যতীত এ কাজ থেকে কেউ বিরত থাকে না।

কাজেই, আল্লাহ্ তা'আলা যেন ইরশাদ করেছেন যে, যদি তাদের কতিপয় ব্যক্তি এ কাজ থেকে বিরত থাকে তাহলে তাদের অত্যাচারী লোকদের ব্যতীত অন্য কারো প্রতি জুলুম করা ঠিক নয়। উপরোক্ত আয়াতে **ظالمين** শব্দের পর **منهم** একটি সর্বনাম উহ্য আছে। যেমন **فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدى** এর মধ্যে **عليه** এর আরবী বাক্য **الى من تقصد اقصدا** এর মধ্যে **اليه** সর্বনাম দুটো উহ্য আছে। তবে কোন কোন মুফাস্‌সীর এ ধরনের সর্বনাম উহ্য মানাকে স্বীকার করেন না। তারা বলেন আয়াতের ব্যাখ্যা যদি তারা বিরত থাকে তবে আল্লাহ্ বিরত লোকদের জন্য অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তবে যে সব অত্যাচারী লোকেরা এ ধরনের কর্মকান্ড থেকে বিরত থাকছে না, তাদের ব্যতীত আর কারো প্রতি সীমালংঘন করা এবং আক্রমণ করা সমীচীন নয়।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী–

اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَ الْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ - وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ -

অর্থ ঃ "পবিত্র মাস পবিত্র মাসের বিনিময়ে। সমস্ত পবিত্র বিষয় যার অবমাননা নিষিদ্ধ তার জন্য কিসাস। সুতরাং যে কেউ তোমাদের সাথে বাড়াবাড়ি করবে, তোমাদের জন্য অনুরূপ কাজ বৈধ হবে। এবং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর,এবং জেনে রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ মুত্তাকিগণের সাথে আছেন।" (সূরা বাকারা ঃ ১৯৪)

ব্যাখ্যাঃ পবিত্র মাস পবিত্র মাসের বিনিময়ে। এখানে পবিত্র মাস বলে যিলকাদ মাসকে বুঝানো হয়েছে। এ মাসে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) 'উমরাতুল্ হুদায়বিয়া' পালন করেছেন। মক্কার মুশরিকরা তাঁকে মক্কা প্রবেশ করে বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ করতে বাধা দেয়। এ সময়টি ছিল হিজরী ৬ষ্ঠ বছর। অবশেষে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এ বছর মুশরিকদের সাথে এ শর্তের উপর সন্ধি করেন যে, তিনি আগামী বছর পুনরায় আসবেন এবং মক্কা প্রবেশ করে তথায় তিন দিন অবস্থান করবেন। এরপর আগামী বছর তথা ৭ম হিজরী সনে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও তাঁর সাহাবিগণ সমভিব্যাহারে 'উমরা করার উদ্দেশ্যে (মক্কা শরীফের দিকে) যাত্রা করেন। এ মাসটি ছিল যিলকাদ মাস, এ মাসেই ৬ষ্ঠ হিজরী সনে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–কে মুশরিকরা বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ করতে বাধা দিয়েছিল। তবে, এ বছর মক্কাবাসী তাঁকে শহরে প্রবেশ করার জন্য পথ উন্মুক্ত করে দেয়। তাই তিনি মক্কাতে প্রবেশ করে নিজের প্রয়োজনীয় কাজ এবং 'উমরার কার্যক্রম পূর্ণ করে নেন এবং তথায় তিন দিন অবস্থান করে মদীনাভিমুখে রওয়ানা করেন। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ পাক তাঁর নবীকে এবং তদীয় সাহাবিগণকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেছেন, পবিত্র মাস তথা যিলকাদ মাস, যে মাসে আল্লাহ্

তা'আলা তোমাদেরকে তাঁর হারাম শরীফে এবং ঘরের নিকট পৌঁছিয়ে দিয়েছেন, কুরায়শ মুশরিকদের অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও। ফলে তোমরা তোমাদের প্রয়োজন সমাধা করে নিয়েছ। এ সুযোগ ঐ পবিত্র মাসের বিনিময়ে তোমরা পেয়েছো যে মাসে বিগত বছর কুরায়শ মুশরিকরা তোমাদেরকে বাধা দিয়েছি। তাদের এ অসম্মতির ফলে তোমরা হারাম শরীফে থেকে ফিরে গিয়েছ, তোমরা হারাম শরীফে প্রবেশ করতে পারনি এবং বায়তুল্লাহ্ শরীফের নিকটেও পৌঁছতে পারনি। হে মু'মিনগণ! এ পবিত্র মাসে মুশরিকরা যেহেতু তোমাদেরকে বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ করার ব্যাপারে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে এবং এ কাজের প্রতি অসম্মতি প্রকাশ করেছে তাই এ পবিত্র মাসেই তোমাদেরকে হারাম শরীফে প্রবেশ করিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের থেকে তোমাদের প্রতিশোধ নিয়ে দিলেন। যেমন বর্ণিত হয়েছে– ।

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা.) **و الحرمات قصاص** এর ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, এ আয়াত মুশরিকদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা যিলকাদ মাসে হযরত মুহাম্মাদ (সা.)–কে (হুদায়বিয়া নামক স্থানে) বাধা দিয়ে ছিল। এরপর পরবর্তী বছর এ যিলকাদ মাসেই আল্লাহ্ পাক তাঁকে নিয়ে আসেন এবং বায়তুল্লাহ্ শরীফে প্রবেশ করার তাওফীক দেন। এভাবে মুশরিকদের থেকে তাঁর প্রতিশোধ নিয়ে দেন। হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে মহান আল্লাহ্র বাণী–**الشهر الحرام بالشهر الحرام و الحرمات قصاص** এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত, যিলকাদ মাসে হুদায়বিয়ার দিন পবিত্র শহর থেকে মহ্‌রিম অবস্থায় রসূলুল্লাহ্ (সা.)–কে ফিরিয়ে দিয়ে মুশরিকরা দাম্ভিকতা প্রদর্শন করেছিল। এরই প্রতিশোধস্বরূপ পরবতী বছর এ যিলকাদ মাসেই আল্লাহ্ পাক তাঁকে মক্কা প্রবেশ করিয়েছে। তারপর তিনি 'উমরার কাযা সমাধা করেন। এভাবেই আল্লাহ্ পাক হুদায়বিয়ার দিন তার এবং মক্কার মাঝে যে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রতিশোধ নিয়ে দেন।

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে আরেকটি অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আল্লাহ্র বাণী– **الشهر الحرام بالشهر الحرام و الحرمات قصاص** এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, যিলকাদ মাসে নবী করীম (সা.) তাঁর সাহাবায়ে কিরাম সমভিব্যাহারে 'উমরা করার উদ্দেশ্য (মক্কা শরীফের পথে) যাত্রা করেন। তাঁদের সাথে কুরবানীর জানোয়ারও ছিলো। তারা হুদায়াবিয়া প্রান্তরে পৌঁছলে মুশরিকরা তাঁদেরকে মক্কা শরীফ প্রবেশে বাধা দেয়। অবশেষে, নবী করীম (সা.) এ শর্তের ওপর মুশরিকদের সাথে সন্ধি করেন যে, এ বছর তিনি ফিরে যাবেন এবং পরবর্তী বছর 'উমরা করবেন। আর তখন মক্কা মুকাররমাতে তিন দিন অবস্থান করবেন এবং হাতিয়ারসহ সওয়ার হয়ে মক্কা প্রবেশ করবেন। তবে যাবারকালে তিনি নিজে চলে যাবেন কিন্তু মক্কা থেকে কাউকে সাথে নিয়ে যেতে পারবেন না। (এ সন্ধি সম্পাদিত হবার পর) নবী

করীম (সা.) ও তাঁর সাহাবায়ে কিরাম হুদায়াবিয়া প্রান্তরেই নিজ নিজ কুরবানীর জানোয়ার যবেহ্ করে মাথা কামিয়ে ফেলেন এবং চুল ছেটে নেন। তারপর পরবর্তী বছর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও তাঁর সাহাবায়ে কিরাম যিলকাদ মাসে মক্কা প্রবেশ করে নিজ নিজ 'উমরা আদায় করেন এবং এ সময় তাঁরা মক্কা শরীফে তিন দিন অবস্থান করেন, অথচ হুদায়বিয়ার দিন মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–কে ফিরিয়ে দিয়ে চরম দাম্ভিকতা প্রদর্শন করেছিলেন। তাই, আল্লাহ্ পাক তাঁর হাবীবের পক্ষ হয়ে তাদের থেকে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করলেন এবং তাকে ঐ যিলকাদ মাসেই মক্কাতে প্রবেশ করালেন যে মাসে তাঁকে তারা ফিরিয়ে দিয়েছিল। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ্ পাক নাযিল করেন ঃ আল্লাহ্ পাক–**الشهر الحرام بالشهر الحرام و الحرمات قصاص** অর্থাৎ পবিত্র মাসে পবিত্র মাসের বিনিময়ে, সমস্ত পবিত্র বিষয় যার অবমাননা নিষিদ্ধ তার জন্য কিসাস।

হযরত কাতাদা (র.) (অন্য সূত্রে) মিক্সাম (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা মহান আল্লাহ্র বাণী–**الشهر الحرام بالشهر الحرام و الحرمات قصاص** এর ব্যাখ্যায় বলেছেন এ আয়াত হুদায়বিয়ার সফরে অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন মুশরিকরা নবী করীম (সা.) ও তাঁর সাহাবিগণকে পবিত্র মাসে বায়াতুল্লাহ্ শরীফ যিয়ারত করতে বাধা দিয়েছিল। তখন মুসলমানগণ মুশরিকদের সাথে এ বিষয়ে পরস্পর আলোচনা করেন, এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ পাক মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেন, আগামী বছর এ মাসেই তোমরা 'উমরা আদায় করতে সক্ষম হবে, যে মাসে তারা তোমাদেরকে বাধা প্রদান করেছে। সুতরাং পরবর্তী বছর যে পবিত্র মাসে তোমরা 'উমরা আদায় করবে এ মাসকে আল্লাহ্ পাক ঐ পবিত্র মাসের বিনিময়–স্বরূপ নির্ধারণ করেছেন। যে মাসে তারা তোমাদের যিয়ারতে কা'বার পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছিল। এ কারণেই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেছেন, **و الحرمات قصاص** অর্থাৎ সমস্ত পবিত্র মাস যার অবমাননা নিষিদ্ধ তার জন্য কিসাস।

হযরত সূদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, **الشهر الحرام بالشهر الحرام و الحرمات قصاص** এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, ৬ষ্ঠ হিজরী সনে যিলকাদ মাসে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন 'উমরা করার উদ্দেশ্য (মক্কা শরীফের দিকে) যাত্রা করেন, তখন মুশরিকরা তাঁকে হুদায়াবিয়া নামক স্থানে বাধা দেয় এবং তাঁদের পথ ছেড়ে দিতে অস্বীকার করে। অবশেষে তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর সাথে এ শর্তের উপর সন্ধি করে যে, তারা আগামী বছর মুসলমানদের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফকে তিন দিনের জন্য খালি করে দিবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সপ্তম হিজরী সনে খায়বার বিজয়ের পর মক্কা শরীফের দিকে রওয়ানা হন। মুশরিকরা তিন দিনের জন্য মক্কা মুকাররমাকে ছেড়ে দেয়। এ 'উমরা আদায় করার সময় তিনি মায়মূনা বিনতে হারীস হিলালিয়াহ্র (রা.) সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

হযরত যাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি মহান আল্লাহ্র বাণী-الشهر الحرام بالشهر الحرام و الحرمات قصاص এর ব্যাখ্যায় বলেছেন যিলকাদ মাসে বায়তুল্লাহ্ শরীফের যিয়ারতে বাধা সৃষ্টি করে মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পথ অবরোধ করে ফেলে। তারপর আল্লাহ্ পাক তাঁকে পরবর্তী বছর বায়তুলাহ্ শরীফে প্রবেশ করান এবং তাদের থেকে তাঁর প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। তাই আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন পবিত্র মাস পবিত্র মাসের বিনিময়ে, সমস্ত পবিত্র বিষয় যার অবমাননা নিষিদ্ধ তার জন্য কিসাস।

হযরত রবী (র.) থেকে বর্ণিত, মহান আল্লাহ্র নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর সাহাবিগণ (মক্কা শরীফের দিকে) রওয়ানা হন এবং যিলকাদ মাসে 'উমরার জন্য ইহ্রাম বাধেন। তাদের সাথে কুরবানীর জনোয়ার ছিল। তাঁরা হুদায়াবিয়া নামক স্থানে পৌছলে মুশরিকরা তাদের পথ রোধ করে বসে। অবশেষে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদের সাথে এ মর্মে সন্ধি করেন যে, তাঁরা এ বছর ফিরে যাবেন এবং পরবর্তী বছর 'উমরা আদায় করবেন এবং এ উপলক্ষ্যে মক্কাতে তিন দিন অবস্থান করবেন। তবে যাবার কালে মক্কা থেকে তিনি কাউকে সাথে নিয়ে যেতে পারবেন না। তাই, মুসলমানগণ হুদায়াবিয়ায় নিজ নিজ পশু যবেহ করে নিজেদের মাথা কামিয়ে নেন এবং চুল ছেটে ফেলেন। তারপর পরবর্তী বছর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও তাঁর সাহাবাগণ সমভিব্যাহারে মক্কার দিকে রওয়ানা হন এবং মক্কাতে পৌছে তাঁরা যিলকাদ মাসে 'উমরা আদায় করে তথায় তিন দিন অবস্থান করেন। পক্ষান্তরে, মুশরিকরা হুদায়াবিয়ার দিন তাঁকে ফিরিয়ে দিয়ে তাঁর প্রতি চরম অহংকার প্রদর্শন করেছিল। তাই, আল্লাহ্ পাক তাঁর পক্ষ হয়ে তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন এবং তাঁকে এ যিলকাদ মাসেই মক্কাতে প্রবেশ করান যে মাসে তারা তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছিল, এ কারণেই আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন ইরশাদ করেছেন যে, "পবিত্র মাস পবিত্র মাসের বিনিময়ে। সমস্ত পবিত্র বিষয় যার অবমাননা নিষিদ্ধ তার জন্য রয়েছে কিসাসের ব্যবস্থা।

ইবনে 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্র বাণী-وَ الْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, এ আয়াত মক্কার মুশরিকদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তাঁরা যিলকাদ মাসে বায়তুল্লাহ্র যিয়ারত থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে আটকিয়ে রেখেছিল। আর এ করে তাঁরা রাসূল (সা.)-এর প্রতি চরম আত্মম্ভরিতা প্রদর্শন করেছিল। তাই আল্লাহ্ পাক তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ স্বরূপ

পরবর্তী বছর সে যিলকাদ মাসেই তাকে মক্কায় নিয়ে এসেছেন এবং বায়তুল্লায় প্রবেশ করিয়েছেন। ইবনে যায়দ থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্‌র বাণী– اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ الخ সম্পর্কে বলেছেন যে, যে সব আয়াতে আল্লাহ্‌পাক মুশরিকদের সাথে জিহাদ করার নির্দেশ দিয়েছেন ঐ সমস্ত আয়াতের দ্বারা উপরোক্ত আয়াতটি রহিত হয়ে গেছে। এরপর তিনি পাঠ করলেন– وَ قَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَافَّةً – (অর্থাৎ–তোমরা মুশরিকদের সাথে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করবে যেমন তারা তোমাদের সাথে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করে থাকে)। আর قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ (কাফিরদের মধ্যে যারা তোমাদের নিকটবর্তী তাদের সাথে তোমরা যুদ্ধ কর)। বর্ণনাকারী বলেন, আরব কাফিরদের সাথে যুদ্ধ –বিগ্রহ সমাপ্ত করার পর আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর প্রতি নাযিল করলেন– قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ لاَ بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهُ – হতে وَ هُمْ صَاغِرُوْنَ পর্যন্ত (অর্থাৎ যাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্‌তে ঈমান আনে না এবং আখিরাতের বিষয়েও বিশ্বাস স্থাপন করে না আর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যা নিষিদ্ধ করেছেন তা নিষিদ্ধ করে না এবং সত্য দীন অনুসরণ করে না, তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিযিয়া দেয়)। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী বলেন, এ আয়াতে যাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে তারা হচ্ছে রোমের অধিবাসী। তাই রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এ আয়াত নাযিল হবার পর রোমীয়দের প্রতি মনোনিবেশ করেন।

ইবনে আব্বাস থেকে (রা.) বর্ণিত, তিনি নিম্নোক্ত আয়াত– اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَمِ وَ الْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ সম্পর্কে বলেছেন যে, এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক তোমাদের উপর কিসাসের বিধান প্রদান করেছেন এবং গ্রহণ করেছেন তোমাদের থেকে প্রতিশোধ। ইবনে জুরায়জ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি 'আতাকে اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَمِ وَ الْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ এর শানে নুযূল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার পর তিনি বললেন আয়াতখানা হুদায়বিয়া নামক স্থানে অবতীর্ণ হয়েছে। মুশরিকরা পবিত্র মাসে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর পথ রোধ করে দিয়েছিল। তাই আল্লাহ্ পাক অবতীর্ণ করেছেন– اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَمِ (অর্থাৎ পবিত্র মাসে উমরা পবিত্র মাসের উমরার বিনিময়ে)।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, যিলকাদ মাসকে আল্লাহ্ পাক اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ তথা পবিত্র মাস বলে নামকরণ করেছেন, এর কারণ হচ্ছে এই যে, অন্ধকার যুগে আরবীয় লোকেরা এ মাসে যুদ্ধ–বিগ্রহ এবং খুন–হত্যাকে হারাম ঘোষণা করে দিয়েছিল। এ মাসে তারা হাতিয়ার খুলে রাখত এবং কেউ কাউকে হত্যা করত না। যদিও তাদের সম্মুখে সাক্ষাত হত পিতা বা পুত্র হত্যাকারীর সাথে। আর এ মাসে যেহেতু আরবীয় লোকেরা যুদ্ধ–বিগ্রহ না করে বাড়ীতে বসে থাকত,

তাই তারা এ মাসকে বলত যিলকাদ মাস। আরবীয় লোকদের রাখা এ নামের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই আল্লাহ্ পাক এ মাসকে যিলকাদ মাস اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ তথা পবিত্র মাস বলে নামকরণ করেছেন। اَلْحُرُمَاتُ–শব্দটি حُرْمَةٌ এর বহুবচন, যেমন– ظُلْمَةٌ - ظُلُمَات এর এবং حُجْرَةٌ –حُجُرَات এর বহুবচন। উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্‌পাক اَلْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ আয়াতাংশে বহুবচন ব্যবহার করে الشهر الحرام (পবিত্র মাস) البلد الحرام (পবিত্র শহর) এবং حرمة الإحرام (ইহ্‌রামে পবিত্রতা) এর প্রতি ইংগিত করেছেন। এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক তাঁর নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর সাহাবীদেরকে লক্ষ্য করে একথাই বলেছেন যে, এ ইহ্‌রামের সাথে, হারাম মাসে তোমাদের হারাম শরীফে প্রবেশ করা–ঐ প্রতিবন্ধকতার প্রতিশোধ এবং কিসাস হিসাবেই তোমাদের নসীব হয়েছে যার তোমরা সম্মুখীন হয়েছিলে বিগত বছর এ হারাম মাসে। এটাই হচ্ছে ঐ حرمات যাকে আল্লাহ্ পাক কিসাস হিসাবে নিরূপণ করেছেন। আমি পূর্বেও এ কথা বর্ণনা করেছি যে, ক্রিয়া, কথা এবং শারীরিক প্রতিশোধকে কিসাস বলা হয়, তবে এ ক্ষেত্রে কিসাস বলে ক্রিয়াগত প্রতিশোধকেই বুঝানো হয়েছে।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী–فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ এর ব্যাখ্যা ঃ এ আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে তাফসীরকারদের মাঝে মতবিরোধ আছে। নিম্নে বর্ণিত ঘটনাকে কেউ শানে নুযূল হিসাবে অবিহিত করেছেন ঃ

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্‌র বাণী– فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ সম্পর্কে বলেছেন যে, উপরোল্লিখিত আয়াত এবং অনুরূপ আয়াতগুলো মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়েছে। তখন মুসলমানদের সংখ্যা ছিল কম। মুশরিকদেরকে ধমক বা হুমকি দেয়ার মত তখন তাদের পক্ষে কোন সামর্থ ছিল না। ফলে, ইসলাম গ্রহণ করার সাথে সাথে নেমে আসত মুসলমানদের উপর গালি–গালাজ এবং অত্যাচার। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, তাদেরকে শাস্তি দিতে সক্ষম ব্যক্তি হয়তো তাদেরকে অনুরূপ শাস্তি দিবে যে পরিমাণ শাস্তি তারা তাকে দিয়েছে অথবা ধৈর্য ধারণ করবে অথবা ক্ষমা করে দিবে এবং তাই উত্তম। এরপর যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)মদীনায় হিজরত করলেন এবং যখন আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদেরকে শক্তিশালী করলেন, তখন তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–কে নির্দেশ দিলেন যে, মুসলমানগণ যেন অত্যাচার থেকে বিরত থাকে এবং পরস্পর একে অন্যর উপর সীমালংঘন না করে অজ্ঞতার যুগের লোকদের ন্যায়। অন্যান্য মুফাসসীরগণ বলেছেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যা তা নয় যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে বরং এ আয়াতের ব্যাখ্যা, হে মু'মিনগণ ! মুশরিকদের যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে তোমরাও তাদের সাথে যুদ্ধ কর, যেমন তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে। তাঁরা বলেন এ আয়াত 'উমরাতুল কাযা আদায় করার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর প্রতি মদীনায় নাযিল হয়েছে।

এ ব্যাখ্যার সমর্থকগণের আলোচনা ঃ

হযরত মুজাহিদ (র.)–فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তোমরাও এ পবিত্র মাসে তাদের সাথে লড়াই কর, যেমন তারা তোমাদের সাথে লড়াই করেছে। আয়াতের বাহ্যিক অর্থ অনুপাতে হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত ব্যাখ্যাই উপরোক্ত ব্যাখ্যা দুটোর মাঝে সর্বাধিক বিশুদ্ধ এবং সামঞ্জস্যশীল। কারণ, পূর্বের আয়াতগুলোতে আল্লাহ্ পাক মু'মিনদেরকে তাদের শত্রুর সাথে লড়াই করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم অর্থাৎ যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও মহান আল্লাহ্র পথে তাদের বিরুদ্ধে কর। এরপর তিনি বলেছেন– فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه অর্থাৎ যারা তোমাদের উপর আক্রমণ করবে, তোমরাও তাদের উপর আক্রমণ করবে। পক্ষান্তরে এ আয়াত জিহাদ এবং যুদ্ধের বিধান সম্বলিত আয়াতের হুকুমের আওতাভুক্ত। আর আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন যেহেতু জিহাদের বিধান মু'মিনদের উপর হিজরতের পর ফরয করেছেন। তাই বুঝা যায় যে, নিম্নোক্ত আয়াত–فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم মাদানী মক্কী নয়। কারণ, মক্কাতে মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করা মু'মিনদের উপর ফরয ছিল না। অধিকন্তু– فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ হলো– وَ قَاتِلُوْا فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ (যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহ্র পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর), এর সুস্পষ্ট নজীর। তাই উক্ত আয়াতের অর্থ হবে, যারা হারাম শরীফে তোমাদের প্রতি সীমালংঘন করে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যেমন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। কেননা, আমি সমস্ত নিষিদ্ধ বিষয়কে পরস্পর সমান করে দিয়েছি। সুতরাং হে মু'মিনগণ! যে সমস্ত মুশরিক আমার হুরমের মধ্যে হত্যা করা হালাল মনে করবে, তোমরাও অনুরূপ মনে করবে। উল্লিখিত আয়াতদ্বারা আল্লাহ্পাক তাঁর নবীকে হারামের অধিবাসীদের সাথে হারাম শরীফে যুদ্ধ করার অনুমতি প্রদানের মাধ্যমে এবং–و قاتلوا المشركين كافةً (তোমরা মুশরিকদের সাথে সর্বাত্মক যুদ্ধ করবে) এর দ্বারা রহিত করে দিয়েছেন। যেমন, আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, এ বিধান প্রতিশোধমূলক। একই উৎস থেকে নির্গত বিভিন্ন অর্থবোধক দু'টি শব্দের একটির পর একটিকে ব্যবহার করার নজীর আল–কুরআনেই বিদ্যমান আছে। যেমন আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন, وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ – فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ (আল ইমরান ঃ ৫৪) এবং যেমন, তিনি ইরশাদ করেছেন– سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ (সূরা তাওবাঃ ৭৯) সুতরাং ভাষাগত দিক থেকে এর মধ্যে কোন অসুবিধা নেই।

مجازاة এর অর্থ ব্যতীত এ শব্দটি عد و এর অর্থেও হতে পারে যার অর্থ شد ও وَ ثُوْبٌ–বাধা, লাফিয়ে পড়া ও হামলা করা, যেমন বলা হয়, عدا الاسد على فريسته বাঘটি একটি ছোট ঘোড়ার উপর হামলা করেছে। এ হিসাবে উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা হবে, فمن عدا عليكم الى فمن شد عليكم و وثب بظلم فاعتدوا عليه الى فشدوا عليه و وثبوا نحوه قصاصاً لما فعل بكم لاظلماً (অর্থাৎ যে তোমাদের উপর আক্রমণ করবে তোমরাও অনুরূপ তাদের উপর আক্রমণ করবে। তবে এ আক্রমণ জুলুম হিসাবে নয়, বরং এ হলো কিসাস হিসাবে। তারপর عدا এর সাথে تاء সংযোগ করে اعتدى বানানো হায়ছে। যেমন, বলা হয় اقترب هذا الامر –যার অর্থ– قرب هذا الامر –এবং যেমন, বলা হয়, اجتلب যার অর্থ جلب –ইত্যাদি।

মহান আল্লাহ্র বাণী– وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ এর ব্যাখ্যাঃ হে মু'মিনগণ ! তোমরা আল্লাহ্ পাকের নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ এবং তাঁর নির্ধারিত সীমালংঘন করার ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় কর এবং জেনে রাখো, আল্লাহ্ ঐ মুত্তাকীদেরকে ভালবাসেন। যারা আল্লাহ্র নির্দেশিত ফরযসমূহ আদায় করে এবং তাঁর নিষিদ্ধ কাজসমূহ থেকে বেঁচে-থাকার মাধ্যমে তাঁকে ভয় করে।

মহান আল্লাহ্র বাণী–

وَ اَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلاَ تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ – وَ اَحْسِنُوْا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ –

অর্থঃ "আল্লাহ্র পথে ব্যয় কর এবং তোমরা নিজের হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করবে না, তোমরা সৎ কাজ কর, আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণ লোকদেরকে ভালবাসেন।" (সূরা বাকারাঃ ১৯৫)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ বলেন, উক্ত আয়াতে বর্ণিত و انفقوا فى سبيل الله এর অর্থ আল্লাহ্র ঐ রাস্তার, যে রাস্তায় মুশরিক শত্রুদের সাথে যুদ্ধ ও লড়াই করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة –এর অর্থ তোমরা আল্লাহ্র পথে ধন-সম্পদ ব্যয় করাকে ছেড়ে দিও না। কেননা এর বিনিময়ে আল্লাহ্ তোমাদেরকে উত্তম বিনিময়ে দান করবেন এবং দুনিয়াতে জীবনোপকরণ প্রদান করবেন। এমতের সমর্থনে আলোচনা ঃ

হযরত হুযায়ফা (রা.) থেকে এ ব্যাখ্যায় বর্ণিত, "তোমরা নিজের হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করবে না" এর-অর্থ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করাকে ছেড়ে দেয়া।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة এর ভাবার্থ, তোমরা আল্লাহ্র রাস্তার ব্যয় কর যদিও–তোমরা নিকট ফলা অথবা একটি তীর ব্যতীত আর কিছুই নেই। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, যদিও একটি ফলা অথবা একটি তীর ব্যতীত তোমার নিকট কিছুই নেই, তথাপিও তুমি আল্লাহ্র পথে ব্যয় কর।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত,– ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة আয়াতখানি দান করা সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি– ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة এর ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, আল্লাহ্র পথে জীবন দান করা নয় ধ্বংস নয় বরং ধ্বংস হলো আল্লাহ্র পথে ব্যয় করা থেকে বিরত থাকা।

ইকরামা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন– وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ আয়াতাংশে আল্লাহ্র রাস্তায় দান করা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

মুহাম্মদ ইবনে কা'ব আল–কুরাযী থেকে বর্ণিত যে, তিনি উপরোক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ সম্পর্কে বলেছেন যে, মুসলমানগণ আল্লাহ্র পথে জিহাদ করার জন্য বেরিয়ে যেত। সাথে কেউ অনেক পাথেয় নিয়ে যেত। আর এ সব কিছু অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির পেছনে ব্যয় করত। অবশেষে নিজ সাথীর সহযোগিতা করার মত তার নিকট আর কিছু বাকী থাকত না। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন– وَ اَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ তোমরা আল্লাহ্র পথে ব্যয় কর এবং তোমরা নিজের হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না। তোমরা সৎকাজ কর, আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণ লোকদেরকে ভালবাসেন।

ইবনে 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি– وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, তোমাদের কেউ যেন এ কথা না বলে যে, দান করার মত আমার নিকট কিছুই নেই। কারণ দান করার মত যদি সে একটি ফলা ব্যতীত আর কিছু না পায় তাহলে সে যেন ঐ ফলাটি নিয়ে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে।

আমির থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, আনসারদের নিকট ধন–সম্পদ জমা থাকত। তাই তারা নিজেদের ধন–সম্পদ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করতেন। কিন্তু এক বছর দুর্ভিক্ষ হওয়ায় তারা খরচ করা থেকে বিরত থাকেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন– وَ اَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ – এখানে تَهْلُكَةٌ শব্দ দ্বারা তাদের অসৎ ধারণা এবং দান না করাকে বুঝানো হয়েছে। মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, উক্ত আয়াতের অর্থ হচ্ছে দারিদ্রের আশংকায় তোমরা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করছ না। কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি এ আয়াতের শানে নুযূল

সম্পর্কে বলেছেন যে, মুসলমানগণ দেশ ভ্রমণে বের হত, যুদ্ধ করত কিন্তু নিজেদের মাল ব্যয় করত না। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করার সময় নিজেদের মাল খরচ করার নির্দেশ দিয়ে ইরশাদ করেন– وَ اَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلاَ تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَـةِ কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন– وَلاَ تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَـةِ এর অর্থ হচ্ছে, তোমরা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করা থেকে নিজেদের হাত গুটিয়ে রেখো না।

সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন,– وَ اَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ এর অর্থ হচ্ছে একটি রশি হলেও তোমরা আল্লাহ্র পথে ব্যয় কর এবং– وَلاَ تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَـةِ এর অর্থ আমার নিকট দান করার মত কোন কিছুই আর অবশিষ্ট নেই।

হযরত ইকরামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি– ولا تلقوا بايد يكم الى التهلكة এর শানে নুযূল সম্পর্কে বলেছেন যে, আল্লাহ্পাক দীনের পথে ব্যয় করার নির্দেশ দেয়ার পর কেউ কেউ একথা বলাবলি করতে লাগলো যে, আমরা কি আল্লাহ্র পথে সবকিছু ব্যয় করব। তাহলে তো আমাদের মাল শেষ হয়ে যাবে। আমাদের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, তোমরা আল্লাহ্র পথে ব্যয় কর এবং নিজেকে নিজেদের হাতে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না। অর্থাৎ তোমরা দান কর। আমিই তোমাদের রিযিকদাতা।

হযরত হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, উপরোক্ত আয়াত দান খয়রাত সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

হযরত হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি تهلكة শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা লোকদেরকে তার পথে ধন–সম্পদ ব্যয় করার নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ মহান আল্লাহ্র পথে ব্যয় না করা প্রকৃতপক্ষে নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করারই শামিল।

হযরত ইবনে জুরায়জ (র.) থেকে বর্ণিত, আমি আতা (র.)–কে মহান আল্লাহ্র বাণী– وَ اَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلاَ تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَـةِ – সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার পর তিনি বলেছেন, চাই কম হোক অথবা বেশী হোক তোমরা মহান আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় কর। বর্ণনাকারী বলেন, আমাকে আবদুল্লাহ্ ইবনে কাছীর (র.) বলেছেন, এ আয়াত আল্লাহ্র পথে দান করা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

হযরত ইবনে 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, কেউ যেন না বলে যে, আমার নিকট দান করার মত কিছুই নেই। তাহলে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই এ ধরনের ব্যক্তি যেন একটি ফলা নিয়ে হলেও আল্লাহ্র রাস্তায় সফরের প্রস্তুতি নেয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি–وَ اَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلاَ تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَـةِ – এর অর্থ কম হোক অথবা বেশী, তোমরা মহান আল্লাহ্র পথে ব্যয় কর। কারণ যদি

তোমরা মহান আল্লাহ্‌র পথে খরচ না কর এবং তাঁর আনুগত্য না কর, তাহলে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে।

হযরত যাহ্‌হাক (র.) থেকে বর্ণিত, মহান আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করার ক্ষেত্রে জান-মাল ব্যয় করা থেকে নিজেকে বিরত রাখাই বাস্তবে নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করার শামিল।

হযরত হাসান (র.) থেকে বর্ণিত,- ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة এর অর্থ তোমরা মুক্ত হস্তে মহান আল্লাহ্‌র রাহে ব্যয় কর। কোন কোন মুফাসসীর বলেছেন যে, এ আয়াতের ব্যাখ্যা হলো, তোমরা মহান আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় কর। এবং সহায় সম্বলহীন অবস্থায় মহান আল্লাহ্‌র পথে বের হয়ে তোমরা নিজেকে নিজেদের হাতে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না।

এমতের সমর্থনে আলোচনা ঃ

হযরত ইবনে যায়দ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি- وَ اَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন খরচ করার মত কোন সম্পদ তোমার নিকট না থাকলে তুমি সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় কখনো যুদ্ধে যাত্রা করবে না। যদি কর, তাহলে তুমি নিজ হাতে নিজেকে ধবংসের মধ্যে নিক্ষেপ করলে। অন্যান্য মুফাসসীরগণ বলেন, উল্লিখিত আয়াতের অর্থ, তোমরা মহান আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় কর এবং কৃত পাপের কারণে মহান আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ে তোমরা নিজের হাতে নিজেকে ধবংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না। বরং মহান আল্লাহ্‌র রহমতের উপর আশা করে সৎকর্ম করতে থাকে। এ মতের সমর্থনে আলোচনা ঃ

হযরত রাবা ইবনে আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত,- ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة এ আয়াত ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে নাযিল হয়েছে যে, গুনাহ্‌তে লিপ্ত হওয়ার পর নিজের হাতে নিজেকে ধবংসের মধ্যে নিক্ষেপ করে, আর বলে যে, আমার জন্য কোন তওবা নেই।

হযরত বারা (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি এসে তাঁকে প্রশ্ন করলেন যে, আমি যদি একাই মুশরিকদের উপর হামলা করি, আর তারা আমাকে হত্যা করে ফেলে, তাহলে কি আমি আমাকে নিজের হাতে ধবংসের মধ্যে নিক্ষেপ করলাম ? উত্তরে তিনি বললেন, না না, নিজেকে ধবংসের মধ্যে নিক্ষেপ না করার বিধানটি মূলতঃ দান করার সাথে সংশ্লিষ্ট, (এর সাথে এ আয়াতের কোন সম্পর্ক নেই) আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তার রাসূলকে দুনিয়াতে পাঠিয়ে আদেশ দিয়াছেন- فقاتل فى سبيل الله لا تكلف الا نفسك 'তুমি আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম কর; তোমাকে শুধু তোমার নিজের জন্যই দায়ী করা হবে।'

হযরত বারা ইবনে আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্‌র বাণী- ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة সম্পর্কে বলেছেন যে, এ হলো ঐ ব্যক্তি যে গুনাহ্ করার পর এ কথা বলে যে, আল্লাহ্ পাক তাকে ক্ষমা করবেন না।

হযরত বারা (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবূ আম্মারাঃ আল্লাহ্ পাকের বাণী- **ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة** সম্পর্কে আপনার কি অভিমত? যদি এক ব্যক্তি অগ্রগামী হয়ে যুদ্ধ করতে করতে নিহত হয়ে যায়, তাহলে কি সে এ আয়াত অনুসারে নিজের জীবনকে নিজেই ধবংসকারীরূপে পরিগণিত হবে ? তিনি জবাবে বললেন, না না,-এখানে তো ঐ ব্যক্তির সম্পর্কে বলা হয়েছে যে অন্যায় কাজ করে এবং নিজেকে নিজের হাতে ধবংসের মধ্যে নিক্ষেপ করে এবং তওবা না করে।

হযরত বারা (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, যদি কোন ব্যক্তি একাই শত্রু সেনাদের উপর আক্রমণ করে এবং প্রচন্ড লড়াই করে নিহত হয়ে যায় তাহলে কিসে নিজেই নিজের জীবনকে ধবংসকারীরূপে পরিগণিত হবে? জবাবে তিনি বললেন, না না, এ আয়াত ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে যে, গুনাহ্ করার পর নিজেকে ধবংসের মধ্যে নিক্ষেপ করে আর বলে যে, আমার তওবা কবূল হবে না।

হযরত আবূ ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি বারা ইবনে আযিব (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আবূ 'আম্মারা! যদি কোন ব্যক্তি একাই এক হাজার শত্রু সেনার মুকাবিলা করে এবং তাদের উপর আক্রমণ করে তাহলে সে- **ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة** এর মধ্যে শামিল হয়ে যাবে কি? জবাবে তিনি বললেন না না। সে লড়াই করতে থাকবে শহীদ হওয়া পর্যন্ত। কারণ মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তার নবী করীম (সা.)-কে আদেশ করেছেন- **فقاتل فى سبيل الله لا تكلف الا نفسك** - "আপনি আল্লাহ্র পথে জিহাদ করুন ! আপনাকে শুধু আপনার নিজের জন্যই দায়ী করা হবে"। (সূরা নিসা ঃ ৮৪) মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত, আমি উবাদাকে মহান আল্লাহ্র বাণী- **وَ اَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ** - সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার পর তিনি বললেন, এ আয়াত ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যে গুনাহ্ করার পর ধবংসের মধ্যে নিক্ষেপ করে নিজেকে ধবংস করে দেয়। অথচ এ কাজ থেকে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে।

হযরত ইবনে সিরীন (র.) থেকে বর্ণিত, আমি উবায়দা সালমানী (রা.)-কে এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার পর তিনি আমাকে বললেন, যে, এ আয়াত ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে নাযিল হয়েছে যে গুনাহ্তে লিপ্ত হওয়ার পর আনুগত্য স্বীকার করে নিজের হাতে নিজেকে ধবংসের মধ্যে নিক্ষেপ করে, আর বলে যে, তার কোন তওবা নেই।

হযরত উবায়দা (রা.) থেকে বর্ণিত,- **ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة** এ আয়াত ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যে পাপ কার্যে জড়িত হবার পর নিজের হাতেই নিজেকে ধবংসের মধ্যে নিক্ষেপ করে।

হযরত উবায়দা (রা.) থেকে অন্য সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, পাপীদের মহান আল্লাহ্র দয়া হতে নিরাশ হয়ে যাওয়াই ধবংস হওয়া।

হযরত 'উবায়দা আস্সালমানী থেকে বর্ণিত, এ আয়াত ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে যে পাপ কার্যে লিপ্ত হবার পর আনুগত্য স্বীকার করে পুনরায় আমার জন্য কোন তওবা নেই এ কথা বলে নিজেকে ধবংসের মধ্যে নিক্ষেপ করে দেয়।

হযরত উবায়দা (রা.) থেকে বর্ণিত,এ আয়াত ব্যক্তি সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যে মহা অপরাধ করার পর ধবংস হয়ে গেছে মনে করে নিজেকে নিজের হাতে ধবংসের মধ্যে নিক্ষেপ করে দেয়। কোন কোন তাফসীরকার বলেন, উপরোক্ত আয়াতের অর্থ, তোমরা মহান আল্লাহ্র পথে ব্যয় কর, এবং মহান আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা কখনো ছেড়ে দিও না।

এ মতের সমর্থনে বক্তব্য ঃ

ইমরানের পিতা আসলাম (র.) থেকে বর্ণিত, আমরা কন্সট্যান্টিনোপলের যুদ্ধ করেছি, এ যুদ্ধে মিসরীয়দের নেতা ছিলেন হযরত 'উকবা ইবনে আমির (রা.) এবং (মুসলমানদের) অন্য দলের নেতা ছিলেন, আবদুর রহমান ইবনে খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা.)। এ যুদ্ধে আমরা দুই কাতারে সারিবদ্ধ হয়ে ছিলাম। দৈর্ঘ্য-প্রস্থে এত বড় কাতার আমি জীবনে আর কখনো দেখেনি। রোমীয় সৈন্যরা ঐ শহর ঘেরা প্রাচীরের সাথে ঘেষে দাঁড়িয়ে ছিল তখন। এ সময় আমাদের এক ব্যক্তি কাফির সৈন্য বাহিনীর উপর বীরত্বপূর্ণ আক্রমণ চালান এবং তাদের ব্যুহ ভেদ করে শত্রু সৈন্যদের মধ্যে ঢুকে পড়েন। তখন কিছু লোক বললেন, لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ এ ব্যক্তি নিজেই নিজেকে ধবংসের মধ্যে নিক্ষেপ করছে। হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা.) এ কথা শুনে বললেন, শাহাদাতের কামনায় শত্রু সৈন্যদের উপর আক্রমণ করা ও তাদের বিরুদ্ধে প্রচন্ড যুদ্ধ করাকে তোমরা নিজেকে ধবংসের মধ্যে ঠেলে দেয়া বলে মনে করছ এবং আয়াতের ব্যাখ্যাও এ ভাবেই করছ, অথচ এ আয়াত আমাদের আনসারগণের ব্যাপারেই নাযিল হয়েছে (এবং আমরাই জানি এর সঠিক ভাবার্থ)। আল্লাহ্ পাক যখন তাঁর নবীকে সাহায্য করলেন এবং ইসলামকে জয়যুক্ত করলন তখন আমরা আনসারগণ একদা একত্র হয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে লুকিয়ে এ কথা পরামর্শ করি যে, অনেক দিন যাবত আমরা আমাদের পরিবারবর্গ, অর্থ-সম্পদ দেখা শুনা করতে পারিনি। এখন যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে সাহায্য করেছেন, তাই এখন আমাদের ধন-সম্পদ ও পারিবারিক ব্যাপারে মনোযোগ দেয়া উচিত। তখন অবতীর্ণ হয়- وَ اَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ কাজেই জিহাদ ছেড়ে দিয়ে ছেলে-মেয়ে ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি মনোযোগ দেয়া যেন নিজের হাতে নিজেকে ধবংসের মুখে ঠেলে দেয়ারই শামিল। বর্ণনাকারী আবূ ইমরান বলেন, হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা.) সর্বদা জিহাদের কাজেই ব্যাপৃত ছিলেন, অবশেষে কন্সট্যান্টিনোপলে তার সমাধি রচিত হয়।

তাজিবের আযাদকৃত গোলাম ইমরানের পিতা আসলাম (র.) থেকে বর্ণিত, কন্সট্যান্টিনোপলের যুদ্ধে আমরা শরীক ছিলাম। এ যুদ্ধে মিসরীয়দের নেতা ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহাবী হযরত

'উকবা ইবনে আমির জুহনী (রা.) এবং সিরিয়াদের নেতা ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অপর সাহাবী হযরত ফুযালা ইবনে 'উবায়দ (রা.)। এ যুদ্ধে রোমীয়দের ছিল যেমন বিরাট বাহিনী এমনিভাবে মুসলমানগণেরও ছিল এক বিরাট বাহিনী। এ সময় একজন মুসলিম বীর রোম সেনাদের উপর বীরত্বপূর্ণ আক্রমণ চালায় এবং তাদের ব্যূহ ভেদ করে শত্রু সৈন্যদের মধ্যে ঢুকে পড়েন। তারপর আবার মুসলিম বাহিনীর কাতারে এসে দাঁড়িয়ে যান, তখন কতিপয় লোক চিৎকার করে বলতে লাগলেন, سبحان الله দেখ দেখ, সে তো নিজের হাতেই নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করছে, এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহাবী হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা.) দাঁড়িয়ে বললেন, তোমরা তো উপরোক্ত আয়াতের এ ভাবে ব্যাখ্যা করেছে, অথচ এ আয়াত আমাদের আনসারগণের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। এরপর তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা যখন তার দীনকে শক্তিশালী করলেন এবং যখন দীনের সাহায্যকারিগণের সংখ্যা বাড়িয়ে দিলেন, তখন আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে না জানিয়ে পরস্পর বলাবলি করতে লাগলাম যে, আমাদের ধন-সম্পদ তো সব ধ্বংস হয়ে গেছে। যদি আমরা এসবগুলো দেখাশুনা করতাম তাহলে আমাদের এ মাল কখনো বিনষ্ট হতো না। এসময় আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের এ চিন্তাধারাকে বাতিল করে আল-কুরআনে নাযিল করলেন, "তোমরা আল্লাহ্র পথে ব্যয় কর এবং নিজেকে নিজেদের হাতে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না"। হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা.) বলেন, এ আয়াতে জিহাদ ছেড়ে দিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য ও ছেলে মেয়েকে দেখাশুনা করার প্রতি মনোযোগ দেয়াকেই মূলতঃ নিজের হাতে নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করার মধ্যে পরিগণিত করা হয়েছে। সুতরাং জিহাদ চালিয়ে যাওয়াই আমাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ। তাই হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা.) মহান আল্লাহ্র রাহে মৃত্যু পর্যন্ত জিহাদে রত থাকেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আমার নিকট وَ اَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ এর সঠিক ব্যাখ্যা হলো এই যে, এ আয়াতে আল্লাহ্পাক আমাদেরকে 'ইনফাক ফী সাবী লিল্লাহ্' তথা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর আল্লাহ্র পথ হলো যে পথকে আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের জন্য বিধিবদ্ধ এবং সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন উপরোক্ত মতামতের প্রেক্ষিতে আয়াতাংশের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা হলো এই যে, তোমরা তোমাদের শত্রু তথা তামাম কুফরী মতাদর্শের বিরুদ্ধে জিহাদ করার মাধ্যমে আমার বিধিবদ্ধ করা দীনকে সর্বত্র প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে খরচ কর।

আয়াতের দ্বিতীয়াংশে তিনি- ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة বলে মুসলমানগণকে নিজেদের হাতে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করতে নিষেধ করে দিয়েছেন। আরবী বাক্ধারা অনুসারে এ আয়াতে কারীমার প্রয়োগ বিধি اَعْطَى فُلَانٌ بِيَدِهِ এর মতই যা কোন কাজের প্রতি চরম আনুগত্যশীল ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এ হিসাবে ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة এর অর্থ ধ্বংসের জন্য তোমরা

কখনো আনুগত্য প্রকাশ করো না। যদি কর তাহলে এ ধ্বংসের দায়–দায়িত্ব তোমাদের উপরই পতিত হবে। পরিণামে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যখন মহান আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করা ওয়াজিব, এ সময় যে ব্যয় না করে সে যেন ধ্বংসের প্রতিই চরম আনুগত্য প্রকাশ করল।

প্রকাশ থাকে যে, ওয়াজিব দানসমূহের খাত সর্বমোট আটটি। এর মধ্যে একটি হলো **فى سبيل الله** তথা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করা। এ সম্পর্কে কুরআন মজীদে আল্লাহ্‌পাক ইরশাদ করেছেন।

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسٰكِيْنِ الْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ–

"সাদ্‌কা তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, দাস মুক্তির জন্য, ঋণভারাক্রান্তদের, আল্লাহ্‌র পথে যারা যুদ্ধ করে ও মুসাফিরদের জন্য। এ হলো আল্লাহ্‌র বিধান। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা তওবা ঃ ৬০)

সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে অপরিহার্য ব্যয়কে বর্জন করল, সে যেন স্বেচ্ছায় ধ্বংসের দিকে এগিয়ে গেলো এবং নিজ হাতে নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করল। অনুরূপভাবে যে পূর্বের কৃত গুনাহ্‌র কারণে আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ে গিয়েছে সেও নিজের হাতে নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করে দিয়েছে। একারণেই আল্লাহ্‌পাক এধরনের কর্মকান্ডকে নিষেধ করে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে– **وَلَا تَايْئَسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِنَّهٗ لَا يَايْئَسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ** 'আল্লাহ্‌র রহমত হতে তোমরা নিরাশ হয়ো না। কেননা আল্লাহ্‌র রহমত হতে কাফিররা ব্যতীত কেউ নিরাশ হয় না'। (সূরা ইউসুফঃ ৮৭)

এমনিভাবে জিহাদ ওয়াজিব হওয়ার অবস্থায় যে মুশারিকদের সাথে জিহাদ করা বর্জন করল সে যেন আল্লাহ্‌র বিধানকে ক্ষুণ্ন করল এবং নিজের হাতে নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করল। মহান আল্লাহ্‌র বাণী– **ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة** এর মধ্যে যেহেতু উল্লিখিত সব কয়টি অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে এবং আল্লাহ্ তা'আলা যেহেতু এগুলোর মাঝে কোনটাকেই খাস করেননি তাই আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা হলো আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন আমাদেরকে নিজেদের হাতে ঐ অবস্থায় নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন, যাতে রয়েছে আমাদের নিশ্চিত ধ্বংস। অতএব নিজ দায়িত্ব–কর্তব্য বর্জন করে ধ্বংস তথা আযাবের প্রতি চরম আনুগত্য প্রকাশ করা আমাদের কারো জন্য বৈধ নয়। কারণ এ কাজ মহান আল্লাহ্‌র পসন্দীয় নয়। এতে আল্লাহ্ পাকের শাস্তি অবধারিত। তবে বিষয়টি এমন হওয়া সত্ত্বেও– আয়াতের বিপুল ব্যবহৃত ব্যাখ্যা হলো, হে মু'মিনগণ ! তোমরা আল্লাহ্ পাকের পথে ব্যয়

কর। আল্লাহ্ পাকের পথে দান করাকে তোমরা কখনো ছেড়ে দিও না। কারণ তাহলে তোমরা আমার আযাবেরযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। ফলে তোমরা ধ্বংসের হয়ে যাবে। যেমন-বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে আল্লাহ্র বাণী- ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة এর ব্যাখ্যায়-বর্ণিত হয়েছে যে, تهلكة শব্দের ব্যাখ্যা হলো, আল্লাহ্ পাকের আযাব।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ হিসাবে আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে তাঁর রাস্তায় খরচ করায় নির্দেশ প্রদান করতঃ এ কথাই বুঝিয়েছেন যে, আল্লাহ্র পথে ব্যয় করা যাদের উপর ওয়াজিব তারা যদি আল্লাহ্র পথে ব্যয় না করে তাহলে পরকালে তাদের জন্য শাস্তি অবধারিত।

যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে, আরবী ভাষায় এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, তাঁরা القيت الى فلان بد রহলা না বলে সাধারণত القيت الى فلان د رحماً বলে থাকেন। এতদ্সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'আলা কেন ولا تلقوا ايد يكم الى التهلكة না বলে ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة বললেন ? তাহলে জবাবে বলা হবে যে, جزبت بالثوب - تعلقت به এবং تنبت بالذ هب এর মাঝে যেমনিভাবে باء সংযোজিত হয়েছে এমনিভাবে ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة এর মাঝেও باء সংযোজন করা হয়েছে। অথচ تنبت بالدهن এর অর্থ تنبت الدهن ।

অন্যান্য মুফাসসীর এ প্রশ্নের জবাবে এ কথাও বলেছেন যে, ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة এর باء হরফটি كلمة এর মূল অক্ষরের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, আরবী বাক্য বিন্যাস শাস্ত্রে كتابة কৃত فعل এর পরে باء সংযোজন করা সর্বজনবিদিত। যেমন, তুমি এক ব্যক্তির সাথে কথোপকথন করার পর এ ক্রিয়াটি থেকে كناية করার ইচ্ছা পোষণ করছ। আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্রের বিধান মতে তখন তোমাকে বলতে হবে فعلت به সুতরাং باء অক্ষরটি যেহেতু মূল كلمة এর অন্তর্ভুক্ত তাই তাকে শব্দের মাঝে সংযোজন করা ও শব্দ থেকে বের করে দেয়া উভয় প্রক্রিয়াই বৈধ ও বিধান সম্মত।

تهلكة শব্দটি باب تفعيل এর مصدر - تفعلة এর ওযনে ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে ধ্বংস ও হালাকাত মহান আল্লাহ্র বাণী- وَ اَحْسِنُوْا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ এর ব্যাখ্যা ঃ হে মু'মিনগণ ! তোমরা সৎকাজ কর। অর্থাৎ আমার নির্দেশিত দায়িত্ব ও কর্তব্য আদায় করে গুনাহ্ থেকে বেঁচে থেকে, 'ইনফাক ফী সাবী লিল্লাহ' করে এবং দুর্বলও অসহায় লোকদের খবরা-খবর রেখে তোমরা

সৎকাজ করে যেতে থাক। কারণ আমি সৎকর্মপরায়ণ লোকদেরকে ভালবাসি। যেমন বর্ণিত আছে যে, হযরত আবূ ইসহাক (র.) জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন যে, وَاَحْسِنُوْا এর অর্থ মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা। কেউ কেউ বলেছেন, و احسنوا এর অর্থ তোমরা মহান আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসকে দৃঢ় কর। এ মতের সমর্থনে আলোচনা ঃ

হযরত ইকরামা (রা.) থেকে বর্ণিত,–و احسنوا ان الله يحب المحسنين এর অর্থ হে মু'মিনগণ ! তোমরা মহান আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসকে দৃঢ় কর। তাহলে আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে সৎ বানিয়ে দেবেন।

অন্যান্য তাফসীরকার বলেছেন, আয়াতাংশের ব্যাখ্যা, হে মু'মিনগণ ! তোমরা অভাবী লোকদেরকে খবরা-খবর রেখে তাদের প্রতি সদাচারী হও। এ মতের সমর্থনে আলোচনা ঃ

হযরত ইবনে যায়দ থেকে বর্ণিত, و احسنوا ان الله يحب المحسنين এর অর্থ হে মু'মিনগণ তোমরা ইহ্‌সান কর ঐ সমস্ত লোকদের প্রতি যাদের হাতে কিছুই নেই।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَ اَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ – فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَ لاَ تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهٗ – فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖۤ اَذًى مِّنْ رَّاْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ فَاِذَاۤ اَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ –وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ –

অর্থঃ "তোমাদের আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হজ্জ ও 'উমরা পূর্ণ কর, কিন্তু তোমরা যদি বাধাপ্রাপ্ত হও তবে সহজলভ্য কুরবানী করবে, যে পর্যন্ত কুরবানীর পশু তার স্থানে না পৌঁছে তোমরা মস্তকমুন্ডন করোনা। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি পীড়িত হয় কিংবা মাথায় ক্লেশ থাকে তবে সিয়াম কিংবা সাদ্‌কা অথবা কুরবানীর দ্বারা তার ফিদ্‌ইয়া দিবে। যখন তোমারা নিরাপদ হবে তখন তোমাদের মধ্যে যে, ব্যক্তি হজ্জের প্রাক্কালে 'উমরা দ্বারা লাভবান হতে চায় সে সহজলভ্য কুরবানী করবে। কিন্তু যদি কেউ তা না পায় তবে তাকে হজ্জের সময় তিন দিন এবং গৃহ

প্রত্যাবর্তনের পর সাত দিন এ পূর্ণ দশদিন সিয়াম পালন করতে হবে। তা তোমাদের জন্য, যাদের পরিবারবর্গ মাসজিদুল হারামের এলাকার নয়। আল্লাহ্কে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ শাস্তি দানে কঠোর।" (সূরা বাকারাঃ ১৯৬)

মহান আল্লাহ্র বাণী- **واتموا الحج والعمرة لله** এর ব্যাখ্যা ঃ উপরোক্ত আয়াতাংশের তাফসীরের ব্যাপারে মুফাসসীরগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, আয়াতাংশের ব্যাখ্যা তোমরা হজ্জ ও 'উমরা তাদের নিজ নিজ অনুষ্ঠানাদি ও সুন্নাতসহ পূর্ণ কর। এ মতের সমর্থনে আলোচনা হযরত আলকামা (রা.) থেকে বর্ণিত আবদুল্লাহ্ (রা.)-এর পাঠ পদ্ধতি অনুযায়ী আয়াতে করীমা তিলাওয়াত **وَ اَقِيْمُوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ اِلَى الْبَيْتِ** অর্থাৎ হজ্জ ও 'উমরাকে তোমারা বায়তুল্লাহ্ পর্যন্ত পূর্ণ কর 'উমরাসহ তোমরা কখনো বায়তুল্লাহ্ অতিক্রম করবে না। বর্ণনাকারী ইবরাহীম (র.) বলেন, হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়র (র.)-এর নিকট এ পাঠ পদ্ধতি আমি উথাপন করলে তিনি বললেন, হযরত ইবনে 'আব্বাস (রা.)-এর পাঠ পদ্ধতিও অনুরূপ। হযরত ইবরাহীম (র.) থেকে বর্ণিত, তাঁর পাঠ পদ্ধতি ছিলো **واقيموا الحج والعمرة الى البيت** হযরত আলকামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তাঁর পাঠ পদ্ধতি ছিল অনুরূপ **واقيموا الحج والعمرة الى البيت**

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি **وا تموا الحج والعمرة لله** এর ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, হজ্জ ও 'উমরার ইহ্রাম বাধার পর ও দু'টি পূর্ণ করে ইহ্রাম ছেড়ে দেয়া কারো জন্য বৈধ নয়। হজ্জ পূর্ণ হয় কুরবানীর দিন (দশই যিলহাজ্জে) জাম্রায়ে আকাবাতে পাথর মারার পর এবং তাওয়াফে যিয়ারত পূর্ণ করার পর। এ কাজ দু'টো আদায় করার পর মুহ্রিম পূর্ণভাবে ইহ্রাম থেকে হালাল হয়ে যায় এবং 'উমরা পূর্ণ হয় তাওয়াফ এবং সাফা ও মারওয়া পর্বতদ্বয়ের মধ্যস্থলে দৌড়ানের পর। এ কাজ দু'টো সমাধা করার পর মুহ্রিম 'উমরার ইহ্রাম থেকে পূর্ণভাবে হালাল হয়ে যায়।

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে মহান আল্লাহ্র বাণী-**وا تموا الحج والعمرة لله** এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত, হজ্জ ও 'উমরার সাথে সংশ্লিষ্ট নির্দেশিত সমুদয় বিষয়াদিসহ তোমরা হজ্জ ও উমরা আদায় কর।

হযরত আলকামা ইবনে কায়স থেকে বর্ণিত আয়াতাংশে **الحج।** বলে হজ্জের সমুদয় অনুষ্ঠানাদিকে বুঝানো হয়েছে এবং (তাওয়াফ না করে) 'উমরার ইহ্রামসহ বায়তুল্লাহ্ শরীফ অতিক্রম করা কারো জন্য বৈধ নয়।

হযরত ইবরাহীম (র.) থেকে وا تموا الحج والعمرة لله এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত, হজ্জের অনুষ্ঠানাদি পূর্ণ হয়, আরাফাত, মুযদালিফা এবং এর বিভিন্নস্থানে অবস্থান করার দ্বারা এবং 'উমরার অনুষ্ঠানাদি পূর্ণ হয় বায়তুল্লাহ্ শরীফে তাওয়াফ এবং সাফা ও মারওয়া পর্বতদ্বয়ের মধ্যস্থলে দৌড়ানের দ্বারা। এ কাজ দু'টো আদায়করার পর মুহ্‌রিম স্বীয় ইহ্‌রাম থেকে হালাল হয়ে যায়।

অন্যান্য মুফসসীরগণ বলেছেন যে, হজ্জ এবং 'উমরা পূর্ণ করার অর্থ তোমরা নিজ নিজ বাড়ি হতে ইহ্‌রাম বাধাবে। এ মতের সমর্থনে আলোচনা ঃ

হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি হযরত আলী (রা.)-এর নিকট এসে তাঁকে বললেন যে, উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যা, তোমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ বাড়ী থেকে ইহ্‌রাম বাধবে।

হযরত আলী (রা.) থেকে অন্যসূত্রে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়র (র.) থেকে বর্ণিত, 'উমরা পূর্ণ হবে যদি তোমারা নিজ নিজ বাড়ী থেকে ইহ্‌রাম বাধ।

হযরত তাউস (র.) থেকে বর্ণিত, হজ্জ এবং 'উমরা পূর্ণ হবে যদি তোমরা পৃথক পৃথকভাবে হজ্জ নিজ নিজ বাড়ী থেকে উভয়ের জন্য ইহ্‌রাম বাধ।

হযরত তাউস (র.) থেকে আল্লাহ্‌র বাণী- وا تموا الحج والعمرة لله এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত যদি তোমারা নিজ নিজ বাড়ী থেকে পৃথক পৃথক ভাবে হজ্জ এবং 'উমরার জন্য ইহরাম বাধ তাহলেই তোমাদের হজ্জ এবং 'উমরা পূর্ণ হবে।

অন্যান্য মুফাসসীরগণ বলেছেন যে, 'উমরা পূর্ণ করার অর্থ হচ্ছে, হজ্জের মাস ব্যতীত অন্যান্য মাসে 'উমরা আদায় করা এবং হজ্জ পূর্ণ করার অর্থ হজ্জের অনুষ্ঠানাদি সম্পূর্ণ পৃথকভাবে আঞ্জাম দেয়া। যাতে হাজী সাহেবের উপর কিরান এবং তামাত্তু'র কারণে কোন প্রকার দম ওয়াজির না হয়।

এ মতের সমর্থনে আলোচনা ঃ

হযরত কাতাদা (র.) থেকে মহান আল্লাহ্‌র বাণী- وا تموا الحج والعمرة لله এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত, ঐ 'উমরা পূর্ণ হয় যা হজ্জের মাস ব্যতীত অন্যান্য মাসে আদায় করা হয়। আর যে ব্যক্তি হজ্জের মাসে 'উমরার ইহ্‌রাম বেধে হজ্জ করা পর্যন্ত তথায় অবস্থান করে সে হচ্ছে মুতামাত্তি অর্থাৎ সে হজ্জে তামাত্তুকারী, তার জন্য একাট পশু কুরবানী করা ওয়াজিব, যদি সে তা পায়, অন্যথায় হজ্জের সময় তিন দিন এবং গৃহ প্রত্যাবর্তনের পর সাত দিন এই পূর্ণ দশ দিন সিয়াম পালন করতে হবে।

হযরত কাতাদা (র.) থেকে মহান আল্লাহ্‌র বাণী-وا تموا الحج والعمرة لله এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত যে, 'উমরা হজ্জের মাস ব্যতীত অন্যান্য মাসে আদায় করা তা পূর্ণাঙ্গ 'উমরা আর যা হজ্জের মাসে আদায় করা হয় তা হজ্জে তামাত্তু' এর জন্য একটি পশু কুরবানী করা তার উপর ওয়াজিব।

হযরত কাসিম ইবনে মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত হজ্জের মাসে 'উমরা আদায় করলে তা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হল, মুহাররম মাসে 'উমরা আদায় করা কেমন ? উত্তরে তিনি বললেন, এ, কে তো লোকেরা পূর্ণাঙ্গ 'উমরাই মনে করতেন।

অন্যান্য মুফাসসীরগণ বলেছেন যে, হজ্জ এবং 'উমরা পূর্ণ করার অর্থ তোমরা নিজ নিজ বাড়ী থেকে হজ্জ এবং 'উমরার উদ্দেশ্যেই বের হবে। অন্য কোন উদ্দেশ্য নয়। নিম্নের বর্ণনাটিকে তাঁরা দলীলস্বরূপ উল্লেখ করেছেন।

হযরত সুফিয়ান (র.) থেকে বর্ণিত, হজ্জ এবং 'উমরা পূর্ণ করার অর্থ, তোমরা নিজ নিজ বাড়ী থেকে হজ্জ এবং 'উমরা উদ্দেশ্যেই বের হবে, অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয় এবং মীকাত (যেখান থেকে ইহ্‌রাম বাধতে হয়) পৌছে উচ্চস্বরে তালবিয়াহ্ পাঠ আরম্ভ করবে। তোমাদের অভিপ্রায় ব্যবসা-বাণিজ্য বা অন্যকোন ইহলৌকিক কার্য সাধনের জন্য হবে না। তোমারা বেরিয়েছ নিজের কাজে, মক্কার নিকটবর্তী হয়ে তোমাদের খেয়াল হল যে, এসো আমরা হজ্জ ও 'উমরাব্রত পালন করে নেই। এভাবে হজ্জ ও 'উমরা আদায় হয়ে যাবে বটে, কিন্তু পূর্ণ হবে না। পূর্ণ ঐসময়ই হবে যদি তোমরা শুধু এ উদ্দেশ্যেই বাড়ী থেকে বের হও, অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়। কোন কোন মুফাস্‌সীর বলেছেন যে, وا تموا الحج والعمرة لله অর্থ হজ্জ এবং 'উমরা আরম্ভ করার পর এ গুলো পূর্ণ করা তোমাদের জন্য অপরিহার্য।

এ মতের আলোচনা ঃ

হযরত ইবনে যায়দ (র.) থেকে বর্ণিত, 'উমরাব্রত পালন করা কোন মানুষের উপর ওয়জিব নয়। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আমি তাকে- وا تموا الحج والعمرة لله সম্পর্কে প্রশ্ন করার পর তিনি আমাকে বললেন, যে কোন কাজ আরম্ভ করার পর তা পূর্ণ করা ওয়াজিব হয়ে যায়। এ হিসাবে উমরার ইহ্‌রাম বাধার পর একদিন অথবা দু'দিন তালবিয়াহ্ পাঠ করে পুনরায় বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করা কোন মানুষের জন্য সমীচীন নয়। যেমন, সমীচীন নয় একদিন রোযা রাখার নিয়্যত করে অর্ধ দিবসের সময় ইফতার করে ফেলা। হযরত শা'বী (র.) শব্দটিকে والعمرةُ (ওয়াল 'উমরাতু) পাঠ করে থাকেন।

হযরত শু'বা থেকে বর্ণিত আমাকে সাঈদ ইবনে আবূ বুরদাহ্ (র.) বলেছেন যে, একদা শা'বী এবং আবূ বুরদা' 'উমরা সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। এমতাবস্থায় শা'বী বললেন, উমরা মুস্তাহাব, এরপর তিনি- وا تموا الحج والعمرة لله আয়াতাংশটি তিলাওয়াত করলেন। এরপর আবূ বুরদা (র.)

বললেন, 'উমরা ওয়াজিব, দলীলস্বরূপ তিনিও واتموا الحج والعمرة لله আয়াতাংশটি পাঠ করলেন।

হযরত শা'বী (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি উপরোক্ত আয়াতাংশে বর্ণিত و العمرة (ওয়াল 'উমরাতু) শব্দটিকে পেশের সাথে পাঠ করতেন। তবে শাবী (র.)–এর থেকে এর বিপরীত বর্ণনাও বিদ্যমান রয়েছে। এ পাঠ পদ্ধতিই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। যেমন বর্ণিত আছে যে, শাবী (র.) থেকে বর্ণিত, 'উমরাব্রত আদায় করা ওয়াজিব। যারা 'উমরাকে ওয়াজিব বলেন, তারা و العمرة শব্দটিকে (ওয়াল উমরাতা) যবরের সাথে পাঠ করেন। এ পাঠ পদ্ধতি অনুপাতে আয়াতাংশের অর্থ হবে, و اقيموا فرض الحج و العمر অর্থাৎ 'তোমরা হজ্জ এবং 'উমরার ফরযকে কায়েম কর।' যেমন বর্ণিত আছে যে, হযরত মাসরূক (র.) থেকে বর্ণিত, মহান আল্লাহ্র কিতাবে তোমাদেরকে চারটি বিষয়ের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ সালাত, হজ্জ এবং 'উমরা কায়েম করা এবং যাকাত প্রদান করা। এরপর তিনি পাঠ করলেন, وَ لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً (মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাবার সামর্থ আছে –মহান আল্লাহ্র উদ্দেশ্য ঐ গৃহের হজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য) (সূরা আলে-ইমরান ঃ ৭) এবং و اتموا الحج و العمرة لله الى البيت (তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহ্ পর্যন্ত হজ্জ এবং 'উমরা পূর্ণ কর।

হযরত মাসরূক (র.) থেকে বর্ণিত, আমাদেরকে চারটি বিষয় কায়েম করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ সালাত, উমরা এবং হজ্জ কায়েম করা ও যাকাত প্রদান করা নির্দেশ দেয়া হয়েছে। উপরোক্ত বর্ণনায় হজ্জ ও 'উমরাতে যে সম্পর্ক নামায ও যাকাতেও সে সম্পর্ক।

হযরত ইবনে জুরায়জ (র.) থেকে বর্ণিত, আলী ইবনে হুসায়ন এবং সাঈদ ইবনে জুবায়র 'উমরা মানুষের উপর ওয়াজিব কিনা এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবার পর তারা উভয়ই বললেন যে, আমরা তা ওয়াজিবই জানি। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে–و اتموا الحج و العمرة لله–অর্থাৎ তোমরা মহান আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে হজ্জ এবং 'উমরা পূর্ণ কর।

হযরত আবদুল মালিক ইবনে আবূ সুলায়মান থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়র (র.)–কে জিজ্ঞেস করলেন যে, উমরা কি ফরয না মুস্তাহাব ? উত্তরে তিনি বললেন, ফরয। তখন প্রশ্নকারী বললেন যে, শাবীর মতে তা মুস্তাহাব বলছেন। এ কথা শুনে তিনি বললেন, শাবী ঠিক বলেননি। এরপর তিনি পাঠ করলেন–و اتموا الحج و العمرة لله তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে হজ্জ এবং 'উমরা পূর্ণ কর।

আতা (র.) থেকে আল্লাহ্‌র বাণী–وَ اَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, হজ্জ এবং 'উমরা হচ্ছে ওয়াজিব।

সুতরাং আল্লাহ্ পাকের বাণী–وَ اَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ সম্পর্কে তাফসীরকারগণের ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, এ দু'টো কাজ ফরয। যেমন ইকামতে সালাত ফরয। আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন হজ্জের ন্যায় 'উমরাকেও ওয়াজিব করে দিয়েছেন। সাহাবা, তাবেঈন এবং পরবর্তী তাফসীরকাগণ যাঁ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাঁদের সংখ্যা অসংখ্য এবং অগণিত। তাঁদের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এবং সম্পূর্ণ বর্ণনা উল্লেখ করে আমি কিতাবকে দীর্ঘায়িত করতে চাই না। তাঁরা বলেন–وَ اَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ এর অর্থ হচ্ছে وَ اَقِيْمُوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ এ মতের সমর্থনের আলোচনা ঃ

সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, وَ اَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ এর অর্থ হচ্ছে وَ اَقِيْمُوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ –অর্থাৎ আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হজ্জ এবং 'উমরা কায়েম কর।

আলী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি وَ اَقِيْمُوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ এর স্থলে وَ اَقِيْمُوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ اِلَى الْبَيْتِ পাঠ করতেন। এরপর তিনি বললেন, যেমনিভাবে হজ্জব্রত পালন করা ওয়াজিব অনুরূপভাবে 'উমরাব্রত পালন করাও ওয়াজিব।

হযরত আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি وَ اَقِيْمُوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ পাঠ করে – وَ اَقِيْمُوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ اِلَى الْبَيْتِ – পাঠ করতেন। তারপর আবদুল্লাহ্ বললেন, যদি কোন জটিলতা দেখা না দিত এবং যদি আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে এ বিষয়ে কোন কথা না শুনতাম, তাহলে অবশ্যই আমি বলতাম, হজ্জের মত 'উমরাও ওয়াজিব। সম্ভবতঃ وَ اَقِيْمُوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ অর্থ তাঁরা এভাবে করতেন যে, তোমরা হজ্জ এবং 'উমরার অনুষ্ঠানাদি এবং ঐ বিধানসহ আদায় কর যা আল্লাহ্ পাক তোমাদের উপর ফরয করেছেন।

যারা العمرةَ (আল্ 'উমরাতা) শব্দটিকে যবর দিয়ে পাঠ করেন, তারা 'উমরা করা মুস্তাহাব বলেন এবং তাঁরা মনে করেন যে, العمرةَ (আল উমরাতা) শব্দটিকে যবর দিয়ে পাঠ করার পাঠ পদ্ধতি অনুসারে তার ওয়াজিব হওয়ার কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান নেই। কেননা, কতিপয় আমল এমন আছে যা আরম্ভ করার কারণে এর পূর্ণতা বিধান বান্দার উপর অপরিহার্য হয়। অথচ এ আমল প্রথমত আরম্ভ করা তার জন্য ওয়াজিব ছিল না। যেমন, নফল হজ্জ, এ বিষয়ে উলামাদের মাঝে কোন দ্বিমত নেই যে, হজ্জের ইহ্‌রাম বাধার পর তা করে যাওয়া এবং তার পূর্ণতা বিধান হাজীর জন্য অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়, অথচ প্রাথমিকভাবে এ হজ্জ আরম্ভ করা তার জন্য ফরয ছিল না।

অনুরূপভাবে 'উমরাও শুরু করা প্রথমত ওয়াজিব নয়। তবে আরম্ভ করার পর এর পূর্ণতা বিধান অপরিহার্য দাঁড়ায়। মুফাসসীরগণ বলেন, হজ্জ এবং 'উমরা পূর্ণ করার নির্দেশ দেয়ার মাঝে 'উমরা ওয়াজিব হওয়ার উপর কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান নেই। কারণ এ আয়াতের দ্বারা যেমনিভাবে 'উমরার ওয়াজিব হওয়া প্রমাণিত হয় না। এমনিভাবে এর দ্বারা প্রমাণিত হয় না হজ্জের ওয়াজিব হওয়ার বিষযটি। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ পাকের বাণী-**و لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا** অর্থাৎ (মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ আছে, আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য) এর দ্বারা আমাদের উপর হজ্জকে অবশ্য পালনীয় করে দিয়েছেন। সাহাবী, তাবেঈন এবং পরবর্তীকালের লোকেদের এক বিরট জামাআত এ মতামত পোষণ করেন। তাদের কতিপয় লোক নিম্নের বর্ণনাগুলোকে প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করেন।

হযরত ইবরাহীম (র.) থেকে বর্ণিত, হযরত আবদুল্লাহ্ (রা.) বলেছেন, হজ্জব্রত পালন করা ফরয এবং 'উমরা পালন করা মুস্তাহাব।

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে অন্যসূত্রে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ার (র.) থেকে বর্ণিত, 'উমরাব্রত পালন করা ওয়াজিব নয়।

হযরত সাম্মাক (র.) থেকে বর্ণিত আমি ইবরাহীম (র.)-কে 'উমরা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার পর তিনি বললেন, 'উমরাব্রত পালন করা হচ্ছে উত্তম সুন্নাত।

হযরত ইবরাহীম (র.) থেকে অন্যসূত্রে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

হযরত ইবরাহীম (র.) থেকে আরেক সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

হযরত ইবরাহীম (র.) আরও একটি বর্ণনা রয়েছে।

হযরত শাবী (র.) থেকে বর্ণিত 'উমরাব্রত পালন করা মুস্তাহাব।

যারা **العمرةُ** (আল উমরাতু) শব্দটিকে পেশ দিয়ে পড়েন, তাঁরা বলেন যে, **العمرةَ** (আল উমরাতা) শব্দটিকে যবর দিয়ে পড়ার কোন যৌক্তিকতা নেই, কারণ 'উমরা যিয়ারতে বায়তুল্লাহ্র নাম। এক ব্যক্তি **معتمر** ('উমরা পালনকারী)-এর নামে অভিহিত হতে পারে না যিয়ারতে বায়তুল্লাহ্ ব্যতীত। যিযারতে বায়তুল্লাহ্ ব্যতীত এক ব্যক্তি যেহেতু 'উমরা পালনকারীর নামে অভিহিত হতে পারে না। তাই সে বায়তুল্লায় পৌছে তাওয়াফ এবং সাফা ও মারওয়া পর্বতদ্বয়ের মধ্যস্থলে দৌড়ানোর পর তার উপর এমন কোন আমল বাকী থাকে না, যা পূর্ণ করার জন্য তাকে নির্দেশ দেয়া হবে। যেমন হজ্জব্রত পালনের ক্ষেত্রে বায়তুল্লায় পৌছার পর তাওয়াফ এবং সাফা ও মারওয়া পর্বতদ্বয়ের মধ্যেস্থলে দৌড়ানোর (সায়ীর) পর তাকে আরাফাত, মুযদালিফা, নির্দেশিত স্থানে অবস্থান এবং হজ্জের অন্যান্য আমলগুলো বাস্তবায়িত করে হজ্জ পূর্ণ করার নির্দেশ দেয়া হয়।সুতরাং 'উমরাব্রত

পালনকারী ব্যক্তিকে তোমার 'উমরা কি শেষ হয়েছে? বলার বোধগম কোন অর্থ নেই। যেহেতু এর কোন সঠিক অর্থ নেই তাই العمرةُ (আল'উমরাতু) শব্দের মধ্যে পেশ পড়াই সঠিক এবং বিশুদ্ধ। এ হিসাব 'উমরা একটি নেক কাজ; যা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে। অতএব العمرةُ শব্দটি مبتداء হওয়ার ভিত্তিতে مرفوع এবং পরে বর্ণিত لله শব্দটি এর خبر–

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, উভয় পঠন পদ্ধতির মধ্যে আমার নিকট সর্বোত্তম পদ্ধতি হল ঐ পাঠ পদ্ধতি যারা اَلْعُمْرَةَ (আল উমরাতা) শব্দটিকে যবরের সাথে পাঠ করেছে। এ সময় العمرةَশব্দটি الحج এর উপর عطف হবে। তখন আয়াতাংশে হজ্জ এবং 'উমরা উভয়ই পূর্ণ করার নির্দেশ বিদ্যমান থাকবে। তবে যারা العمرةُ (আল উমরাতু) শব্দটিকে পেশের সাথে পড়ে, কেননা 'আল্লাহ্ পাকের ঘর যিয়ারত করার নাম 'উমরা। সুতরাং পালনাকারী ব্যক্তি যখন আল্লাহ্র ঘরের নিকট পৌঁছে যিয়ারত করে তখন তার ওপর আর কোন আমল বাকী থাকে না। যা সম্পূর্ণ করার জন্য তাকে নির্দেশ দেয়া যেতে পারে।' কারণ দর্শানোর কোন অর্থ নেই। কেননা 'উমরা পালনকারী ব্যক্তি যখন বায়তুল্লাহ্ শরীফের নিকট পৌঁছে তখন তাঁর যিয়ারত সম্পূর্ণ হয়ে যায় বটে। তবে 'উমরা এবং যিয়ারতে বায়তুল্লাহ্র ক্ষেত্রে তার প্রতি আল্লাহ্র নির্দেশিত আমলগুলোর পূর্ণতা বিধান এখনো তার উপর বাকী থেকে যাচ্ছে। আর তা হচ্ছে, বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ, সাফা ও মারওয়া পর্বতদ্বয়ের মধ্যস্থলে দৌড়ানো এবং ঐ সমস্ত গর্হিত কাজসমূহ থেকে বেঁচে থাকা যা থেকে বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন। যদিও এ আমলগুলো যিয়ারতে বায়তুল্লাহ্র কারণেই 'উমরা পালনকারীর উপর অবশ্য কর্তব্য বলে বিবেচিত হয়েছে। তথাপিও العمرةَ (আল 'উমরাতা) শব্দটিকে যবরের সাথে পড়ার উপর যেহেতু ইজমা সংগঠিত হয়েছে এবং সমস্ত শহরের কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ যেহেতু العمرةُ (পেশের সাথে) পড়ার বিরুদ্ধে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তাই العمرةَ (আল উমরাতু) শব্দটিকে যারা পেশের সাথে পড়েন তাদের বিভ্রান্তির প্রমাণ করার জন্য অধিক আলোচনা করা আমি প্রয়োজনবোধ করছি না।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) আরও বলেন, و العمرةَ তথা যবরের যোগে পঠন পদ্ধতির মাঝে আমি যে দু'টি ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছি এর মধ্যে উত্তম ব্যাখ্যা হচ্ছে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ (রা.)–এর ব্যাখ্যা এবং ঐ ব্যক্তির ব্যাখ্যা যিনি বলেন যে, উল্লেখিত আয়াতাংশের ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, তোমরা হজ্জ ও 'উমরাকে নিজেদের উপর অপরিহার্য করে নেয়ার পর তোমরা তা পূর্ণ কর। তবে এদের শুরু অপরিহার্য হওয়ার নির্দেশ এ আয়াতে বিদ্যমান নেই। কারণ উক্ত আয়াতে বর্ণিত দু'টি অর্থেরই সম্ভাবনা রয়েছে। ১। হয়তো হজ্জ এবং 'উমরার বাস্তবায়ন প্রথমতই এ আয়াতে নির্দেশিত হবে। ২। অথবা শুরু করার পর এ দু'টির অপরিহার্যতার নির্দেশ আয়াতে বির্দমান থাকবে। সুতরাং

আয়াতটি যেহেতু উভয় অর্থকেই বুঝবার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই কোন পক্ষের দলীলই আয়াতে বিবৃত নয়। সর্বোপরি 'উমরার আবশ্যকীয়তার ব্যাপারে যেহেতু কোন সুস্পষ্ট হাদীস বিদ্যমান নেই এবং যেহেতু 'উমরার ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে উম্মতের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে, তাই যারা প্রমাণ ব্যতিরেকে 'উমরাকে ফরয বলেন তাদের কথা অর্থহীন। কারণ সুস্পষ্ট দলীল ব্যতীত ফরয কখনো প্রমাণিত হয় না।

যদিও কোন ধারণাকারী ধারণা করেন যে, হজ্জের মতই 'উমরা ওয়াজিব।

যারা وَ اَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ এর ব্যাখ্যা হজ্জ ও 'উমরার নিয়ম-কানুন যথাযথভাবে পালন কর। এ ব্যাখ্যা করেন তাদের এ ব্যাখ্যা আমার নিকট অন্যান্য ব্যাখ্যা হতে উত্তম-যেমন বর্ণিত আছে যে, আবুল মুন্তাফিক নামক এক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত, আমি আরাফাতে-হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দরবারে হাযির হলাম এবং অতি নিকটে পৌঁছলাম। তারপর আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এমন একটি আমল আমাকে বলে দিন যা আমাকে আল্লাহ্র আযাব থেকে নাজাতের কারণ হবে এবং জান্নাতে প্রবেশের ওয়াসীলা হবে। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করলেন, আল্লাহ্র ইবাদত কর, তাঁর সাথে কাউকেও শরীক করো না, ফরয নামায কায়েম কর, ফরয যাকাত প্রদান কর, হজ্জ এবং 'উমরা পালন কর। বর্ণনাকারী আশহাল (রা.) বলেন, আমার মনে হয় হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এ কথাও বলেছেন যে, রমযানের রোযা রাখ এবং তোমার প্রতি মানুষের যে আচরণকে তুমি পসন্দ কর তুমি ও মানুষের সাথে সে আচরণ কর। আর তোমার প্রতি মানুষের যে আচরণকে তুমি অপসন্দ কর তুমিও মানুষের সাথে সে আচরণ করাকে বর্জন কর।

হযরত বনী আমির গোত্রের এক ব্যক্তি আবূ রাযীন উকায়লী থেকে বর্ণিত, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা.) ! আমার আব্বা একজন বৃদ্ধ মানুষ। তাঁর হজ্জ এবং 'উমরা করার কোন ক্ষমতা নেই এবং তিনি সওয়ারীর উপর আরোহণ করতেও সক্ষম নন। অথচ তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আমি কি তার পক্ষ হতে হজ্জ করতে পারব ? হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, তুমি তোমার আব্বা পক্ষ হতে হজ্জ এবং 'উমরা আদায় কর।

হযরত আবূ কিলাবা (রা.) থেকে বর্ণিত, এক সময় ওয়ায প্রসঙ্গে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করলেন, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর, কোন কিছুকে তাঁর সাথে শরীক করো না, নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর, হজ্জ ও 'উমরা পালন কর এবং তোমরা ঈমানের উপর স্থির থাক, তাহলে আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে স্থির রাখবেন। অনুরূপ আরো বহু হাদীস। এসব দলীল দীনী ব্যাপারে কোন অকাট্য প্রমাণ নয়। এ সমস্ত হাদীসের প্রেক্ষিতে 'উমরার অপরিহার্যতা প্রমাণিত হয় না কখনো। যেমন নিম্নের হাদীসসমূহের দ্বারা কথা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়।

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, 'উমরা ওয়াজিব কি না এ সম্বন্ধে হযরত নবী করীম (সা.)-কে প্রশ্ন করা হলে, তিনি বললেন, 'উমরা করা তোমাদের জন্য উত্তম।

হযরত আবূ সালিহ্ আল–হানাফ (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন, হজ্জ হলো জিহাদ এবং 'উমরা হলো মুস্তাহাব।

কতিপয় সাধারণ অজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিগণ মনে করেন যে, 'উমরা ওয়াজিব, কারণ প্রত্যেক মুস্তাহাব আমলের জন্য ফরয ইবাদত শীর্ষস্থানীয়। কাজেই 'উমরা যেহেতু মুস্তাহাব তাই এর শীর্ষস্থানীয় আমল থাকা ও অত্যাবশ্যক। কেননা সমস্ত আমলের ক্ষেত্রে ফরযই হল মুস্তাহাবের শীর্ষস্থানীয়

এমন মতামত পোষণকারী লোকদের এ মতের উত্তরে বলা হবে যে, ই'তিকাফ তো মুস্তাহাব। কোন ই'তিকাফ ফরয আছে কি ? যা এ মুস্তাহাব ই'তিকাফের শীর্ষে থাকার যোগ্যতা রাখে ? এরপর এ সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন লোকদেরকে পুনরায় প্রশ্ন করা হবে যে, ই'তিকাফ ওয়াজিব কি না ? উত্তরে যদি তারা ওয়াজিব বলে, তাহলে তারা সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্র বিরুদ্ধাচরণ করল। আর যদি বলে ওয়াজিব নয় বরং মুস্তাহাব তাহলে তাদেরকে বলা হবে, কোন যুক্তিতে তোমরা ই'তিকাফকে মুস্তাহাব এবং 'উমরাকে ফরয় বলে দাবী করছ ? এ বিষয়ে তোমাদের দলীল কি ? এ ব্যাপারে তারা সন্তোষজনক কোন দলীল পেশ করতে পারবে না। অবশেষে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হওয়া ব্যতীত তাদের কোন গত্যন্তর নেই।

সার কথা, উভয় পঠন পদ্ধতির মধ্যে ঐ সমস্ত কিরাআত বিশেষজ্ঞগণের পাঠ প্রক্রিয়াই উত্তম, যারা العمرةَ (আল 'উমরাতা) শব্দটিকে যবর দিয়ে পড়েন। و اتموا الحج و العمرة لله এর ব্যাখ্যাসমূহের মাঝে হযরত ইবনে 'আব্বাস (রা.)–এর ব্যাখ্যাটিই উত্তম, যা 'আলী ইবনে আবূ তালহার সূত্রে তাঁর বর্ণনা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। অর্থাৎ হজ্জ এবং 'উমরার অনুষ্ঠানাদি ও সুন্নাতগুলো নিজের উপর অপরিহার্য করার পর এবং হজ্জ এবং 'উমরা আরম্ভ করার পর এ গুলোর পূর্ণতা বিধানের নির্দেশ উপরোক্ত আয়াতে বিদ্যমান রয়েছে এবং 'উমরা সম্বন্ধে বর্ণিত মতামত দু'টোর মধ্যে ঐ সমস্ত লোকদের মতামতই সঠিক ও নির্ভুল যারা বলেন, 'উমরা মুস্তাহাব, ফরয নয়।

এ হিসাবে আয়াতাংশের ব্যাখ্যা হবে মু'মিনগণ ! আল্লাহ্র নির্দেশিত পন্থা ও পদ্ধতি মত হজ্জ এবং 'উমরাকে নিজেদের উপর আবশ্যক করে নেয়ার পর এবং হজ্জ ও 'উমরার অনুষ্ঠানাদি আরম্ভ করার পর তোমরা হজ্জ এবং 'উমরাকে মহান আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে পূর্ণ কর। কারণ এ আয়াতগুলোকে আল্লাহ্ পাক তাঁর নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)–এর প্রতি হুদায়বিয়ার 'উমরা করার সময় নাযিল করেছেন, যেখানে তাঁর যিয়ারতে বায়তুল্লাহ্র পথ অবরুদ্ধ করে দেয়া হয়ে ছিল। এ আয়াতগুলোর মূল উদ্দেশ্যে ছিল পথ উম্মুক্ত হয়ে যাবার পর এ ইহ্রামের মধ্যে মুসলমানদের করণীয় কি, ইহরাম বাধার পর যিয়ারতে বায়তুল্লাহ্র পথ অবরুদ্ধ হয়ে গেলে এ ইহ্রাম থেকে হালাল হবার উপায় কি, 'উমরাতুল হুদায়বিয়ার বছর তাদের করণীয় দায়িত্ব কি এবং আগামী বছর হজ্জ এবং উমরার ব্যাপারে তাদের কি আমল করতে হবে ? ইত্যাকার বিষয়াদি সম্পর্কে মুসলমানদেরকে ওয়াকিফহাল করা। তাই আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন– يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَ الْحَجِّ

এর (সূরা বাকারাঃ ১৮৯) দ্বারা হজ্জ এবং উমরা সংক্রান্ত আলোচনা আরম্ভ করেছেন। হজ্জ এবং 'উমরার আভিধানিক অর্থ সম্পর্কে আমি পূর্বেই আলোচনা করেছি। এখানে এর পুনরাবৃত্তি করা আমি আর সমীচীন মনে করছি না।

মহান আল্লাহ্র বাণীর- فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ এর ব্যাখ্যা হজ্জ এবং 'উমরার আদায় করার ব্যাপারে যে বাধার সৃষ্টি হয়, তার কারণে সহজলভ্য কুরবানী করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, এ ব্যাপারে ব্যাখ্যায় আলিমগণের একাধিক মত রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, মুহ্রিমকে ইহ্রামের অবস্থায় আল্লাহ্র নির্দেশিত কাজগুলো আঞ্জাম দেয়ার ক্ষেত্রে এবং বায়তুল্লাহ্ শরীফে পৌছার ব্যাপারে প্রতিটি প্রতিবন্ধক বস্তুই বাঁধার মধ্যে শামিল।

এ মতের সমর্থনে বর্ণনা ঃ

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলতেন الحصر এর অর্থ الحبس (বাধাপ্রাপ্ত হওয়া)। তিনি বলতেন, হজ্জ অথবা 'উমরার সফরে যদি কেউ ওযরের সম্মুখীন হয় তাহলে যেখানে সে বাধাপ্রাপ্ত হবে-সেখানে থেকেই কুরবানীর পশু পাঠিয়ে দিবে।

হযরত মুজাহিদ (র.) فان احصرتم-এর ব্যাখ্যায় বলতেন, যদি কোন মানুষ রুগ্ন হয়ে পড়ে, পা ভেংগে যায় অথবা আটকা পড়ে, তা হলে সে যেন সহজলভ্য কুরবানীর পশু পাঠিয়ে দেয়। এমতাবস্থায় সে কুরবানীর দিনের পূর্বে মাথাও কামাবে না এবং হালালও হতে পারবে না।

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

হযরত আতা (র.) থেকে বর্ণিত, احصار বলে প্রত্যেক ঐ বস্তুকে বুঝানো হয়েছে যা মুহ্রিমের পথ আটকিয়ে রাখে।

কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, محصر অর্থ ভয়, রোগ এবং বাধাদানকারী, যদি কেউ এগুলোর সম্মুখীন হয় তা হাল সে যেন কুরবানীর পশু পাঠিয়ে দেয়। কুরবানীর পশু যখন তার স্থানে পৌছে যাবে তখন সে (محصر) হালাল হয়ে যাবে।

কাতাদা (র.) থেকে মহান আল্লাহ্র বাণী- فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত, এ বিধান ঐ ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য যে ভয়, রোগ অথবা কোন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছে, যা তার বায়তুল্লাহ্ শরীফে যাওয়ার পথ আটকে রেখেছে। এহেন অবস্থার সম্মুখীন ব্যক্তি একটি কুরবানীর পশু পাঠিয়ে দিবে। যখন কুরবানীর পশু তার স্থানে পৌছে, তখন সে (محصر) হালাল হয়ে যাবে।

হযরত 'উরওয়ার (র.) পিতা থেকে বর্ণিত, মুহ্রিমকে তার কার্য সম্পাদনে বাধা দান করে এমন প্রতিটি ব্যাপারই- احصار এর অন্তর্ভুক্ত।

হযরত ইবরাহীম (র.) থেকে- فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, রোগ, ভীতি এবং পা ভেংগে যাওয়া প্রতিটি বিষয়ই- احصار এর অন্তর্ভুক্ত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে আল্লাহ্‌র বাণী-فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ এর ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি হজ্জ অথবা 'উমরার ইহ্‌রাম বাধার পর মরণাপন্ন রোগ অথবা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী ওযরের কারণে বায়তুল্লায় না গিয়ে আটকিয়ে পড়ে-তাহলে তার উপর এগুলোর কাযা জরুরী।

উপরোক্ত মতামত পোষণকারী মুফাসসীরগণ উক্ত বিশ্লেষণের কারণ হিসাবে এ কথা বর্ণনা করেন যে, আরবী ভাষায় احصار এর অর্থ কোন কারণে তথা রোগ, দংশন করা, ক্ষত হওয়া, টাকা পয়সা না থাকা, অথবা সওয়ারীর পা ভেংগে যাওয়া ইত্যাকার কারণে বাধাপ্রপ্ত হওয়া। তবে অপ্রতিহত বা পরাক্রমশালী কোন শক্তির কারণে বাধাপ্রাপ্ত হওয়াকে আরবী ভাষায় বলে না। বরং শত্রু কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হওয়া, জেলখানায় অন্তরীণ হওয়া এবং পরাক্রমশালী কোন শক্তির মুহ্‌রিম এবং বায়তুল্লাহ্ শরীফের মাঝে বাধা সৃষ্টি করাকে আরবী ভাষায় বলা হয়। যেমন, আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন- وَ جَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِيْنَ حَصِيْرًا (জাহান্নামকে আমি কাফিরদের জন্য কারাগার করে দিয়েছি) (সূরা ইস্‌রা ঃ ৮) এখানে حصير শব্দটি حاصر এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যার মর্মার্থ বাধাপ্রদানকারী। অন্যথায় যদি উল্লেখিত কারণসমূহ ব্যতীত পরাক্রমশালী কোন শক্তি কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হওয়াকে احصار বলা হয় তাহলে قد احصر العدو বলা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। অথচ حوصر العدو এবং و العدو محاصر এর উপর আরবী ভাষাবিদগণের ঐক্যমত রয়েছে। احصر العدو و هم محصرون এবং احصر الرجل এর উপর নয় । এতে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, আয়াতাংশের অর্থ فان احصرتم بمرض او خوف او علة مانعة অর্থাৎ যদি তোমরা রোগ, ভয় অথবা অন্য কোন বাধা সৃষ্টিকারী ওযরের কারণে বাধাপ্রাপ্ত হও।

মুফাসসীরগণ বলেছেন যে, আমরা حبس العدو তথা শত্রু দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে বায়তুল্লাহ্ শরীফে যেতে না পারাকে حصر المرض অর্থে ব্যবহার করেছি এ কথার উপর কিয়াস করে যে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন রুগ্ন ব্যক্তির জন্যও এ হুকুম দিয়েছেন ঐ রোগের কারণে যে রোগ মুহ্‌রিমকে বায়তুল্লাহ্ শরীফে যেতে বাধা দেয়। আমরা حبس العدو কে فان احصرتم فما استيسر من الهدى এর ظاهرى دلالة এর উপর কিয়াস করিনি। কেননা শত্রু, বাদশাহ্ এবং কোন পরাক্রমশালী শক্তির কারণে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার কারণটি মূলতঃ রোগের কারণে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার হুবহু নজীর। এতে কোন বৈসাদৃশ্য নেই।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন- فان احصرتم فما استيسر من الهدى এর অর্থ, যদি শত্রুগণ তোমাদেরকে বায়তুল্লাহ্ শরীফে পৌঁছতে বাধা দেয়, তা হলে সহজলভ্য কুরবানী করবে। অনুরূপভাবে কোন মানুষ যদি বাধাদানকারী রূপে দাঁড়ায়, তা হলেও তোমরা সহজলভ্য কুরবানী করবে। আর সে সমস্ত বাধাসৃষ্টিকারী, কারণ মানুষের শরীরের সাথে সম্পর্কিত যেমন রোগ-ক্ষত ইত্যাদি। এ সব فان احصرتم এর হুকূমের অন্তর্ভুক্ত নয়।

এ মতের সমর্থনে বর্ণনা ঃ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, শত্রুকর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হওয়াই প্রকৃতপক্ষে বাধা। এ হেন অবস্থায় পতিত ব্যক্তি একটি কুরবানীর পশু পাঠিয়ে দিবে। শত্রুর কারণে যদি কেউ বায়তুল্লাহ্ শরীফে পৌঁছতে সক্ষম না হয় তাহলে সে একটি কুরবানীর পশু পাঠিয়ে দিবে এবং ইহ্রাম অবস্থায় থাকবে। বর্ণনাকারী আবূ আসিম বলেন, আমি জানি না, তিনি কি বলেছেন, ইহ্রাম অবস্থায় থাকবে অথবা পশু খরিদ করার পর যেদিন পাঠানোর ওয়াদা করেছেন সে দিন হালাল হয়ে যাবে। এরপর তাঁর (محصر) উপর হজ্জ অথবা 'উমরা কাযা করে নেয়া ওয়াজিব। যদি কেউ পথ চলা অসম্ভব এমন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে এবং তার সাথে কুরবানীর পশু না থাকে, তাহলে সে সাথে সাথে হালাল হয়ে যাবে। আর যদি তাঁর সাথে কুরবানীর পশু থাকে, তাহলে সে কুরবানীর পশু তার স্থানে পৌঁছার পূর্বে হালাল হতে পারবে না। কুরবানীর পশু পাঠিয়ে দেয়ার পর পরবর্তী বছর তার উপর হজ্জ বা 'উমরা আদায় করা ওয়াজিব নয়। হাঁ যদি আল্লাহ্ পাক তাওফীক দেন তা স্বতন্ত্র ব্যাপার।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, শত্রু দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হওয়া ব্যতীত আর কোন বাধাই প্রকৃত বাধা নয়।

হযরত ইবন আব্বাস (রা.) থেকে মুহাম্মদ ইবনে আমরের মতই বর্ণনা রয়েছে। তবে তিনি বলেছেন, সে বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কুরবানীর পশু পাঠিয়ে দিবে এবং পশু খরিদ করার পর কুরবানী দাতা যে দিন তা পৌঁছানোর ওয়াদা তার সাথে করেছেন, সে দিন পর্যন্ত তিনি ইহ্রাম অবস্থায় থাকবেন। হাদীসের পরবর্তী অংশটুকু মুহাম্মদ ইবনে আমরের বর্ণনার মতই। মালিক ইবনে আনাস (র.) বলেছেন, হুদায়বিয়ায় অবস্থানকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও তাঁর সাহাবিগণ হালাল হয়ে যাওয়ার ফলে সকলেই কুরবানী করে নিজ নিজ মাথা মুন্ডিয়ে নিলেন এবং বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ করা ও কুরবানীর পশু মক্কায় পৌঁছার পূর্বেই তারা ইহ্রাম থেকে হালাল হয়ে গেলেন । হযরত মালিক ইবনে আনাস (র.) বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর সাহাবিগণের কাউকে কোন কিছু কাযা করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং কোন আমল তারা পুনরায় করেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

মালিক (র.) থেকে বর্ণিত, এক সময় তিনি শত্রু দ্বারা আক্রান্ত বায়তুল্লাহ্ হতে পৌঁছতে অক্ষম মুহ্রিম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবার পর বললেন, সে যেখানে বন্দী হয়েছে সেখানেই ইহ্রাম ভেংগে ফেলবে, কুরবানী করবে এবং মাথা মুন্ডিয়ে নিবে। কাযা তার উপর ওয়াজিব নয়। হাঁ যদি সে কখনো

হজ্জ না করে থাকে তাহলে অন্য সময় তাকে ইসলামের ফরয হজ্জটি আদায় করে নিতে হবে। তিনি বলেন, যদি কোন ব্যক্তি রোগ অথবা এ ধরনের কোন কারণে বাধাপ্রাপ্ত হয় তাহলে সে প্রথমে নিজের জরুরী কাজ সেরে নিবে এবং ফিদ্ইয়া দিবে। এরপর এ আমলগুলোকে 'উমরা ধরে পরবর্তী বছর এ হজ্জ কাযা করে নিতে হবে। তবে এ বছর তাকে একটি কুরবানীর পশু পাঠিয়ে দিতে হবে। আয়াতের যারা এ ব্যাখ্যা করেন তাঁরা কারণ হিসাবে বলেন যে, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও তাঁর সাহাবায়ে কিরামকে মুশরিকরা যিয়ারতে বায়তুল্লাহ্র পথে যে বাধা সৃষ্টি করেছিল, এ বাধা সম্পর্কেই মূলতঃ এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। এতে আল্লাহ্ পাক তাঁর নবী ও তাঁর সাহাবিগণকে তাঁদের পশুগুলোকে যবেহ্ করা এবং হালাল হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং আয়াত যেহেতু শত্রু কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হওয়া সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, তাই তাকে তার নিজস্বস্থান থেকে অন্যস্থানের প্রতি স্থানান্তরিত করা কখনো ঠিক নয়। তবে রুগ্ন ব্যক্তি যে তার রোগের কারণে চলাফেরা করতে অক্ষম, তার আরাফাতের অবস্থান যেহেতু হয়নি তাই তার হজ্জ ও হয়নি। সুতরাং ইহ্রাম ভেংগে ফেলা তার জন্য অপরিহার্য। তবে এ রুগ্ন ব্যক্তি এ বাধাপ্রাপ্ত এর অর্থের অন্তর্ভুক্ত নয়, যার সম্পর্কে এ আয়াতে অবতীর্ণ হয়েছে।

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যাদ্বয়ের মধ্যে ঐ মুফাসসীরগণের ব্যাখ্যাই সঠিক ও নির্ভরযোগ্য, যারা বলেন যে, যদি শত্রুর ভয়, রোগ অথবা অন্য কোন কারণ তোমাদের বায়তুল্লাহ্ শরীফের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে যার ফলে তোমরা হজ্জ অথবা 'উমরার ঐ সমস্ত অনুষ্ঠানাদি পালন করতে পারছ না যা তোমরা তোমাদের নিজেদের উপর অবশ্য কর্তব্য করে নিয়েছিলে তাহলে তোমরা সহজ লভ্য কুরবানী করবে। একারণেই বলা হয়েছে **فان احصرتم** আরবীতে কায়দা আছে যে, যদি ভয় এবং রোগের কথা উল্লেখ না করা হয় তখন বলা হয় **احصرني خوفي من فلان عن لقائك و مرض ي عن فلان**–যার অর্থ – **جعلني احبس نفسي عن ذالك** বাধা প্রদানকারী যদি কোন মানুষ বা পুরুষ হয় তাহলে বলা হবে – **حصرني فلان عن لقائك** যার অর্থ হচ্ছে **حبسني عنه** আয়াতের ব্যাখ্যা যদি তাই হত যেমন কোন কোন মুফাসসীর মনে করছেন। (অর্থাৎ যদি কোন বাধা প্রদানকারী শত্রু তোমাদেরকে বাধাদান করে) তাহলে **فان احصرتم** না বলে **فان حصرتم** বলা দরকার ছিল।

পূর্বোক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যা সম্পর্কে আমি যে মতামত ব্যক্ত করেছি তার বিশুদ্ধতা মহান আল্লাহ্র বাণী– **فَاِذَا اَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ** (যখন তোমরা নিরাপদ হবে তখন তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি হজ্জের প্রাক্কালে 'উমরা দ্বারা লাভবান হতে চায় সে সহজলভ্য কুরবানী করবে।) এর দ্বারা সুস্পষ্টভাবে নিরূপিত হয়। কারণ, নিরাপত্তা বলা হয় ভয় বিদূরিত হওয়াকে। এতে বুঝা যায় যে, আয়াতে বর্ণিত অবরোধের অর্থ ঐ ভয় যা দূরীভূত হলে নিরাপত্তা হাসিল হয়।। সুতরাং যে প্রতিবন্ধকতার সাথে ভয় নেই সে প্রতিবন্ধকতা উপরোক্ত আয়াতের হুকুমের মধ্যে শামিল হবে না।

যদিও কিয়াস করে শামিল করা হয়। সুতরাং মুহ্‌রিম–এর বায়তুল্লাহ্ শরীফ যাওয়ার পথ অবরোধ করা এ ধরনের প্রতিটি প্রতিবন্ধকতাই অবরোধের অন্তর্ভুক্ত। এরই বিধান বর্ণিত হয়েছে, – فان احصرتم فما استيسر من الهدى এর মধ্যে।

– فما استيسر من الهدى (সহজলভ্য কুরবানী করবে)–এর ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণের একাধিক মত রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, সহজলভ্য কুরবানী হলো বকরী কুরবানী করা ।

এ মতের সমর্থনে বর্ণনা ঃ

হযরত ইবনে আববাস (রা.) থেকে বর্ণিত – فما استيسر من الهدى সহজলভ্য কুরবানী হলো বকরী কুরবানী করার কথা বুঝানো হয়েছে।

অন্যসূত্রে ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে অন্যসূত্রে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

হযরত নু'মান ইবনে মালিক (র.) থেকে বর্ণিত, আমি ইবনে 'আব্বাস (রা.)–কে فما استيسر من الهدى সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার পর তিনি বললেন, বকরী কুরবানী কর।

হযরত নু'মান ইবনে মালিক (র.) থেকে বর্ণিত, আমি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)–কে فما استيسر من الهدى সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার পর তিনি বললেন, উট–উটণী, গরু–গাভী, ছাগল–বকরী, ভেড়া–ভেড়ী এ আট প্রকারের মধ্যে ইচ্ছা মত যবেহ্ করবে।

হযরত যুহরী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি فما استيسر من الهدى এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবার পর বলেছেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলতেন, আয়াতাংশে সহজলভ্য পশু কুরবানী করার কথা বলে বকরী কুরবানী করার কথা বুঝানো হয়েছে।

হযরত ইবনে আববাস (রা.) থেকে বর্ণিত, فما استيسر من الهدى আয়াতাংশে আট প্রকারের পশু থেকে ইচ্ছামত কুরবানী করার কথা বলা হয়েছে।

হযরত খালিদ থেকে বর্ণিত, আশ'আস (র.)–কে প্রশ্ন করা হল যে, فما استيسر من الهدى সম্পর্কে হযরত হাসানের (র.) অভিমত কি? 'উত্তরে তিনি বললেন, তিনি বকরীর কথা বলেছেন।

হযত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, উক্ত আয়াতাংশে ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, তা হলো বকরী ।

হযরত কাতাদা থেকে–فما استيسر من الهدى এর ব্যাখ্যার বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, সহজলভ্য পশুর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট হলো উট এবং মধ্যম হলো গরু এবং একেবারে নিম্নস্তরের হলো বকরী।

হযরত কাতাদা (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা, তার অভিমত সম্বন্ধে বলা হতো, উত্তম হলো উট, অপর সব বর্ণনা পূর্ববর্তী উক্তির ন্যায়।

হযরত ইবনে আববাস (রা.) থেকে فما استيسر من الهدى এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত সহজলভ্য পশু বলে উক্ত আয়াতে বকরীকেই বুঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে আববাস (রা.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

হযরত আতা (র.) থেকে এর ব্যাখ্যায় فما استيسر من الهدى বকরী কুরবানী করার কথা বর্ণনা করেছেন।

হযরত আতা (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

হযরত সূদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বাধাপ্রাপ্ত মুহ্‌রিম সম্পর্কে বলেছেন যে, সে একটি বকরী অথবা এর চেয়ে বড় কোন পশু মক্কা শরীফে পাঠিয়ে দিবে।

হযরত আলকামা থেকে বর্ণিত, হজ্জের ইহ্‌রাম বাধার পর যদি কোন ব্যক্তি বাধাপ্রাপ্ত হয়ে যায় তাহলে সে সহজলভ্য একটি বকরী মক্কা শরীফে পাঠিয়ে দিবে। বর্ণনাকারী আলকামা (রা.) বলেন, এ কথাটি আমি হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়র (রা.)–এর সামনে উল্লেখ করলে তিনি বললেন, হযরত ইবনে 'আববাস (রা.) অনুরূপ কথাই বলেছেন।

হযরত ইবনে আববাস (রা.) থেকে– فما استيسر من الهدى এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত, এমতাবস্থায় তোমরা একটি বকরী অথবা এর চেয়ে বড় কোন পশু কুরবানী করবে।

হযরত ইবনে আববাস (রা.) থেকে বর্ণিত,– فما استيسر من الهدى আয়াতাংশে সহজলভ্য পশু কুরবানী করার নির্দেশ দিয়ে উট, গাভী, বকরী অথবা শরিকানা কুরবানী করার কথাই বুঝানো হয়েছে।

হযরত কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, হযরত ইবনে আববাস (রা.) বকরীকেই সহজলভ্য পশু বলে মনে করতেন।

হযরত ইবনে আববাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, বকরীই হলো সহজলভ্য পশু।

হযরত ইবরাহীম (র.) থেকে বর্ণিত, বকরী হচ্ছে সহজলভ্য পশু।

হযরত ইবনে আববাস (রা.) থেকে বর্ণিত, الهدى অর্থ বকরী, এরপর তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, 'হাদ্‌য়ী' গাভীর চেয়ে ছোট হয় কি? এ কথা শুনে তিনি বললেন, আমি তোমাদের নিকট কুরআন পাঠ করছি, তোমরা কি জান না ? 'হাদ্‌য়ী' হলো বকরী। এরপর তিনি প্রশ্ন করলেন যে, যদি কোন মুহ্‌রিম গর্ভজাত হরিণের বাচ্চাকে মেরে ফেলে তাহলে তাকে কি বিনিময় দিতে হবে, তারা বললেন, বকরী তিনি বললেন, এ তো হল কা'বাতে প্রেরিতব্য কুরবানীরূপে। সুতরাং বকরীই হল 'হাদ্‌য়ী'।

মুছান্না.............ইবনে আববাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, বকরীই হল সহজলভ্য কুরবানীর পশু।

আবূ কুরায়ব ....আবূ জা'ফর থেকে **فما استيسر من الهدى** এর ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন যে, তিনি বললেন, উপরোক্ত আয়াতে–সহজলভ্য কুরবানীর কথা বলে বকরীকেই বুঝানো হয়েছে।

হযরত আলী ইবনে আবূ তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, **فما استيسر من الهدى** এর অর্থ হচ্ছে বকরী।

হযরত আলী ইবনে আবূ তালিব (রা.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আববাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, **فما استيسر من الهدى** এর অর্থ বকরী।

فما استيسر من الهدى এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত, বাধাপ্রাপ্ত মুহ্‌রিম যদি ধনী হয়, তাহলে একটি উট, যদি এর চেয়ে কম ক্ষমতাবান হয়, তাহলে একটি গরু এবং সে যদি এর চেয়েও কম ক্ষমতা সম্পন্ন হয় তাহলে একটি ছাগল যবেহ্ করবে।

হযরত ইবনে আববাস (রা.) থেকে বর্ণিত, **فما استيسر من الهدى** এর অর্থ বকরী , তবে **شعائر الله** ('আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী) যত বড় হবে ততই তা উত্তম হবে।

হযরত আতা ইবনে আবূ রিবাহ্ (র.) থেকে বর্ণিত, **فما استيسر من الهدى** এর অর্থ বকরী।

কোন কোন মুফাসসীর বলেছেন, উপরোক্ত আয়াতে সহজলভ্য পশু কুরবানী করার নির্দেশ দিয়ে উট এবং গরুকেই বুঝানো হয়েছে। দাঁত উঠুক বা না উঠুক ।

ইবনে উমার **فما استيسر من الهدى** এর ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন যে, সহজলভ্য কুরবানীর ক্ষেত্রে উট,গাভী এবং এ জাতীয় প্রাণীয়ই প্রযোজ্য।

হযরত আবূ মিজলায (র.) থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি হযরত ইবনে উমার (রা.)-কে **فما استيسر من الهدى** এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার পর তিনি তাকে বললেন, আপনি কি বকরী কুরবানী করতে চাচ্ছেন ? যেন তিনি এ বিষয়ের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন।

হযরত ইবনে উমার (রা.) থেকে–**فما استيسر من الهدى** এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত আয়াতাংশে সহজলভ্য পশু কুরবানী করার কথা বলে উট ও গাভীকেই বুঝানো হয়েছে।

এরপর তাকে প্রশ্ন করা হল, তাহলে–**فما استيسر من الهدى** অর্থ কি? উত্তরে তিনি বললেন, এর অর্থই উট ও গাভী। এ ছাড়া অন্য কোন পশু কুরবানী করা এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

হযরত ইবনে উমার (রা.) থেকে মহান আল্লাহ্র বাণী–فما استيسر من الهدى এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত, সহজলভ্য কুরবানী বলে এখানে উট এবং গাভীকেই বুঝানো হয়েছে।

হযরত যুহরী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি মহান আল্লাহ্র বাণী–فما استيسر من الهدى এর ব্যাখ্যা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেছেন, হযরত ইবনে উমার (রা.) বলেছেন, হাদ্য়ী হল উট এবং গরু।

হযরত ইবনে উমার (রা.) থেকে মহান আল্লাহ্র বাণী–فما استيسر من الهدى এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত, 'হাদ্য়ী' উট এবং গাভী ব্যতীত অন্য কোন প্রাণী নয়।

হযরত ইবনে উমার (রা.) থেকে মহান আল্লাহ্র বাণী–فما استيسر من الهدى এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত, 'হাদ্য়ী' হলো উট এবং গরু।

হযরত কাসিম ইবনে মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা.) এবং হযরত আয়েশা (রা.) বলতেন–فما استيسر من الهدى বলে উপরোক্ত আয়াতে উট এবং গরুই বুঝানো হয়েছে।

হযরত 'আবদুল্লাহ্ অথবা 'উবায়দুল্লাহ্ ইবনে জুবায়র (রা.) থেকে বর্ণিত, আমি হযরত ইবনে উমার (রা.)–কে متعة فى الهدى সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার পর তিনি বললেন, متعة فى الهد হলো উট। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর বকরী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার পর তিনি বললেন, তাহলে কি তোমরা বকরী দিতে চাচ্ছ ?

হযরত মুজাহিদ (র.) এবং হযরত তাউস (র.) থেকে বর্ণিত, فما استيسر من الهدى অর্থ গাভী।

হযরত আলী ইবনে আবূ তালহা (র.) থেকে– فما استيسر من الهدى এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত, হযরত ইবনে উমার (রা)–এর ভাষ্য অনুসারে এর অর্থ গাভী অথবা এর চেয়ে বড় অন্য কোন প্রাণী।

হযরত ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, فما استيسر من الهدى এর অর্থ উট অথবা গাভী, তবে বকরী জরিমানাতে যবেহ্যোগ্য পশু।

হযরত উরওয়া (র.) থেকে বর্ণিত, নির্ধারিত বয়সে উপনীত উট এবং গাভী 'হাদ্য়ী' হওয়ার যোগ্য, কম বয়সের উট এবং গাভী 'হাদ্য়ী' হওয়ার যোগ্য নয়। আর বকরী হলো জরিমানাতে যবেহ্যোগ্য পশু। বর্ণনাকারী বলেন, গাভী চল্লিশ অথবা পঞ্চাশে ঐ সীমায় উপনীত হয়।

হযরত ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলতেন, فما استيسر من الهدى এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো গাভী।

হযরত সাঈদ (র.) থেকে বর্ণিত, আমি দেখেছি, ইয়ামেনী লোকেরা হযরত ইবনে উমার (রা.)–এর নিকট এসে তাকে فما استيسر من الهدى সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন এবং বলতেন, এর অর্থ

বকরী, বকরী। উত্তরে তিনিও বলতেন, বকরী, বকরী, উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকে অনুপ্রাণিত করা, শুনে রাখ, নির্ধারিত বয়সে উপনীত উট এবং গাভীই মূলতঃ 'হাদ্‌য়ী' হওয়ার যোগ্য, এবং **فما استيسر من الهدى** আয়াতাংশে বর্ণিত 'হাদ্‌য়ী' থেকে গাভীই উদ্দেশ্য।

উভয় ব্যাখ্যার মধ্যে উত্তম ব্যাখ্যা হলো, তাদের ব্যাখ্যা যারা বলেন, **فما استيسر من الهدى** এর অর্থ বকরী, কেননা, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সহজলভ্য পশু কুরবানী করা ওয়াজিব করেছেন। কুরবানীকারী ব্যক্তি যা সহজে পায় তা কুরবানী করাই কর্তব্য। তবে কুরবানীর জন্য আল্লাহ্ তা'আলা কয়েকটি পশু নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। যতগুলো পশু আয়াতে কারীমায় বাহ্যিক অর্থের আওতায় আসে সেগুলো থাকবে সতন্ত্র। কাজেই, বাদ দেয়া পশুগুলো ব্যতীত অন্য যে কোনটাকেই কুরবানীকারী ব্যক্তি কুরবানী করবে তার দ্বারাই কুরবানী আদায় হবে।

যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে, সহজলভ্য কুরবানীর পশুর মধ্যে বকরী শামিল নয়। কেননা, মুরগী এবং ডিম যেমনিভাবে উৎসর্গ করার পরও কুরবানীর বস্তুতে পরিণত হতে পারে না, এমনিভাবে বকরী ও কুরবানীর পশু হিসাবে আখ্যায়িত হতে পারে না।

জবাবে বলা হবে যে, বকরী হাদ্‌য়ী হওয়া সম্পর্কে যেমন মতভেদ আছে এমনিভাবে যদি মুরগী এবং ডিমের হাদ্‌য়ী হওয়ার ব্যাপারেও মতভেদ থাকতো, তাহলে, উভয়ের ব্যাপারে দ্বিধাহীনচিত্তে এ কথা বলা যেতো যে, এগুলো কুরবানীকারী ব্যক্তি অবশ্যই বাহ্যিক আয়াতের উপর আমলকারীরূপে পরিগণিত হবে। কেননা, হুকুমের দিক থেকে এ গুলোর মধ্যে কোন ব্যবধান নেই। কিন্তু মূলতঃ বিষয়টি এমন নয়, কারণ ভেড়া, বকরী, উট, গরু ইত্যাদি নির্ধারিত বয়সে পদার্পণ করার পূর্বে যদি কেউ হাদ্‌য়ী হিসাবে গণ্য করে তাহলে হজ্জে যাওয়ার পথে বাধাপ্রাপ্ত হবার কারণে যে কুরবানী তার উপর ওয়াজিব হয়েছিল তা আদায় হবে না। এমনিভাবে নির্ধারিত পশু ব্যতীত অন্য কোন পশু দ্বারাও এ দায়িত্ব আদায় হবে না। কারণ, অন্য পশুগুলো যদিও সহজলভ্য তথাপিও যেহেতু এগুলোর হাদ্‌য়ী হওয়া হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়, তাই এ গুলো **فما استيسر من الهدى** এর গন্ডিভুক্ত নয়। অতএব, হজ্জ অথবা 'উমরা থেকে বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি ভেড়া বা ছাগল কুরবানী করে, তাহলে অবশ্যই সে আয়াতের উপর আমলকারীরূপে নিরূপিত হবে। কারণ, এ বিষয়ে ইমামগণের একাধিক মত রয়েছে। ডিম ইত্যাদির বিষয়টি এর থেকে আলাদা তাই ডিমকে এ গুলোর উপর কিয়াস করা সমীচীন নয়।

যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে-**فما استيسر من الهدى** আয়াতাংশে বর্ণিত **ما** শব্দটি আরবী ব্যাকরণবিদগণের হিসাবে কোন অবস্থাতে পতিত হয়েছে ?

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, হাদ্য়ী (উপঢৌকন) প্রদান করে যেমনিভাবে একলোক অন্যলোকের নৈকট্য লাভ করে এমনিভাবে হাদ্য়ী তথা কুরবানীর মাধ্যমেও যেহেতু কুরবানী দাতা মহান আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করে তাই হাদ্য়ীকে হাদ্য়ী বলে নামকরণ করা হয়েছে। আরবীতে প্রবাদ আছে যে, **اهديت الهدى الى بيت الله فانا اهديه اهداء** এবং হাদীয়া সম্পর্কে বর্ণিত আছে, **اهديت الى فلان هدية و انا اهديها** এ হিসাবেই উষ্ট্রীকেও বলা হয়। যেমন যুহায়র ইবনে আবূ সালমা হুরমতের ক্ষেত্রে কুরবানীর পশু উষ্ট্রীর সাথে এক বন্দী ব্যক্তিকে তুলনা করতে গিয়ে প্রসঙ্গতঃ আলোচনা করে বলেছেন,

فلم ار معشرا اسروا هديا + و لم ار جار بيت يستباء

কোন দলকে আমি হাদ্য়ী বন্দী করতে দেখেনি এবং প্রতিবেশীকে ও বন্দী করতে আমি কাউকে দেখেনি।

আল্লাহ্ পাকের বাণী-**وَ لاَ تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهٗ** এর ব্যাখ্যাঃ হে মু'মিনগণ ! হজ্জে যাত্রাকালে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার পর তোমরা যদি তোমাদের ইহ্‌রাম থেকে হালাল হতে চাও তাহলে সহজলভ্য পশু কুরবানী করা তোমাদের জন্য অপরিহার্য। বাধাপ্রাপ্ত হবার পর তোমরা তোমাদের ইহ্‌রাম থেকে হালাল হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের উপর ওয়াজিব কুরবানীর পশু কুরবানীর স্থানে না পৌঁছে। এর কারণ হচ্ছে এই যে, মুহ্‌রিম তার নিজের উপর যে ইহ্‌রামকে অপরিহার্য করে নিয়েছে এর থেকে হালাল হবার প্রক্রিয়া হল মাথা কামিয়ে নেয়া। তাই আল্লাহ্ পাক কুরবানীর পশু তার স্থানে পৌঁছার পূর্বে মাথা কামিয়ে হালাল হতে নিষেধ করে দিয়েছেন। **حتى يبلغ الهدى محله** বলে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন যে স্থানের প্রতি ইংগিত করেছেন, এ স্থান সম্বন্ধে তাফসীরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন।

কেউ কেউ বলেছেন, বাধা যদি শত্রুর ভীতি প্রদর্শনের কারণে হয়, তাহলে দেখা যাবে যে, উক্ত পশুটি যবেহ্ করার মত, না নহর করার মত, যদি যবেহ্ করার মত হয়, তাহলে হারাম শরীফে যবেহ্ করার সাথে সাথেই মুহ্‌রিমের মাথা মুন্ডান জায়েয হয়ে যাবে। আর যদি তা নহর করার হয় তাহলে তাকে হারাম শরীফে নহর করার সাথে সাথেই মুহ্‌রিমের জন্য স্বীয় মাথা কামিয়ে নেয়া বৈধ হয়ে যাবে। আর যদি বাধা শত্রুর কারণে না হয়ে অন্য কোন কারণে হয় তাহলে বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ এবং সাফা ও মারওয়া পর্বতদ্বয়ের মধ্যস্থলে দৌড়ানোর পূর্বে তাঁর জন্য হালাল হওয়া বৈধ নয়। এ হলো ঐ মুফাসসীরদের মতামত যারা বলেন, শত্রুর বাধাই হচ্ছে প্রকৃত বাধা। অন্য কারো বাধা বাধাই নয়। উপরোক্ত মুফাসসীরগণ নিম্নলিখিত বর্ণনাগুলো প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করেছেন।

মালিক ইবনে আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও তাঁর সাহাবিগণ হুদায়বিয়া নামক স্থানেই হালাল হয়ে পশুগুলো যবেহ্ করে নিয়েছিলেন। এরপর বায়তুল্লাহ্র শরীফের তাওয়াফ এবং কুরবানীর পশুটি বায়তুল্লাহ্ শরীফে পৌছার পূর্বেই তাঁরা নিজ নিজ মাথা কামিয়ে সকল কিছু থেকে হালাল হয়ে যান। বর্ণনাকারী সাহাবী বলেন, এরপর হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর কোন সাহাবী এগুলো কাযা করা এবং এগুলোর কোন একটি পুনরায় আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন বলে আমাদের জানা নেই।

হযরত নাফি' (র.) থেকে বর্ণিত ফিতনার যামানায় হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা.) একবার 'উমরা করার উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফের দিকে রওয়ানা হলেন এবং বললেন, বায়তুল্লাহ্র পথে আমি যদি বাধাপ্রাপ্ত হই, তাহলে আমি তাই করব যা আমরা হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সঙ্গে থেকে করেছিলাম। হুদায়বিয়ার বছর হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যেহেতু প্রথমে 'উমরার ইহ্রাম বেধে ছিলেন তাই তিনি ও প্রথমে 'উমরার ইহ্রাম বাধলেন। এরপর তিনি নিজে কাজের প্রতি মনোনিবেশ করে বললেন, مَا اَمْرُهُمَا اِلاَّ وَاحِدٌ (এ দু'টি কাজ একই) বর্ণনাকারী বলেন, ('উমরার ইহ্রাম বাঁধার পর) হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর সাহাবিগণের প্রতি তাকিয়ে বললেন, ما امرهما الا واحد (এ দুটো তথা হজ্জ এবং 'উমরার অনুষ্ঠানাদি প্রায় একই) আমি তোমাদেরকে সাক্ষ্য রেখে বলছি, আমি 'উমরার সাথে হজ্জকেও নিজের উপর ওয়াজিব করে নিয়েছি। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তিনি একবার তাওয়াফ আদায় করলেন (তিনি একবারে তাওয়াফকেই যথেষ্ঠ মনে করতেন) এবং কুরবানী করলেন। হযরত ইউনুস ইবনে ওয়াহাব (র.)-এর মাধ্যমে মালিক থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, শত্রু দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তির ব্যাপারে আমাদের অভিমত তাই। যেমন, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি শত্রু ব্যতীত অন্য কোন কারণে বাধাপ্রাপ্ত হয় তাহলে সে বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ করার পূর্বে কখনো হালাল হবে না। বর্ণনাকারী বলেন, শত্রুদ্বারা বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি সম্পর্কে হযরত মালিক (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, উত্তরে তিনি বললেন, যেখানে সে বাধাপ্রাপ্ত হবে তথাই সে কুরবানী করে মাথা কামিয়ে নিবে। তার ওপর কোন কাযা ও জরুরী নয়। হাঁ, যদি সে কখনো হজ্জ আদায় না করে থাকে, তাহলে হজ্জব্রত পালন করা তার জন্য অপরিহার্য। হযরত সুলায়মান ইবনে ইয়াসর থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা.), মারওয়ান ইবনে হাকাম এবং আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়র (রা.) কোন এক সময় ইবনে হিযাবা আল্-মাখযূমীকে একটি ফতোয়া জিজ্ঞেস করেছিলেন। হজ্জে যাত্রাকালে কোন এক রাস্তায় তিনি বাধাপ্রাপ্ত হয়ে পড়েছিলেন, উত্তরে তিনি বললেন, বাধাপ্রাপ্ত প্রথমে প্রয়োজনীয় কাজ আঞ্জাম দিয়ে তারপর ফিদ্ইয়া আদায় করবে। এরপর কুরবানীর কাজ সমাপন করে কৃত অনুষ্ঠানগুলোকে

'উমরা ধরে নিয়ে আগামী বছর হজ্জব্রত পালন করে নিতে হবে। ইউনুস ইবনে ওয়াহাবের মাধ্যমে মালিক থেকে বর্ণিত, শত্রু ছাড়া অন্য কোন কারণে বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি সম্পর্কে আমাদের নিকট এ বিধান প্রযোজ্য। বর্ণনাকারী বলেন, মালিক (র.) বলেছেন, হজ্জের ইহ্রাম বাধার পর রোগ, তারিখ গণনার ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি এবং আকাশে চাঁদ অস্পষ্ট থাকায় যদি কোন ব্যক্তি হজ্জের রাস্তায় বাধাপ্রাপ্ত হয়ে যায় তাহলে সেই হবে (বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি) এবং বাধাপাপ্ত ব্যক্তির ওপর যা ওয়াজিব তার জন্যও তা ওয়াজিব অর্থাৎ বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ এবং সাফা ও মারওয়া পর্বতদ্বয়ের মধ্যস্থলে দৌড়ানোর পূর্ব পর্যন্ত নিজের পূর্ব ইহ্রামের ওপর ঠিক থাকবে। তারপর পরবর্তী বছর হজ্জকরে নিবে এবং কুরবানী করবে।

হযরত ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ থেকে বর্ণিত, আইয়ূব ইবনে মূসা (র.) আমাকে জানিয়েছেন যে, দাঊদ ইবনে আবূ আসিম (র.) একবার হজ্জব্রত পালন করতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তারপর তিনি সাফা ও মারওয়া পর্বতদ্বয়ের মধ্যস্থলে তাওয়াফ করা ব্যতীতই তায়িফের পথে রওয়ানা হয়ে গেলেন। এ সময় তিনি আতা ইবনে আবূ রাবাহের (র.) নিকট এ বিষয় জিজ্ঞেস করে পত্র লিখলেন। উত্তরে তিনি বললেন, একটি কুরবানী করে দাও। "শত্রু কবলিত বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য কুরবানীর স্থান হলো, যে স্থানে সে বাঁধাপ্রাপ্ত হয়েছে তথায়ই একটি কুরবানী করা।" মালিক (রা.)-এর মত যারা এ ধরনের মতামত ব্যক্ত করেন তাদের কারণ, ঐ সমস্ত বর্ণনা যা নিম্নে উল্লেখ রয়েছে।

হযরত ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত সানিয়্যা উপত্যকায় অবস্থিত পর্বতের পাদদেশে কুরবানীর পশু পৌছলে মুশরিকরা হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) পথ রোধ করে দাঁড়ায় এবং তাঁর গতিকে অন্য দিকে ফিরিয়ে দেয়, বর্ণনাকারী বলেন, এরপর যেখানে তারা বাঁধা দিয়েছিল সেখানেই তিনি কুরবানীর জন্তুগুলো যবেহ্ করে নেন এবং মস্তক মুন্ডন করে ফেলেন। পক্ষান্তরে এ জায়গাটি ছিল হুদায়বিয়া প্রান্তর, এ দেখে সাহাবিগণ আফসোস করলেন এবং হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দেখাদেখি কতিপয় সাহাবী নিজ নিজ মাথা কামিয়ে নিলেন। আর বাকী কতিপয় সাহাবী প্রতীক্ষায় রইলেন এবং তাঁরা বলাবলি করতে লাগলেন যে, আহা ! যদি আমরা বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ করে নিতে পারতাম। এরপর হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, মস্তক মুন্ডনকারীদের প্রতি আল্লাহ্ করুণা বর্ষণ করুন। সাহাবিগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ! চুল ছোটকারীদের প্রতি ও দু'আ করুন। তিনি বললেন, মস্তক মুন্ডনকারীদের প্রতি আল্লাহ্ করুণা বর্ষণ করুন। সাহাবিগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! যারা চুলছোট করে তাদের প্রতিও করুণার দু'আ করুন। হযরত রাসূলুল্লাহ্ বললেন, চুল ছোটকারীদের প্রতিও আল্লাহ্ করুণা বর্ষণ করুন।

হযরত মিসওয়ার ইবনে মাখরামা এবং মারওয়ান ইবনে হাকাম থেকে বর্ণিত, হুদায়বিয়ার বছর হুদায়বিয়া প্রান্তরে হযরত রাসূলুল্লাহ্ ও কুরায়শ মুশরিকদের সাথে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সন্ধিচুক্তি

সম্পাদিত করার পর সাহাবিগণ বললেন, তোমরা উঠ, কুরবানী কর এবং মাথা কামিয়ে নাও। বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহ্‌র কসম ! হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এ কথা তিন বার বলা সত্ত্বেও সাহাবিগণের কেউ উঠে দাঁড়াননি। তাদের না দাঁড়ানোর ফলে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজেই উঠে দাঁড়ালেন এবং হযরত উম্মে সালামা (রা.) নিকট গিয়ে এ কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করলেন। এ কথা শুনে হযরত উম্মে সালামা (রা.) বললেন, আপনি যেয়ে কারো সাথে কথা না বলে কুরবানীর পশুটি যবেহ্ করুন এবং মাথা কামিয়ে নিন। তারপর হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বেরিয়ে গিয়ে কারো সাথে কোন কথা না বলে উল্লিখিত কাজগুলো সম্পাদন করে নেন। এ দেখে উপস্থিত সকলেই উঠে গিয়ে নিজ নিজ কুরবানী করে নেন এবং পরস্পর একে অন্যের মাথা কামিয়ে দেন। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর আনুগত্যের ব্যাপারে বিলম্ব হওয়ার কারণে তাঁরা দুঃখে, ক্ষোভে একে অপরকে হত্যা করতে পর্যন্ত উদ্যত হয়ে যায়। সাহাবিগণ বলেন, হুদায়বিয়া প্রান্তরে মুশরিকরা যেখানে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–কে যিয়ারতে বায়তুল্লাহ্ শরীফের পথে বাধা সৃষ্টি করে ছিল। সেখানেই তিনি তাঁর পশুটি কুরবানী করেছিলেন এবং তিনিসহ সাহাবিগণ এখানেই হালাল হয়ে গিয়েছিলেন। হুদায়বিয়া হারাম শরীফের অন্তর্ভুক্ত নয়। মুফাসসীরগণ বলেন, উপরোক্ত বর্ণনাগুলোতে এ কথার উপর সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যামান আছে যে, حتى يبلغ الهدى محله এর অর্থ হচ্ছে, তোমারা তোমাদের মাথা কামাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না যবেহ্ এবং নহরের স্থানটি খাওয়া ও উপকৃত হওয়ার স্থানে পরিণত হবে। এ কথার নজীর নিম্নের হাদীসে বিদ্যামান আছে। এক সময় হযরত বারীরা (রা.)–কে কিছু সাদ্‌কার গোশ্‌ত দেয়া হয়েছিল। এ সময় হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ঐ গোশ্‌তগুলোর নিকট এসে বললেন, তোমরা এর কাছে এসে যাও, কারণ এ তার স্থানে পৌছে গেছে, অর্থাৎ বারীরার প্রতি সাদ্‌কা করার পর পুনরায় তা হাদীয়া করার ফলে তা হালাল এবং বৈধতার স্থানে পৌছে গেছে। এখন বিনাদ্বিধায় তোমরা তা ভক্ষণ করতে পার।

কোন কোন তাফসীরকার বলেছেন, বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তির কুরবানীর পশু পৌছাবার স্থানে হারাম শরীফে। অন্য কোন স্থান নয়। দলীলস্বরূপ তাঁরা নিম্নের বর্ণনাগুলো উল্লেখ করেছেন।

'আবদুর রহ্‌মান ইবনে ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, 'আমর ইবনে সাঈদ নাখ্‌ঈ 'উমরার ইহ্‌রাম বেধে যাতুশ শুকূক নামক স্থানে পৌছার পর তাঁকে সাপে কাটে। তখন তাঁর সংগী সাথীরা রাস্তায় গিয়ে উঁকি–ঝুঁকি মেরে পথিক মানুষের দিকে তাকাতে লাগল। আকস্মিকভাবে হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.)–এর সাথে তাদের সাক্ষাৎ হয়। তাঁরা তাঁর নিকট সমস্ত ঘটনা খুলে বলার পর তিনি বললেন, এখন তাঁর জন্য একটি কুরবানীর পশু পাঠিয়ে দেয়া অপরিহার্য। আর তোমরা একদিকে يوم الأمارة তথা আলামত দিবস নির্ধারণ কর। এরপর কুরবানী হয়ে গেলে সে পশু যবেহ্ হয়ে যাবার পর সে হালাল হয়ে যাবে। তবে পরবর্তী বছর 'উমরা কাযা করা তাঁর উপর অপরিহার্য।

আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদসহ একদা আমরা 'উমরার ইহ্রাম বেধে বাড়ী থেকে যাত্রা করে যাতুল শুকূক নামক স্থানে পৌছলে আমাদের জনৈক সাথী দংশিত হয়। এতে তার জীবন অত্যন্ত দূর্বীসহ হয়ে ওঠে। কি করব, কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছিলাম না আমরা। উপায়ান্তর না দেখে আমাদের কতিপয় লোক রাস্তায় বেরিয়ে গেল। এ সময় একটি কাফিলার সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হল। এর মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা.)ও ছিলেন। আমরা তাকে বললাম, হে আবদুর রহমানের পিতা ! আমাদের এক ব্যক্তি দংশিত হয়েছে, এখন আমরা কি করতে পারি ? উত্তরে তিনি বললেন, সে এখন তোমাদের সাথে একটি পশুর মূল্য পাঠিয়ে দিবে এবং তোমরা সম্ভাব্য একটি দিন নির্ধারণ করবে যে তোমরা একটি পশু কুরবানী করবে। হাদ্য়ী কুরবানী করার পর সে হালাল হয়ে যাবে। তবে পরবর্তী বছর পুনরায় 'উমরা করা তাঁর ওপর অপরিহার্য।

আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, একদা আমরা যাতুশ্ শুকূক নামক স্থানে অবস্থান করছিলাম। এমতবস্থায় –আমাদেরকে এক ব্যক্তি 'উমরার তালিকায় তালবিয়া পাঠ করার পর তিনি দংশিত হন। এসময় হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা.) আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমরা তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করার পর তিনি উত্তরে বললেন, হাদ্য়ী কুরবানী করার জন্য তোমরা একটি দিন তারিখ নির্ধারণ কর। এরপর সে তোমাদের নিকট হাদ্য়ীর মূল্য পাঠিয়ে দিবে। হাদ্য়ীটি কুরবানী করার পর সে হালাল হয়ে যাবে। আগামী বছর তাকে একটি 'উমরা করে নিতে হবে।

আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ থেকে অন্য সূত্রে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, আমাদের এক ব্যক্তি উমরার ইহ্রাম বাধার পর হঠাৎ দংশিত হন। এরপর তিনি একটি কাফিলার সম্মুখীন হলেন। এদের মধ্যে ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা.)। উপস্থিত লোকেরা তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, সে একটি কুরবানীর পশু পাঠিয়ে দিবে এবং তোমরা একটি সম্ভাব্য দিন নির্ধারণ করবে যে দিন তাকে যবেহ্ করা হবে। ঐ নির্ধারিত দিন আসার পর সে হালাল হয়ে যাবে। তবে আগামী বছর তাঁকে একটি 'উমরা করে নিতে হবে।

আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ থেকে অপর এক সূত্রে বর্ণিত যে, তিনি বললেন, হযরত আম্মার (রা.)–সহ একদা আমরা সফরে বের হলাম। যাতুশ্ শুকূক নামক স্থানে পৌছার পর আমাদের জনৈক সাথীকে দংশন করে। এ সম্পর্কে সমাধান বের করার উদ্দেশ্যে আমরা রাস্তায় গেলাম। হঠাৎ এক কাফিলার মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা.)–কে দেখতে পেলাম। আমরা তাঁকে বললাম, আমাদের এক ব্যক্তিকে দংশন করা হয়েছে, এখন আমরা কি করতে পারি ? উত্তরে তিনি বললেন, তোমরা পরস্পর আলোচনা করে একটি দিন সাব্যস্ত কর (যে দিন একটি পশু কুরবানী করা হবে) এবং একটি কুরবানীর পশু পাঠিয়ে দাও। পশুটি কুরবানী করার পর সে হালাল হয়ে যাবে। তবে আগামী বছর তাকে একটি 'উমরা করে নিতে হবে।

ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, আমরা ইবনে সাঈদ নাখঈ 'উমরার ইহ্‌রাম বেধে যাতুশ্ শুকূক নামক স্থানে পৌছার পর হঠাৎ তিনি দংশিত হন। এরপর তাঁর সংগী সাথীরা রাস্তায় বেরিয়ে আগন্তক লোকদের প্রতি উঁকি-ঝুঁকি মেরে দেখতে থাকে। আকস্মিকভাবে হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর সাথে তাদের সাক্ষাৎ হয়। তাঁরা তার নিকট সমস্ত ঘটনা খুলে বলার পর তিনি বললেন, সে যেন একটি কুরবানীর পশু পাঠিয়ে দেয়। আর তোমরা একটি দিন নির্ধারণ কর (যে দিন একটি পশু তোমরা কুরবানী করবে)। এরপর পশুটি যবেহ্ করার পর সে হালাল হয়ে যাবে। তবে আগামী বছর এ 'উমরা কাযা করা তাঁর উপর অপরিহার্য।

হযরত ইবনে 'আব্বাস (রা.) থেকে-فان احصرتم فما استيسر من الهدى এর ব্যাখ্যায় বলতেন, যদি কোন ব্যক্তি হজ্জ অথবা 'উমরার ইহ্‌রাম বাধার পর অসহনীয় রোগ যন্ত্রণা অথবা চলাচলে বাধা সৃষ্টিকারী ওজরের কারণে যিয়ারতে বায়তুল্লাহ্ থেকে বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাহলে তার জন্য সহজলভ্য পশু তথা-বকরী অথবা এর চেয়ে বড় কোন পশু কুরবানী করা অপরিহার্য। যদি তা ফরয হজ্জ হয়ে থাকে তাহলে এর কাযা তার উপর-অপরিহার্য। আর যদি 'উমরা অথবা ফরয হজ্জ আদায় করার পর এ হজ্জ দ্বিতীয় হজ্জ হয়ে থাকে তাহলে এর জন্য তাকে কোন কাযা করতে হবে না। এরপর- وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهٗ – পাঠ করে তিনি বললেন, যদি মুহ্‌রিম হজ্জের ইহ্‌রাম বেধে থাকে তাহলে তার محل (স্থান) হল-কুরবানীর দিবস। আর যদি সে 'উমরার ইহ্‌রাম বেধে থাকে তাহলে তার محل (স্থান) হল বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ সম্পন্ন করা।

হযরত ইবনে 'আব্বাস (রা.) থেকে আল্লাহ্‌র বাণী- فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, এ আয়াত হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জনৈক সাহাবী সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি বায়তুল্লাহ্ শরীফে যাওয়ার পথে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে বায়তুল্লাহ্‌তে একটি কুরবানীর পশু পাঠিয়ে দেন। এরপর উক্ত পশুটি বায়তুল্লাহ্ পৌছা পর্যন্ত তিনি তার ইহ্‌রামের ওপর অবিচল থাকেন। বায়তুল্লাহ্ শরীফে পশুটি পৌছে গেলে তিনি তার মাথা কামিয়ে নেন। এরপর আল্লাহ্ তাঁর হজ্জকে সম্পূর্ণ করে দেন।

احصار এর ব্যাখ্যায় হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, احصار হচ্ছে হজ্জের অনুষ্ঠানাদি পালন করতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া। বাধাপ্রাপ্ত হবার পর বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য একটি কুরবানী করা ওয়াজিব। অর্থাৎ সে যদি ধনী হয় তাহলে একটি উট, যদি এর চেয়ে কম ক্ষমতাবান হয় তাহলে একটি গরু, যদি এর চেয়েও কম ক্ষমতাবান হয় তাহলে একটি বকরী কুরবানী করবে। মুহ্‌রিম বাধাপ্রাপ্ত হবার পর তার এ হজ্জকে 'উমরাতে পরিণত করে ফেলবে এবং এর জন্য একটি কুরবানী বায়তুল্লাহ্ শরীফে পাঠিয়ে দিবে। এরপর পশুটি যবেহ্ করে দেয়ার পর সে হালাল হয়ে যাবে। তবে পরবর্তী বছর তাকে এ হজ্জ কাযা করে নিতে হবে।

আবদুল্লাহ্ ইবনে সালমা থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, একদা হযরত আলী (রা.)– فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে বলেছেন, যে, হজ্জব্রত পালনকারী ব্যক্তি বাধাপ্রাপ্ত হলে কুরবানী যোগ্য একটি পশু পাঠিয়ে দিবে। তাঁর পক্ষ হতে পশুটি কুরবানী করে দেয়ার সাথে সাথেই সে হালাল হয়ে যাবে। কুরবানী করে দেয়ার সাথে সাথেই সে হালাল হয়ে যাবে। কুরবানী করার পূর্বে সে কোন অবস্থাতেই হালাল হতে পারবে না। 'আতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলতেন, 'উমরার ইহ্‌রাম বেধে পথিমধ্যে কেউ বাধাপ্রাপ্ত হলে একটি কুরবানীযোগ্য পশু পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু যদি সে এর বিনিময়ে অন্য কিছু করতে চায় তাহলে কোন বস্তু সাদ্‌কা করবে অথবা রোযা রাখবে। কেননা কুরবানীর বিনিময় প্রদানকারী ব্যক্তির বিধান এ–ই। তার উপর এছাড়া অন্য কোন কিছু ওয়াজিব নয়। প্রকাশ থাকে যে, কুরবানী আর ইহ্‌রামের মহল কুরবানীর দিবসই। 'আতা থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

সূদ্দী থেকে আল্লাহ্‌র বাণী–فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهٗ এর ব্যাখ্যায় বলেন, যে, কোন ব্যক্তি ইহ্‌রাম বেধে বাড়ী থেকে যাত্রা করার পর যদি পথিমধ্যে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে যায়, চাই তা রোগের কারণে হোক, অথবা (সাপ, বিচ্ছু) দংশন করার কারণে হোক, যার ফলে এখন আর সে চলাফেরা করতে পারছে না। অথবা যদি কোন ব্যক্তির সওয়ারীর পা ভেংগে যায় তাহলে সে তথায় অবস্থান করবে এবং একটি কুরবানী তথা বকরী অথবা এর চেয়ে বড় অন্য কোন পশু পাঠিয়ে দিবে। তবে সে রোগমুক্ত হবার পর সফর করে গিয়ে যদি হজ্জ পেয়ে যায় তাহলে তাকে কুরবানী করতে হবে না। যদি উক্ত ব্যক্তির হজ্জ ছুটে যায় তাহলে তার এ হজ্জ 'উমরাতে রূপান্তরিত হয়ে যাবে এবং পরবর্তী বছর তাঁকে হজ্জ করে নিতে হবে। আর যদি সে ব্যক্তি বাড়ীতে চলে আসে তাহলে কুরবানীর দিন তারপক্ষ হতে পশু কুরবানী করা পর্যন্ত সে সর্বদাই মুহ্‌রিম থেকে যাবে। এই বাধাপ্রাপ্ত মুহ্‌রিমের নিকট যদি এ মর্মে সংবাদ পৌঁছে যে, তার বন্ধু তারপক্ষ হতে কুরবানী করেনি। তাহলে কুরবানীর পশু পাঠানো সত্ত্বেও সে মুহ্‌রিমই থেকে যাবে। তবে যদি সে অপর একটি পশু পাঠায় এবং তার বন্ধু থেকে এ মর্মে অংগীকার গ্রহণ করে যে, সে কুরবানীর দিন মক্কাতে তারপক্ষ হতে পশুটি কুরবানী করে দিবে এবং সে মতে কুরবানীও করে দেয় তাহলে হালাল হয়ে যাবে। অবশ্য পরবর্তী বছর তাকে পুনরায় একটি হজ্জ এবং একটি 'উমরা আদায় করে নিতে হবে। কোন কোন লোক বলেন, দু'টি 'উমরা আদায় করতে হবে। যদি কেউ 'উমরার ইহ্‌রাম বেধে বাড়ীতে চলে আসে এবং কুরবানীর পশু পাঠিয়ে দেয় তাহলে তাকে পরবর্তী বছর দু'টি 'উমরা আদায় করতে হবে। কেউ কেউ বলেন, তিনটি 'উমরা করতে হবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, কোন ব্যক্তি বাধাপ্রাপ্ত হবার পর শত্রুর কারণে বায়তুল্লাহ্ শরীফে পৌঁছতে যদি অক্ষম হয়ে যায়, তাহলে সে একটি কুরবানীর

পশু পাঠিয়ে দিবে। তবে বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি তাকে তারপক্ষ হতে মক্কা শরীফে পৌছিয়ে দেয়ার মত লোক পেয়ে যায়, তাহলে সে তার নিজের পরিবর্তে তাহাকেই তথায় পাঠিয়ে দিবে এবং ঐ পশুর মালিক তার থেকে ওয়াদা নিয়ে নিবে। তবে আশংকামুক্ত হয়ে যাবার পর বাধাপ্রাপ্ত (পরবর্তী বছর) একটি হজ্জ একটি 'উমরা পুরা করে নিতে হবে। যদি কেউ গৃহবন্দী রোগে আক্রান্ত হয়ে যায় এবং তার সাথে কোন পশু না থাকে, তাহলে সে আটকিয়ে যাওয়া স্থানেই হালাল হয়ে যাবে। আর যদি তার সাথে পশু থাকে তাহলে তা পাঠানোর পর তা তার স্থানে পৌছার পূর্বে সে হালাল হতে পারবে না এবং মর্যী না হলে পরবর্তী বছর তার উপর হজ্জ এবং 'উমরা কোনটাই অপরিহার্য নয়।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, যারা বলেন, হাদ্য়ী এবং উষ্ট্রীর محل (স্থান) হচ্ছে হারাম শরীফ তারা নিম্নের আয়াতটি দলীল হিসাবে পেশ করেন ঃ وَ مَنْ يُّعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ – (কেউ আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে সম্মান করলে এ তো তার হৃদয়ের তাকওয়া সঞ্জাত। এতে তোমাদের জন্য নানাবিধ উপকার রয়েছে এক নির্দিষ্ট কালের জন্য। তারপর এগুলোর কুরবানীর স্থান প্রাচীন গৃহের নিকট।)

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্‌পাক হারাম শরীফকেই কুরবানীর পশুর মহল ঘোষণা করেছেন। সুতরাং এ ছাড়া দ্বিতীয় অন্য কোন محل নেই।

হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হুদায়বিয়া প্রান্তরে মুশরিকদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হলে কুরবানীর পশু–গুলোকে সেখানেই তিনি যবেহ্ করেন। এ হাদীস দ্বারা যারা প্রমাণ পেশ করেছেন, তাদের উক্তিকে নাকচ করার লক্ষ্যে উল্লেখিত মুফাসসীরগণ বলেছেন যে, এ কথা কোন নির্ভরযোগ্য দলীল নয়, কারণ এ কথার উপর উলামাদের ঐক্যমত নেই। কারণ নিম্নে প্রদত্ত হল।

হযরত নাজিয়া ইবনে জুনদাব আসলামী (রা.) থেকে বর্ণিত, যখন হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–কে বায়তুল্লাহ্ শরীফে যাওয়ার পথে বাধা প্রদান করা হয়েছিল। তখন আমি তাঁর নিকট এসে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কুরবানীর পশুটি আমার সাথে পাঠিয়ে দিন। আমি তা নিয়ে হারাম শরীফে কুরবানী করে দিব। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, তুমি কিভাবে নিবে? আমি বললাম, উপত্যকা দিয়ে আমি তা নিয়ে যাব। কাফিররা এর নাগাল পাবে না। এরপর আমি উক্ত পশুটি নিয়ে হারাম শরীফে কুরবানী করে দিলাম।

এ হাদীসের প্রেক্ষিতে উপরোক্ত মুফাসসীরগণ বলেছেন যে, কুরবানীর পশু হারাম শরীফেই যবেহ্ করা হবে, অন্য কোন স্থানে নয়। কাজেই "হারামের বাইরে হুদায়বিয়া প্রান্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তার কুরবানীর পশুগুলোকে যবেহ্ করেছেন" দলীল দিয়ে যারা প্রমাণ পেশ করেন তাদের প্রমাণ নিতান্তই অনির্ভরযোগ্য। উপরোক্ত তাফসীরকারগণ ব্যতীত অন্য কয়েকজন মুফাসসীর বলেছেন, আয়াতের ব্যাখ্যা, হে মু'মিনগণ ! যদি তোমরা তোমাদের হজ্জে বাধাপ্রাপ্ত হও, এবং যদি রোগ

অথবা শত্রুর ভয়ের কারণে বর্তমান ইহ্‌রামের উপর বাকী থাকাও হজ্জের প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠানাদি আদায় করা তোমাদের জন্য দুষ্কর হয়ে পড়ে, যার ফলে আরাফাতে অবস্থান তোমাদের হাত ছাড়া হয়ে যায়। এ অবস্থায় পতিত হলে হজ্জ ছুটে যাওয়ার কারণে তোমরা সহজলভ্য কুরবানী করবে। তবে এ ছুটে যাওয়া হজ্জ পরবর্তী বছর তোমাদের কাযা করে নিতে হবে। তাফসীরকারগণ বলেন, রোগ অথবা অন্য কোন কারণে হজ্জে বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি হজ্জ আদায় করতে না পারে, তাহলে বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ এবং সাফা ও মারওয়া পর্বতদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে সায়ী করা ব্যতীত তার জন্য পূর্ববর্তী ইহ্‌রাম থেকে হালাল হওয়া কোন ব্যবস্থাই নেই। তবে মাশাহিদে (যবেহ করার জায়গা?) উপস্থিত হতে সক্ষম ব্যক্তি মূলতঃ বাধাপ্রাপ্ত নয়। তাঁরা বলেন, 'উমরার মাঝে কোন বাধা নেই। কেননা, 'উমরা সর্বদাই আদায় করা যায়। তাঁরা মনে করেন যে, 'উমরা পালনকারী ব্যক্তি তাঁর ইহ্‌রামের সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট আমল ব্যতীত অন্য কোন আমল দ্বারা নিজ ইহ্‌রাম থেকে হালাল হতে পারবে না। সর্বোপরি, 'উমরা আদায়াকারী ব্যক্তি এ আয়াতের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং এ আয়াতে হজ্জব্রত পালনকারী ব্যক্তির বিধানঃ বিবৃত হয়েছে।

উক্ত ব্যাখ্যা পোষণকারী তাফসীরকারগণের মধ্যে একাধিক মত রয়েছে। তাদের কেউ কেউ বলেছেন যে, বর্তমানকালে রোগের কারণে যেমনিভাবে অবরোধ হয় না। এমনিভাবে শত্রুর ভয়ের কারণেও বাধা হয় না, বরং এ ধরনের ব্যক্তি বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ এবং সাফা ও মারওয়া পর্বতদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে সায়ী করার পূর্বেই নিজ ইহ্‌রাম থেকে হালাল হয়ে যেতে পারবে। নিম্নের রিওয়ায়েতগুলোকে তারা দলীল হিসাবে উল্লেখ করেছেন ঃ

হযরত ইবনে 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, বর্তমানকালে বাধা নেই।

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, ইহ্‌রামকারী বায়তুল্লাহ্ শরীফে না গিয়ে কোন আমল দ্বারা হালাল হতে পারে বলে আমার জানা নেই।

হযরত ইবনে 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, শত্রু কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ব্যতীত কোন ব্যক্তিই বাধাপ্রাপ্ত নয়, ইহ্‌রামকারী ব্যক্তি শত্রু কবলিত হলে সে 'উমরা করে হালাল হয়ে যাবে, তবে পরবর্তী বছর তাঁকে পুনরায় হজ্জ এবং 'উমরা কিছুই আদায় করতে হবে না।

অন্যান্য মুফাসসীগণ বলেছেন যে, শত্রু কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তির বিধান আজও বিদ্যমান আছে এবং আগামী দিনেও থাকবে। তারা বলেন আয়াতের ব্যাখ্যা হলো, হে মু'মিনগণ ! হজ্জে যাওয়ার পথে তোমরা যদি বাধাপ্রাপ্ত হও। ফলে হজ্জ তোমাদের থেকে ছুটে যায়, তাহলে এ হজ্জ ছুটে যাওয়ার কারণ তোমাদেরকে সহজলভ্য কুরবানী করতে হবে।

হযরত সালিম (র.) থেকে বর্ণিত, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা.) হজ্জের ব্যাপারে শর্তারোপ করাকে সমর্থন করতেন না। তিনি বলতেন, হজ্জর পথে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া কি হযরত রাসুলুল্লাহ্ (সা.)–এর সুন্নাত নয় ? হজ্জে যাবার পথে রাস্তায় তোমাদের কেউ যদি বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাহলে সে বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ এবং সাফা ও মারওয়া পর্বতদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে সায়ী

করে সমস্ত কিছু থেকে হালাল হয়ে যাবে। এরপর পরবর্তী বছর হজ্জ করে নিবে। তবে এ বছর (ইহ্‌রাম থেকে হালাল হবার পর) কুরবানীর পশু পাঠিয়ে দিবে অথবা সিয়াম সাধনা করবে, যদি সে কুরবানীর পশু না পায়।

হযরত ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, মুহ্‌রিম বায়তুল্লাহ্ শরীফে না পৌঁছে কোন কিছু থেকেই হালাল হতে পারবে না। বরং পূর্বের মত বর্তমানেও সেই ইহ্‌রামের অবস্থায় থাকবে। তবে সে যদি আঘাতপ্রাপ্ত হয় তাহলে নিরাময়ের জন্য ঔষধ ব্যবহার করবে এবং ফিদ্‌ইয়া দিবে। আর যদি সে বাড়ীতে চলে যায়, তাহলে দেখা যাবে যে, তার এ ইহ্‌রাম 'উমরার জন্য ছিল না হজ্জের জন্য ছিল। যদি 'উমরার জন্য হয়ে থাকে, তাহলে এ 'উমরা পুনরায় তাকে আদায় করতে হবে। আর যদি হজ্জের জন্য হয়ে থাকে তহিলে তা 'উমরাতে পরিণত হয়ে যাবে। কিন্তু পরবর্তী বছর এ হজ্জ পুনরায় আদায় করা তার জন্য অপররিহার্য। ইহ্‌রাম ভেংগে ফেলার পর একটি কুরবানীযোগ্য পশু মক্কা শরীফে পাঠিয়ে দিতে হবে। কিন্তু হাদ্‌য়ী না পেলে তাকে হজ্জের সময় তিন দিন এবং বাড়ী ফিরে আসার পর সাত দিন এই পূর্ণ দশদিন সিয়াম পালন করতে হবে।

হযরত ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, একবার তিনি সাক্‌ইয়া নামক স্থানে অবস্থানরত ইবনে হিযাবার পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন। এ সময় তিনি যখমপ্রাপ্ত দেখতে পেলেন। লোকটি তখন তাকে এ সম্পর্কে ফতোয়া জিজ্ঞেস করার পর তিনি বললেন, সে যেন এ অবস্থায়ই অবস্থান করে। বায়তুল্লাহ্ শরীফে না যাওয়া পর্যন্ত সে হালাল হতে পারবে না। হাঁ, যদি সে রোগাক্রান্ত হয়ে যায়, তাহলে প্রতিষেধক ঔষধ ব্যবহার করবে, তবে এ অবস্থায় সহজলভ্য পশু কুরবানী করা তার উপর অপরিহার্য। সম্ভবত তিনি হজ্জের ইহ্‌রাম বেধে ছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, হজ্জের ইহ্‌রাম বাধার পর কেউ যদি রাস্তায় বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং ভয়–ভীতি ও রোগের কারণে কেউ যদি পথে আটকা পড়ে, তাহলে সে সম্ভাব্য সব ব্যবস্থা গ্রহণ করে তা নিরসনে চেষ্টা করবে। তবে স্ত্রী সহবাস এবং সুগন্ধী ব্যবহার তার জন্য বৈধ হবে না। এরপর সে আল্লাহ্‌র নির্দেশিত ফিদ্‌ইয়া আদায় করবে, অর্থাৎ সিয়াম কিংবা সাদ্‌কা অথবা কুরবানীর দ্বারা তার ফিদ্‌ইয়া দিবে। যদি আট্‌কা পড়ে তার হজ্জ ছুটে যায় অথবা মুযদালিফার রাত্রে ফজরের পূর্বে যদি তার আরাফায় অবস্থান করা ছুটে যায়, তাহলে তাঁর হজ্জ ছুটে গেল। সুতরাং তাঁর এ হজ্জ 'উমরাতে পরিণত হয়ে যাবে। এ ব্যক্তি প্রথমে মক্কা শরীফে গিয়ে বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ এবং সাফা ও মারওয়া পর্বতদ্বয়ের মধ্যস্থলে সায়ী (দৌড়ানোর) এর কাজ সম্পন্ন করে নিবে, যদি তাঁর নিকট কুরবানীর পশু থাকে তাহলে তা (মক্কাতে) মসজিদে হারামের নিকট যবেহ্ করবে। তারপর সে মাথা কামিয়ে অথবা চুল ছোট করে নিবে। এরপর স্ত্রী সহবাস এবং সুগন্ধী ব্যবহার সব কিছুই তার জন্য হালাল হয়ে যাবে। তবে আগামী বছর তাকে অবশ্যই হজ্জব্রত পালন করতে হবে। আর এ বছর একটি সহজলভ্য পশু কুরবানী করবে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ এবং সাফা ও মারওয়া পর্বতদ্বয়ের মধ্যস্থলে না দৌড়িয়ে কোনক্রমেই হালাল হতে পারবে না। যদি সে অতীব প্রয়োজনীয় কাপড় এবং ঔষধ ব্যবহার করার ব্যাপারে অনন্যোপায় হয়। তাহলে তার এগুলো করার অনুমতি আছে। তবে এ কারণে তাকে ফিদ্ইয়া দিতে হবে। রোগ এবং এ ধরনের কোন বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার ব্যাপারে হযরত ইবনে উমার (রা.)–এর এ বর্ণনা। তবে শত্রু দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সম্পর্কে তিনি ঐ কথাই বলতেন, যা পূর্বে আমরা হযরত মালিক ইবনে আনাস (রা.)–এর সূত্রে উল্লেখ করেছে। তিনি বলেছেন, হযরত ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, যে বছর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ, হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইব্নে যুবায়রের উপর আক্রমণ করেছিল সে বছর হযরত ইবনে উমার (রা.) হজ্জ যাওয়ার ইচ্ছা করলে, তাঁর দুই ছেলে তাঁর সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করে বলেন যে, এ বছর আপনি যদি হজ্জে না যান, তাহলে আপনার কোন ক্ষতি হবে না। মানুষের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ লেগে যেতে পারে বলে আমাদের আশংকা। ফলে আপনার বায়তুল্লাহ্ শরীফ যাওয়ার পথ বন্ধ হয়ে যাবে । বায়তুল্লাহ্ শরীফে যাওয়া আপনার পক্ষে আর সম্ভব হবে না। এ কথা শুনে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা.) বললেন, যদি পথিমধ্যে আমি বাধাপ্রাপ্ত হই তাহলে কাফিররা হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–কে বাধাদানকালে আমরা হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর সাথে যে আমল করেছিলাম, এখনও তাই করব। তৎকালে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মাথা কামিয়ে বাড়ীতে ফিরে এসেছিলেন। 'উমরার মধ্যে বাধা ও অবরোধ কিছুই নেই বলে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা.)–এর যে অভিমত আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি, তার দলীলঃ ইয়াযীদ ইবনে 'আবদুল্লাহ্ ইবনে শাখীর (র.) বর্ণিত, তিনি 'উমরার ইহ্রাম বেধে পথিমধ্যে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে হযরত ইবনে আববাস (রা.) হযরত ইবনে উমার (রা.) নিকট পত্র লিখলেন, তাঁরা পত্রে উত্তরে লিখলেন, তিনি যেন একটি কুরবানীযোগ্য পশু পাঠিয়ে দিয়ে তথায় কিছু দিন অবস্থান করে পরে হালাল হয়ে যান। বর্ণনাকারী বলেন, এ চিঠি পেয়ে তিনি ছয় মাস অথবা সাত মাস তথায় অবস্থান করেন। আবুল 'আলা ইবনে শাখীর (র.) থেকে বর্ণিত, 'উমরার ইহ্রাম বেধে বাড়ী থেকে যাত্রা করে পথিমধ্যে হঠাৎ আমি আমার সওয়ারী থেকে পড়ে যাই, ফলে আমার একটি পা ভেংগে যায়। তারপর এ সমন্ধে প্রশ্ন করে হযরত ইবনে 'আব্বাস (রা.) ও হযরত ইবনে উমার (রা.)–এর নিকট আমি একটি পত্র লিখি, উত্তরে তাঁরা বলেন, হজ্জের মত 'উমরার জন্য কোন নির্ধারিত সময় নেই। তাওয়াফ না করে 'আপনি হালাল হতে পারবেন না, তিনি বলেন, তৎপর আমি দাসিনা অথবা এর পার্শ্ববর্তী স্থানে সাত মাস অথবা আট মাস অবস্থার করি। বসরার পুরাতন অধিবাসীদের জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত, একবার আমি মক্কা শরীফের পথে যাত্র করলাম। পথিমধ্যে আমার একটি উরু ভেংগে যায়। আমি মক্কা মুকাররমায় হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইবনে আববাস (রা.)–এর নিকট একটি পত্র লিখলাম। তখন মক্কা শরীফে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আববাস (রা.) হযরত আবদল্লাহ্ ইবনে উমার (রা.) এবং আরো বহু লোক বসবাস করতেন। কেউ আমাকে হালাল হবার ব্যাপারে অনুমতি দেননি। তাই আমি এ অবস্থায়

সাত মাস অবস্থান করে পরে 'উমরা করে হালাল হয়ে যাই। হযরত ইবনে শিহাব (র.) থেকে এমন এক ব্যক্তি সম্বন্ধে বর্ণনা রয়েছে যার অংগহানী ঘটে ছিল 'উমরা পালনরত অবস্থায়। তিনি বলেছেন, এ ব্যক্তি বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ এবং সাফা ও মারওয়া পর্বতদ্বয়ের মধ্যস্থলে সায়ী (দৌড় না) করার পূর্বে নিজ ইহ্রামের উপর বলবৎ থাকবে। এরপর মাথা কামিয়ে অথবা চুল ছেটে ইহ্রাম থেকে হালাল হয়ে যাবে। এখন আর কোন কিছু করা তাঁর উপর অপরিহার্য নয়।

فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ এর ব্যাখ্যায় যে সব মতামত ব্যক্ত করা হয়েছে, তন্মধ্যে সঠিক কথা হলো, 'উমরা এবং হজ্জের ইহ্রাম বাধার পর যদি কেউ বাধাগ্রস্ত হয়, তাহলে তাকে একটি সহজলভ্য পশু কুরবানী করতে হবে। তবে এর স্থান ঐ জায়গা যথায় সে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। তাঁর বলেন, কুরবানীর পশু তার স্থানে পৌছার সাথে সাথেই বাধাগ্রস্ত মুহ্রিম ব্যক্তি তাঁর ইহ্রাম থেকে হালাল গয়ে যাবে। তাদের ধারণা মতে محل এর অর্থ متحر অথবা مذبح (যবেহ্ করার স্থান)–চাই এ نحر (নহর) অথবা ذ بح (যবেহ্) حل (হিল) এর মধ্যে হোক কিংবা হারাম শরীফের মধ্যে হোক, তবে মুহ্রিম যেহেতু তাঁর ইহ্রামের সাথে সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানাদি পুরা না করে নিজ ইহ্রাম থেকে হালাল হয়ে গিয়েছে তাই সামর্থবান হবার সাথে সাথে তাকে একাজ পুনরায় আদায় করে নিতে হবে। কেননা মুতাওয়াতিরভাবে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুদায়বিয়ার বছর তিনি এবং তাঁর সাহাবিগণ উমরার ইহ্রাম বাধা অবস্থায় বায়তুল্লাহ্ শরীফের পথে বাধাপ্রাপ্ত হন, ফলে তিনি ও সাহাবিগণ তাঁর নির্দেশে বায়তুল্লাহ্ শরীফে পৌছার পূর্বেই কুরবানী করেন। এরপর পরবর্তী বছর এর কাযা করেন। কোন ঐতিহাসিক এবং কোন প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি এ কথা দাবী করেননি যে, বায়তুল্লাহ্ শরীফে পৌছার অপেক্ষায় হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এবং তার সাহাবিগণের কেউ পূর্ববর্তী ইহ্রামের উপর বাকী ছিলেন, এবং তারা এ কথাও দাবী করেননি যে, বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ এবং সাফা ও মারওয়া পর্বতদ্বয়ের মধ্যস্থলে দৌড়ানোর মাধ্যমেই মুহ্রিম তাঁর স্বীয় ইহ্রাম থেকে হালাল হতে পরে। তবে কুরবানীর পশু হারাম শরীফে পৌছার বিষয়টি কারো নিকট অস্পষ্ট নয়। সুতরাং সর্বোত্তম কাজ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কাজের অনুসরণ করে কাজ করা, যতক্ষণ না এর বিপরীত কোন খবর কিংবা কোন দলীল পাওয়া যায়। বিষয়টি যেহেতু এমনই এবং মুফাসসীরগণ যেহেতু এ বিষয়ে একাধিক মত প্রকাশ করেছেন, অধিকন্তু আমাদের উল্লেখিত বিষয়টির ব্যাপারে যেহেতু হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বর্ণনা ও বিদ্যমান রয়েছে, তাই আয়াতের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর বর্ণিত ব্যাখ্যাই সর্বাধিক উত্তম ও বিশুদ্ধ। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর বায়তুল্লাহ্ শরীফের পথে মুশরিকদের বাধা প্রদান করার ব্যাপারে যে, আয়াতখানা অবতীর্ণ হয়েছে এ বিষয়ে আলিমগণের কেউ দ্বিমত পোষণ করেননি, যেমন বর্ণিত আছে যে, হাজ্জাজ ইবনে 'আমর আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলতে শুনেছেন,যার পা ভেংগে গেছে অথবা যার পা খোড়া হয়ে গেছে, সে তার ইহ্রাম থেকে

হালাল হয়ে গিয়েছে। তবে পরবর্তী বছর একটি হজ্জ তার উপর অপরিহার্য । বর্ণনাকারী বলেন, এ হাদীসটি আমি হযরত ইবনে আব্বাস এবং আবূ হুরায়রা (রা.)–এর নিকট বর্ণনা করার পর তাঁরা উভয়ই বলেছেন, তিনি সত্য বলেছেন। হাজ্জাজ ইবনে 'আমরের সূত্রে নবী করীম (সা.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। যে হজ্জের ইহ্‌রাম থেকে মুহ্‌রিম হালাল গয়ে গিয়েছে তা পুনরায় আদায় করার নির্দেশ করার মাঝে হযরত নবী করীম (সা.) এবং সাহাবিগণের আমলের সাথে বিপুল সামঞ্জস্য রয়েছে। কারণ হুদায়বিয়ার বছর যে 'উমরার ইহ্‌রাম থেকে তাঁরা হালাল হয়ে গিয়েছিলেন উমরাতুল কাযার বছর সে 'উমরাকেই পুনরায় কাযা করেছিলেন। "যারা মনে করেন যে, শত্রু কতৃক আক্রান্ত হয়ে নফল ইহ্‌রাম থেকে হালাল হবার পর ঐ ব্যক্তির উপর কাযা অপরিহার্য নয়। তবে অন্য কোন কারণে যে হয় বাধাগ্রস্ত হয় তার–উপর কাযা অপরিহার্য।" এ ধরনের অভিমত পোষণকারী ব্যক্তিগণকে বলা হবে যে, যে কারণ (علة) একজনের উপর কাযাকে ওয়াজিব করে কিন্তু অন্যজনের উপর ওয়াজিব করে না, علة এ মূলতঃ কোন–ই علة নয়। তাই কোন জটিল বাধা না থাকলে উভয় অবস্থাতেই উক্ত আমলের পূর্ণতা বিধান ওয়াজিব। যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে, আয়াত তো শত্রু কর্তৃক বাধাগ্রস্ত ব্যক্তি সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে তাই আয়াতের হুকুমকে অন্য প্রসঙ্গে টেনে নেয়া কখনো আমাদের জন্য সমীচীন নয়।

জবাবে বলা যাবে, একথা 'উলামাদের নিকট সর্বজন স্বীকৃত নয়। কারণ, একদল 'আলিম এ মতের বিরোধিতা করেছেন। সর্বোপরি যদি আমরা এ কথাকে মেনে ও নেই তথাপিও আমরা বলতে পারি, যে রোগের কারণে বাধাগ্রস্ত হওয়া এবং আটকা পড়ে যাওয়ার বিধান দ্বারা বাধাগ্রস্ত ব্যক্তির বিধান এক এবং অভিন্ন না হওয়ার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ আছে কি ? মূলতঃ নেই কারণ, উভয় অবস্থাতেই মুহ্‌রিমের পক্ষে বায়তুল্লাহ্ শরীফে পৌঁছা এবং তাদের স্বীয় ইহ্‌রামের সাথে সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানাদি পালন করা সম্ভব নয়। আর যদি এ দু'ধরনের বিধানের কারণও দু' প্রকার হয়ে থাকে তাহলে বলা যেতে পারে যে, একটি কারণ হলো শারীরিক আর অপরটি শারীরিক নয়। শরীয়তের দৃষ্টিতে এ দুটো কারণ হুকুমের বিভিন্নতার ক্ষেত্রে প্রভাবশালী কারণ হিসাবে স্বীকৃত হতে পারে না। তাই পার্থক্য করণের ব্যাপারে যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, এ সম্পর্কে তোমাদের নিকট কুরআন, হাদীস, ইজমা এবং কিয়াসের থেকে কোন নির্ভরযোগ্য দলীল আছে কি? তাহলে তাদের কিংকর্তব্যবিমূঢ় হওয়া ব্যতীত কোন গত্যন্তর নেই।

যাঁরা বলেন, 'উমরার মধ্যে কোন অবরোধ পথ নেই। তাদেরকে বলা হবে, আপনারা নিশ্চয়ই জ্ঞাত আছেন যে, হযরত নবী করীম (সা.) 'উমরার ইহ্‌রাম বেধে যখন বায়তুল্লাহ্ শরীফের দিকে রওয়ানা করেছিলেন, তখন তাঁকে বাধা দেয়া হলে তিনি তার ইহ্‌রাম ভেংগে হালাল হয়ে যান। এতে তো সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হলো যে, 'উমরার মাঝেও অবরোধ আছে। যদি না থাকে তাহলে এ বিষয়ে আপনাদের নিকট কোন দলীল আছে কি?

যদি কেউ প্রশ্ন করেন হজ্জে মাঝে কোন অবরোধ নেই। কারণ আর যার হজ্জ (فوت) ছুটে যায়। তাকে শুধু বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ এবং সাফা ও মারওয়া পর্বতদ্বয়ের মধ্যস্থলে দৌড়িয়ে নেয়াই যথেষ্ঠ। কারণ, احصار فى الحج এর ব্যাপারে হযরত নবী করীম (সা.) থেকে কোন সুন্নাত বিদ্যমান নেই। মাননীয় ইমামগণের এক জামাআত এ কথাই বলেছেন। তবে উমরা সম্পর্কে হযরত নবী করীম (সা.)–এর সুন্নাত বিদ্যমান–আছে এবং উমরার বিধান তথা 'উমরার থেকে হালাল হওয়া ও 'উমরা কাযা করা প্রভৃতি সম্পর্কে আল্লাহ্পাক আয়াত ও অবতীর্ণ করেছেন। কাজেই 'উমরাতে অবরোধ হতে পারে কিন্তু পবিত্র হজ্জের অবরোধ হতে পারে না এ ধরনের প্রশ্ন যারা উথাপন করেন তাঁদেরকে বলা হবে যে, এদ'ুটি আমলের মধ্যে মূলতঃ কোন পার্থক্য আছে কি ? এর উত্তরে তারা লা জবাব হতে বাধ্য। কাজেই তাদের এ বক্তব্যের কোন যৌক্তিকতা নেই।

আল্লাহ্র বাণী– فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ بِهٖ اَذًى مِّنْ رَّأْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ (তোমাদের মধ্যে যদি কেউ অসুস্থ হয়, অথবা মাথায় ব্যথা থাকে, তবে রোযা কিংবা সাদ্কা অথবা কুরবানীর দ্বারা এর ফিদ্ইয়া দিবে) এর ব্যাখ্যাঃ উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন, হে মু'মিনগণ! তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হলে সহজলভ্য কুরবানী করবে এবং কুরবানীর পশু যথাস্থানে না পৌছিলে তোমরা তোমাদের মাথাও কামাবে না। হাঁ, যদি কেউ রোগ অথবা মাথায় উকুন হবার কারণে মাথা কামানোর ব্যাপারে অনোন্যপায় হয়ে পড়ে তাহলে সে তার মাথা কামিয়ে নিবে। তবে এ কারণে তাকে সিয়াম কিংবা সাদ্কা অথবা কুরবানী দ্বারা ফিদ্ইয়া দিতে হবে। মুফাসসীরগণের এক জামাআত ব্যাখ্যাই প্রদান করেছেন। নিম্নে তাঁদের মতের সমর্থনে বর্ণনা ঃ

হযরত ইবনে জুরায়জ (র.) থেকে বর্ণিত, আমি 'আতা (র.)–কে প্রশ্ন করলাম, মাথায় যন্ত্রণা থাকার অর্থ কি ? জবাবে তিনি বললেন, মাথায় উকুন হওয়া, মাথা ব্যথা করা ইত্যাদি। মস্তিষ্ক রোগ হল– মাথায় ক্লেশ থাকার অর্থ।

অন্যান্য মুফাস্সীরগণ বলেছেন, কুরবানী অথবা সাদ্কা দ্বারা যিনি হজ্জের ফিদ্ইয়া দিতে ইচ্ছুক তিনি কাফ্ফারা আদায় করার পর মুস্তক মুন্ডন করবেন। আর সিয়াম দ্বারা ফিদ্ইয়া দিতে ইচ্ছুক, তিনি প্রথমে মাথা মুন্ডন করবেন এবং পরে রোযা রাখবেন। উল্লেখিত মুফাস্সীরগণ নিম্নের রিওয়ায়েতগুলোকে প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করেছেন।

হযরত হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, মুহ্রিমের মাথায় যদি কোন যন্ত্রণা হয় তাহলে তিনি বকরী পাঠানোর পর অথবা মিসকীনদেরকে খানা খাওয়ানোর পর মাথা মুন্ডন করবেন। আর যদি তিনি সিয়াম দ্বারা ফিদ্ইয়া দেন, তাহলে প্রথমে মাথা মুন্ডন করবে, তারপর রোযা রাখবে।

এ মত যারা পোষণ করেন ঃ

'আলকামা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজ্জের ইহ্রাম বাধার পথে কোন ব্যক্তি যদি

বাধাপ্রাপ্ত হয় তাহলে সে সহজলভ্য পশু তথা বকরী কুরবানী করবে। যদি সে তাড়াহুড়া করে ঐ পশু তার স্থানে পৌছার পূর্বে মাথা কামিয়ে নেয় কিংবা সুগন্ধি ব্যবহার করে অথবা ঔষধ-সেবন করে, তাহলে তাকে সিয়াম অথবা ঔষধ সেবন করে, তাহলে তাকে সিয়াম অথবা সাদ্‌কা কিংবা কুরবানী দ্বারা ফিদ্‌ইয়া আদায় করতে হবে । বর্ণনাকারী বলেন, ইবরাহীম বলেছেন, হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়রের নিকট আমি এ কথাটি বর্ণনা করলে তিনি বললেন, হযরত ইবন আব্বাস (রা.) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। মুজাহিদ (র.) থেকে আল্লাহ্‌র বাণী–فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ এর ব্যাখ্যায় বলেন, রোগ অথবা অংগভংগের কারণে যদি কেউ পথে আটকিয়ে যায় তাহলে সে একটি সহজ লভ্য পশু কুরবানী করবে। কুরবানীর দিবসের আগে সে মাথা কামাবে না এবং হালালও হবে না। যদি কেউ রুগ্ন হয় কিংবা চোখে সুরমা লাগায় বা সুগন্ধযুক্ত তৈল ব্যবহার করে অথবা ক্লেশ থাকার কারণে সে মাথা মুন্ডিয়ে ফেলেছে, তাহলে সিয়াম কিংবা সাদ্‌কা অথবা কুরবানীর দ্বারা ফিদ্‌ইয়া আদায় করবে। মুজাহিদ (র.) থেকে অনুরূপ এটি বর্ণনা রয়েছে।

কাতাদা (র.) থেকে আল্লাহ্‌র বাণী– وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهٗ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖ اَذًى مِّنْ رَّاْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ – (তোমরা মস্তক মুন্ডন করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত পশু তার (কুরবানীর) স্থানে না পৌছে তোমাদের মধ্যে যদি কেউ পীড়িত হয় কিংবা মাথায় ব্যথা থাকে তাহলে সে রোযা কিংবা সাদ্‌কা অথবা কুরবানী দ্বারা ফিদ্‌ইয়া দিবে।) এর ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, কুরবানীর পশু পাঠানোর পর যদি কারো রোগের কারণে মাথা কামানো, সুগন্ধি ব্যবহার করা এবং জামা অথবা অন্য কোন কাপড় ব্যবহার করা এবং জামা অথবা অন্য কোন কাপড় ব্যবহার করার প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে সে এ গুলো করার পর ফিদ্‌ইয়া প্রদান করবে।

হযরত ইবনে শিহাব (র.) থেকে বর্ণিত, হজ্জে যাওয়ার পথে কেউ বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার পর যদি সে এ অবস্থায় রুগ্ন হয়ে পড়ে অথবা যদি তার মাথায় ব্যথা দেখা দেয়, তাহলে সে মাথা মুন্ডন করে রোযা কিংবা সাদ্‌কা অথবা কুরবানী দ্বারা ফিদ্‌ইয়া প্রদান করবে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, হজ্জের ইহ্‌রাম বেধে বাধাপ্রাপ্ত হবার পর যদি কেউ আশংকাগ্রস্ত অথবা রুগ্ন হয়ে পড়ে তাহলে সে এগুলো থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে। তবে এ অবস্থায় তার জন্য সুগন্ধি ব্যবহার করা ও স্ত্রী সহবাস করা বৈধ হবে না। কিন্তু তাকে অবশ্যই আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পন্থা অনুসারে রোযা কিংবা সাদ্‌ক অথবা কুরবানী দ্বারা ফিদ্‌ইয়া প্রদান করতে হবে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত আলী (রা.) মহান আল্লাহ্র বাণী–فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖ اَذًى مِّنْ رَّأْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ – সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবার পর তিনি বলেছেন, কুরবানী করার পূর্বের অবস্থার সাথে উক্ত বিধানের সম্পর্ক অর্থাৎ এ অবস্থায় যদি কেউ বিপদাপদে পতিত হয় তাহলে তাকে কাফ্ফারা আদায় করতে হবে।

কোন কোন মুফাস্সীর বলেছেন, আয়াতের অর্থ হলো, যদি কেউ পীড়িত হয় কিংবা মাথায় ব্যথা থাকে তাহলে তাকে মাথা কামানোর আগে রোযা কিংবা সাদ্কা অথবা কুরবানী দ্বারা ফিদ্ইয়া প্রদান করতে হবে। এ মতের সমর্থনে বর্ণনা, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে মহান আল্লাহ্র বাণী–فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖ اَذًى مِّنْ رَّأْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ–সম্পর্কে বর্ণিত, মুহ্রিম অবস্থায় যদি কেউ চরমভাবে পীড়িত হয়, অথবা তাঁর মাথায় ব্যথা থাকে তাহলে তাঁকে রোযা কিংবা সাদ্কা অথবা কুরবানী দ্বারা ফিদ্ইয়া দিতে হবে। ফিদ্ইয়া দেয়ার পূর্বে সে মাথা মুন্ডাতে পারবে না। কেননা বর্ণিত আছে যে, হযরত ইয়াকূব (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি 'আতা (র.)-কে – فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖ اَذًى مِّنْ رَّأْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ – এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার পর তিনি বলেছেন, একবার হযরত কা'ব ইবনে উজরা (রা.) হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নিকট দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। এসময় তাঁর মাথায় ছোট বড় অনেক অনেক উকুন ছিল। হযরত নবী করীম (সা.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নিকট কোন বকরী আছে কি ? হযরত কা'ব (রা.) বললেন, না, নেই ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! এরপর হযরত নবী করীম (সা.) তাকে বললেন, যাও ছয়জন মিসকীনকে খানা খাওয়াও অথবা তিন দিন রোযা রাখ। তারপর মাথা কামিয়ে নাও। সুগন্ধযুক্ত ঔষধ এবং মাথা কামিয়ে যে সমস্ত রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করা যায়, যেমন বিরসাম (যার চিকিৎসা হলো মাথা কামানো) এবং শরীরের আঘাতজনিত ক্ষত যার থেকে আরোগ্য লাভ করার জন্য সুগন্ধময় ঔষধের দরকার হয়, অনুরূপ আরো রোগ ব্যাধি,–ফোঁড়া ইত্যাদি যা শরীরের সাথে সম্পর্কিত, মাথার ব্যথা, এমনিভাবে মাথা ব্যথা, অর্ধ–কপাল মাথা ব্যথা–ইত্যাদি, মাথায় অত্যধিক উকুন হওয়া এবং মাথার জন্য ক্ষতির প্রতিটি রোগ–ব্যাধি যা মাথা কামানোর সাথে বিদূরিত হয়ে যায় প্রভৃতি বিষয়াদি নির্দেশের হিসাবে আয়াতাংশে– او به اذًى من رأسه এর মধ্যে শামিল এবং সবগুলো সমস্যার সমাধান এতেই নিহিত আছে। অধিকন্তু হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হাদীস ও কথাই সমর্থন করছে যে, যখন কা'ব ইবনে 'উজরা (রা.) তার মাথায় অত্যধিক উকুন

আছে বলে অভিযোগ করেছিলেন, তখনই আয়াত তার কারণে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) প্রতি নাযিল হয়। আর এ ঘটনাটি ঘটেছিল হুদায়বিয়ার সন্ধির বছর। এ সম্বন্ধে বর্ণিতসমূহ ঃ

হযরত কা'ব ইবনে 'উজরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হুদায়বিয়ার প্রান্তরে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমার নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন। তখন আমার মাথায় ওয়াফ্‌রা (وفره) তথা অত্যধিক বড় বড় চুল ছিল। আর প্রতিটি চুলের আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত উকুনে ভরপুর ছিল। এ দেখে হযরত রাসূল (সা.) বললেন, এতো অত্যন্ত কষ্টদায়ক। আমি বললাম, হ্যাঁ ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা.)। এরপর তিনি বললেন, তোমার সাথে কুরবানীযোগ্য কোন পশু আছে কি? আমি বললাম জী না। তারপর তিনি বললেন, তাহলে তুমি তিন দিন রোযা রাখ কিংবা ছয়জন মিসকীনকে অর্ধসা' করে তিন সা' খুরমা দান করে দাও।

হযরত কা'ব ইবনে 'উজরা (রা.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। হযরত কা'ব ইবনে উজরা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, হুদায়াবিয়ার বছর আমি হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে যাত্রা করেছিলাম। তখন আমার মাথায় ওয়াফরা (وفره) তথা অত্যধিক বড়বড় চুল ছিল। এতে ছিল অসংখ্য উকুন। উকুনগুলো আমাকে খেয়ে শেষ করে ফেলছিল। আমার এ অবস্থা দেখে হযরত রাসূল (সা.) আমাকে বললেন, তুমি মাথা কামিয়ে ফেল, আমি তা করলাম। এরপর হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, তোমার নিকট কুরবানীযোগ্য কোন পশু আছে কি? আমি বললাম, না নেই। তারপর তিনি বললেন, সহজলভ্য পশু কুরবানী করার নির্দেশ দিয়ে আল-কুরআনে আল্লাহ্ পাক এদিকেই ইংগিত করেছেন। আমি বললাম, আমার কাছে তো নেই হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)। এরপর তিনি বললেন, যাও তিন দিন রোযা রাখ অথবা অর্ধ সা' করে ছয়জন মিসকীনকে খাবার দাও। এরপর হযরত কা'ব ইবনে 'উজরা বললেন, আমার সম্বন্ধেই অবতীর্ণ হয়েছে- فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ- আয়াতটি উপরোক্ত হাদীসের আলোকে সুস্পষ্টভাবে একথাই প্রতিভাত হচ্ছে যে, মাথা কামানোর পরই ফিদ্ইয়া ওয়াজিব হয় এবং এটাই হচ্ছে বিশুদ্ধতম রায়, আর কামানোর পূর্বে যারা ফিদ্ইয়া দেয়ার কথা বলেন, তাদের কথা ঠিক নয়। কেননা, হযরত নবী করীম (সা.) হযরত কা'বকে মাথা কামানোর পর ফিদ্ইয়া দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং সে মতেই তিনি আমল করেছেন।

হযরত কা'ব ইবনে উজরা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন,আমাকে হযরত রাসূল (সা.) তিন দিন রোযা রাখার অথবা এক ফরক (فرق) অর্থাৎ তিন সা' ছয় জন মিসকীনের মধ্যে বন্টন করে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মা'কাল (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, আমি (কূফার) মসজিদে কা'ব ইবনে উজরা (রা.)-এর পাশে বসেছিলাম। এ সময় আমি তাঁকে- فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ

– نُسُكٍ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার পর তিনি বললেন, আয়াতটি আমার সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে। আমার মাথায় ব্যথা ছিল। আমাকে হযরত রাসূল (সা.)–এর নিকট উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এ সময় আমার মুখের উপর উকুন ঝরে পড়ছিল। আমাকে দেখে হযরত রাসূল (সা.) বললেন, তোমার অবস্থা যে এত দূর পর্যন্ত পৌঁছে যাবে তা আমি ধারণাই করিনি। তুমি কি একটি ছাগল যবেহ্ করার ক্ষমতা ও রাখ না ? আমি বললাম না, আমার ক্ষমতা নেই। এরপর অবতীর্ণ হল– فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ অর্থাৎ তুমি সিয়াম কিংবা সাদ্‌কা অথবা কুরবানী দ্বারা ফিদ্‌ইয়া আদায় কর। সুতরাং এই আয়াতটি আমার সম্বন্ধেই অবতীর্ণ হয়। তবে নির্দেশ হিসাবে আয়াতখানা এ রকম প্রত্যেক ওযরযুক্ত লোকদের জন্যই প্রযোজ্য।

তামীম......আবদুল্লাহ্ ইবনে মা'কাল মিরবী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি কা'ব ইবনে 'উজারা (রা.) থেকে শুনেছি, তিনি বলতেন, একবার আমি হযরত রাসূল (সা.)–এর সাথে হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলাম। এ সময় আমার চুল, দাড়ি, মোচ এবং ভ্রূতে অসংখ্য উকুন হয়েছিল। এ কথা হযরত রাসূল (সা.)–এর নিকট আলোচনা করা হলে তিনি একজন লোক ডেকে পাঠালেন। এরপর তিনি আমাকে বললেন, তোমার কষ্ট এতদূর পর্যন্ত পৌঁছে যাবে বলে আমি ধারণাই করিনি। তারপর তিনি বললেন, আমার নিকট একজন নাপিত ডেকে আন। লোকেরা একজন নাপিত ডেকে আনলে সে আমার মাথা কামিয়ে দেয়। এরপর হযরত রাসূল (সা.) বললেন, কুরবানী করার মত কোন পশু তোমার নিকট কি নেই ? আমি বললাম নেই। তারপর তিনি বললেন, যাও, তিন দিন রোযা রাখ, অথবা অর্ধ সা' করে ছয় জন মিসকীনকে খাবার ব্যবস্থা করে দাও। হযরত কা'ব বলেন, আমার সম্বন্ধেই অবতীর্ণ হয়েছে–فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ بِهٖ اَذًى مِنْ رَّاْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ আয়াতখানা। তবে এর হুকুম সমস্ত মানুষের জন্য ব্যাপক এবং 'আম।

কা'ব ইবনে উজরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা আমি ডেকচির নীচে জ্বাল দিচ্ছিলাম, এমন সময় হযরত রাসূল (সা.) আমার নিকট আগমন করেন। সে সময় আমার মুখের উপর উকুন ঝড়ে পড়ছিল। তখন হযরত রাসূল (সা.) বললেন, তোমার মাথার উকুনগুলো তোমাকে কি কষ্ট দিচ্ছে না? আমি বললাম, হ্যাঁ কষ্ট দিচ্ছে। এরপর তিনি বললেন, তাহলে তুমি মাথা কামিয়ে ফেল এবং ফিদ্‌ইয়াস্বরূপ তিন দিন রোযা রাখ কিংবা ছয় জন মিসকীনকে খাদ্য দাও অথবা একটি বকরী যবেহ্ কর।

হযরত আইয়ূব (রা.) নবী করীম (সা.) থেকে অনরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বলেছেন, উকুনগুলো আমার উপর অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) আমার। ভ্রূ–এর উপর ঝরে পড়তেছিল এবং তিনি একথাও বলেছেন যে, তুমি একটি পশু কুরবানী কর। বর্ণনাকারী আইয়ূব বলেন আমি জানি না সে কোন কাজ প্রথমে আরম্ভ করবে।

হযরত কা'ব (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, এ আয়াত আমার সম্বন্ধেই অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত কা'ব (রা.) বলেন, হযরত রাসূল (সা.) আমার মাথায় উকুন দেখে আমাকে বললেন, তুমি একটু আমার কাছে আস, আমি তাঁর কাছে গেলে তিনি আমাকে বললেন, উকুনগুলো তোমাকে কি কষ্ট দিচ্ছে না ? বর্ণনাকারী বলেন, সম্ভবতঃ তিনি উত্তরে হাঁ বলেছেন। হযরত কা'ব বলেন, এরপর রাসূল (সা.) আমাকে রোযা , সাদ্‌কা এবং সহজলভ্য কুরবানী করার নির্দেশ দিলেন।

হযরত কা'ব ইবনে উজরা (রা.) থেকে অন্যসূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেন,—হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় হযরত রাসূল (সা.) তাঁর নিকট এসে দেখলেন, তিনি চুলার নীচে জ্বাল দিতেছেন, আর তাঁর মাথার উকুনগুলো তাঁর মুখের উপর ঝরে পড়ছিল। এ দেখে হযরত রাসূল (সা.) বললেন, এ উকুনগুলো তোমাকে কি কষ্ট দিচ্ছে না ? তিনি বললেন, হাঁ। তারপর হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে তুমি তোমার মাথা কামিয়ে ফেল এবং সিয়াস, কিংবা সাদ্‌কা অথবা কুরবানী দ্বারা ফিদ্‌ইয়া প্রদান কর। অর্থাৎ হয়তো কুরবানী করবে কিংবা তিন দিন রোযা রাখবে অথবা ছয় জন মিসকীনকে খানা খাওয়াবে।

আবদুর রহমান ইবনে আবূ লায়লা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমাদের নিকট বর্ণনা করা হয়েছে যে, হুদায়বিয়ার সন্ধি চলাকালে হযরত নবী করীম (সা.) হযরত কা'ব ইবনে উজরা (রা.)-এর নিকট তাশরীফ আনেন। এরপর হাদীসটি পূর্বের ন্যায় হুবহু বর্ণনা করেছেন।

হযরত কা'ব ইবনে 'উজরা (রা.) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, আমি হুদায়বিয়ায় অবস্থানকালে হযরত রাসূল (সা.) আমার নিকট তাশরীফ আনেন। এ সময় আমার মাথা থেকে উকুন ঝরে পড়ছিল। আমার এ অবস্থা দেখে হযরত রাসূল (সা.) আমাকে বললেন, তোমার মাথার উকুন কি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে না ? আমি বললাম ,হাঁ কষ্ট দিচ্ছে। তিনি বললেন, যাও তাহলে তুমি তোমার মাথা কামিয়ে ফেল। হযরত কা'ব ইব্‌ন উজরা বলেন, فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ আয়াতখানা আমার সম্বন্ধেই অবতীর্ণ হয়েছে।

হযরত কা'ব ইবনে 'উজরা (রা.) থেকে এরূপও বর্ণিত, হুদায়বিয়ার সন্ধির সময়ে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমার নিকট আসলেন। তখন আমি রান্নার কাজে ব্যস্ত ছিলাম। আমার মাথা থেকে উকুন ঝরে পড়ছিল। এ দেখে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "উকুন কি তোমাকে কষ্ট দেয় না ?" আমি বললাম, হাঁ, কষ্ট দেয়। তারপর তিনি বললেন, তাহলে তুমি তোমার মাথা কামিয়ে ফেল এবং একটি পশু কুরবানী কর কিংবা তিন দিন রোযা রাখ অথবা ছয় জন মিসকীনকে এক ফরাক (প্রায় দশ কে,জি,) খাদ্য দিয়ে দাও। বর্ণনাকারী আইয়ূব (রা.) বর্ণনা করেছেন, انسك نسيكة (হজ্জের নিয়ম ঠিকমত পালন কর) ইবনে আবূ নাজীহ্ (র.) বর্ণনা করেছেন, اذبح شاة (বকরী যবেহ্ কর) সুফইয়ান (রা.) বলেছেন তিন সা' এক ফরাকের সমান।

হযরত কা'বা ইবনে 'উজরা (রা.) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত, একদিন মাথা থেকে আমার চেহারায় উকুন ঝরে পড়তে দেখে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাকে বললেন, এ উকুন তোমাকে কি কষ্ট দেয় না, তিনি বললেন, হাঁ কষ্ট দেয়। তারপর হুদায়বিয়ায় অবস্থানকালে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে মাথা কামানোর নির্দেশ দিলেন। তবে মক্কা শরীফে প্রবেশে অনুরাগী লোকদেরকে তিনি একথা পরিষ্কার করে বলেন যে, তারা এখানেই হালাল হয়ে যাবে। এ ঘটনার পর আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ফিদ্ইয়া সম্পর্কিত আয়াত নাযিল করেন। এ আয়াতের আলোকে হযরত নবী করীম (সা.) হযরত কা'ব ইবনে উজরা (রা.)–কে ছয়জন মিসকীনের মধ্যে এক ফরাক খাদ্য প্রদান করা কিংবা একটি পশু কুরবানী করা অথবা তিনদিন রোযা রাখার নির্দেশ দেন।

হযরত কা'ব ইবনে 'উজরা (রা.) থেকে আরেক ধারায় বর্ণিত, ইহ্রাম অবস্থায় হুদায়বিয়া প্রান্তরে আমরা হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর সাথে ছিলাম। তখন মুশরিকগণ আমাদের পথ আটকিয়ে রেখেছিল।আমার মাথায় ছিল ওয়াফ্রা লম্বা লম্বা চুল (وفرة) এর মধ্যে ছিল বহু উকুন। উকুনগুলো আমার মুখের উপর বেয়ে চলছিল। এসময় হযরত নবী করীম (সা.) আমার নিকট এসে বললেন, তোমার মাথার উকুনগুলো তোমাকে কি কষ্ট দেয় না ? আমি বললাম, হাঁ কষ্ট দেয়। তারপর নাযিল হল–فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ بِهٖ اَذًى مِنْ رَأْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ–অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যদি কেউ পীড়িত হয় অথবা যদি কারো মাথায় ব্যথা থাকে, তাহলে সে রোযা বিংবা সাদকা অথবা কুরবানী দ্বারা ফিদ্ইয়া প্রদান করবে।

হযরত কা'ব ইবনে 'উজরা (রা.) থেকে অন্য সূত্রে বর্ণিত–فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ بِهٖ اَذًى مِنْ رَأْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ–এ আয়াত আমার সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে এবং এতে আমাকেই বুঝানো হয়েছে। তিনি বলেছেন, হযরত নবী করীম (সা.) হুদায়বিয়ার বৃক্ষের নিকট অবস্থানকালে ইহ্রাম অবস্থায় তাকে বলেছেন, এ মাথার উকুন কি তোমাকে কষ্ট দেয় ? আমি বললাম, হাঁ কষ্ট দেয়। তিনি এ ধরনের কথা বলেছেন অথবা অন্য কোন কথা বলেছেন, যা আমার মনে নেই। এ ঘটনার পর আল্লাহ্ পাক এ আয়াত নাযিল করেছেন– فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ بِهٖ اَذًى مِنْ رَأْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ–এখানে نسك এর অর্থ হল বকরী।

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। হযরত কা'ব ইবনে 'উজরা (রা.) বলেছেন, ঐ পবিত্র স্বত্বার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, নিশ্চয়ই এ আয়াত আমার সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে এবং এতে আমাকে বুঝানো হয়েছে। এরপর পূর্বের ন্যায় হুবহু বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁকে মাথা কামানোর নির্দেশ দেন।

হযরত কা'ব ইবনে উজরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর সাথে ছিলেন। এ সময় তাঁর মাথার উকুন তাঁকে পীড়া দিত। একারণে হযরত নবী করীম (সা.) তাঁকে মাথা কামিয়ে তিনদিন রোযা রাখা কিংবা ছয়জন মিসকীনের প্রত্যেককে দুই মুদ করে খাদ্য প্রদান করা অথবা একটি বকরী কুরবানী করার নির্দেশ দিয়ে বললেন, এর মধ্যে যেটাই করবে তোমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে।

হযরত কা'ব ইবনে 'উজরা (রা.) থেকে আরেক সূত্র হযরত নবী করীম (সা.) তাঁকে বলেছেন, উকুনগুলো সম্ভবত তোমাকে কষ্ট দেয়। আমি আরয করলাম, হাঁ ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমাকে কষ্ট দেয়। তারপর হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করলেন, মাথা কামিয়ে ফেল এবং তিনদিন রোযা রাখ কিংবা ছয়জন মিসকীনকে খাদ্য দাও অথবা একটি বকরী কুরবানী কর।

হযরত কা'ব ইবনে 'উজারা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একদা আমি ডেকচির নীচে ফুঁক দিতে ছিলাম। এমতবস্থায় রাসূল (সা.) আমার নিকট আসলেন। আমার মাথা এবং দাড়ি উকুনে ভরপুর ছিল। তাই তিনি আমার কপালে হাত রেখে বললেন, মাথা কামিয়ে ফেল। এরপর তিনদিন রোযা রাখ, অথবা ছয়জন মিসকীনকে খাদ্য দাও। কুরবানী করার মত আমার নিকট কিছুই নেই একথা রাসূল (সা.) বহু পূর্ব থেকেই জানতেন।

হযরত কা'ব ইবনে 'উজরা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, উকুন যখন আমাকে পীড়া দিচ্ছিল তখন রাসূল (সা.) আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমি যেন আমার মাথা মন্ডন করে পরে তিনদিন রোযা রাখি অথবা ছয়জন মিসকীনকে খাদ্য খাওয়াই। কুরবানী করার মত কোন পশু আমার নিকট নেই একথা রাসূল (সা.) পূর্ব থেকেই জানতেন।

হযরত কা'ব ইবনে 'উজরা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূল (সা.) আমাকে মাথা মুন্ডন করে একটি ছাগী ফিদ্ইয়া প্রদান করার নির্দেশ দিয়েছেন।

আবূ ওয়াইল শাকীক ইবনে সালমা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, এই বাজারে হযরত কা'ব ইবনে 'উজারা (রা.)–এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। আমি তাঁকে তাঁর মাথা মুন্ডানোর কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন, ইহ্রাম বাঁধার পর উকুন আমাকে পীড়া দিচ্ছিল। এ সংবাদ নবী করীম (সা.)–এর নিকট পৌঁছার পর তিনি আমার নিকট আসলেন। তখন আমি আমার সংগীদের জন্য ডেটচির মধ্যে খানা তৈরী করছিলাম। তিনি এসেই অঙ্গুলী দ্বারা আমার মাথায় নাড়াচাড়া দিলেন। অমনি মাথা থেকে উকুন ঝরে পড়তে লাগল। এ দেখে নবী করীম (সা.) বললেন, তুমি মাথা মুন্ডিয়ে ছয়জন মিসকীনকে খানা দিয়ে দাও।

ইবনে জুরায়জ থেকে তিনি বলেন, আমাকে আতা সংবাদ দিয়েছেন যে, মুশরিকদের পথ আটকিয়ে রাখার বছর যখন রাসূল (সা.) হুদায়বিয়া প্রান্তরে ছিলেন তখন তাঁর জনৈক সাহাবীর মাথা উকুনে ভরে যায়। তার নাম ছিল কা'ব ইবনে 'উজরা (রা.) তাঁকে নবী করীম (সা.) বললেন, এ উকুন কি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে ? তিনি বললেন, হাঁ কষ্ট দিচ্ছে। এরপর তিনি বললেন, তাহলে তুমি মাথা

কামিয়ে ফেল এবং এরপর তিনদিন রোযা রাখ, অথবা ছয়জন মিসকীনকে দুই মুদ করে খাদ্য দিয়ে দাও। বর্ণনাকারী বলেন, নবী করীম (সা.) কি দুই মুদের কথা উল্লেখ করেছেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ উল্ল্যেখ করেছেন। তারপর বর্ণনাকারী বলেছেন, আমার নিকট অনুরূপ সংবাদই পৌঁছেছে যে, নবী করীম (সা.) হযরত কা'ব (রা.)–এর নিকট ফিদ্ইয়ার দু'টি পদ্ধতির কথাই উল্লেখ করেছেন। কুরবানীর কথা উল্লেখ করেননি। আতা বলেন, আমাকে কা'ব ইবনে 'উজরা জানিয়েছেন যে, নবী করীম (সা.) তাঁকে হুদায়বিয়া প্রান্তরে এ সংবাদ জানিয়েছিলেন, নবী করীম (সা.) ও তার সাহাবিগণকে হলক এবং নহরের কথা নবী করীম (সা.) বর্ণনা করেছেন, আতা তা জানেন না।

হযরত কা'ব ইবনে 'উজরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি মাথার ব্যথায় আক্রান্ত হয়ে কুরবানীর পশু তার স্থানে পৌঁছার আগেই মাথা কামিয়ে নেন। এ কারণে নবী করীম (সা.) তাঁকে তিনদিন রোযা রাখার নির্দেশ দেন।

হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইবনে 'আমর ইবনে 'আস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, রাসূল (সা.) হযরত কা'ব ইবনে 'উজরা (রা.)–কে বলেছেন, তোমার মাথার উকুনগুলো তোমাকে কি কষ্ট দিচ্ছে না ? তিনি বললেন, হ্যাঁ কষ্ট দিচ্ছে। তারপর তিনি বললেন, যাও মাথা কামিয়ে ফেল এবং তিনদিন রোযা রেখে অথবা ছয়জন মিসকীনকে খাদ্যদান করে অথবা একটি বকরী কুরবানী করে ফিদ্ইয়া প্রদান কর। ইমাম তাবারী (র.) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে প্রতিদান, বদলা বা বিনিময়।

মাথায় ব্যথা থাকা বা পীড়িত হবার কারণে মুহ্‌রিম ব্যক্তি মাথা কামিয়ে ফেলার পর তার ওপর যে খাদ্য প্রদান এবং সিয়াম সাধনাকে আল্লাহ্ পাক ওয়াজিব করেছেন, এর পরিমাণ ও সংখ্যা নির্ধারণের ব্যাপারে উলামাদের মধ্যে একাধিক মত রয়েছে। কেউ বলেন, তার উপর তিনটি রোযা এবং ছয়জন মিসকীনের প্রত্যেককে অর্ধ সা' করে তিন সা' খাদ্য প্রদান করা ওয়াজিব, তারা পূর্বের হাদীসগুলোকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেন এবং নিম্নের বর্ণনাগুলোকে প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করেছেন।

এ মত যাঁরা পোষণ করেন তাঁরা আবূ মালিক থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন–فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ (তাহলে সে সিয়াম, কিংবা সাদ্কা অথবা কুরবানী দ্বারা ফিদ্ইয়া প্রদান করবে) এর ব্যাখ্যা হচ্ছে হয়তো সে তিন দিন রোযা রাখবে কিংবা ছয়জন মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করবে অথবা একটি বকরী কুরবানী করবে।

আতা (র.) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

ইব্রাহীম এবং মুজাহিদ থেকে বর্ণিত যে, তারা উভয়ই–فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, রোযা রাখলে তিন দিন রাখতে হবে, খাওয়ালে ছয় মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করতে হবে এবং কুরবানী করলে বকরী বা এর চেয়ে বড় কিছু কুরবানী করবে।

ইবরাহীম এবং মুজাহিদ থেকে অপর একসূত্রে বর্ণিত, তারা উভয়ই আল্লাহ্ পাকের বাণী– فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, রোযা রাখলে তিন দিন, সাদ্‌কা দিলে ছয় মিসকীনের খাদ্য এবং কুরবানী করলে একটি বকরী বা এর চেয়ে বড় ধরনের কোন পশু কুরবানী করবে।

ইয়াকূব........হযরত কা'ব ইবনে উজরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্‌র বাণী–فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, রোযা রাখলে তিন দিন, সাদ্‌কা দিলে ছয় মিসকীনের খাদ্য এবং কুরবানী দিলে একটি বকরী বা এর চেয়ে বড় কোন পশু কুরবানী করবে। তবে তিনি মিসকীনদেরকে সাদ্‌কা দেয়ার ব্যাপারে বলেছেন, ছয় মিসকীনকে তিন সা' খুরমা প্রদান করবে।

সূদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্‌র বাণী–فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖٓ اَذًى مِّنْ رَّاْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ এর ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, উল্লেখিত বিষয়াদির কোন একটির মধ্যে যদি কেউ পতিত হয় তাহলে তাকে একটি ফিদ্‌ইয়া দিতে হবে। আর যদি কেউ দু'টির মধ্যে পতিত হয় তাহলে তাকে দু'টি ফিদ্‌ইয়া দিতে হবে। এহেন অবস্থায় পতিত ব্যক্তিকে ইখ্‌তিয়ার দেয়া হয়েছে যে, উল্লেখিত তিনটি বিষয়ের যে কোন একটির দ্বারা সে ফিদ্‌ইয়া আদায় করতে পারবে। রোযা রাখলে তিনটি রোযা আর সাদ্‌কা দিলে অর্ধ সা' করে ছয় জন মিসকীনকে তিন সা' প্রদান করতে হবে, আর কুরবানী করলে একটি বকরী বা এর চেয়ে বড় কোন পশু কুরবানী করবে। হযরত কা'ব ইবনে উজরা (রা.) হজ্জে যাওয়ার পথে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। এ সময় তাঁর মাথায় ছিল ভীষণ উকুন; তাই তিনি তাঁর মাথা কামিয়ে নেন। এ ঘটনার পর তার সম্বন্ধেই অবতীর্ণ হয় উপরোক্ত আয়াত খানা।

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, যদি কেউ পীড়িত হয়, কিংবা চোখে সুরমা লাগায় অথবা তৈল ব্যবহার করে বা ঔষধ সেবন করে কিংবা যদি তাঁর মাথায় উকুন থাকে আর সে মাথা কামিয়ে ফেলে তাহলে তাকে তিন দিন রোযা রেখে কিংবা ছয় জন মিসকীনের মধ্যে এক ফরাক (فرق) খাদ্য সাদ্‌কা করে অথবা কুরবানী করে ফিদ্‌ইয়া প্রদান করবে, نسك এর অর্থ হচ্ছে একটি ছাগী।

হযরত রবী' থেকে আল্লাহ্‌র বাণী–وَ لَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهٗ এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, কুরবানীর পশু তার স্থানে পৌঁছার পূর্বে যদি কেউ তাড়াহুড়া করে মাথা কামিয়ে ফেলে, তাহলে তাকে সিয়াম, কিংবা সাদ্‌কা অথবা কুরবানী দ্বারা ফিদ্‌ইয়া আদায় করতে হবে, অর্থাৎ রোযা রাখলে তিন দিন, সাদকা দিলে ছয়জন মিসকীনের মধ্যে প্রত্যেক দুই জনকে এক সা' করে খাদ্য দিতে হবে, এবং কুরবানী করলে একটি বকরী কুরবানী করবে।

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়র (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, ফিদ্ইয়া দাতা প্রতি দুই মুদের (مد) বিনিময়ে একদিন রোযা রাখবে। এক মুদ খাদ্য হিসাবে এবং অপর মুদ তরকারি হিসাবে।

'আমবাসা (রা.) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইবনে সালমা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, একদা হযরত 'আলী (রা.) আল্লাহ্ পাকের বাণী– فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖ اَذًى مِّنْ رَّأْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবার পর তিনি বলেছেন, রোযা রাখলে তিন দিন, সাদকা দিলে ছয় মিসকীনকে তিন সা' এবং কুরবানী করলে একটি বকরী কুরবানী করতে হবে।

মুহাম্মদ ইবনে কা'ব থেকে বর্ণিত, তিনি, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖ اَذًى مِّنْ رَّأْسِهٖ যে ব্যক্তির সম্পর্কে আয়াত খানা অবতীর্ণ হয়েছিল তার আলোচনা করে বলেছেন, হযরত রাসূল (সা.) তাঁকে উপদেশ দেন যে, রোযা রাখলে তিন দিন, সাদ্কা দিলে ছয় মিসকীনকে এবং কুরবানী করলে একটি বকরী কুরবানী করবে।

'আলকামা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি হজ্জের ইহ্রাম বাধার পর পথিমধ্যে বাধাপ্রাপ্ত হয় তাহলে সে সহজলভ্য একটি কুরবানী তথা একটি বকরী পাঠিয়ে দিবে। কুরবানীর পশু তার স্থানে পৌঁছার পূর্বে যদি সে তাড়াহুড়া করে মাথা কামিয়ে ফেলে কিংবা সুগন্ধি ব্যবহার করে অথবা ঔষধ সেবন করে তাহলে তাঁকে সিয়াম কিংবা সাদ্কা অথবা কুরবানী দ্বারা ফিদ্ইয়া দিতে হবে। রোযা রাখলে তিনটি রোযা, সাদকা দিলে ছয়জন মিসকীনের প্রত্যেককে অর্ধ 'সা' করে তিন সা' খাদ্য এবং কুরবানী দিলে একটি বকরী কুরবানী দিবে।

ইব্রাহীম এবং মুজাহিদ থেকে বর্ণিত যে, তাঁরা উভয়ই আল্লাহ্ পাকের বাণী– فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, রোযা রাখলে তিন দিন, সাদকা দিলে ছয়জন মিসকীনকে তিন সা' এবং কুরবানী করলে একটি বকরী কুরবানী দিবে।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন, মুহ্রিমের মাথায় কোন ব্যথা থাকার কারণে যদি সে মাথা কমিয়ে ফেলে কিংবা কোন রোগ ব্যাধির কারণে যদি সে সুগন্ধি ব্যবহার করে অথবা এমন কাজ করে যা মুহ্রিম অবস্থায় তার জন্য করা সমীচীন ছিল না তাহলে সে রোযা রাখলে দশ দিন রোযা রাখবে এবং সাদ্কা দিলে দশজন মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করবে।

এ মত যাঁরা পোষণ করেন ঃ

হযরত হাসান (র.) থেকে আল্লাহ্র বাণী– فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ এর ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, মুহ্রিমের মাথায় যদি কোন রোগ থাকে তাহলে সে মাথা কামিয়ে ফেলবে এবং নিম্নলিখিত তিনটির মধ্যে যে কোন একটির দ্বারা ফিদ্ইয়া আদায় করবে। (১) রোযা

দশদিন (২) দশজন মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করবে। প্রত্যেক মিসকীনকে "মুক্কুক" খেজুর ও এক মুক্কুক গম দিতে হবে, (৩) একটি বকরী কুরবানী করবে।

হযরত কাতাদা, হাসান এবং 'ইকরামা (রা.) থেকে আল্লাহ্র বাণী- فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ এর ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন যে, সাদ্কা দিলে দশজন মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করতে হবে।

এমত পোষণকারী তাফসীরকারগণের যুক্তি হচ্ছে এই যে, মুহ্রিমের ইহ্রামের মাঝে ত্রুটি এবং তাঁর অসমীচীন কার্য-কলাপের বিনিময় হিসাবে আল্লাহ্ তাঁর ওপর যে রোযা এবং সাদ্কা ওয়াজিব করেছেন তা হচ্ছে ঐ দমের বদল যা আল্লাহ্ পাক হজ্জে তামাত্তু পালনকারীর ওপর অপরিহার্য করেছেন। যথা কুরবানীযোগ্য পশু না পেলে রোযা রাখা, আর এ রোযা রাখতে হবে তাঁকে দশ দিন, সুতরাং কুরবানীর বিনিময়ে যে রোযা ওয়াজিব হয় তার হুকুমও অনুরূপই। অর্থাৎ রোযা রাখলে দশ দিন রাখতে হবে। মুফাস্সীরগণ বলেছেন, রোযা না রেখে কেউ যদি খাওয়াতে চায় তাহলে এর বিধান সম্পর্কে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আল্লাহ্ পাক রমযান মাসে রোযা রাখতে অক্ষম ব্যক্তির জন্য রমযানের এক এক রোযার বিনিময়ে এক এক মিসকীনকে খাওয়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং ওয়াজিব রোযার বিনিময়ে খাদ্য দান করার বিষয়টিও এর মতই হবে। এ কারণেই আল্লাহ্ পাক মাথা কামানোর ফিদ্ইয়া হিসাবে দশজন মিসকীনের খাদ্য দান করাকে আমাদের ওপর অবধারিত করেছেন।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন, মাথা কামানোর জন্য বকরী কুরবানী করা ওয়াজিব। অন্যথায় মুদ্রা দ্বারা বকরীর মূল্য নির্ধারণ করে তা দ্বারা খাদ্য ক্রয় করবে। তারপর তা সাদ্কা করে দিবে, নতুবা অর্ধ সা'-এর পরিবর্তে একদিন করে রোযা রাখবে।

যাঁরা এ মত পোষণ করেনঃ

আ'মাশ থেকে বর্ণিত যে, একদা তিনি হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়র (রা.)-কে- فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ এর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, প্রথমে তার উপর খাদ্যের নির্দেশ দেয়া হবে। যদি তাঁর কাছে তা বিদ্যমান থাকে তাহলে তা দিয়ে একটি ছাগল ক্রয় করবে। নচেৎ রৌপ্য মুদ্রা দ্বারা ছাগলের মূল্য নির্ণয় করবে এবং তা দিয়ে খাদ্য ক্রয় করবে। এরপর তা সাদ্কা করে দিবে। নতুবা অর্ধ সা' এর পরিবর্তে একটি করে রোযা রাখবে।

মুজাহিদ (র.) বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, কোন ব্যক্তির শিকার সম্পর্কে বিধান হল, ফিদ্ইয়া দেয়ার জন্য যদি অনুরূপ কোন জন্তু না পায়, তবে খাদ্যদ্রব্যের বিনিময়ে এর মূল্য নির্ধারণ করবে। যদি খাদ্য-দ্রব্য না থাকে তা হলে সে প্রতি দুই মুদ্দের বিনিময়ে একদিন রোযা রাখবে। ফিদ্ইয়ার বিষয়টিও অনুরূপই।

কোন কোন তাফসীরকার বলেছেন, মাথা কামানোর উক্ত তিনটি বিষয়ের যে কোন একটির দ্বারা ফিদ্ইয়া আদায় করা যাবে।

এ মতের সমর্থনে আলোচনা ঃ

মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, কুরআন শরীফের যে যে স্থানে أَو – أَو শব্দ দিয়ে দু–তিনটি রূপ বর্ণনা করা হয় সেখানে যে কোন একটিকে গ্রহণ করার অধিকার থাকে। যেমন একটি মটকা, যার মধ্যে আছে শুভ্র এবং কৃষ্ণ সূতা। এর থেকে যেটাই বেরিয়ে আসে আমি তাই গ্রহণ করব।

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে কুরআন শরীফের যে স্থানে أَو – أَو শব্দ দিয়ে দু'তিনটি বিষয়ের কথা আলোচনা করা হয়েছে সেখানে উক্ত বিষয়াদির সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির যে কোন একটি গ্রহণ করার অধিকার আছে। প্রথমে সে উত্তমটি গ্রহণ করবে এরপর দ্বিতীয় নম্বরে যে জিনিষটি উত্তম তা গ্রহণ করবে।

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত কুরআন শরীফের যেখানে একথা বর্ণিত আছে যে, كَذَا فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَكَذَا অর্থাৎ অমুক এ কাজ করবে। যদি না পায় তাহলে এ কাজ করবে। সেখানে সে প্রথমটি পূর্ণ করবে। অন্যোন্যপয় হলে দ্বিতীয়টি করবে এবং কুরআন শরীফের যেখানে أَوْ كَذَا – أَوْ كَذَا বলে কোন হুকুম বর্ণনা করা হয়, সেখানে উক্ত কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য এর যে কোন একটি করার অধিকার আছে।

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত, একদা তিনি–فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেছেন, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন যখন أَو – أَو দ্বারা কোন কিছু সম্বন্ধে হুকুম দেন, ইচ্ছা করলে তুমি প্রথমটিও করতে পার এবং ইচ্ছা করলে দ্বিতীয়টিও করতে পার।

হযরত ইবনে জুরায়জ থেকে বর্ণিত, হযরত আতা (র.) এবং হযরত 'আমর ইবনে দীনার (র.) মহান আল্লাহ্র বাণী–فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖٓ اَذًى مِّنْ رَّأْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ– সম্পর্কে বলেছেন যে, সে এর যে কোন একটি করতে পারবে।

হযরত ইবনে জুরায়জ (র.) থেকে হযরত আতা (র.) বলেছেন, কুরআন শরীফে যেখানে أَو – أَو দ্বারা কোন বিধান বর্ণনা করা হয়েছে সেখানে উক্ত বিধানের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য এর যে কোন একটি করার অধিকার আছে। হযরত ইবনে জুরায়জ (র.) বলেন, 'আমর ইবনে দীনার র.) আমাকে বলেছেন, কুরআন শরীফে أَو – أَو শব্দ দ্বারা যে বিধান বর্ণনা করা হয়েছে এতে এ বিধানের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য যে কোন একটি অবলম্বন করার অধিকার আছে।

হযরত 'আতা (র.) এবং হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তাঁরা উভয়ই বলেছেন, কুরআন শরীফে اَوْ كَذَا – اَوْ كَذَا শব্দ দ্বারা যে হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে, এতে উক্ত বিধানের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তির জন্য এর যে কোন একটি অবলম্বন করা জায়েয আছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, কুরআন শরীফে যেখানেই اَوْ – اَوْ শব্দ দ্বারা কোন হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে সেখানে উক্ত হুকুমের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তির জন্য সুযোগ আছে, সে সক্ষম হলে প্রথমটি পূর্ণ করবে, আর সক্ষম না হলে দ্বিতীয়টি আদায় করবে।

হযরত ইকরামা (রা.) থেকে বর্ণিত, কুরআন শরীফের যেখানে اَوْ – اَوْ শব্দ দিয়ে কোন হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে উল্লেখিত বিষয়াদির যে কোন একটির দ্বারা কাফ্‌ফারা আদায় করা জায়েয আছে। যদি সে فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ (না পায়) হয় তা হলে দ্বিতীয়টি আদায় করবে।

হযরত আতা (র.) থেকে বর্ণিত, কুরআন শরীফে যেখান اَوْ – اَوْ শব্দ দ্বারা কোন হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে, এর যে কোন একটি করার সুযোগ আছে।

উল্লেখিত মতামতসমূহের মধ্যে আমার নিকট তা অধিকতর বিশুদ্ধ এবং নির্ভরযোগ্য যা হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত এবং যা বিভিন্ন রিওয়ায়েত দ্বারা সমর্থিত। তা হলো, তিনি হযরত কা'ব ইবনে উজরা (রা.)-কে মাথায় ব্যথা থাকার কারণে তাঁর মাথা কামিয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন, এবং বলেছেন, তিনি যেন, একটি বকরী কুরবানী করে কিংবা তিন দিন রোযা রেখে অথবা ছয়জন মিসকীনের প্রত্যেককে অর্ধ সা' (প্রায় ১ সের ১২ ছটাক)করে এক ফরাক (প্রায় দশ কে, জি,) খাদ্য দিয়ে ফিদ্ইয়া আদায় করেন। ফিদ্ইয়া প্রদানকারীর জন্য এ তিনটির যে কোন একটি আদায় করার সুযোগ আছে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা নির্ধারিত কোন একটির মধ্যে হুকুমকে সীমাবদ্ধ করে দেননি যে, অন্যটি আদায় করা তাঁর জন্য না জায়েয হয়ে যাবে। বরং এ তিনটির যে কোন একটি আদায় করার ব্যাপারে তিনি তাকে অনুমতি দিয়েছেন, যদি কেউ আমাদের এ কথাকে অস্বীকার করে তা হলে তাকে প্রশ্ন করা হবে যে, বিত্তশালী ব্যক্তির জন্য কসমের কাফ্‌ফারা আদায় করার ক্ষেত্রে তিনটি যে কোন একটির দ্বারা কাফ্‌ফারা আদায় করার অধিকার আছে কি ? যদি অস্বীকার করেন, তা হলে তো সে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্‌র সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করল এবং তাদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত থেকে বের হয়ে গেল। আর যদি হ্যাঁ বলে তা হলে তাকে পুনরায় জিজ্ঞেস করা হবে যে, ইহ্‌রাম অবস্থায় মাথার উকুন থাকার ফলে মাথা মুন্ডনকারী ব্যক্তির ফিদ্ইয়া প্রদান করার ক্ষেত্রে এবং কসমের কাফ্‌ফারা আদায় করার ক্ষেত্রে হুকুমের দিক থেকে পার্থক্য করা হলো কেন ? এর মধ্যে কোন যুক্তিযুক্ত কারণ আছে কি ? উত্তরে সে কিছুই বলতে পারবে না। লা-জবাব হওয়া ব্যতীত তার কোন উপায় নেই। আমরা যা বলেছি, এ ব্যাপারে ইজমাও সংঘটিত হয়েছে। সুতরাং এর বিশুদ্ধতার পক্ষে প্রমাণ পেশ করার আর কোন প্রয়োজন নেই।

যারা বলেন, মাথা মুন্ডানোর কাফ্ফারা মাথা মুন্ডানোর পূর্বেই পরিশোধ করতে হবে, তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, হজ্জে তামাত্তুর কাফ্ফারা হজ্জ করা পূর্বে আদায় করতে হবে, না পরে ? যদি তারা বলেন, পূর্বেই আদায় করতে হবে, তা হলে তাদেরকে পুনরায় জিজ্ঞেস করা হবে, এমনিভাবে কসমের কাফ্ফারাও কি কসমের পূর্বেই আদায় করতে হবে ? যদি বলেন হাঁ, তা হলে তাঁরা মুসলিম উম্মার সিদ্ধান্ত থেকে পদস্খলিত হয়ে গেলেন। আর যদি বলেন, কসমের কাফ্ফারা কসমের পূর্বে দেয়া জায়েয নেই, তা হলে তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, কোন্ কারণে মাথা মুন্ডানোর কাফ্-ফারা মাথা মুন্ডানোর পূর্বে ও হজ্জে তামাত্তুর কুরবানী করা হজ্জ সমাপন করার পূর্বে আদায় করা ওয়াজিব এবং কসমের কাফ্ফারা কসমের পূর্বে আদায় করা ওয়াজিব নয় ? এদের মধ্যে কোন সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে কি ? এ বিষয়ে আপনাদের নিকট কোন দলীল আছে কি ? এ বিষয়ে তাদের নিকট কোন দলীল নেই। যদি তারা উম্মতের ইজমার কারণে কসমের কাফ্ফারা কসমের পূর্বে আদায় করার অবৈধতার কথা বলেন, তা হলে তাদেরকে বলা হবে অন্য দুটো বিষয়ের মধ্যে যদি মতভেদ থাকে তবে এগুলোকে কসমের কাফ্ফারার উপর কিয়াস করুন। অর্থাৎ যেমনিভাবে কসমের কাফ্ফারা কসমের পূর্বে ওয়াজিব নয়, এমনিভাবে মাথা মুন্ডানোর কাফ্ফারা এবং হজ্জে তামাত্তুর কুরবানী করা ও মাথা মুন্ডানো এবং হজ্জে তামাত্তু' করার পূর্বে ওয়াজিব হতে পারে না।

যারা বলেন, ব্যথার কারণে যে মাথা কামাবে তার উপর দশটি রোযা অথবা দশজন মিসকীনকে খাদ্য দান ওয়াজিব। মূলতঃ তারা হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতিষ্ঠিত সুন্নতের সম্পূর্ণ বিরোধী, তাদেরকে প্রশ্ন করা যায়, আপনাদের কি মত ? যদি কেউ কোন পশু শিকার করার পর রোযা অথবা সাদ্কা দ্বারা ফিদ্ইয়া দিতে চায় তা হলে শিকার জন্তু বড়-ছোট হওয়া সত্ত্বেও সাদ্কা ও রোযার ক্ষেত্রে একই পদ্ধতি প্রযোজ্য হবে ? না ছোট-বড়র পার্থক্যের কারণে বিধানের ক্ষেত্রেও পার্থক্য হয়ে যাবে ? যদি তারা বলেন, সকলের ক্ষেত্রে একই বিধান প্রযোজ্য, তা হলে তো তারা বন্য গরু হত্যাকারী ব্যক্তি এবং হরিণীর বাচ্চা হত্যাকারী ব্যক্তির উপর অপরিহার্য রোযা ও সাদ্কাকে সমান করে ফেললেন। অথচ এ সিদ্ধান্ত সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্র সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তারা যদি বলেন, এগুলোর মধ্যে আমরা একই ধরনের বিধানের কথা বলি না, বরং আমরা শিকারকৃত পশুর ভেদাভেদ লক্ষ্য করে এদের মূল্য অনুপাতে রোযা এবং সাদ্কার কথা বলি। এরূপ অভিমতপোষণকারী লোকদের প্রশ্ন করা যায়, তা হলে আপনারা কিভাবে ব্যথার কারণে মাথা মুন্ডনকারী ব্যক্তির উপর ওয়াজিব কাফ্ফারাকে হজ্জে তামাত্তু আদায়কারী ব্যক্তির উপর ওয়াজিব রোযার উপর কিয়াস করলেন, অথচ আপনারা জানেন যে, হজ্জে তামাত্তু' আদায়কারী ব্যক্তিকে রোযা, সাদ্কা এবং কুরবানী করার ব্যাপারে কোন সুযোগ দেয়া হয়নি এবং এমন কোন বস্তুকে সে ধ্বংস করেনি যার কারণে তাঁর উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হতে পারে। সে তো কোন একটি আমল বর্জন করেছে। যার ওপর আপনারা কিয়াস করেননি, সুতরাং এ কিয়াস ঠিক নয়, কেননা, মাথা মুন্ডনকারী ব্যক্তি মাথা মুন্ডন করে এমন একটি ক্ষতি করেছে যা তার জন্য নিষিদ্ধ ছিল এবং তাকে

তো তিনটি কাফ্ফারার যে কোন একটি আদায় করার ব্যাপারে সম্পূর্ণ সুযোগ দেয়া হয়েছে। তাই মাথা মুন্ডনকারী ব্যক্তি পশু শিকারী ব্যক্তির সম্পূর্ণ সাদৃশ্য এবং যথাযথ উদাহরণ। কারণ সে পশু শিকার করে একটি ক্ষতিকর কাজ করেছে এবং তাকেও তিন ধরনের কাফ্ফারা থেকে যে কোন এক ধরনের কাফ্ফারা প্রদান করার সুযোগ দেয়া হয়েছে। কাজেই যারা এরূপ মত পোষণ করে তাদেরকে এ প্রশ্নই করতে হয় যে, মৌলিক এবং উদাহরণগত দিক থেকে আপনাদের এবং তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি? যারা উক্ত বিষয়ে আপনাদের বিরোধিতা করেন, কিয়াস করেন মাথা মুন্ডকারী ব্যক্তিকে পশু শিকারী ব্যক্তির উপর অভিন্ন কারণে উভয়ের হুকুমকে একীভূত করেন এবং মাথামুন্ডন ও হজ্জে তামাত্তুর বিষয়াদির মাঝে বিভিন্নতার কারণে মাথা মুন্ডুনকারী এবং হজ্জে তামাত্তু আদায়কারী ব্যক্তির হুকুমসমূহের ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন? এ সব প্রশ্নের উত্তরে তাদের লা-জবাব হওয়া ব্যতীত বিকল্প কোন গতি নেই। সর্বোপরি এরূপ বক্তাদের বিভ্রান্তির ওপর বহু প্রমাণাদি রয়েছে যা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না, অধিকন্তু তাদের এ ব্যক্তব্য কি করেই বা ঠিক হতে পারে ? কেননা এর খিলাফ হযরত রাসূল (সা.)-এর বহু হাদীস মওজুদ রয়েছে এবং রয়েছে কিয়াসী দলীল যা তাদের বিভ্রান্তির প্রতি সুস্পষ্ট ইংগিত করছে।

ইমাম তাবারী বলেন, মাথা কামানোর ফলে যে কুরবানী এবং সাদ্‌কা ওয়াজিব হয়, এর স্থান কোনটি কোন্ স্থানে তা আদায় করতে হবে এ বিষয়ে আলিমগণের একাধিক মত রয়েছে। কেউ বলেছেন, কুরবানী এবং মিসকীন খাওয়ানো মক্কা মকাররমাতে আদায় করতে হবে। অন্য কোন শহরে আদায় করলে তা জায়েয হবে না।

এ মতের সমর্থনে বর্ণনা ঃ

হযরত হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, কুরবানী এবং সাদ্‌কা মক্কা মুকাররমাতে আদায় করতে হবে। এ ছাড়া অন্যগুলো যে কোন স্থানে আদায় করলে চলবে।

হযরত তাউস (র.) থেকে বর্ণিত, রোযা ব্যতীত হজ্জের সকল অনুষ্ঠানাদি মক্কা মুকাররমাতে আদায় করতে হবে।

হযরত ইবনে জুরায়জ (র.) থেকে বর্ণিত আমি 'আতা (র.)-কে نُسُكٍ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করার পর তিনি বলেছেন, نُسُكٍ কুরবানী মুক্কা মুকাররমাতে হওয়া অপরিহার্য।

হযরত 'আতা থেকে বর্ণিত, ফিদ্‌ইয়ার সাদ্‌কা এবং 'কুরবানী মক্কা মুকাররমাতে দিতে হবে। তবে রোযা যেখানে ইচ্ছা তুমি রাখতে পার।

হযরত তাউস (র.) থেকে বর্ণিত, 'কুরবানী এবং সাদ্‌কার খাদ্য মক্কা মুকাররমাতে প্রদান করতে হবে। তবে রোযা সেখানে ইচ্ছা সে রাখতে পারে।

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, কুরবানী করতে হবে মক্কা মুকাররমাতে কিংবা মিনায়। হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, মক্কা মুকাররমা কিংবা মিনায় কুরবানী করতে হবে। তবে সাদ্‌কার খাদ্য মক্কা মুকাররমাতে পরিবেশন করবে।

কোন কোন মুফাস্সীর বলেন, মাথা মুন্ডানোর ফিদ্ইয়া হিসাবে যে কুরবানী কিংবা সাদ্কা অথবা সিয়াম সাধনা ওয়াজিব হয় তা ফিদ্ইয়া প্রদানকারী ব্যক্তি যে কোন স্থানে আদায় করতে পারবে।

এমত পোষণকারী মুফাস্সীরগণ নিম্নোক্ত বর্ণনাগুলো প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন ঃ

ইয়াকূব ইবনে খালিদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমাকে ইবনে জা'ফর (রা.)-এর আযাদকৃত গোলাম হযরত আবূ আসমা (রা.) সংবাদ দিয়েছেন যে, একদা হযরত 'উসমান গনী (রা.) হজ্জে যাত্রা করেন, তাঁর সাথে ছিলেন হযরত 'আলী (রা.) এবং হযরত হুমায়ন ইবনে আলী (রা.) হযরত 'উসমান গনী (রা.) চললেন। আবূ আসমা (রা.) বলেন, আমি ছিলাম ইবনে জা'ফর (রা.)-এর সংগে। পথ চলতে চলতে আমরা এমন এক ব্যক্তির নিকট গিয়ে পৌছি, যিনি ঘুমিয়ে আছেন,এবং তাঁর উষ্ট্রী তাঁর শিয়রে বাঁধা রয়েছে। তিনি বলেন, আমি তাঁকে বললাম হে ঘুমন্ত ব্যক্তি ! জাগ্রত হও। জেগে উঠার পর দেখলাম, তিনি হযরত হুসায়ন ইবনে 'আলী (রা.) হযরত ইবনে জা'ফর (রা.) তাকে উঠিয়ে নেন। তারপর তিনি তাকে নিয়ে "সুক্য়া" নামক স্থানে পৌছেন। এরপর তিনি হযরত 'আলী (রা.)-এর নিকট একজন লোক ডেকে পাঠালে, তিনি তাঁর সাথে আসলেন, হযরত আসমা বিন্ত 'উমায়স (রা.), হযরত আবূ আসমা (রা.) বলেন, তথায় আমরা তার সেবায় বিশ দিন নিয়োজিত থাকি। তারপর একদিন আলী (রা.) হুসায়ন (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কেমন লাগছে ? তিনি তাঁর মাথার প্রতি ইংগিত করলেন। আলী (রা.) তাকে মাথা মুন্ডানোর নির্দেশ দিলে তিনি মাথা কামিয়ে নেন। এরপর একটি উট এনে তা কুরবানী করেন।

ইয়াকূব ইবনে খালিদ ইবনে মুসাইয়িব আলমাখযূমী থেকে বর্ণিত, তিনি আবদুল্লাহ্ ইবনে জা'ফর (রা.)-এর আযাদকৃত গোলাম হযরত আবূ আসমা (রা.)-কে এ কথা বর্ণনা করতে শুনেছেন যে, তিনি বলতেন, তিনি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জা'ফর (রা.)-এর সফর সংগী হয়ে হযরত উসমান গনী (রা.)-এর সাথে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। যেতে আমরা যখন, সুক্য়া" এবং "আরজ" এর মধ্যেস্থলে পৌছি তখন হযরত হুসায়ন ইবনে 'আলী (রা.) অসুস্থ হযে পড়েন। ফলে গতকল্য যে স্থানে তিনি শয়ন করেছিলেন সেখানেই তাঁর ভোর হল। ভোরে আমি এবং আবদুল্লাহ্ ইবনে জা'ফর তাঁর নিকট গেলাম। দেখলাম, তিনি শুয়ে আছেন এবং তার উষ্ট্রী দাঁড়িয়ে আছে তার শিয়রের কাছে। এ দেখে 'আবদুল্লাহ্ ইবনে জা'ফর (রা.) বললেন, অবশ্যই এটি হুসায়ন (রা.)-এর উষ্ট্রী, তিনি তাঁর নিকটে পৌছে তাঁকে বললেন, হে ঘুমন্ত ব্যক্তি ! তাঁর ধারণা ছিল, তিনি ঘুমিয়ে আছে। কিন্তু কাছে যেয়ে দেখলেন, তিনি অসুস্থ, তাই হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জা'ফর তাঁকে উঠিয়ে "সুক্য়া" নামক স্থানে নিয়ে আসেন। তারপর তিনি হযরত 'আলী (রা.)-এর নিকট পত্র লিখেলে হযরত 'আলী (রা.) সুক্য়া নামক স্থানে তাঁর নিকট পৌছেন, এবং প্রায় চল্লিশ দিন তাঁর সেবায় নিয়োজিত থাকেন। এ সময় হযরত হুসায়ন (রা.)-এর মাথায় প্রতি ইংগিত করে হযরত 'আলী

(রা.)–কে বলা হল, এ তো হুসায়ন, তখন হযরত আলী (রা.) একটি উট নিয়ে আসার জন্য এক ব্যক্তিকে ডেকে পাঠালেন। (উট নিয়ে আসলে) তিনি তা কুরবানী করেন এবং তাঁর মস্তক মুন্ডিয়ে দেন।

ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত হুসায়ন ইবনে আলী (রা.) হযরত উসমান গনী (রা.)–এর সাথে ইহ্রাম বেধে রওয়ানা হন, আমার ধারণা, তিনি "সুক্য়া" নামক স্থানে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তখন হযরত আলী (রা.)–এর নিকট একথা আলোচনা করা হলে তিনি এবং হযরত আসমা বিনতে 'উমায়াস তাঁকে দেখার জন্য আসলেন। তথায় তাঁর সেবায় বিশ দিন পর্যন্ত নিয়োজিত থাকলেন, এ সময় হযরত হুসায়ন (রা.) তাঁর মাথায় দিকে ইংগিত করলে হযরত 'আলী (রা.) তাঁর মাথা কামিয়ে দেন এবং তাঁর পক্ষ হতে একটি উট কুরবানী করেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম। তারপর তিনি কি তাঁকে নিয়ে বাড়ী চলে যান ? অপর বর্ণনাকারী উত্তরে বললেন, আমার জানা নেই। ইমাম তাবারী (র.)–এর মতে "হযরত হুসায়ন (রা.)–এর মাথা কামানোর পূর্বে তাঁর পক্ষ হতে হযরত 'আলী (রা.) কর্তৃক কুরবানী করা এবং পরে তাঁর মাথা কামিয়ে দেয়া " উপরোক্ত হাদীসের একাধিক ব্যাখ্যা হতে পারে।

হযরত মুজাহিদ (র.)–এর বর্ণনা মতে হযরত আলী (রা.)–এর এ কাজ হযরত হুসায়ন (রা.)–এর মাথা কামিয়ে দেয়ার পূর্বে হযরত আলী (রা.) তার পক্ষ থেকে হালাল হয়ে কুরবানী করেছেন। তার কারণ রোগাক্রান্ত হয়ে হজ্জের বাধাপ্রাপ্ত হয়ে এবং হযরত ইয়াকূব (র.)–এর বর্ণনা মতে ইহ্রাম থেকে হালাল হয়েছিলেন। মাথা কামানোর পরে কুরবানী করেছেন, ফিদ্ইয়া হিসাবে। এমনি ভাবে তা এ–ই হিসাবেও হতে পারে যে, তিনি ফিদ্ইয়ার কুববানী মক্কা এবং হারাম শরীফের বাইরে হওয়াকে বৈধ মনে করতেন। তাই তিনি এ কুরবানী মক্কার বাইরে সম্পন্ন করেছেন।

মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, তুমি যেখানে ইচ্ছা সেখানেই ফিদ্ইয়া আদায় করতে পার।

ইব্রাহীম থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, সিয়াম, কুরবানী এবং সাদ্কার দ্বারা ফিদ্ইয়া যেখানে ইচ্ছা সেখানেই করা যায়।

ইব্রাহীম থেকে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

অপর একদল তাফসীরকার বলেছেন, কুরবানী মক্কাতে দিতে হবে। তবে সিয়াম এবং সাদ্কা–ফিদ্ইয়া প্রদানকারী যেখানে ইচ্ছা আদায় করতে পারবে।

এ মতে সমর্থনে আলোচনা ঃ

'আতা থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলতেন, কুরবানী মক্কাতে দিতে হবে। তবে সাদ্কার খাদ্য ও সিয়াম ফিদ্ইয়া প্রদানকারী যেখানে ইচ্ছা সেখানেই আদায় করতে পারবে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, কোন জন্তু শিকার করার বিনিময়ে যেমন দম বা কুরবানী ওয়াজিব হয়, তার ওপর কিয়াস করে যারা মিসকীন খাওয়ানো এবং কুরবানী মক্কা শরীফে

করাকে অপরিহার্য বলে দাবী করেন, তাদের যুক্তি, আল্লাহ্ তা'আলা কুরবানীর জন্তু কা'বাতে পৌঁছানোর শর্ত দিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন– يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ অর্থাৎ যার ফয়সালা করবে তোমাদের মধ্যে দু'জন ন্যায়বান লোক কা'বাতে প্রেরণের উদ্দেশ্যে কুরবানীরূপে। কাজেই ইহ্রামের মধ্যে ফিদ্ইয়া অথবা বিনিময় হিসাবে যে কুরবানীই ওয়াজিব হবে, بلوغ الكعبة তথা কা'বাতে প্রেরণ ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে তার বিধান, শিকার জন্তুর বিধানের মতই। কুরবানীর বিধান যেহেতু এরূপই। তাই সাদ্কার বিধানও অনুরূপই হবে। কেননা কুরবানী যার উপর ওয়াজিব সাদ্কাও তার উপর ওয়াজিব। কারণ কুরবানীর মত খাদ্য দান করারও ফিদ্ইয়া। কাজেই উভয়ের বিধান এক এবং অভিন্ন।

কুরবানী, সাদ্কা এবং রোযা ফিদ্ইয়া যেখানে ইচ্ছা সেখানেই আদায় করতে পারবে, যারা এ কথা বলেন, তাদের যুক্তি, ব্যথার কারণে মাথা মুন্ডনকারী ব্যক্তির উপর আল্লাহ্ পাক কুরবানী ওয়াজিব করেননি। তিনি তাঁর উপর কুরবানী কিংবা রোযা অথবা সাদ্কা ওয়াজিব করেছেন। যথায়ই তিনি কুরবানী করবেন কিংবা সাদ্কার খাদ্য প্রদান করবেন অথবা রোযা রাখবেন তথায়ই তাকে نَاسِكٌ (কুরবানীদাতা) مطعم (খাদ্যদাতা) এবং صائم (রোযাপালনকারী) বলা হবে। কাজেই সে যেহেতু এ নামের উপযোগী লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল, তাই মহান আল্লাহ্র দেয়া দায়িত্বও সে যথাযথভাবে পালন করতে সক্ষম হল। কেননা, মাথা কামানোর ফলে ওয়াজিব কুরবানী আদায়ের বিষয় যদি بلوغ الكعبة তথা কুরবানীর পশুটি কা'বাতে প্রেরণের ব্যাপারে মহান আল্লাহ্র প্রয়াস থাকত তাহলে তিনি যেমনিভাবে শিকার জন্তুর ক্ষেত্রে এ বিষয়টির শর্ত লাগিয়েছেন, এমনিভাবে এখানেও তিনি এ শর্ত আরোপ করতেন। অথচ এখানে তিনি এ শর্ত আরোপ করেননি। এতে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, কুরবানী এবং সাদ্কা যেখানেই আদায় করুক না কেন জায়েয আছে। যারা বলেন, কুরবানী মক্কা মুকাররমাতে দিতে হবে। তবে সাদ্কা এবং রোযা যেখানে ইচ্ছা সেখানেই আদায় করতে পারবে। এর কারণ কাফ্ফারা হিসাবে যে কুরবানী এবং হজ্জের জন্য যে কুরবানী, তা একই ধরনের। কাজেই কাফ্ফারার কুরবানীর বিধান মূল কুরবানীর বিধানের মতই। কিন্তু সাদ্কার খাদ্যের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা যেহেতু কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মিসকীন লোকদেরকে দান করার শর্ত আরোপ করেন নি, যেমনিভাবে তিনি শিকার জন্তুর কুরবানীর ব্যাপারে কা'বাতে প্রেরণের শর্ত লাগিয়েছেন। তাই আল্লাহ্ পাক কর্তৃক হারাম শরীফের অধিবাসীদের জন্য নির্ধারিত কুরবানীর মধ্যে অন্যদের অধিকার আছে বলে দাবী করা, যেমন কারো জন্য ঠিক নয় তদ্রূপ সাদকার খাদ্য কোন বিশেষ ভূখণ্ডের লোকদের জন্য নির্ধারিত এ কথা বলে দাবী করাও সমীচীন নয়।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, উপরোক্ত মতামতসমূহের মধ্যে বিশুদ্ধতম এবং সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য কথা, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যথার কারণে মাথা মুণ্ডনকারী ইহ্রামকারীর উপর রোযা কিংবা সাদ্কা অথবা কুরবানী দ্বারা ফিদ্ইয়া প্রদানকরাকে ওয়াজিব করেছেন। তবে কোন

নির্ধারিত স্থানে তা আদায় করা ওয়াজিব বলে তিনি শর্ত আরোপ করেননি। বরং তিনি বিষয়টিকে অস্পষ্ট রেখেছেন। কাজেই যে কোন স্থানে কুরবানী করলে কিংবা সাদ্‌কার খাদ্য দান করলে অথবা রোযা রাখলে, ফিদ্‌ইয়া প্রদানকারীর জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। যেমনঃ আমরা দেখতে পাই যে, আল্লাহ্ পাক যখন আমাদের জন্য আমাদের শাশুড়ীদেরকে হারাম করেছেন, তখন তিনি "তোমাদের স্ত্রী যাদের সাথে তোমাদের মিলন হয়েছে, তাদের-মা" একথার সাথে হুকুমকে সীমাবদ্ধ করেননি। কাজেই শাশুড়ীর বিষয়টিকে বর্তমান স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর ঔরসে তাঁর গর্ভজাত কন্যা যা বর্তমান স্বামীর তত্ত্বাবধানে আছে।" এর কিয়াস করে একথা বলা সমীচীন নয় যে, মিলন হয়েছে এমন স্ত্রীর মাতাই কেবল জামাইর জন্য হারাম। অতএব, কুরআন মজীদের কোন অস্পষ্ট বিধানকে বিস্তারিত সুস্পষ্ট বর্ণনার উপর কিয়াস করে স্থানান্তরিত করা কখনোই ঠিক নয়। বরং আয়াতের বাহ্যিক মর্মানুসারে সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রে তাদের প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক নির্দেশ দেয়া একান্তভাবে অপরিহার্য। হাঁ, যদি কোন ক্ষেত্রে জাহির থেকে বাতিনের দিকে আয়াতকে ফেরানোর জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাদীস বিদ্যমান থাকে, তাহলে সে বিষয়টি স্বতন্ত্র। হাদীস বিদ্যমান থাকার কারণে এ পরিবর্তনকে মেনে নেয়া হবে, কারণ তিনিই তো হলেন, আল্লাহ্‌র মর্জি ও উদ্দেশ্যের অদ্বিতীয় ব্যাখ্যাকার। সর্বোপরি এ বিষয়ে আলিমগণের ইজমা সংগঠিত হয়েছে যে, ব্যথার কারণে মাথা মুন্ডনকারী ব্যক্তি যদি রোযা রাখে তাহলে এ রোযাই তার ফিদ্‌ইয়ার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। রোযা যে কোন শহরেই রাখুক না কেন তাতে কোন অসুবিধা নেই।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, মাথা মুন্ডানোর কারণে কুরবানী দ্বারা ফিদ্‌ইয়া আদায় করার পর তার গোশ্‌ত কি করবে, ফিদ্‌ইয়া আদায়কারী ব্যক্তি নিজে এ গোশ্‌ত ভক্ষণ করতে পারবে কি না, এ সম্পর্কে আলিমদের মাঝে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেছেন, ফিদ্‌ইয়া দাতা তা খেতে পারবে না। বরং সকল গোশ্‌ত তাকে সাদ্‌কা করে দিতে হবে। তাঁরা নিম্নোক্ত বর্ণনাগুলোকে প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

হযরত 'আতা থেকে বর্ণিত তিন প্রকার জিনিষ যা খাওয়া জায়েয নেই (১) শিকারের কারণে ইহ্‌রাম ভঙ্গ হলে তার জন্য যে দম দিতে হয়, তার গোশ্‌ত। (২) পারিশ্রমিকের বদলে কুরবানীর গোশ্‌ত। (৩) মিসকীনকে খাওয়ানোর জন্য যে পশু মান্নত করা হয় , তার গোশ্‌ত।

হযরত আতা (র.) থেকে বর্ণিত, ফিদ্‌ইয়া, কাফ্‌ফারার ও মান্নতের গোশ্‌ত খাবে না। হজ্জে তামাত্তু এবং নফল কুরবানীর গোশ্‌ত খেতে পার। হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, শিকারের কারণে ইহ্‌রাম ভঙ্গ হলে তার কাফ্‌ফারার যে জন্তু কুরবানী করা হয়, ফিদ্‌ইয়া হিসাবে যে কুরবানী করা হয় এবং মান্নতের পশুর গোশ্‌ত কুরবানী দাতার জন্য খাওয়া বৈধ্য নয়। তবে সে নফল এবং হজ্জে তামাত্তুর কুরবানীর গোশ্‌ত খেতে পারবে।

'আতা (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, جزاء (বিনিময়ে দেয়া পশু) এবং ফিদ্‌য়ার গোশ্‌ত তুমি খেতে পারবে না। বরং এগুলোকে সাদ্‌কা করে দিবে।

আতা (র.) বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, হারাম কাজে লিপ্ত ব্যক্তির উষ্ট্রীর গোশ্ত তিনি খান না। এমনিভাবে কাফ্ফারার গোশ্তও।

আতা, তাউস এবং মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত যে, তাঁরা বলেছেন, ফিদ্ইয়ার গোশ্ত খাওয়া যাবে না। অন্য এক সময় বলেছেন, কাফ্ফারার পশু এবং শিকার জন্তুর বিনিময় পশুর গোশ্তও খাওয়া যাবে না।

আতা (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলতেন, শিকার জন্তুর বিনিময় পশুর গোশ্ত মান্নতের কুরবানীর গোশ্ত এবং ফিদ্ইয়ার গোশ্তও খাওয়া যাবে না। এছাড়া অন্য সব কিছু গোশ্ত খাওয়া যাবে। কোন কোন তাফসীরকার বলেছেন, এ সবের গোশ্ত খাওয়া জায়েয আছে। এ মতের আলোচনা ঃ

হযরত ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, শিকার জন্তুর বিনিময় এবং মান্নতের পশুর গোশ্ত খাওয়া বৈধ নয়। তবে এছাড়া অন্য সব কিছুর গোশ্ত খাওয়া বৈধ আছে।

ইবনে আবূ লায়লা থেকে বর্ণিত যে, তিনি جذا ء الصيدو النز ر এর সাথে من الفدية শব্দটিকেও সংযোগ করেছেন।

হযরত হাম্মাদ থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, একটি বকরী ছয়জন মিসকীনের মাঝে বন্টন করতে হবে। তবে দাতা ইচ্ছা করলে নিজে খেয়ে অবশিষ্টগুলো ছয়জন মিসকীনের মধ্যে সাদ্কা করে দিতে পারবে।

হযরত হুসায়ন (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলতেন, শিকার জন্তুর বিনিময় পশু, মান্নতের পশু এবং ফিদ্ইয়া হিসাবে প্রদানকৃত কুরবানীর পশুর গোশ্ত তোমরা খাও। এতে কোন অসুবিধা নেই।

হযরত হাসান (র.) বিনিময় থেকে বর্ণিত যে, তিনি শিকার জন্তুর বিনিময় পশু এবং মিসকীনদের উদ্দেশ্যে মান্নতকৃত পশুর গোশ্ত খাওয়াকে নাজায়েয মনে করতেন না। মাথা মুন্ডন এবং অন্যান্য যে সব কারণে পশু কুরবানী ওয়াজিব হয়, এ পশুর গোশ্ত খাওয়া দাতার জন্য জায়েয নয় বলে যাঁরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তাদের যুক্তি হলো, মাথা মুন্ডনকারী, খুশবূ ব্যবহারকারী এবং তাদের মত লোকদের উপর রোযা কিংবা সাদ্কা অথবা কুরবানীর দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা যে ফিদ্ইয়া আদায় করাকে ওয়াজিব করেছেন, তার মধ্যে মিসকীন খাওয়ানো এবং কুরবানী করা নিম্নের দু'টি বিষয়ের যে কোন একটি হবেই। (১) তিনি তাঁর উপর তাঁর নিজের অথবা অপরের জন্য কিংবা উভয়ের জন্য ওয়াজিব করেছেন। যদি আল্লাহ্ তা'আলা তা তাঁর উপর অপরের জন্য ওয়াজিব করে থাকেন, তাহলে তো তাঁর জন্য উক্ত বস্তু খাওয়া জায়েয নয়। কেননা, যে জিনিষটি অপরের জন্য তাঁর উপর ওয়াজিব হয়েছে, তা ঐ ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করা ব্যতীত কখনো আদায় হবে না। (২) যদি তা তাঁর নিজের উপর আল্লাহ্ তা'আলা ওয়াজিব করে থাকেন, তাহলে আমরা বলব, নিজের জন্য নিজের উপর কোন কিছু ওয়াজিব–করা একথা কখনো ঠিক নয়। কেননা একথা বলা (অমুকের

নিজের জন্য নিজের প্রতি দীনার অথবা দিরহাম অথবা বকরী ওয়াজিব হয়েছে) কোন ভাষাতেই শুধু নয়। হাঁ (তার জন্য অন্যের উপর কোন কিছু ওয়াজিব হতে পারে)। কিন্তু নিজের জন্য নিজের উপর কোন কিছু ওয়াজিব হওয়া কোনক্রমে বোধগম্য নয়। আর যদি এ কথা বলা হয় যে, তা তার উপর তার জন্য এবং অন্যের জন্য আল্লাহ্ পাক ওয়াজিব করেছেন, তাহলে বলা হবে যে, যে অংশটি তার জন্য ওয়াজিব তা কখনো তার ওয়াজিব হতে পারে না। কারণ, যা আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি। বিষয়টি যেহেতু এমনই তাই বুঝা যায় যে, অপরের জন্যই তার উপর ওয়াজিব হয়েছে। আর যা অপরের জন্য ওয়াজিব হয়েছে, তা হল কুরবানীর কিছু অংশ পুরা কুররবানী নয়। অথচ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তার উপর পূর্ণ কুরবানী ওয়াজিব করেছেন, যা উপরোক্ত মতামতের বিভ্রান্তির উপর সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করছে।

যারা ফিদ্ইয়ার কুরবানীর গোশ্ত খাওয়াকে বৈধ বলেন, তাদের যুক্তি হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা ফিদ্ইয়াদাতার উপর কুরবানী ওয়াজিব করেছেন। আর কুরবানী যবেহের অর্থে ব্যবহৃত হয়। যবেহ্ বলা হয় আট প্রকার নর মাদী থেকে কোন একটি পশু কুরবানীর উদ্দেশ্যে যবেহ্ করাকে। এগুলোর গোশ্ত মুক্ত হস্তে মিসকীনদের বিলিয়ে দেয়ার জন্য আল্লাহ্ পাক আদেশ করেননি। বরং যবেহ্ করার সাথে সাথেই সে কুরবানী আদায় করল এবং আঞ্জাম দিল মহান আল্লাহ্র নির্দেশিত দায়িত্বকে। এখন এ জানোয়ারের গোশ্ত সে নিজে খেতে পারে, সাদ্কা করতে পারে এবং বন্ধু–বান্ধবের মধ্যে বিতরণ করতে পারে। অনুরূপভাবে আমরা বলতে চাই যে, কেউ যদি কুরবানীর দ্বারা ফিদ্ইয়া আদায় করতে চান, তাহলে মহান আল্লাহ্র পক্ষ হতে এটা তার উপর ওয়াজিব হিসাবেই পরিগণিত হবে। তবে এ ওয়াজিবটি দুই অবস্থা থেকে খালি নয়। হয়তো তার উপর শুধু যবেহ্ করাই ওয়াজিব। অন্য কিছু নয়। অথবা যবেহ্ এবং সাদ্কা করা উভয়টাই তার উপর ওয়াজিব। যদি শুধু যবেহ করাই তার উপর ওয়াজিব হয় তাহলে যবেহ্ করার সাথে সাথেই সে ওয়াজিব আদায় হয়ে গেল। যদি সে সমস্ত গোশত খেয়েও ফেলে এবং মিসকীনকে একটুকরা গোশতও না দেয় তাহলেও তার দায়িত্ব পালনে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে না। তবে আলিমগণের কেউ এ কথা বলছেন বলে আমাদের জানা নেই। আর যদি যবেহ্ এবং সাদ্কা উভয়টাই তার উপর ওয়াজিব হয়। তাহলে তো সাদ্কা ওয়াজিব এমন বস্তু খাওয়া তার জন্য কস্মিনকালেও জায়েয নয়। যেমনঃ যে ব্যক্তির মালে যাকাত ওয়াজিব সে কখনো উক্ত যাকাত খেতে পারে না। বরং মহান আল্লাহ্র ঘোষিত ক্ষেত্রে এগুলো বন্টন করে দেয়া ওয়াজিব। তবে ইহ্রামের মধ্যে ত্রুটি বিচ্যুতির কারণে আল্লাহ্ যে কাফফারা ওয়াজিব করেন তা সাধারণত অন্যের জন্যই হয়ে থাকে, এতে যেহেতু জ্ঞানীগণের ইজমাও সংগঠিত হয়েছে, তাই বিতর্কিত বিষয়টির সুস্পষ্ট মীমাংসা এতেই রয়েছে। আরবী অভিধানে نسك এর অর্থ হল, আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যবেহ্ করা। যেমন বলা হয়, অর্থাৎ অমুক ব্যক্তি মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একটি পশু যবেহ্ করেছে। যেমন বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত نسك এর অর্থ হল একটি বকরী যবেহ্ করা।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী- فَاِذَا اَمِنْتُمْ এর ব্যাখ্যা ঃ এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে তাফসীকারগণের মধ্যে একাধিক মত রয়েছে। কেউ বলেছেন, এর ব্যাখ্যা হল, যে রোগ তোমাদের হজ্জ অথবা 'উমরা করার পথে বাধা সৃষ্টি করল তা থেকে তোমরা যখন মুক্তি লাভ করবে, (তখন তোমরা উল্লেখিত কাজ করবে)।

এ মতের সমর্থে আলোচনা ঃ

হযরত আলকামা (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন- فَاِذَا اَمِنْتُمْ এর অর্থ হচ্ছে- فَاِذَا بَرَأْتُمْ অর্থাৎ যখন তোমরা আরোগ্য লাভ করবে।

'উরওয়ার পিতা থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্‌র বাণী- فَاِذَا اَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ এর ব্যাখ্যায় বলেন, অবরোধের পর যখন তুমি নিরাপদ হবে অর্থাৎ যখন তোমারা ভাঙ্গা পা ভাল হয়ে যাবে, তোমার ব্যথা প্রশমিত হবে তখন তুমি বায়তুল্লাহ্ শরীফে যাবে এবং তোমার এ হজ্জ তামাত্তু হজ্জ হয়ে যাবে। সুতরাং বায়তুল্লাহ্ শরীফে যাওয়া ব্যতীত তুমি ইহ্‌রাম ভঙ্গ করতে পারবে না। অন্যান্য মুফাসসীরগণ বলেছেন, فاذا امنتم من وجع خوفكم আয়াতাংশের ব্যাখ্যা হচ্ছে, অর্থাৎ যখন তোমরা তোমাদের ভয়-ভীতি হতে নিরাপদ হয়ে যাবে। এ আয়াতের সমর্থনে আলোচনা ঃ কাতাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র বাণী- فاذا امنتم এর ব্যাখ্যা হল অবশ্যই তোমরা জান যে, তখন মুসলমানগণ ভীত-সন্ত্রস্ত ছিল। রবী' বললেন যে, এর যখন বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি তার ভীতি থেকে নিরাপদ হবে এবং যখন সে অসুখ থেকে আরোগ্য লাভ করবে, এ মতটি আয়াতের সাথে আধিক সামঞ্জস্যশীল। কেননা امن এর বিপরীত শব্দ হল امن - خوف শব্দের বিপরীত مرض নয়। তবে রোগটি যদি এমন হয় যে তা মৃত্যু ঘটাতে পারে (তাহলে امن শব্দের বিপরীত শব্দ مرض হতে পারে)। যেমনঃ আরবী ভাষায় বলা হয় فاذا امنتم الهلاك من خوف المرض و شدته অর্থাৎ আশংকাজনক রোগের ধ্বংস থেকে যখন তোমরা নিরাপদ হবে। তবে এ অর্থ প্রচলিত নয়।

আমরা পূর্বে বলেছি যে, এখানে নিরাপত্তা লাভ করার অর্থ হচ্ছে শত্রু ভয় থেকে নিরাপদ থাকা। কেননা এ আয়াত হুদায়বিয়ার ঘটনার সময়ে রাসূল (সা.)-এর উপর অবতীর্ণ হয়। তখন সাহাবিগণ শত্রুর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলেন। তাই আল্লাহ্‌পাক হজ্জে যাওয়ার পথে শত্রু দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার পর এবং শত্রুর ভয় কেটে গেলে তাদের করণীয় কার্যাবলী সম্পর্কে এ আয়াতে উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ্‌র বাণী- فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ এর ব্যাখ্যা হলঃ হে মু'মিনগণ! বাধাপ্রাপ্ত হলে তোমরা সহজলভ্য কুরবানী করবে। আর যখন তোমরা নিরাপদ হয়ে যাবে, শত্রুর ভয় কেটে যাবে এবং আশংকাজনক রোগ থেকে মুক্ত হবে তখন যদি তোমরা তামাত্তু হজ্জ আদায় করতে চাও তাহলে তোমরা একটি সহজলভ্য কুরবানী করবে। ইমাম আবূ জা'ফর

তাবারী বলেন, উপরোক্ত আয়াতে উল্লিখিত হজ্জে তামাত্তুর ধরন ও পদ্ধতি সম্পর্কে আলিমদের মধ্যে মতভেদ আছে।

কেউ কেউ বলেছেন, কোন ব্যক্তি হজ্জের ইহ্‌রাম বাধার পর যদি শত্রুর ভয়, রোগ অথবা অন্য বিশেষ কোন কারণে এমনভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয় যে তার হজ্জ ছুটে গেল, তখন সে মক্কায় এসে 'উমরার নিয়মনীতি পালন করলে সে ইহ্‌রাম থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। সে পরবর্তী হজ্জের পূর্ব পর্যন্ত মুক্ত অবস্থায় থাকবে। এরপর হজ্জ করবে, কুরবানী দেবে। এমনিভাবেই সে হবে তামাত্তু হজ্জ পালনকারী (লাভবান ব্যক্তি)। যুক্ত এ বক্তব্যের সমর্থনে আলোচনা।

হযরত ইবনে যুবায়র (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বক্তৃতা প্রদানকালে বলেছেন, হে লোকসকল! হজ্জের সাথে 'উমরা করাকে তামাত্তু বলে না, যেমন তোমরা করছ। বরং তামাত্তু হল হজ্জের ইহ্‌রাম বেঁধে কোন ব্যক্তি শত্রু, রোগ অথবা অংগহানির কারণে এমনভাবে বাধাগ্রস্ত হওয়া অথবা অন্য কোন যুক্তিযুক্ত কারণে পথে আটকে যাওয়া, যার ফলে তাঁর হজ্জ তরক হয়ে গিয়েছে এবং হজ্জের দিনগুলোও অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। অবশেষে সে মক্কাতে এসে 'উমরা করে হালাল হয়ে যাবে এবং এ হালাল হওয়ার ভিত্তিতে পরবর্তী বছর পর্যন্ত সে ফায়দা হাসিল করতে থাকবে। এরপর হজ্জ সমাপন করে সর্বশেষ কুরবানী করবে। এটাই হচ্ছে **بالعمرة الى الحج** তামাত্তু অর্থাৎ হজ্জের প্রাক্কালে 'উমরা দ্বারা লাভবান হওয়া।

আতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হযরত ইবনে যুবায়র (রা.) বলতেন, বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্যই হল হজ্জে–তামাত্তু। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত ইবনে 'আব্বাস (রা.) বলেছেন, পথ মুক্ত এবং বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্যই হল হজ্জে–তামাত্তু।

'আতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, হযরত ইবনে যুবায়র (রা.) বলতেন, বাধাগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য হচ্ছে হজ্জে তামাত্তু। পথ উন্মুক্ত ব্যক্তির জন্য হজ্জে তামাত্তু নয়। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন, আয়াতের ব্যাখ্যা তা নয়। বরং আয়াতের ব্যাখ্যা হচ্ছে–যদি তোমরা হজ্জে যাওয়ার পথে বাধাপ্রাপ্ত হও–তাহলে তোমরা সহজলভ্য কুরবানী করবে, আর যখন তোমরা নিরাপদ হবে এবং হালাল হবে তোমাদের ইহ্‌রাম থেকে। অথচ এখনো তোমরা তোমাদের হজ্জের ইহ্‌রাম হতে হালাল হওয়ার মত 'উমরা আদায় করনি, বরং বাধাপ্রাপ্ত হয়ে কুরবানী করে তোমরা পূর্বের ইহ্‌রাম হতে হালাল হয়ে গিয়েছ এবং তোমাদের উমরাকে পরবর্তী বছর পর্যন্ত বিলম্বিত করেছ। এরপর হজ্জের মাসে 'উমরা পালন করেছ। এরপর ইহ্‌রাম থেকে মুক্ত হয়েছে। তোমরা হজ্জের প্রাক্কালে ইহ্‌রাম থেকে মুক্ত হওয়ার ফলে তোমরা অনেক ফায়দা হাসিল করেছ। এজন্য তোমাদেরকে সহজলভ্য কুরবানী করতে হবে।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

ইবরাহীম ইবনে 'আলকামা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, কোন ব্যক্তি যদি হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধার পর বাধাপ্রাপ্ত হয় তাহলে সে সহজলভ্য একটি বকরী (মক্কায়) পাঠিয়ে দিবে। কুরবানীর পশু

তার স্থানে পৌঁছার পূর্বে যদি সে তাড়াহুড়া করে মাথা কামিয়ে ফেলে কিংবা সুগন্ধি ব্যবহার করে অথবা ঔষধ সেবন করে তাহলে তাঁকে সিয়াম কিংবা সাদ্‌কা অথবা কুরবানী দ্বারা কাফফারা আদায় করতে হবে। فَاِذَا اَمِنْتُمْ অর্থাৎ যদি সে এর থেকে মুক্ত হয়ে এ বছরই বায়তুল্লাহ্ শরীফে এসে 'উমরা করে হজ্জের ইহ্‌রাম থেকে হালাল হয়ে যায়, তাহলে তাকে আগামী বছর একটি হজ্জ আদায় করতে হবে। আর যদি সে এমনিই বাড়ীতে চলে আসে এ বছর বায়তুল্লাহ্ শরীফে না যায়, তাহলে তাকে একটি হজ্জ, একটি 'উমরা এবং 'উমরা বিলম্বিত হওয়ার কারণে একটি কুরবানী দিতে হবে। কিন্তু যদি কেউ হজ্জের মাসে হজ্জে তামাত্তু করে বাড়ীতে ফিরতে চায় তাহলে তাকে সহজলভ্য একটি বকরী কুরবানী করতে হবে। তবে যদি কেউ তা না পায় তবে তাকে হজ্জের সময় তিন দিন এবং গৃহ প্রত্যাবর্তনের পর সাত দিন সিয়াম পালন করতে হবে। ইব্‌রাহীম বলেন, আমি এ হাদীসটি হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়র (রা.)-এর নিকট পেশ করলে তিনি বললেন, হযরত ইবনে 'আব্বাস (রা.) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

কাতাদা (র.) আল্লাহ্র পাকের বাণী- فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, এ বিধান ঐ ব্যক্তির জন্য যিনি হজ্জে যাত্রা করে পথিমধ্যে ভীতি অথবা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছেন, কিংবা অন্য কোন প্রতিবন্ধকতার কারণে বাধাপ্রাপ্ত হন। ফলে তিনি একটি কুরবানীর পশু পাঠিয়ে দিয়েছেন। পশুটি কুরবানীর স্থানে পৌঁছার সাথে সাথেই তিনি ইহ্‌রাম থেকে হালাল হয়ে গিয়েছেন। যদি তিনি নিরাপত্তা লাভ করে অথবা রোগমুক্তি লাভ করে বায়তুল্লাহ্ শরীফে যান তাহলে তা তাঁর জন্য 'উমরা হয়ে যাবে এবং তিনি হালাল হয়ে যাবেন। তবে পরবর্তী বছর তাঁকে একটি হজ্জ আদায় করতে হবে। আর যদি তিনি বায়তুল্লাহ্ শরীফে না গিয়ে এমনিই বাড়ীতে চলে আসেন তাহলে তাকে পরবর্তী বছর একটি হজ্জ ও একটি 'উমরা আদায় করতে হবে এবং একটি কুরবানী দিতে হবে। কাতাদা বলেন, হজ্জে তামাত্তুর বিষয়টি এমনই। এ ব্যাপারে সবাই পরিচিত।

'ইব্‌রাহীম থেকে আল্লাহ্র বাণী- فَاِذَا اَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ - এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, এ বিধান হচ্ছে বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি জন্য। যদি সে নিরাপদ হয় তাহলে সে হজ্জে তামাত্তু আদায় করবে এবং পরে একটি কুরবানী করবে। যদি কুরবানী না পায় তাহলে সে রোযা রাখবে। আর যদি সে তাড়াহুড়া করে হজ্জের মাসের পূর্বে 'উমরা আদায় করে নেয় তাহলে তাকে একটি কুরবানী করতে হবে।'

হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, যদি সে 'উমরাকে বিলম্বিত করে হজ্জ এবং 'উমরা এক সাথে আদায় করে তাহলে তাকে একটি কুরবানী করতে হবে।

অন্যান্য তাফসীরকার বলেছেন, উপরোক্ত আয়াতে হজ্জে যাওয়ার পথে যিনি বাধাপ্রাপ্ত এবং যিনি বাধাপ্রাপ্ত নন, উভয়কেই বুঝানো হয়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেনঃ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলতেন, যিনি বাধাপ্রাপ্ত এবং যিনি বাধাপ্রাপ্ত নন উভয়ের জন্যই হজ্জে তামাত্তু। অপর কয়েকজন তাফসীরকার বলেছেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যা, যদি কোন ব্যক্তি তার হজ্জকে উমরাতে বদল করে দেয়, তারপর তাকে উমরাতে পরিণত করে, অবশেষে হজ্জের প্রাক্কালে উমরাও করে, তাহলে তার জন্য সহজলভ্য কুরবানী করা ওয়াজিব। দলীল হিসাবে তাঁরা বর্ণনা করেন যে, হযরত সূদ্দী (র.) থেকে মহান আল্লাহ্‌র বাণী– فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدى এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত, তামাত্তু' বলা হয়, হজ্জের ইহ্‌রাম বেধে 'উমরা দ্বারা তা বদল করে দেয়া। কেননা, এক সময় হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হজ্জের ইহ্‌রাম বেধে মুসলমানদের এক বিরাট কাফিলা নিয়ে রওয়ানা হওয়ার পর পবিত্র মক্কাতে পদার্পণ করে তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি হালাল হতে চায়, সে যেন হালাল হয়ে যায়। সাহাবায়ে কিরাম প্রশ্ন করলেন, আপনার কি হয়েছে, আপনি কি হালাল হবেন না হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) ? জবাবে তিনি বললেন, আমার সাথে তো কুরবানীর জানোয়ার রয়েছে।

অন্যান্য কয়েকজন মুফাসসীর বলেছেন, তামাত্তু' হজ্জ হল, কোন এক ব্যক্তির দূরদেশ থেকে হজ্জের মাসে 'উমরার ইহ্‌রাম বেধে পবিত্র মক্কাতে আগমন করে 'উমরা সমাপন করতঃ মক্কা মুকাররামাতে হালাল অবস্থায় অবস্থান করা। এরপর এখান থেকে হজ্জ আরম্ভ করে এ বছরই হজ্জের অনুষ্ঠানাদি পূর্ণ করা। তা হলেই সে হজ্জ এবং উমরা দ্বারা পালন হল।

এ অভিমত যারা পোষণ করেন তাদের বর্ণনা,

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে মহান আল্লাহ্‌র বাণী– فمن تمتع بالعمرة الى الحج–এর ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, হজ্জের সাথে উমরা পালন করার সময় হলো ঈদুল ফিত্‌রের দিন থেকে আরাফাতের দিন পর্যন্ত। এ সময়ের মধ্যে যদি কেউ এভাবে পালন করে, তা হলে তাঁকে সহজ লভ্য পশু কুরবানী করতে হবে।

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

হযরত আইয়ূব (র.) এবং হযরত নাফি' (র.) থেকে বর্ণিত, একবার হযরত ইবনে 'উমার (রা.) শাওয়াল মাসে মক্কা শরীফ আগমন করেন। আমরাও তাঁর সাথে তথায় অবস্থান করি এবং হজ্জ পালন করি। তিনি আমাদেরকে বললেন,নিশ্চয় তোমরা উমরা পালনের সুবিধা ভোগ করলে হজ্জ পর্যন্ত। কাজেই তোমাদের কেউ কুরবানী করতে সক্ষম হলে তিনি যেন কুরবানী করেন। যদি কেউ সক্ষম না হন তা হলে তিনি যেন এখানে তিন দিন এবং গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর সাত দিন রোযা রাখেন।

হযরত নাফি' থেকে বর্ণিত, একবার তিনি হযরত ইবনে উমার (রা.)–এর সাথে শাওয়াল মাসে 'উমরার ইহ্‌রাম বেধে বাড়ী থেকে রওয়ানা হন। তাঁরা মক্কা শরীফে থাকা অবস্থায় হজ্জের সময় এসে গেলে হযরত ইবনে উমার (রা.) বললেন, যিনি আমাদের সাথে শাওয়াল মাসে 'উমরা করার

পর হজ্জব্রতও পালন করেছেন, তিনি তামাত্তু হজ্জ আদায়কারী। সুতরাং তাকে সহজলভ্য পশু কুরবানী করতে হবে। যদি সে না পায় তাহলে সে হজ্জের সময় তিন দিন এবং গৃহ প্রত্যাবর্তনের পর সাতদিন রোযা রাখবে।

'আতা থেকে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে বর্ণনা করেন, যিনি হজ্জের মাসের বাইরে উমরা আদায় করে নফল কুরবানীর পশু মক্কা পাঠিয়ে দেন। তারপর হজ্জের মাসে মক্কা গমন করেন হযরত ইবনে 'উমার বলেন, যদি সে হজ্জ করার ইচ্ছা না রাখে তাহলে সে তাঁর পশু কুরবানী করে ইচ্ছা করলে বাড়ীতে চলে আসে। পশু যবেহ্ করে হালাল হয়ে যাবার পর যদি সে মক্কায় অবস্থান করার নিয়্যত করে এবং হজ্জব্রত পালন করে তাহলে হজ্জে তামাত্তু আদায় করার কারণে তাঁকে আরেকটি পশু কুরবানী করতে হবে। যদি কুরবানীর পশু না পায় তবে তিনি রোযা পালন করবেন।

হযরত ইবনে আবূ লায়লা থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন

হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব (রা.) থেকে তিনি বলতেন, যদি কেউ শাওয়াল অথবা যিল্‌কাদ মাসে 'উমরা করে। তারপর মক্কা শরীফে অবস্থান করে হজ্জ আদায় করে, তাহলে তিনি হবেন তামাত্তু হজ্জ আদায়কারী। হজ্জে তামাত্তু আদায়কারীর উপর যা ওয়াজিব হয়, যথারীতি তাঁর উপরও তাই ওয়াজিব।

হযরত 'আতা (র.) থেকে অনুরূপ অপর এক বর্ণনা রয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে মহান আল্লাহ্‌র বাণী- فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدى এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত, হজ্জের মাসে যদি কেউ 'উমরার ইহ্‌রাম বাধে তাহলে তাঁকে সহজলভ্য কুরবানী করতে হবে।হযরত আতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলতেন, নর–নারী, স্বাধীন–পরাধীন সকলের জন্যই হজ্জে তামাত্তু। তামাত্তু হল হজ্জের মাসে 'উমরা করে মক্কা মুকাররমাতে অবস্থান করা এবং হজ্জ না করে সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করা। চাই সে কিলাদা পরিয়ে কুরবানীর জ ানোয়ার পাঠাক বা না পাঠাক।

হজ্জের মাসে যেহেতু 'উমরার অনুষ্ঠানাদি সমাপন করে হজ্জ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে এ ধরনের হজ্জে তামাত্তু করা যায়, তাই এ প্রক্রিয়ার হজ্জকে হজ্জে তামাত্তু বলা হয়। তবে স্ত্রী সহবাসের মাধ্যমে বিশেষ সুবিধা ভোগ করার কারণে এ হজ্জকে হজ্জে তামাত্তু বলা হয় না।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আয়াতের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ঐ সমস্ত লোকেদের বিশ্লেষণ সর্বোত্তম যারা বলেন, উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা এ ঘোষণাই দিয়েছেন যে, হে মু'মিনগণ ! যদি তোমরা তোমাদের হজ্জে বাধাপ্রাপ্ত হও, তা হলে তোমরা সহজলভ্য কুরবানী করবে। এরপর নিরাপদ হয়ে যদি তোমাদের কেউ অবরোধের কারণে পূর্ববর্তী হজ্জের ইহ্‌রাম থেকে হালাল হয়ে 'উমরা দ্বারা লাভবান হয়। তা হলে সে বর্তমান বর্ষের হজ্জ ছুটে যাওয়ার কারণে পরবর্তী বছর হজ্জের মাসে ছুটে যাওয়া হজ্জের সাথে 'উমরা আদায় করবে। অর্থাৎ প্রথমে উমরা আরম্ভ করবে।

তারপর 'উমরার ইহ্রাম হতে হালাল হয়ে হজ্জের সময় পর্যন্ত সুযোগ–সুবিধা পেতে থাকবে। এ কারণে, তাকে সহজলভ্য একটি পশু কুরবানী করতে হবে। যদিও তামাত্তু' হজ্জ আদায়কারীর এ ভাবে হওয়া যায় যে, এক ব্যক্তি হজ্জের মাসে 'উমরা আরম্ভ করার পর তা সমাপন করে, উক্ত 'উমরা থেকে হালাল হয়ে যাবে এবং হালাল অবস্থায় মক্কা মুকাররমায় অবস্থান করবে। এরপর এ বছরই হজ্জব্রত পালন করবে। তবে– فمن تمتع بالعمرة الى الحج বলে আল্লাহ্ পাক যে হজ্জে তামাত্তু'র বর্ণনা দিয়েছেন, তা হলো সর্বাধিক উত্তম। তাই প্রকৃত তামাত্তু' তাই যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। কেননা, আল্লাহ্ পাক হজ্জ এবং 'উমরা থেকে বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তির উপর অবশ্য করণীয় বিধানাবলী উক্ত আয়াতে বর্ণনা করেছেন। তাই, উক্ত আয়াতের নির্দেশ যে, বাধামুক্ত হওয়ার পর যদি কেউ হজ্জের প্রাক্কালে 'উমরা পালন করে তা হলে তাকে সহজলভ্য কুরবানী করতে হবে। যদি সে কুরবানীর পশু না পায়, তা হলে তিন দিন রোযা রাখবে। এতে সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে হজ্জের মধ্যে বাধা আছে, তার ইহ্রাম থেকে হালাল হবার কারণে বাধা মুক্তির সময় বাধাপ্রাপ্তের উপর কুরবানী ওয়াজিব। তবে ভীতি এবং রোগের বাধা যার হজ্জ এবং উমরাকে পরবর্তী–বছরের দিকে এগিয়ে দেয়নি, তার জন্য এ বিধান প্রযোজ্য নয়। মহান আল্লাহ্র বাণী–فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ এর ব্যাখ্যাঃ পূর্ববর্তী ইহ্রাম থেকে হালাল হয়ে সুবিধা ভোগের বিনিময় হিসাবেই আল্লাহ্ রাববুল 'আলামীন সহজলভ্য কুরবানী করার ওয়াজিব করেছেন। তবে তা আদায় করতে হবে বাধাপ্রাপ্ত হজ্জের কাযা এবং ছুটে যাওয়া হজ্জের কারণে ওয়াজিব 'উমরা আদায় করার সময়। যদি সে কুরবানীর পশু না পায় তাহলে এ হজ্জের সময় তিন দিন এবং গৃহ প্রত্যাবর্তনের পর সাত দিন রোযা রাখবে। হজ্জের সময় যে তিন দিন রোযা আল্লাহ্ ওয়াজিব করেছেন,এর তারিখ নির্ধারণ করার ব্যাপারে আলিমগণের মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেছেন, হজ্জের মওসুমে যে কোন সময়ই এ রোযা রাখতে পারবে। তবে এর শেষ দিন আরাফার দিবসকে অতিক্রম করতে পারবে না। তারা নিম্নের বর্ণনাগুলোকে দলীল হিসাবে উল্লেখ করেছেন। হযরত 'আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্ তা'আলা হজ্জের সময় যে তিন দিন রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন তা হবে– يوم التر و ية এর পূর্ববর্তী দিন, (যিলহাজ্জের ৭ম দিন) يوم التربية (যিলহাজ্জের ৮ম দিন) এবং يوم العرفه আরাফাত দিবসে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত তামাত্তু 'আদয়াকারী ব্যক্তির জন্য ইহ্রাম বাধার পর হতে আরাফাত দিবস পর্যন্ত যে কোন সময়ই রোযা রাখা জায়েয আছে। হযরত ইবনে 'উমার (রা.) থেকে মহান আল্লাহ্র বাণী– فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত উপরোক্ত তিন দিন হলো يوم التروية এর পূর্ববর্তী দিন تروية এর দিন এবং আরাফাতের দিন। এদিনগুলোতে যদি কেউ

রোযা রাখতে সক্ষম না হয়, তাহলে সে মিনার দিনগুলোতে রোযা রাখবে। উরওয়া (র.) বর্ণিত, তামাত্তুকারী তারবিয়ার পূর্ববর্তী দিন, তারবিয়ার দিন এবং আরাফার দিন রোযা পালন করবে। হযরত হাসান (র.) থেকে আল্লাহ্র বাণী– فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ এর ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, এ দিনগুলোর শেষ দিন হবে 'আরাফাতের দিন।

হযরত শু'বা (র.) থেকে বর্ণিত, আমি হাকামকে হজ্জের মওসুমে এ তিন দিন রোযা রাখার সময় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার পর তিনি বললেন, হজ্জে তামাত্তু 'আদায়কারী ব্যক্তি তারবিয়ার পূর্ববর্তী ব্যক্তি তারবিয়ার পূর্ববর্তী দিন, তারবিয়ার দিন এবং আরাফার দিন রোযা রাখবে।

হযরত ইব্রাহীম (র.) থেকে মহান আল্লাহ্র বাণী–فمن لم يجد فصيام ثلثة ايام এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত রোযা রাখার সর্বশেষ সময় আরাফাতের দিন। আবূ কুরায়ব..................হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়র (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, হজ্জে তামাত্তু আদায়কারী ব্যক্তি যদি কুরবানীর পশু না পায় তাহলে সে তারবিয়ার পূর্ববর্তী দিন, তারবিয়ার দিন এবং আরাফার দিন রোযা রাখবে। হযরত 'আতা (র.) থেকে বর্ণিত, লাভবান হওয়ার কারণে তামাত্তু হজ্জ আদায়কারী তিন দিন রোযা রাখেবে। তবে তা হবে যিলহাজ্জের প্রথম দশকের মধ্যে এবং আখিরাতে সময় হবে আরাফাতের দিন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি মুজাহিদ (র.) এবং তাউস (র.) থেকে শুনেছি, তারা বলতেন, হজ্জে তামাত্তু আদায়কারী ব্যক্তি হজ্জের মাসগুলোতে যদি এ রোযাগুলো আদায় করে তাহলেই চলবে। হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে মুতামাত্তি যদি কুরবানী করার মত পশু না পায় তাহলে সে তিন দিন রোযা রাখবে। এ রোযা হবে যিলহাজ্জ–এর প্রথম দশকের মধ্যে, যার শেষ সময়টি হবে আরাফাতের দিন। তবে যদি সে রোযা রাখে তাহলে যথেষ্ট হয়ে যাবে। কোন ব্যক্তি যদি সাওয়াল অথবা যিলকাদ মাসে রোযা রাখে, তাহলে যথেষ্ট হয়ে যাবে। হযরত 'আতা ইবনে আবূ রাবাহ্ থেকে তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দিবস হতে আরাফাত দিবস পর্যন্ত সময়ের মধ্যে রোযা রাখতে সক্ষম সে যেন রোযা রাখে। হাসান থেকে আল্লাহ্র বাণী– فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ এর ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, এ রোযাগুলোর শেষ সময় হচ্ছে আরাফার দিন। 'আমির– فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ এর ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন যে, এ রোযা তিনটি তারবিয়ার পূর্ববর্তী দিন, তারবিয়ার এবং আরাফার দিনে রাখতে হবে।

মুজাহিদ থেকে– فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ এর ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন যে, এ তিন দিন রোযা রাখার সর্বশেষ সময় হল যিলহাজ্জ মাসে আরাফার দিন। মুজাহিদ থেকে অনুরূপ আরও একটি বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্ পাকের বাণী– فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ এর ব্যাখ্যায় কাতাদা বলেছেন যে, জিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশকের মধ্যে আরাফার দিন এবং এর পূর্বে দুই দিন রোযা রাখাব। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় সূদ্দী (র.) বলেছেন, যদি কেউ কুরবানীর পশু না পায় তাহলে সে তিন

দিন রোযা রাখবে, এর শেষ সময় হবে আরাফার দিন। হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়র (রা.) থেকে তিনি বলছেন, তিন দিন রোযা রাখবে, তবে এর শেষ সময় হচ্ছে আরাফার দিন। 'আতা (র.) থেকে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে তিনি বলেছেন, হজ্জের সময় তিন দিন রোযা রাখবে এবং এর শেষ সময় হচ্ছে 'আরাফার দিন। রবী থেকে فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে যে, হজ্জের সময় তিন দিন রোযা রাখবে এবং এ তিন দিন হবে যিলহাজ্জের প্রথম দশকের আরাফাত দিন ও পূর্বের দিন। মুজাহিদ এবং ইব্রাহীম (র.) থেকে বর্ণিত যে, তারা উভয়ই বলেছেন, হজ্জের সময় তিন দিন রোযা রাখতে যিলহাজ্জের প্রথম দশকে। এর শেষ দিন হবে আরাফাত দিবস।

ইয়াযীদ ইবনে খায়র থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি তাউসকে হজ্জের সময় তিন দিন রোযা রাখার সময়সূচী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছেন, এর শেষ সময় হবে আরাফার দিন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) আল্লাহ্র বাণী– فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ – এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তামাত্তু হজ্জ পালনকারী ব্যক্তির জন্য এই বিধান, সে যদি কুরবানীর পশু না পায় তাহলে সে আরাফা দিবসের পূর্বে হজ্জের সময় তিন দিন রোযা রাখবে, তৃতীয় রোযাটি হবে আরাফার দিনে। এভাবেই তাঁর তিনটি রোযা পূর্ণ করবে। এরপর গৃহ প্রত্যাবর্তন করে সে সাতটি রোযা রাখবে।

আবূ জা'ফর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তিনটি রোযার শেষটি হবে 'আরাফার দিন।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন, রোযার শেষ দিবসটি হল, মিনার দিন। যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

মুহাম্মদ (র.) বলেছেন, হযরত আলী (রা.) বলতেন, হজ্জের সময় যদি কেউ এ তিনটি রোযা রাখতে না পারে তাহলে সে আইয়্যামে তাশরীক অর্থাৎ ঈদুল আযহার পরবর্তী তিন দিনের মধ্যে এ রোযাগুলো রাখবে।

হযরত 'আয়েশা (রা.) বলেছেন, হজ্জে তামাত্তু আদায়কারী ব্যক্তির রোযা যদি ছুটে যায় তাহলে সে মিনার দিনগুলোতে রোযা রাখবে।

হযরত ইবনে উমার (রা.) বলেছেন, হজ্জের সময় রোযা তিনটি ছুটে যায় সে আইয়্যামে তাশ্রীকের মধ্যে রোযা রেখে নিবে। কেননা আইয়্যামে তাশরীকের দিনগুলোও হজ্জের সময়েরই অন্তর্ভুক্ত।

হযরত আবদুলাহ্ ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি হজ্জের মাসগুলোতে 'উমরা পালন করে, কিন্তু তার সাথে কোন কুরবানীর পশু ছিল না এবং সে আইয়্যামে তাশরীকের পূর্বে তিনদিন রোযাও রাখেনি, তাহলে সে মিনার দিনগুলোতে রোযা রাখবে।

হযরত 'আয়েশা (রা.) এবং সালিম ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তাঁরা উভয়ই বলেন, আমাদেরকে আইয়্যামে তাশরিকের মধ্যে রোযা রাখার অনুমতি দেয়া হয়নি। হ্যাঁ, ঐ ব্যক্তির জন্য অনুমতি আছে, যিনি কুরবানীর পশু পাননি।

হযরত ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, কুরবানী করার আগে যদি কেউ তিনটি রোযা না রেখে থাকে, তাহলে সে আইয়্যামে তাশরীকের দিনগুলোতে রোযা রাখবে কেননা, এ দিনগুলোও হজ্জের সময়েরই অন্তর্ভুক্ত।

হযরত হিশাম ইবন 'উরওয়া (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, হজ্জের সময় যে তিন দিন রোযা রাখার আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন, তা হবে আইয়্যামে তাশরীকের দিনগুলোতে।

হযরত ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তামাত্তু হজ্জকারী তারবিয়ার পূর্ববর্তী দিন, তারবিয়ার দিন এবং আরাফাতের দিন রোযা রাখবে। হযরত আবূ উবায়দ (রা.) বলেছেন, এ রোযাগুলো আইয়্যামে তাশরীকের সময় রাখবে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, "হজ্জে তামাত্তু আদায়কারী ব্যক্তি যদি কুরবানীর পশু না পায় তাহলে সে তিন দিন রোযা রাখবে এবং এর শেষ' সময় হবে আরাফাতের দিন," যারা এ কথা বলেন, তাদের এ মতামত ব্যক্ত করার কারণ হলো, আলাহ্ তা'আলা এ রোযাগুলোকে–فصيام ثلثة ايام فى الحج এর দ্বারা ওয়াজিব করেছেন, অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক আদেশ করেছেন যে, হজ্জের সময় তোমরা এ তিনটি রোযা রাখবে এবং আরাফাত দিবস অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে হজ্জের সময়ও অতিবাহিত হয়ে যায়। সুতরাং আরাফাত দিবসের পর রোযা রাখা জায়েয নেই। কারণ, কুরবানীর দিন, ইহ্রাম হতে হালাল হওয়ার দিন। সমস্ত উলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে একমত যে, কুরবানীর দিন রোযা রাখা জায়েয নেই, তবে এর কারণ দু'টো হতে পারে। (১) হয়তো এ দিনটি ايام حج তথা হজ্জের দিনগুলোর অন্তর্ভুক্ত নয়। তাহলে তো তাশরীকের দিনগুলো ايام حج (হজ্জের দিনসমূহের) অন্তর্ভুক্ত না হওয়া আরো সুস্পষ্ট, কেননা, হজ্জের দিনগুলো এ বছর যেহেতু অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে, তাই এরপর পরবর্তী বছরের পূর্ব পর্যন্ত এ দিন আর কখনো ফিরে আসবে না, (২) অথবা এ দিনটি ঈদের দিন তাই, এ দিন রোযা রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। তাহলে তো এর পরবর্তী তাশরীকের দিনগুলোও এর মতই, কেননা এগুলোও ঈদের দিন, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যেমন কুরবানীর দিনে রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন, এমনিভাবে তিনি এ দিনগুলোতে ও রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। কাজেই, আরাফাতের দিনটি অতিবাহিত হবার সাথে সাথে যেহেতু এ তিনটি রোযার সময়ও অতিবাহিত হয়ে যায়। তাই আরাফাত দিবসের পর হজ্জের সময়ের ভেতর রোযা রাখার আর কোন বিকল্প পথ নেই। কেননা আল্লাহ্ পাক হজ্জের সময় এ তিনটি রোযা রাখার

শর্ত আরোপ করেছেন। তাই এহেন অবস্থায় পতিত ব্যক্তির বেলায় তামাত্তু হজ্জ করার কারণে আল্লাহ্‌র নির্দেশিত কুরবানী করা ছাড়া আর অন্য কিছুর দ্বারা কাফ্‌ফারা আদায় করা জায়েয নেই।

"যারা হজ্জের সময় এ তিন দিন রোযা রাখার সময়সূচী সম্পর্কে বলেন যে, এ দিনগুলোর শেষ সময় হলো, ايام منى তথা মিনার দিনগুলোর শেষ দিনটি।" তাঁরা নিজেদের এ মতামতের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করে বলেন যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা হজ্জে তামাত্তু আদায়কারী ব্যক্তির উপর সহজ লভ্য কুরবানী দেয়াকে ওয়াজিব করেছেন। যদি সে কুরবানী করতে সক্ষম না হয় তাহলে তাকে রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, কুরবানী করা কুরবানীর দিনেই ওয়াজিব। যদিও কুরবানীর দিনের পূর্বে কুরবানীর পশু মিলে যায়। সুতরাং যে দিন তার উপর কুরবানী ওয়াজিব হয়েছে এ দিন যদি সে কুরবানীর পশু না পায়, তাহলে এ দিনই সে রোযা রাখার অনুমতি পেতে পারে। আমরা সকলই এ কথা জানি যে, কুরবানীর দিনেই কুরবানী করা ওয়াজিব। এর পূর্বে কুরবানী করা জায়েয নেই, তবে কুরবানীর দিনের পরবর্তী দিন দু'টিও আইয়্যামে নাহারেরই অন্তর্ভুক্ত। কুরবানী যেহেতু কুরবানীর দিনেই ওয়াজিব, এর পূর্বে নয়, তাই রোযাও কুরবানীর দিনেই ওয়াজিব হবে। তাঁর কুরবানীর পশু না পাওয়ার সময়টি হলো এর যথাযথ সময়, তাই এসময়ই তাঁর উপর রোযা ওয়াজিব হবে। তবে এ রোযা কুরবানীর দ্বিতীয় দিন থেকে আরম্ভ হবে, কারণ দশ তারিখ সূর্যাস্তের পর হতেই কুরবানী করা জায়েয। এরপর যদি সে কুরবানীর পশু না পায়, তাহলে রোযা রাখবে। কিন্তু দশ তারিখ সুব্‌হে সাদিকের পর সে যেহেতু রোযাদার নয় এবং এর পূর্বে যেহেতু সে রোযা রাখার নিয়্যত করেনি, তাই এ দিনে তার পক্ষে রোযা রাখা সম্ভব নয়। কারণ দিনের কিছু অংশে কখনো রোযা হয় না। তাই বুঝা যায় যে, কুরবানীর দ্বিতীয় দিন থেকে আইয়্যামে তাশরীক পর্যন্ত সময়ের মধ্যে-ই রোযা রাখা তাঁর উপর ওয়াজিব "মিনার দিনগুলো হজ্জের দিনগুলোর অন্তর্ভুক্ত নয়" বলে যারা যুক্তি দেখান, তাদের বক্তব্য ঠিক নয়। কেননা, এ দিনগুলোতেও হাজী সাহেব হজ্জের মৌলিক আমল হতে অতিরিক্ত তাওয়াফ এবং কংকর মেরে হজ্জের অনুষ্ঠানাদি পালন করেন, যেমনিভাবে তিনি এর পূর্ববর্তী দিনগুলোতে এসব ব্যতীত হজ্জের মৌলিক আমল থেকে অতিরিক্ত কাজ ও আঞ্জাম দিয়ে থাকেন। উক্ত মুফাস্‌সীরগণের দলীল নিম্নে বর্ণিত হল।

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, হজ্জে তামাত্তু আদায়কারী ব্যক্তি যদি কুরবানীর পশু না পায় এবং যদি সে রোযা না রাখে, আর এমনিভাবে চলে যায় যিলহাজ্জ-এর প্রথম দশক, এ ধরনের ব্যক্তির জন্য এ রোযার বিনিময়ে আইয়্যামে তাশরীকের মধ্যে রোযা রাখার জন্য হযরত রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) অনুমতি দিয়েছেন। আমাদের অভিমতের বিশুদ্ধতা স্পষ্ট হয় এবং আমাদের বিপক্ষীয় লোকদের অভিমতের বিভ্রান্তি এর দ্বারা প্রতিভাত হয়।

ইমাম যুহরী (র.) থেকে বর্ণিত, একবার হযরত রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে হুযায়ফা ইবনে কায়স (রা.)-কে প্রতিনিধি করে মক্কা মুকাররমাতে পাঠালেন। তিনি আইয়্যামে তাশরীকের সময় এ মর্মে আহবান জানাতে লাগালেন যে, এ দিনগুলো হল পানাহার এবং আল্লাহ্‌র

যিকরের দিন। তবে যদি কারো উপর কুরবানীর বিনিময়ে রোযা অপরিহার্য থাকে, তাহলে সে রোযা রাখতে পারবে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, হজ্জে তামাত্তু আদায়কারী ব্যক্তির উপর যে তিনটি রোযা রাখা ওয়াজিব, এর শুরু কোন্ দিন থেকে হবে এ সম্বন্ধে আলিমগণের একাধিক মত রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, হজ্জের মাসগুলোর শুরু হতেই রোযা রাখা জায়েয। এ মতের সমর্থনে আলোচনা ঃ

হযরত মুজাহিদ (র.) এবং তাউস (র.) থেকে বর্ণিত, তাঁরা উভয়েই বলতেন, হজ্জের মাসগুলোতে যদি কেউ এ রোযাগুলো রেখে নেয় তাহলেই যথেষ্ট। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত মুজাহিদ (র.) একথাও বলেছেন যে, তামাত্তু হজ্জকারী যদি কুরবানী করার পশু না পায় তাহলে সে যিলহাজ্জ–এর প্রথম দশকের মধ্যে আরাফাতের পূর্ব পর্যন্ত এ রোযা রেখে নিবে। যখনই রাখবে জায়েয। যদি কোন ব্যক্তি শাওয়াল অথবা যিলকাদ মাসে রোযা রাখে তাহলেও যথেষ্ট হবে।

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যদি কেউ শাওয়াল একদিন, যিলকাদে একদিন এবং যিলহাজ্জে একদিন রোযা রাখে তাহলেও জায়েয আছে। এগুলোই তামাত্তুর রোযার জন্য যথেষ্ট।

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে অন্য সূত্রে বর্ণিত, তামাত্তু হজ্জ আদায়কারী ইচ্ছা করলে শাওয়ালের প্রথম দিন থেকেই রোযা রাখতে পারবে।

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে আল্লাহ্র বাণী– فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত, তামাত্তু হজ্জ আদায়কারী ইচ্ছা করলে এ রোযাগুলো যিলহাজ্জ–এর প্রথম দশকে রাখতে পারেন, ইচ্ছা করলে যিলকাদ মাসে রাখতে পারেন এবং ইচ্ছা করলে শাওয়ালেও রাখতে পারেন।

অন্যান্য মুফাসসীরগণ বলেছেন, তামাত্তু হজ্জ আদায়কারী এ তিনটি রোযা যিলহাজ্জ–এর প্রথম দশকের মধ্যে রাখবে। এছাড়া অন্য সময়ের মধ্যে রাখা তার জন্য জায়েয নেই। তারা নিম্নের রিওয়ায়েতগুলোকে প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করেছেন।

হযরত আতা (র.) থেকে বর্ণিত, তামাত্তু হজ্জ আদায়কারী যিলহাজ্জ–এর প্রথম দশকের আরাফাত দিবস পর্যন্ত সময়ের মধ্যে এ তিনটি রোযা রাখবে।

হযরত আতা ইবনে আবূ রাবাহ্ (র.) থেকে বর্ণিত, যিলহাজ্জ–এর প্রথম দিন থেকে নিয়ে আরাফাতের দিন পর্যন্ত সময়ের মধ্যে যে ব্যক্তি এ তিনটি রোযা রাখতে সক্ষম হবে সে রোযা রেখে নিবে।

হযরত আতা (র.) থেকে বর্ণিত, যিলহাজ্জ–এর প্রথম দশকের মধ্যে হালাল অবস্থায় হজ্জ তামাত্তু আদায়কারী ব্যক্তির জন্য রোযা রাখার মধ্যে কোন অসুবিধা নেই।

হযরত আবূ জা'ফর (র.) থেকে বর্ণিত, এ রোযাগুলো যিলহাজ্জ–এর প্রথম দশকেই রাখবে।

হযরত আতা (র.) থেকে বর্ণিত, হজ্জের সময় তিনদিন রোযা রাখা, যিলহাজ্জ–এর প্রথম নয় দিনের যে কোন দিনেই রাখা জায়েয আছে। যদি কেউ এসময়ের পূর্বে শাওয়াল এবং যিলকাদ মাসে রোযা রাখে, তাহলে তার রোযা না রাখার সমতুল্য।

অপর কয়েকজন তাফসীরকারগণ বলেছেন, তামাত্তু' হজ্জ আদায়কারীর জন্য হজ্জের ইহ্‌রাম বাধার আগেও এ রোযাগুলো রাখা বৈধ। তারা নিম্নের বর্ণনাসমূহকে প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

হযরত ইকরামা (রা.) থেকে বর্ণিত, যদি কেউ মক্কা মুকাররমাতে রোযা রাখতে পারবে না বলে আশংকাবোধ করে তাহলে সে পথে একদিন অথবা দু'দিন রোযা রাখবে।

হযরত আতা (র.) থেকে বর্ণিত, হালাল অবস্থায় হজ্জে তামাত্তুর মধ্যে তিনদিন রোযা রাখতে কোন অসুবিধা নেই।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন, এ তিনটি রোযা হজ্জের ইহ্‌রাম বাধার পরই রাখতে হবে। এর আগে রাখা জায়েয নেই। দলীলস্বরূপ নিম্নের রিওয়ায়েত ক'টি তারা উল্লেখ করেছেন।

হযরত ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, এ রোযা তিনটি (হজ্জের) ইহ্‌রামের অবস্থায়ই রাখতে হবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, হজ্জে তামাত্তু আদায়কারী ব্যক্তির এ রোযা তিনটি ইহ্‌রাম বাঁধার পর থেকে নিয়ে আরাফাত দিবস পর্যন্ত সময়ের মধ্যে রাখতে হবে।

হযরত ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, হজ্জে তামাত্তু' আদায়কারী ব্যক্তির এ রোযা তিনটি ইহ্‌রামের অবস্থা ছাড়া অন্য অবস্থায় রাখা জায়েয নেই। হযরত মুজাহিদ (র.) বলেছেন, এ রোযা তিনটি যিলকাদ মাসে রাখলে যথেষ্ট হবে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী বলেন, এ সম্বন্ধে আমার নিকট বিশুদ্ধতম ব্যাখ্যা এই যে, হজ্জে তামাত্তু আদায়কারী যদি কুরবানী করার মত কোন পশু না পায় তাহলে তার উপর এ তিনটি রোযা আদায় করা অপরিহার্য। পরে হালাল হয়ে ফায়দা হাসিল করে হজ্জে ইহ্‌রাম বাধবে। তারপর হজ্জের সর্বশেষে আমলটি সম্পন্ন করার পর্যন্ত সুযোগ থাকবে। মিনার দিনগুলো শেষ হবার পরই হজ্জের সর্বশেষ আমলের সময়ও অতিবাহিত হয়ে যায়। তবে এ দিনটি কুরবানীর দিন ব্যতীত হতে হবে। কেননা এদিনে রোযা রাখা জায়েয নয়। চাই সে এর পূর্বে এ রোযা তিনটি রাখতে আরম্ভ করুক অথবা না করুক। তবে আরাফার দিন অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত এই রোযাকে বিলম্বিত করতে পারবে।

আইয়্যামে তাশরীকের মধ্যে কেন রোযা রাখার কথা বললাম, এর কারণ আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। কোন ব্যক্তি যদি হজ্জের ইহ্‌রাম বাধার আগে এ রোযাগুলো রাখে তা হলে হজ্জে তামাত্তুর মধ্যে পশু কুরবানী করতে অক্ষম হবার কারণে যে রোযা ওয়াজিব হয় তা কখনো আদায় হবে না। কারণ আল্লাহ্ পাক পশু কুরবানী করতে অক্ষম ব্যক্তির উপর এ রোযা ওয়াজিব করেছেন। 'উমরা আদায়কারী ব্যক্তি 'উমরার ইহ্‌রাম হতে হালাল হওয়ার পূর্বে এবং হজ্জব্রত পালন করা শুরু করার পূর্বে "হজ্জে তামাত্তু' আদায়কারী" হিসাবে আখ্যায়িত হতে পারে না। তবে এসময় তাকে معتمر

('উমরা আদায়কারী) বলা হবে। হাঁ যদি সে হজ্জের মাসগুলোতে 'উমরা আদায় করে হালাল অবস্থায় মক্কা অবস্থান করে এবং পরে হজ্জের ইহ্‌রাম বেধে এ বছরই হজ্জব্রত পালন করে তাহলে তাকে متمتع (হজ্জে তামাত্তু আদায়কারী) বলা হবে। হজ্জে তামাত্তু আদায়কারী নামে আখ্যায়িত হবার পরই তাঁর উপর পশু কুরবানী করা ওয়াজিব হয়। সুতরাং হাদ্‌য়ী না পেলে–এ সময়ই তাঁর উপর সিয়াম সাধনা ওয়াজিব হবে। হজ্জের নিয়্যত থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ হজ্জের ইহ্‌রাম বাধার পূর্বে এ রোযা রাখতে আরম্ভ করে তাহলে সে ঐ ব্যক্তির মত হল, যে এমন আমলের কাযার উদ্দেশ্যে রোযা রাখল যা তাঁর উপর অপরিহার্য হতে পারে এবং নাও হতে পারে। আর তার অবস্থা এ বিত্তহীন ব্যক্তির অবস্থার মত যে কসমের কাফ্‌ফারার উদ্দেশ্যে তিনদিন রোযা রাখল, অথচ এখনো সে কসম খায়নি বরং কসম খাওয়া ইচ্ছা করছে এবং পরে কসম ভেংগে ফেলবে বলেও প্রয়াস রাখছে। অথচ এ বিষয়ে আলিমদের কারো মতভেদ নেই যে, এ রোযা রাখার পর কসম খেয়ে তা ভেংগে ফেললে এ রোযা উক্ত কসমের কাফ্‌ফারা হিসাবে যথেষ্ট নয়।

যদি কেউ ধারণা করেন যে, 'উমরা আদায়কারী ব্যক্তি 'উমরা থেকে হালাল হবার পর কিংবা 'উমরা থেকে হালাল হওয়া এবং হজ্জ শুরু করার পূর্বে যদি রোযা রাখে তাহলে হজ্জে তামাত্তুর'–এর ওয়াজিব রোযা আদায় হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে এ কথাটি কসম খাওয়ার পর কসম ভাংগার পূর্বে কাফ্‌ফারা দেয়া জায়েয বলার মতই একথাটি একেবারেই ভুল। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা কসমের থেকে মুক্ত হওয়ার ব্যবস্থা রেখেছেন। কাজেই, শপথকারী শপথ ভাংগার শুধু ইচ্ছা করেই কাফ্‌ফারা দিয়ে দিলো ঐ ব্যক্তির ন্যায় কসম করে কসম ভঙ্গ করার আগেই কাফ্‌ফারা দিয়ে দিলো। যদি হজ্জে তামাত্তুর আগে রোযা রাখে তাহলে সে ভবিষ্যতে ওয়াজিব হবে এমন বিষয়ের কাফ্‌ফারাস্বরূপ রোযা রাখতে পারবে। তামাত্তু হজ্জ আদায়কারীর বিষয়টি ঐ ব্যক্তির মত হল যিনি ইহ্‌রাম অবস্থায় জীব হত্যা করা এবং সুগন্ধি ব্যবহার করার কাফ্‌ফারা দিয়ে দেন, অথচ তিনি এখনো জীব হত্যা করেননি এবং সুগন্ধি ব্যবহার করেননি। কেবল ইচ্ছা পোষণ করছেন মাত্র। সুতরাং তামাত্তু হজ্জ আদায়কারীকে কসমকারী ব্যক্তির উপর কিয়াস করা ঠিক নয়।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, হজ্জের ইহ্‌রাম বাধার পূর্বে উমরাকারীর জন্য রোযা রাখাকে যারা জায়েয মনে করেন, তাদের কেউ যদি আমাদের এ কথাকে অস্বীকার করেন, তাহলে তাকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, ঐ ইহ্‌রামকারী ব্যক্তিদের সম্পর্কে তোমার কি রায় ? যারা কংকর নিক্ষেপ করার ওয়াজিব বিষয়টিকে সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে আরাফাতের দিনে কাফ্‌ফারা দিয়ে দেয়। তারপর মিনার দিনগুলোতে মিনায় অবস্থান করে। কিন্তু কংকর নিক্ষেপ করেনি। এমনিভাবে কংকর নিক্ষেপ করার সুযোগটি তাদের থেকে সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তাদের আদায়কৃত কাফ্‌ফারা দ্বারা তাদের প্রতি ওয়াজিব কাফ্‌ফারা আদায় হবে কি ? জবাবে যদি সে বলে যথেষ্ট হবে, তাহলে হজ্জের যে সব অনুষ্ঠানাদি বিনষ্ট করলে আল্লাহ্ তা'আলা কাফ্‌ফারা ওয়াজিব করেন, কিংবা যে সব কর্মের ফলে আল্লাহ্ পাক কাফ্‌ফারা ওয়াজিব করেন, এসমস্ত

অনুষ্ঠানাদির মধ্যে এর উদাহরণ পেশ করার জন্য তাকে বলা হবে। যদি সে এ সমস্ত বিষয়ে একই ধরনের কথা বলে, তবে তো সে তার কথাকে জটিল বানিয়ে–ফেলল। তারপর তাকে পুনরায় একটি প্রশ্ন করা হবে যে, যদি কোন সুস্থ মুকীম ব্যক্তি রমযান মাসে স্ত্রী সহবাস করার ইচ্ছা রাখে এবং রমযানের পূর্বে কাফ্ফারা দিয়ে দেয়, অবশেষে রমযান আসলে পূর্ব সংকল্প অনুসারে স্ত্রী সহবাস করে, তাহলে কি পূর্ব প্রদত্ত কাফ্ফারা এ সহবাসের কাফ্ফারার জন্য যথেষ্ট হবে ? এমনিভাবে তাকে আরো একটি প্রশ্ন করা হবে যে, যদি কোন ব্যক্তি তাঁর স্ত্রীর সাথে যিহার করার ইচ্ছা করে, যিহারের পূর্বে কাফ্ফারা দিয়ে দেয়, (তাহলে) এবং পরে যিহার করে তাহলে কি পূর্বের দেয়া কাফ্ফারা এ যিহারের কাফ্ফারর জন্য যথেষ্ট হবে ? যদি সে একথাকে প্রমাণ করে তাহলে সে মুসলিম উম্মাহ্র সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত থেকে বহিষ্কৃত হয়ে গেল। আর যদি অস্বীকার করে তাহলে তাকে যিহারের কাফ্ফারা এবং হজ্জে তামাত্তুর রোযার মধ্যে পার্থক্য করণের কারণ জিজ্ঞেস করা হবে। অবশ্য সে এ ব্যাপারে কোন জবাবদিহী করতে পারবে না। মহান আল্লাহ্র বাণী– وَ سَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ এর ব্যাখ্যাঃ যদি কোন ব্যক্তি সহজলভ্য কুরবানীর পশু না পায় তবে সে হজ্জের সময় তিন দিন এবং গৃহ প্রত্যাবর্তনের পর সাত দিন রোযা রাখবে। যদি কেউ আমাদেরকে প্রশ্ন করেন যে, গৃহ প্রত্যাবর্তনের পরই কি এ রোযা ওয়াজিব, না কি হজ্জের সময় তিন দিন রোযা রাখার পর সাথে সাথে এ সাত তিন রোযা রাখাও ওয়াজিব ?

জবাবঃ সহজলভ্য কুরবানীর পশু না পাওয়ার ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তার বান্দার উপর দশদিন রোযা রাখাকে ওয়াজিব করেছেন। তবে আল্লাহ্ তা'আলা দয়াপরবশ হয়ে তার বান্দাদেকে এভাবে রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ যেমনিভাবে মুসাফির এবং অসুস্থ ব্যক্তির জন্য রমযান মাসে ইফতার করে পরবর্তী সময়ে এ পরিমাণ রোযা কাযা করার ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ অনুমতি দিয়েছেন। এমনিভাবে এ ক্ষেত্রেও ভেংগে ভেংগে রোযা রাখার ব্যাপারে আল্লাহ্ পাক অনুমতি দিয়েছেন। তারপরও তামাত্তু হজ্জ আদায়কারী যদি কষ্ট স্বীকার করে গৃহ প্রত্যাবর্তনের পূর্বে সফরের অবস্থায় অথবা মক্কা মুকাররমাতে অবস্থান কালে এ সাতটি রোযা রেখে নেয়, তাহলে সে অবশ্যই দায়িত্ব মুক্ত হয়ে যাবে এবং সে রমযান মাসে সফর অথবা রুগ্ন অবস্থায় স্বস্তির উপর কষ্টকে প্রাধান্যদানকারী রোযাদার ব্যক্তির মত বলে বিবেচিত হবে। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আমরা যে মতামত ব্যক্ত করেছি, আলিমগণ এ কথাই বর্ণনা করেছেন। মুফাস্সীরগণ তাদের এ মতের সমর্থনে নিম্নের বর্ণনাগুলো উল্লেখ করেছেন।

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত তিনি–و سبعة اذا رجعتم (গৃহ প্রত্যাবর্তনের পর সাত দিন) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, এ বিধান আমাদের জন্য সুযোগ (رخصت)। ইচ্ছা করলে কেউ এ সাতটি রোযা রাস্তায় ও রাখতে পারেন।

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে অন্য সূত্রে বর্ণিত –و سبعة اذا رجعتم এর ব্যাখ্যায় তিনি বর্ণনা করেন যে, এ বিধান হচ্ছে আমাদের জন্য সুযোগ (رخصت)। ইচ্ছা করলে এ সাতটি রোযা কেউ রাস্তায় ও রাখতে পারেন এবং গৃহ প্রত্যাবর্তনের পর বাড়ীতেও রাখতে পারেন।

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে আরেক সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

হযরত মানসূর (র.) থেকে–و سبعة اذا رجعتم এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত এ রোযাগুলো রাস্তায় ও রাখা যায়। এ বিধান নিশ্চয় আমাদের জন্য রুখসত (رخصت) বা সুযোগ।

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত, ইচ্ছা করলে তুমি এ সাতটি রোযা রাস্তায় রাখতে পার এবং ইচ্ছা করলে গৃহ প্রত্যাবর্তনের পর বাড়ীতে রাখতে পার।

হযরত আতা (র.) থেকে বর্ণিত, এ সাতটি রোযা গৃহ প্রাত্যাবর্তনের পর রাখাই আমার নিকট পসন্দনীয়।

হযরত ইব্রাহীম (র.) থেকে–و سبعة اذا رجعتم এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত এ সাতটি রোযা তুমি ইচ্ছা করলে রাস্তায় রাখতে পার এবং ইচ্ছা করলে বাড়ীতে গমন করেও রাখতে পার। "و سبعة اذا رجعتم এর অর্থ যে, যখন তোমরা গৃহ প্রত্যাবর্তন করবে এবং শহরে পদার্পণ করবে, এর অর্থ এ নয় যে, যখন তোমরা মিনা থেকে মক্কা মকাররমাতে প্রত্যাবর্তন করবে"। এ সম্পর্কে কেউ যদি আমাদেরকে প্রশ্ন করেন যে, এ বিষয় আপনাদের দলীল কি ? তাহলে উত্তরে বলা হবে সমস্ত আলিমগণ এ ব্যাপারে এক মত যে, এর ব্যাখ্যা তাই যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, অন্য কোন ব্যাখ্যা নয়। উপরোক্ত তাফসীরকারগণের মধ্যে কয়েকজনের বক্তব্যঃ

হযরত আতা (র.) থেকে মহান আল্লাহ্র বাণী–و سبعة اذا رجعتم এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত, যখন তুমি তোমার গৃহে প্রত্যাবর্তন করবে।

হযরত কাতাদা (র.) থেকে মহান আল্লাহ্র বাণী–و سبعة اذا رجعتم এর ব্যাখ্যায় اذا رجعتم الى امصاركم (যখন তোমরা তোমাদের শহরে প্রত্যাবর্তন করবে) বর্ণনা করেছেন।

হযরত রবী (র.) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়র (রা.) থেকে–و سبعة اذا رجعتم এর ব্যাখ্যায় الى اهلك (তোমাদের পরিবারের নিকট) বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ্ পাকের বাণী–تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ এর ব্যাখ্যা ঃ كَامِلَةٌ শব্দের ব্যাখ্যায় আলিমগণ একাধিক মত পোষণ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ হচ্ছে, হজ্জের সময় তিন দিন এবং গৃহ প্রত্যাবর্তনের পর সাত দিন, এ দশদিন রোযা কুরাবানীর চেয়েও পরিপূর্ণ কাজ।

যারা এ মত পোষণ করেন ঃ

হযরত হাসান (র.) থেকে আল্লাহ্র বাণী- تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন- كاملة من الهدى অর্থাৎ কুরবানীর চেয়েও পূর্ণাঙ্গ আমল।

হযরত হাসান থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

কোন কোন তাফসীরকারগণ বলেছেন, আয়াতাংশের ব্যাখ্যা হচ্ছে, যারা হালাল না হয়ে ইহ্রাম অবস্থায় রয়ে গেছে এবং তোমাদের তামাত্তু হজ্জ পালন করেনি। তাদের তুলনায় তোমাদের সওয়াব হবে পূর্ণাঙ্গ। অপর একদল তাফসীরকার বলেছেন, আয়াতটি যদিও বাহ্যিকভাবে খবরের মত বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা খবর নয়, বরং এ হচ্ছে –انشاء অর্থাৎ تلك عشرة كاملة এর অর্থ হচ্ছে এ দশটি দিন তোমরা পূর্ণাঙ্গভাবে রোযা রাখ। এর থেকে আর কমাতে পারবে না, কারণ এ রোযাগুলো তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে।

অপর এক জামা'আত তাফসীরকার বলেছেন, كَامِلَةٌ শব্দটি এখানে বাক্যের তাকীদ হিসাবেই ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আরবীতে বলা হয় যে-سمعته باذنى و رايته بعينى অর্থাৎ তা আমি আমার দুই কানে শুনেছি এবং দুই চোখে দেখেছি। এবং যেমন আল-কুরআনে বর্ণিত আছে যে-فخر عليهم السقف من فوقهم অর্থাৎ উপর দিক থেকে তাদের উপর ছাঁদ ধসে পড়ল। আমরা জানি ছাঁদ উপরের দিক থেকেই পড়ে। অন্য কোন দিক থেকে নয়। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, এখানে من فوقهم শব্দটি তাকীদ হিসাবেই ব্যবহৃত হয়েছে। এমনিভাবে অন্য জায়গায়ও এ প্রক্রিয়া প্রযোজ্য হতে পারে। যেমন আলোচ্য আয়াতাংশে হয়েছে।

কোন কোন তাফসীরকার বলেছেন, سبعة (সাত দিন) এবং ثلثة (তিন দিন) বলার পর পুনরায় تلك عشرة كاملة বলার কারণ হচ্ছে এই যে, এখানে আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেন যে এ রোযাগুলো কাফ্ফারাস্বরূপ। প্রকৃতপক্ষে এর সংখ্যা বর্ণনা করা মহান আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে নয়। তাই তো كاملة শব্দটি এখানে وافية অর্থ ব্যবহৃত হয়েছে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ সবের মধ্যে উত্তম ব্যাখ্যা যারা বলেন- تلك عشرة كاملة এর অর্থ , "এ রোযাগুলো পূর্ণ করা আমি তোমাদের উপর ফরয করেছি," কেননা আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, যদি কেউ কুরবানীর পশু না পায়, তাহলে সে হজ্জের সময় তিন দিন এবং বাড়ী ফিরার পর সাত দিন রোযা পালন করবে। তারপর তিনি ইরশাদ করেছেন, হজ্জের সময় 'উমরা আদায় করার সুবিধা ভোগ করার কারণে তোমাদের উপর এ দশ দিন পূর্ণ রোযা রাখা অপরিহার্য।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী– ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ এর ব্যাখ্যা ঃ তামাত্তু হজ্জের মাধ্যমে 'উমরা আদায় দ্বারা লাভবান হওয়া তাদের জন্য, যাদের পরিজনবর্গ মাসজিদুল হারামের বাসিন্দা নয়, যেমন বর্ণিত আছে যে,

হযরত রবী' (র.) থেকে–ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত, হজ্জে তামাত্তু' মক্কা শরীফের বাইরের লোকদের জন্য বৈধ করা হয়েছে। ওখানকার স্থানীয় লোকদের জন্য হজ্জে তামাত্তু বৈধ নয়।

হযরত সূদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এ বিধান মক্কা শরীফের বাইরের লোকদের জন্য। যাতে তারা একবার হজ্জ এবং একবার 'উমরা আদায় করার জটিলতা থেকে মুক্ত হতে একই বছর হজ্জ এবং 'উমরা সহজভাবে করে নিতে পারেন।

মক্কা মুকাররমার হারাম শরীফের বাসিন্দাদের জন্য হজ্জে তামাত্তু' জায়েয নেই। এ ব্যাপারে ইজমা সংগঠিত হওয়া সত্ত্বেও–ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ বলে কাদেরকে বুঝানো হয়েছে এ বিষয়ে মুফাস্‌সীরগণের একাধিক অভিমত রয়েছে।

কেউ কেউ বলেছেন, আয়াতাংশে বিশেষভাবে–اهل الحرام (হারামের আধিবাসী)–কেউই বুঝানো হয়েছে , অন্য লোকদেরকে নয়। তাঁরা নিজেদের সমর্থনে নিম্নের বর্ণনাগুলো উল্লেখ করেছেন।

হযরত সুফইয়ান (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, হযরত ইবনে আববাস (রা.) এবং মুজাহিদ উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় হারামের অধিবাসীদের কথাই উল্লেখ করেছেন।

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে–ذالك لمن لم يكن اهله حاضرى المسجد الحرام এর ব্যাখ্যায় হারামের অধিবাসীদের কথা বর্ণনা করেছেন।

হযরত ইবনে আববাস (রা.) থেকে মহান আল্লাহ্‌র বাণী–حاضرى المسجد الحرام এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত, তারা হারামের অধিবাসী। আলিমগণের এক জমাআতও এ মতই পোষণ করেন।

হযরত কাতাদা থেকে–ذالك لمن لم يكن اهله حاضرى المسجد الحرام এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত হযরত ইবনে আববাস (রা.)বলতেন, হে মক্কাবাসী! তোমরা হজ্জে তামাত্তু করতে পারবে না। হজ্জে তামাত্তু' হারামের দূরবর্তী লোকদের জন্য বৈধ করা হয়েছে এবং তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে। তোমাদেরকে তো সামান্য দূরে যেতে হয়, অল্প দূরে গিয়েই তোমরা 'উমরার ইহ্‌রাম বেধে থাক।

হযরত ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সাঈদ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত, মক্কাবাসী লোকেরা লড়াই করতেন, ব্যবসা করতেন, তারপর হজ্জের মাসে মক্কা শরীফে আগমন করতেন এবং হজ্জব্রত পালন করতেন, কুরবানী এবং রোযা কিছুই তাদের উপর ওয়াজিব ছিল। উপরোক্ত আয়াতের বিধানানুযায়ী তাদেরকে ব্যাপারে (رخصت) বিশেষ সুযোগ দেয়া হয়েছে।

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, উপরোক্ত আয়াতে হারামের অধিবাসিগণকেই বুঝানো হয়েছে। হযরত তাউস (র.) থেকে বর্ণিত, হজ্জের তামাত্তু' সমস্ত মানুষের জন্য বৈধ। তবে মক্কা শরীফের অধিবাসী যাদের পরিজনবর্গ হারামের অধিবাসী নয়, তাদের বিধান স্বতন্ত্র। কেননা আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছে- **لمن لم يكن اهله حاضرى المسجد الحرام** অর্থাৎ এ বিধান তাদের জন্য যাদের পরিজনবর্গ মাসজিদুল হারামের অধিবাসী নয়। হযরত ইবনে আববাস (রা.) তাউসের মত বর্ণনা করেছেন।

অন্যান্য কয়েকজন তাফসীরকার বলেছেন, উপরোক্ত আয়াতে হারামের অধিবাসী এবং মীকাতের মধ্যে অবস্থানকারী উভয় প্রকার লোকদের জন্যই এ নির্দেশ রয়েছে।

উপরোক্ত বক্তব্যের সমর্থনে আলোচনা ঃ

হযরত মাকহুল (র.) থেকে-**ذالك لمن لم يكن اهله حاضرى المسجد الحرام** এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত এ আয়াতে মীকাতের মধ্যে অবস্থানকারী লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে।

হযরত ইবনে মুবারক (র.) থেকে বর্ণিত, মীকতের মধ্যে মক্কা শরীফের দিকে অবস্থানকারী লোকদের জন্যও এই নির্দেশ রয়েছে।

হযরত আ্তা (র.) থেকে বর্ণিত, যাদের পরিজনবর্গ মীকাতের মধ্যে বসবাস করে তারও মক্কাবাসীদের মত, তাদের জন্য হজ্জে তামত্তু 'জায়েয নেই।

কোন কোন তাফসীরকার বলেছেন, হারামের বাসিন্দা এবং যাদের বাড়ী ঘর হারামের কাছাকাছি তাদের জন্য ও এ নির্দেশ।

হযরত আ্তা (র.) থেকে আল্লাহ্র বাণী-**ذالك لمن لم يكن اهله حاضرى المسجد الحرام**-এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত আরাফাত, মার্র, 'আরনা, দিজনান এবং রজীর অধিবাসীদের জন্যও এ নির্দেশ।

ইমাম যুহরী (র.) থেকে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত, একটি দিন অথবা দুইটি দিন।

ইমাম যুহরী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলতেন, যদি কারো পরিজন এক দিনের দূরত্বে অবস্থান করে তাহলে সে হজ্জে তামাত্তু করবে।

হযরত 'আতা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আরাফাতের অধিাসীদেরকে মক্কা মুয়াজ্জমার অধিবাসীদের মধ্যে গণ্য করতেন।

হযরত ইবনে যায়দ (র.) থেকে মহান আল্লাহ্র বাণী-**ذالك لمن لم يكن اهله حاضرى المسجد الحرام** এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত, তিনি মককা মুকাররমা, ফেজ, যুতুওয়া-এর নিকটবর্তী স্থানসমূহকে মক্কা শরীফের মধ্যে গণ্য করতেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, উপরোল্লিখিত ব্যাখ্যাসমূহের মধ্যে ঐ ব্যক্তির ব্যাখ্যায় আমার নিকট সর্বাধিক উত্তম, যিনি বলেছেন, মাসজিদুল হারামের অধিবাসী ঐ সমস্ত মানুষই যারা

মাসজিদুল হারামের চারপাশে আছেন। অর্থাৎ যাদের বাড়ী মাসজিদুল হারাম থেকে এত নিকট অবস্থিত যে, মাসজিদুল হারামে আসলে তাদেকে নামায কসর করে আদায় করতে হয় না। কেননা, আরবী ভাষায় প্রত্যক্ষদর্শীকেই উপস্থিত বলে গণ্য করা হয়। বিষয়টি যেহেতু এমনই তাই নিজের দেশের বাইরে অবস্থানকারী মুসাফির ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাউকে غائب (অনুপস্থিত) বলে অভিহিত করা যায় না। হ্যাঁ মুসাফির যদি নিজের দেশ থেকে বের হয়ে এত দূরে চলে যায় যে, তাকে এখন নামায কসর করে আদায় করতে হয়, তাহলেই তাকে মুসাফির বলা যাবে। যার অবস্থা এমন নয়, তাকে মুসাফির বলা যাবে না। তাই যার বাড়ী মাসজিদুল হারাম থেকে এত দূরে নয় যে, তার উপর নামায কসর করে আদায় করা ওয়াজিব হতে পারে। তাহলে–তার সম্বন্ধে মাসজিদুল হারামের অধিবাসী নয় বলে মন্তব্য করা কোনক্রমেই সমীচীন নয়। কেননা, غائب (অনুপস্থিত)ঐ ব্যক্তি যার গুণাবলী আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। যারা হারাম শরীফের অধিবাসী তাদের জন্য হজ্জে তামাত্তু জায়েয নেই। কেননা, তামাত্তু বলা হয়, হজ্জের প্রাক্কালে 'উমরার ইহ্রাম থেকে হালাল হয়ে দেশ ও বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন না করে হারাম শরীফে অবস্থান করা এবং ফায়দা হাসিল করা। এরপর হজ্জের ইহ্রাম বেধে হজ্জব্রত পালন করা। 'উমরাকারী যদি হজ্জের মাসগুলোতে 'উমরা আদায় করে, হারাম শরীফ থেকে বের হয়ে বাড়ীতে চলে যায় এবং পরে নতুনভাবে হজ্জের ইহ্রাম আরম্ভ করে তাহলে তার তামাত্তু হজ্জে আদায়ের সুবিধা হওয়া বাতিল হয়ে গেল। কেননা, সে তার সুযোগের দ্বারা লাভবান হয়নি। মক্কা শরীফের অধিবাসী মাসজিদুল হারামের অধিবাসী। সুতরাং সে লাভবান হতে পারবে না। কারণ, 'উমরা কাযা করে যখন সে বাড়ীতে অবস্থান করে , তখন সে–বিদেশী লোকেরা যেমন হজ্জের প্রাক্কালে 'উমরা থেকে হালাল হওয়ার মাধ্যমে লাভবান হয় এমনিভাবে সে লাভবান হতে পারে না। তাই হজ্জে তামাত্তু তার জন্য বৈধ নয়।

মহান আল্লাহ্র বাণী–وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ এর ব্যাখ্যার ঃ মহান আল্লাহ্ তোমাদের উপর যে ফরয এবং ওয়াজিব অপরিহার্য করেছেন, তা পালনকরার মাধ্যমে তোমারা মহান আল্লাহ্কে ভয় কর। এ ব্যাপারে সীমালংঘন করার ক্ষেত্রে তোমরা সতকর্তা অবলম্বন কর। তা না হলে তোমরা হারামকে হালাল মনে করতে থাকবে। পাপে লিপ্ত এবং অবাধ্য ব্যক্তিকে শাস্তিদানে মহান আল্লাহ্ অত্যন্ত কঠোর। এ কথাটি তোমরা দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস কর।

মহান আল্লাহ্র বাণী–

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوْقَ وَ لاَ جِدَالَ فِى الْحَجِّ وَ مَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ – وَ تَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى– وَاتَّقُوْنِ يَا اُوْلِى الْاَلْبَابِ –

অর্থ ঃ "হজ্জ হয় সুবিদিত মাসসমূহে। তারপর যে কেউ এ মাসগুলোতে হজ্জ করা স্থির করে, তার জন্য হজ্জের সময়ে স্ত্রী-সম্ভোগ, অন্যায় আচরণ ও কলহ-বিবাদ বৈধ নয়। তোমরা উত্তম কাজের যা কিছু করো, আল্লাহ্ তা জানেন এবং তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা করিও, আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়। হে বোধসম্পন্ন সম্প্রদায় ! তোমরা আমাকে ভয় করো।" (সূরা বাকারা ঃ ১৯৭)

الحج اشهر معلومات এর ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ একাধিক মত পোষণ করেন। কেউ কেউ বলেছেন, **اشهر معلومات** (জানাশোনা মাসগুলো হলো, শাওয়াল, যিলকাদ এবং যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

হযরত আবদুল্লাহ্ থেকে- **الحج اشهر معلومات** এর ব্যাখ্যায় শাওয়াল যিলকাদ এবং যিলহাজ্জ-এর প্রথম দশ দিনের কথা বর্ণিত হয়েছে।

হযরত ইবনে আববাস (রা.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

হযরত ইবনে আববাস (রা.) থেকে অন্যসূত্রে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

হযরত ইবনে আববাস (রা.) থেকে আরেকসূত্রে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

হযরত ইবনে আববাস (রা.) থেকে আল্লাহ্র বাণী- **الحج اشهر معلومات** এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত, হজ্জের মাসগুলো শাওয়াল, যিলকাদ ও যিলহাজ্জ-এর প্রথম দশ দিন। এ মাসগুলোকে আল্লাহ্ তা'আলা হজ্জের জন্য নির্ধারণ করেছেন এবং বাকী মাসগুলোকে নির্ধারিত করেছেন 'উমরার জন্য। সুতরাং এ মাসগুলোর পূর্বে কারো জন্য ইহ্রাম বাধা ঠিক নয়। তবে 'উমরার ইহ্রাম বাধা চলবে। হযরত ইবনে আববাস (রা.) থেকে মহান আল্লাহর বাণী- **الحج اشهر معلومات** এর ব্যাখ্যায় শাওয়াল, যিলকাদ এবং যিলহাজ্জ-এর কথা উল্লেখ করেছেন।

হযরত হাসান ইবনে ইয়াহ্ইয়া (র.) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবরাহীম (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইব্রাহীম, আমির, সূদ্দী ও মুজাহিদ থেকেও বিভিন্ন সূত্র থেকে অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে।

আতা ও মুজাহিদ (র.) থেকে অপর একসূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। ইবনে উমার (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, শাওয়াল, যিলকাদ ও যিলহাজ্জ-এর প্রথম দশ দিন হজ্জের নির্ধারিত সময়। আহ্মাদ ইবনে হাসিম (র.)......ইবনে উমার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজ্জের সময় নির্ধারিত, তা শাওয়াল, যিলকাদ ও যিলহাজ্জের প্রথম দশ দিন।

যাহ্হাক (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, শাওয়াল, যিলকাদ ও যিলহাজ্জ-এর প্রথম দশ দিন হজ্জের সময়। হুসায়ন ইবনে আকীল আল খুরাসানী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যাহ্হাক ইবনে

মুযাহিম (র.)-কে অনুরূপ বলেত শুনেছি। আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় অন্যরা বলেন তা হল শাওয়াল, যিলকাদ ও পূর্ণ যিলহাজ্জ মাস।

যারা এ মত পোষণ করেন ঃ

ইবনে জুরায়জ বলেন-আমি এ প্রসঙ্গে নাফি (র.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আবদুল্লাহ্ (রা.) কি হজ্জের মাসসমূহের নাম উল্লেখ করেছেন ? উত্তরে তিনি বললেন হাঁ, তা হল-শাওয়াল, যিলকাদ ও যিলহাজ্জ মাস।

ইবনে জুরায়জ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাফি (র.)-কে বললাম, আপনি কি ইবনে উমার (রা.)- কে হজ্জের মাসসমূহের নামকরণ করতে শুনেছেন ? উত্তরে বললেন হাঁ, তা হল-শাওয়াল, জিলকাদ ও জিলাহজ্জ মাস।

ইবনে উমার (রা.) হতে বর্ণিত যে, হজ্জের সময় শাওয়াল, যিলকাদ ও যিলহাজ্জ মাস।

ইবনে জুরায়জ (র.) বর্ণনা করেছেন যে, আতা বলেন হজ্জের মাসসমূহ নির্ধারিত, তা হল শাওয়াল, যিলকাদ ও যিলহাজ্জ মাস। রবী (র.) হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত যে, হজ্জের মাসসমূহ নির্ধারিত, তা হল শাওয়াল, যিলকাদ ও যিলহাজ্জ মাস এবং কখনো কখনো যিলহাজ্জের প্রথম দশদিনও বলেছেন। মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তাঁর মতে হজ্জের মাসসমূহ নির্ধারিত, তা হল শাওয়াল, যিলকাদ ও যিলহাজ্জ মাস। তাউস (র.) তাঁর পিতা হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইবনে শিহাব (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজ্জের মাস শাওয়াল, যিলকাদ ও যিলহাজ্জ।

যদি কেউ প্রশ্ন উত্থাপন করে যে মিনায় অবস্থানের পর হজ্জের কার্যাবলীর পরিসমাপ্তি ঘটে, তাহলে উপরোক্ত বর্ণনার যৌক্তিকতা কোথাও ? উত্তরে বলা যায়। তুমি যা ধারণা করেছ অর্থ তা নয়। তাদের কথার অর্থ হল- হজ্জের সময় পূর্ণ তিন মাস। আর এগুলোই হজ্জের মাস, উমরার সময় নয়। কেননা উমরার সময় সারা বছর।

হযরত ইবনে উমার (রা.) বলেছেন যে, যদি হজ্জ ও উমরার মাসসমূহের পার্থক্য করতে চাও, তবে হজ্জের মাস ব্যাতিরেকে অন্য মাসসমূহ উমরার নিমিত্তে নির্দিষ্ট করো। তোমরা হজ্জ ও 'উমরা উল্লিখিত সময়ে সম্পন্ন করো।

তারিক ইবনে শিহাব (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্কে জিজ্ঞেস করলাম যে, কোন মহিলা হজ্জ করছে বা হজ্জের ইচ্ছা করেছে। সে কি হজ্জের সাথে 'উমরা সম্পাদনে সক্ষম ; জবাবে বললেন একমাত্র হজ্জের মাসসমূহেই তা প্রতীয়মান। আরো বললেন, আমাকে আইয়ুব (রা.) জানিয়েছে এ ধরনের হাদীস কায়েস ইবন মুসলিম, তারিক ইবনে শিহাব হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি এ প্রসংগে আবদুল্লাহ্কে ও প্রশ্ন করেছেন। ইয়াকব্ (র.)...ইবনে আউন (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন কাসিম ইবনে মুহাম্মদকে বলতে শুনেছি হজ্জের মাসসমূহ উমরা সম্পন্ন করল তা পরিপূর্ণ হয় না। তাকে মুহাররম মাসে 'উমরা প্রসংগে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন এ সময়ে 'উমরা করলে তা পূর্ণভাবে সম্পন হয়।

ইবনে আউন (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন কাসিম ইবনে মুহাম্মদকে হজ্জের মাসে 'উমরা প্রসংগে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন, তা উক্ত সময় পূর্ণভাবে সম্পন্ন হয় না।

ইবনে সীরীন (র.) হতে বর্ণিত, তিনি মুহররম মাসে 'উমরা সম্পন্ন করা মুস্তাহাব মনে করেন, হজ্জের মাসসমূহে তা পরিপূর্ণ হয় না। মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ইবনে উমার (রা.) হাকাম ইবনে আরাজ বা অন্যকে লক্ষ্য করে বলেছেন, আমাকে অনুসরণ করলে অপেক্ষা করো, মুহ্‌রিম নিয়্যত করতে আগ্রহী হলে "জাতইরক্" গিয়ে উমরার নিয়্যত করবে।

আবূ ইয়াকূব (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবনে উমার (রা.)-কে বলতে শুনেছি দশই জিলহাজ্জের মধ্যে উমরা সম্পন্নকারী অপেক্ষা আমার নিকট অধিক পসন্দনীয়। তারিক ইবনে শিহাব (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবনে মাসঊদ (রা.)-কে আমাদের জনৈকা মহিলা যিনি হজ্জের সাথে 'উমরা সম্পন্নেব্রতী, তার সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম; তিনি বললেন আল্লাহ্ তা'আলা একমাত্র হজ্জের মাসসমূহকে নির্ধারণ করেছেন, যা তার বাণী থেকে প্রমাণিত। হিশাম আল-কেতয়ী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মদ ইবনে সীরীনকে বলতে শুনেছি আলিমদের মধ্যে কেউ সংশয় পোষণ করেননি যে, উমরা হজ্জের মাসসমূহ অপেক্ষা অন্যান্য মাসসমূহে সম্পন্ন করা শ্রেয়। "ইসতিয়াব" গ্রন্থের লেখকগণ এ বিষয়ে ব্যাপক উপমার অবতারণা করেছেন। যা প্রমাণ করে 'উমরার মাসসমূহ ব্যতীত হজ্জের নিমিত্তে নির্ধারিত পূর্ণ তিন মাস। যে সব মাসে 'উমরার কার্য সম্পাদিত না হয়ে হজ্জের কার্য সম্পাদিত হয়। যদিও হজ্জের কার্যসমূহ ঐ সকল মাসে না হয়ে কিয়দংশে সম্পন্ন হয়। যারা শাওয়াল, যিলকাদ ও যিলহাজ্জের প্রথম দশ দিনে হজ্জের মাস ধারণা করেন। তাদের মতে "হজ্জের মাসসমূহ নির্ধারিত" যা আল্লাহ্ তা'আলার ইরশাদ দ্বারা প্রমাণিত যে, মানবকুলের জন্য হজ্জের সময় নির্দিষ্ট। উমরার সময় প্রসংগে অনুরূপ কোন ইরশাদ হয়নি। তারা বলেন, উমরার সময় পুরো বছর যা মহানবী (সা.)-এর উক্তি দ্বারা স্পষ্ট হয়েছে। যেহেতু তিনি হজ্জের মাসসমূহের কোন অংশে উমরা করেছেন। এরপর এর বিপরীত কোন সঠিক উক্তি তাঁর থেকে বর্ণিত হয়নি। তাঁরা বলেন, বস্তুত হজ্জের কার্য অনুষ্ঠিত হয় যিলহজ্জের প্রথম দশ দিনে। অবহিত হওয়া গেলে আল্লাহ্ তা'আলার ইরশাদ-**الحج اشهر معلومات** দ্বারা হজ্জের মাসসমূহ নির্ধারিত যাতে হজ্জের মেয়াদকাল দু'মাস ও তৃতীয় মাসের কিয়দংশ নির্ধারিত করা হয়েছে। আমাদের নিকট এ বিষয়ে সঠিক ব্যাখ্যা হলো যে, পূর্ণ দু'মাস ও তৃতীয় মাসের প্রথম দশ দিন হজ্জের সময়। হজ্জের সময় প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে তা স্পষ্ট নির্দেশ।

মিনায় অবস্থানের পর হজ্জের কার্য অবশিষ্ট থাকে না। তাও স্পষ্ট হলো যে, তৃতীয় পূর্ণ মাস নির্ধারিত নয়, যদি তা নির্ধারিত নাই হয়, তবে যিলহাজ্জের প্রথম দশ দিন প্রবক্তাদের বর্ণনা সঠিক পূর্ণ দু'মাস ও তৃতীয় মাসের অংশবিশেষ হজ্জের সময় নির্ধারিত বলা কি রূপে ঠিক হলো? প্রত্যুত্তরে বলা যায়, সময়ের প্রসংগে এ ধরনের নির্ধারিত শব্দ ব্যবহার করা যায়। বলা হয় এক ও দু দিন, যা দ্বারা এক দিন ও দ্বিতীয় দিনের অংশে বিশেষ বুঝায়, যেমনি আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

فَمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ فَلَا اِثْمَ ....الاية "যিনি দু' দিনের মধ্যে শীঘ্র করেছেন তার জন্য তা পাপ নয়। যদিও তা সম্পন্ন করেছেন দেড় দিনে, কখনো কর্তা কোন কর্ম মুহূর্তে সম্পন্ন করেন, তারপর তা মাস বা বছরের কোন এক সময়ে প্রকাশ করেন। বলা হয় বছরের কোন এক দিন এসে তাঁর সাথে সাক্ষাত করেছি। তার উদ্দেশ্য এ নয় যে শেষ বর্ণনার দ্বারা তার সাক্ষাত বছরের প্রথমেই সম্পাদিত হয়েছে। বরং তিনি যে কোন সময় সাক্ষাৎ সম্পন্ন করেছেন। অনুরূপভাবে হজ্জের মাসসমূহ বর্ণিত, তা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পূর্ণ দু' মাস ও তৃতীয় মাসের অংশবিশেষ। আয়াতের অর্থ–হে মানব সম্প্রদায় হজ্জের সময় পূর্ণ দু' মাস ও তৃতীয় মাসের কিয়দংশ। তা শাওয়াল, যিলকাদ ও যিলহাজ্জের প্রথম দশ দিন। আল্লাহ্ পাকের বাণী–فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ অর্থ ঃ "তারপর যে কেউ এ মাসসমূহে হজ্জ করা স্থির করে", অর্থাৎ যিনি নিজের উপর হজ্জের নির্ধারিত, সময়ে তা সম্পন্ন অপরিহার্য করেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা হজ্জ করা মনস্থকারীর উপর যা অত্যাবশ্যক করেছেন তা সম্পন্ন ও যে সব কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন তা থেকে দৃঢ়ভাবে নিজকে বিরত রেখেছেন। কুরআন শরীফের ব্যাখ্যাদাতাগণ হজ্জ করা মনস্থকারী সম্পর্কে বিভিন্ন মতের অবতারণা করেছেন। অবশ্য ফরযের অর্থ প্রসংগে অধিকাংশের অভিমত যে তা অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য। অন্যদের মতে হজ্জের ফরয ইহ্রাম।

যারা এ মত পোষণ করেন ঃ

ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, "এরপর যে কেউ এ মাসসমূহে হজ্জ করা স্থির করে"। যিনি হজ্জের ইহরাম এ সময় ধারণ করেছেন,তা গ্রহণযোগ্য হবে। ইবনে অকী (র.) বলেন আমার পিতা অনুরূপ বর্ণনা দিয়েছেন। আতা (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজ্জে তালবীয়াহ্ (লাব্বায়কা......) বলা বাঞ্চনীয়। মিহরান (র.) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। সুফিয়ান সাওরী (রা.) হতে বর্ণিত যে, তিনি–فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ এর ব্যাখ্যায় বলেন– এতে ইহ্রাম অপরিহার্য এবং ইহ্রাম হলো তালবীয়াহ্। মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এর দ্বারা তালবীয়াহ্ অপরিহার্য। ইবনে উমার (রা.) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, এর দ্বারা তালবীয়াহ্ বাঞ্চনীয়। ইবরাহীম (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন হজ্জে তালবীয়াহ্ অপরিহার্য এবং প্রত্যাবর্তনের সময় হালাল অবস্থায়ও ইচ্ছানুসারে তা বলতে পারেন।

হাসান ইবনে ইয়াহ্ইয়া (র.)......মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত যে, "এরপর যে কেউ এ মাসসমূহে হজ্জ করা স্থির করে।" তিনি বলেন হজ্জে তালবীয়াহ্ ফরয। তাউসের (র.) ছেলে তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, "এরপর যে কেউ এ মাসসমূহে হজ্জ করা স্থির করে" তিনি বলেন, এতে তালবীয়াহ্ অত্যাবশ্যক, জাবর ইবনে হাবীব (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কাসিম ইবনে মুহাম্মদকে "যে কেউ এ মাসসমূহে হজ্জ করা স্থির করে" তার প্রসংগে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি

বলেন যদি কেউ গোসল বা নিয়্যত করে ; বস্ত্র ও বাসস্থান না থাকলেও তার উপর হজ্জ অপরিহার্য হলে অন্যদের মতে হজ্জের ফরয ইহ্রাম।

এ প্রসংগে প্রবক্তাদের নামও তারা উল্লেখ করেছেন, ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, এরপর যে কেউ এ মাসসমূহে হজ্জ করা স্থির করে ; বলা যায়, যে কেউ 'উমরা বা হজ্জের ইহ্রাম বেধেছেন।

ইবরাহীম (র.) হতে বর্ণিত যে, 'এরপর যে কেউ এ মাসসমূহে হজ্জ করা স্থির করে', তিনি বলেন, অর্থাৎ যে কেউ ইহ্রাম বেধেছেন। এ শব্দসমূহ ইবনে বিশার (র.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস হতে সংকলিত।

হযরত আতা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন হজ্জের ফরয কাজ হলো 'ইহ্রাম'। হযরত কাসিম (র.) হাসান হতে বর্ণিত, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, (এরপর যে কেউ এ মাসসমূহে হজ্জ করা স্থির করে)", তাঁদের মতে হজ্জের ফরয 'ইহ্রাম'। হযরত কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত যে, ('এরপর যে কেউ এ মাসসমূহে হজ্জ করা স্থির করে') তা হলো ইহ্রাম। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজ্জের ফরয হলো 'ইহ্রাম'। হযরত হুসায়ন ইবনে আকীল খুরাসানী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত দাহ্হাক ইবনে মাযাহিম (র.)-কে অনুরূপ বর্ণনা করতে শুনেছি।

হযরত ইবরাহীম (র.) হতে বর্ণিত যে, (এরপর যে কেউ এ মাসসমূহে হজ্জ করা স্থির করে) তিনি বলেন, অর্থাৎ যে কেউ ইহ্রাম বাধে।

দ্বিতীয় অভিমত আমাদের বর্ণনার অনুরূপ, হজ্জ হলো নিয়্যত ও ইহ্রাম সম্বলিত প্রস্তুতি, তা ছাড়া নিয়্যত ও তালবীয়াহ্ বলার অভিমতটিও গ্রহণযোগ্য। যা প্রথম অভিমতের প্রবক্তাগণ বলেছেন। ইজমা মতে হজ্জের ফরয "ইহ্রাম", তা হলো মুহ্রিম ব্যক্তি স্বীয় স্বত্বার উপর যা অত্যাবশ্যক করেছেন, সে সব বৈশিষ্টের বিস্তারিত বিবরণ সূক্ষ্মভাবে ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। যে সব বর্ণনায় হজ্জের তিনটি মূল নীতির বিচ্যুতি ঘটেনি। তা হলো ইহ্রাম যে করেনি তালবীয়াহ্ বলা ও মুহ্রিম ব্যক্তির আনুষাঙ্গিক কার্যাবলী করা যা নিজের ওপর অপরিহার্য করেছে। এ ক্ষেত্রে ইহ্রাম বেধে হজ্জ সম্পন্ন করা অপরিহার্য। কোন অবস্থায়ই ইহ্রাম মুক্ত ব্যক্তি মুহ্রিম নহে। অবশ্য ইহাও প্রতীয়মান যে সিলাই বিহীন বস্ত্রদ্বারা ইহ্রাম ধারণ না করেও মুহ্রিম হওয়া সম্ভব। যা তালবীয়াহ্ ব্যতিরেকে মুহ্রিম হওয়া সমর্থন করে, যদিও তালবীয়াহ্ ইহ্রামের নির্দেশাবলীর অর্ন্তভুক্ত। তদ্রূপ কোন নির্দেশনের বিচ্যুতি ঘটলেও একই বিধান প্রযোজ্য হবে। ইজমা মতে হজ্জের কোন কোন নির্দেশন বর্জন করেও মুহ্রিম হওয়া যায়। বিভিন্ন বর্ণনায় হজ্জের নির্দেশনাবলীর বিধান প্রমাণিত হয়েছে, বর্ণিত নির্দেশনাবলী-যেমন হজ্জের মনস্থ, ইহ্রাম এবং তালবীয়াহ্ ব্যতিরেকে হজ্জ গ্রহণযোগ্য নহে। এরূপও বর্ণিত হয়েছে যে, ইহ্রাম ধারণ না করে মুহ্রিম হওয়া সঠিক নহে যা ইজমা দ্বারা স্বীকৃত। হজ্জের মনস্থকারীর পক্ষে তা সম্পাদন কষ্টসাপেক্ষ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রক্ষাপটে অসংগতি পূর্ণ হলে উক্ত ব্যক্তির হজ্জ গৃহীত হবে না। বর্ণিত দু'টি পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য না হলে তৃতীয় পদ্ধতি সঠিক হওয়া প্রমাণ করে। তা হলো যে কেউ হজ্জ সম্পাদনের নিয়্যতে ইহ্রাম ধারণ করে মুহ্রিম হয়।

যদিও তার মধ্যে পার্থিব কার্যাবলী হতে মুক্তি, তালবীয়াহ্ বলা ও তৎসম্পর্কিত আনুসাঙ্গিক অন্যান্য কার্যাবলী দ্বারা বিকশিত হয়নি। এ প্রসংগে উল্লেখ্য যে, হজ্জের ফরয তথা নিয়্যতের মাধ্যমে সাড়া সম্পর্কে পূর্বে প্রদত্ত বর্ণনা সঠিক হলে এ বর্ণনা ও সঠিক।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন-فلا رفث প্রসংগে মুফাস্‌সীরগণ একাধিক মত পোষণ করেন। কারো কারো মতে , তা মহিলাদের প্রতি অশ্লীল বাক্য স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করা। এ অর্থ প্রয়োগে তা বলা যায় যে, হালাল হয়ে তোমার সাথে এরূপ কাজ করবো।

এ মত সমর্থনে বর্ণনা ঃ

হযরত ইবনে তাউস তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করে বলেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-কে আল্লাহ্ তা'আলার কালাম- فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ এ اَلرَّفَثُ সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। জবাবে তিনে বললেন, তা আরবদের ভাষায় স্বামী-স্ত্রীর মিলনকে বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। যা নিম্ন ধরনের বাক্যালাপ।

ইবনে তাউস (র.) হতে বর্ণিত। আল্লাহ্ তা'আলার কালাম-فَلَا رَفَثَ প্রসংগে, তিনি বলেন, তা স্বামী-স্ত্রীর মিলন সম্পর্কিত আলোচনা। হযরত আবূ হুসাইন ইবনে কায়েস (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সাথে সাথীরূপে হজ্জে রওয়ানা হলাম, ইহ্‌রাম করার পর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) তাঁর পাশে ঘোড়ার উপর আমাকে বসালেন। এরপর রশি নিজের দিকে টেনে উটকে হাঁকাতে হাঁকাতে বলতে লাগলেন- وَ هُنَّ يَمْشِيْنَ بِنَا هَمِيْسًا + اِنْ تَصْدُقِ الطَّيْرُ نَنِكْ لَمِيْسًا মহিলারা আমাদের সাথে ধীর গতিতে চলছে। যদিও পাখী দুর্বলতার সত্যতা জানাচ্ছে। তিনি বলেন, তুমি মুহ্‌রিম অবস্থায় অশ্লীল উচ্চারণ করেছো, অশ্লীল হলো মহিলাদের কাছে যা বলা হয়।

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি মুহ্‌রিম অবস্থায় বর্ণনা করেন যে, তারা (মহিলারা) আমাদের সাথে ধীর গতিতে চলছে যদিও পাখী দুর্বলতার সত্যতা জানাচ্ছে। তিনি বলেন, তুমি মুহ্‌রিম অবস্থায় অশ্লীল আলোকপাত করেছো, অশ্লীলতা হলো-যা মহিলাদের কাছে বলা হয়।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, الرفث হলো পুরুষের নিকট মহিলার আগমন, এরপর পরস্পরের মধ্যে অশ্লীল কথাবার্তা বলা।

মুহাম্মদ ইবনে কা'ব আল কুরজী (র.) হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন,হযরত জুরায়জ (র.) থেকে বর্ণিত, আতা (র.)-কে বললাম মুহরিম কি তার স্ত্রীকে একথা বলা হালাল যে, যখন হালাল হবো তোমাকে স্পর্শ করবো। প্রত্যুত্তরে বললেন না। এটা অশ্লীল উচ্চারণ। হযরত আতা (র.) বললেন অশ্লীল সঙ্গমের বহির্ভূত। হযরত ইবনে জুরায়জ (র.) হতে বর্ণিত। হযরত আতা বলেছেন, অশ্লীল হলো স্ত্রী-সঙ্গম তা ছাড়া অশালীন আলোকপাত।

হযরত জুরায়জ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি হযরত আতা (র.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, কেউ তার স্ত্রীকে বললো, হালাল হবার পর তোমার সাথে মিলবো। প্রত্যুত্তরে বললেন এটাই রাফাস (অশ্লীল)।

আবূ আলীয়া (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর তাঁর সাথে চলছিলাম, তখন তিনি মুহ্‌রিম ছিলেন। তিনি উটকে হাঁকিয়ে বললেন ঃ

তারা (মহিলারা) আমাদের সাথে ধীর গতিতে চলছে যদিও পাখী দুর্বলতার সত্যতা জানাচ্ছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-কে বললাম আপনি কি মুহ্‌রিম অবস্থায় অশ্লীল উচ্চারণ করেন। জবাবে তিনি বললেন, রাফাস (অশ্লীল কর্ম) হজ্জ বা 'উমরা থেকে ফিরে আসার পর স্ত্রীর সাথে সম্পাদন করা বৈধ।

তাউস (র.) ইবনে যুরায়র (র.)-কে বলতে শুনেছেন যে, মুহ্‌রিমের জন্য স্ত্রী-সঙ্গম হালাল নহে। ইবনে আব্বাস (রা.)-এর নিকট তা বর্ণনা করলাম, তিনি বললেন, তা সত্য। ইবনে আব্বাস (রা.)-কে বললেন এরাব (الاعراب) কি ? তিনি বললেন, তা স্ত্রী-সঙ্গমের প্রতি ইঙ্গিতবহ শব্দ।

তাউস (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন মুহ্‌রিমের জন্য স্ত্রী-সঙ্গমের প্রতি ইঙ্গিত করা জায়েজ নয়। তাউস (র.) বলেন, اَلْاَعْرَبَةُ হল মুহ্‌রিম অবস্থায় বলা হালাল হলে, আমি হল তোমাকে স্পর্শ করবো। আবূ আলীয়া হতে বর্ণিত যে, স্ত্রীদের প্রতি আসক্ত হওয়াই রাফাস (অশ্লীল)।

আতা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন সাহাবাগণ এরাবাহ্ অর্থাৎ মুহ্‌রিম অবস্থায় স্ত্রী সহবাসের প্রতি ইঙ্গিত করা অপসন্দ করতেন।

ইবনে তাউস (র.) হতে বর্ণিত, তিনি তার পিতাকে বলতে শুনেছেন যে, এরাবাহ্ হালাল নয়। এরাবাহ্ হলো স্ত্রী সঙ্গমের প্রতি ইঙ্গিত করা। ইবনে তাউস (র.) তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী-فلا رفث সম্পর্কে ইবনে আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী- اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَائِكُمْ ....الاية (রমযানের রাত্রিতে স্ত্রীদের সঙ্গে তোমাদের সঙ্গম হালাল (২ ঃ ১৮৭) এখানে স্ত্রী-সঙ্গম উদ্দেশ্য নয়, বরং এ ক্ষেত্রে আরবগণের ভাষায় স্ত্রী-সঙ্গম অর্থ প্রয়োগ না করে অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ বা স্ত্রীকে স্পর্শ উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

'আতা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি মুহ্‌রিম অবস্থায় স্ত্রী সঙ্গমের প্রতি ইঙ্গিত করা অপসন্দ করতেন।

ইবনে তাউস (র.) বর্ণনা করেন যে, তাঁর পিতার মতে রাফাস হলো স্ত্রী সঙ্গমের ইঙ্গিত। যা আর স্ত্রী সঙ্গমের ইঙ্গিত দ্বারা এখানে স্পষ্টভাবে সহবাসকে বুঝিয়েছেন। হাসান ইবনে মুসলিম (র.) তাউস (র.)-কে বলতে শুনেছেন যে, মুহ্‌রিমের জন্য স্ত্রী সঙ্গম হালাল নহে। ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাফাস বা অশ্লীল হলো স্ত্রী সহবাস, চুম্বন, ওেসসকামড়ানো ও অশ্লীল কথা ইত্যাদি পরোক্ষভাবে তার কাছে উপস্থাপন ইত্যাদি।

মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা.) বলতেন, হজ্জের মনস্থকারী মহিলাদের আলোকপাতের সম্মুখীন হবে না।

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রোযার সময় রাফাস হলো স্ত্রী–সঙ্গম এবং হজ্জের সময় তা অশ্লীল বাক্য, অন্যদের মতে তা স্ত্রী–সহবাস ও সঙ্গমের জন্য স্পর্শ করা। অন্যদের মতে এখানে রাফাস বলতে স্বয়ং স্ত্রী–সঙ্গম বুঝানো হয়েছে।

এর প্রবক্তাদের নামও তিনি উল্লেখ করেছেন। মিকসাম (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাফাস হলো স্ত্রী–সঙ্গম। আব্বাস (রা.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে অপরসূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাফাস হলো মহিলাদের নিকট আগমন। তামীমী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস (রা.)–কে রাফাস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তা হলো স্ত্রী সম্ভোগ।

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাফাস হলো স্ত্রী সম্ভোগ, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় মর্যাদা রক্ষাকল্পে নিজ ইচ্ছাকে ইঙ্গিতের মাধ্যমে প্রকাশ করেন।

আবূ আলীয়া (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস (রা.) মুহ্‌রিম অবস্থায় উটকে হাঁকিয়ে বললেন ঃ

خرجن يسرين بنا هميا + ان تصدق الطير ننك لميسا

অর্থ ঃ ধীরগতি সম্পন্ন মহিলারা আমাদের সাথে বেরিয়েছে। যদিও পাখি দুর্বল তার সত্যতা জানাচ্ছে। শুরাইক বলেন 'জিমা' (جماع) ও লামিস (لميسا) এক নয়। আবূ আলীয়া (র.) বললেন, তা কি রাফাস নয়, প্রত্যুত্তরে ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন ; রাফাস হলো স্ত্রীর নিকট আগমন এবং সহবাস করা।

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে অনুরূপ বর্ণিত, তবে তা তিনি আরো সহজতর ও প্রকাশ্য করে তুলেছেন।

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাফাস হলো স্ত্রী সঙ্গম।

আবদুল্লাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী– فَلاَ رَفَثَ প্রসঙ্গে তিনি বলেন ; রাফাস হলো স্ত্রীর নিকট আগমন।

হাসান (রা.) হতে বর্ণিত। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী– فَلاَ رَفَثَ প্রসংগে তিনি বলেন, রাফাস হলো স্ত্রী সহবাস।

ইবনে জুরায়জ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,আমর ইবনে দীনার বলেছেন, রাফাস হলো স্ত্রী সঙ্গম, স্ত্রীদের প্রসংগে তা ব্যতিরেকে অন্য কিছু নয়।

আমর ইবনে দীনার (রা.) হতে অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে। আতা (র.) হতে বর্ণিত, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী– فَلَا رَفَثَ প্রসংগে তিনি বলেছেন রাফাস হলো স্ত্রী সঙ্গম।

মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,– فَلَا رَفَثَ এ রাফাস হলো স্ত্রী সঙ্গম।

কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী– فلا رفث প্রসংগে বলতেন যে, রাফাস হলো স্ত্রী সহবাস।

কাতাদা (র.) হতে অপর সূত্রে অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাফাস হলো স্ত্রী সঙ্গম। ইবনে আব্বাস (রা.) অন্যসূত্রে হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাফাস হলো স্ত্রী সঙ্গম।

মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাফাস হলো স্ত্রী সঙ্গম।

সাঈদ ইবনে জুবায়র (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাফাস হলো স্ত্রী সঙ্গম।

সূদ্দী (র.) হতে বর্ণিত যে, রাফাস না করা অর্থ স্ত্রী সঙ্গম না করা । তিনি বলেন, তা আম্মার ও রবী (র.) বর্ণনা করেন, রাফাস হলো মহিলার সাথে সহবাস করা।

মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি– فلا رفث প্রসংগে বলেন, তা হলো মহিলার সাথে সহবাস করা।

ইবরাহীম (র.) হতে বর্ণিত। আল্লাহ্ পাকের বাণী– فَلَا رَفَثَ প্রসংগে তিনি বলেন, রাফাস হলো স্ত্রী সঙ্গম।

আতা ইবনে আবূ রিবাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাফাস হলো স্ত্রী সঙ্গম।

ইবনে উমার (রা.) হতে বণিত। তিনি বলেন, রাফাস হলো স্ত্রী সঙ্গম।

ইকরামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাফাস হলো স্ত্রী সঙ্গম। ইকরামা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাফাস হলো স্ত্রী সঙ্গম।

দাহ্হাক (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাফাস হলো স্ত্রী সঙ্গম।

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, আবদুল মালিক (র.) আতা (র.) হতেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। মুগীরা ও ইবরাহীম (র.) হতেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

মুজাহিদ (র.) হতেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাফাস হলো বিবাহ।

সুওয়াইব বলেন, আমি ইবনে উমার (রা.)–কে বলতে শুনেছি যে, রাফাস হলো স্ত্রী সঙ্গম।

মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণির্ত। তিনি বলেন, রাফাস হলো স্ত্রী সহবাস করা। মামার (র.) বলেন, যুহ্রী (র.) কাতাদা (র.) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইবনে যায়দ (র.) বলেন,রাফাস হলো স্ত্রীর নিকট আগমন করা। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার বাণী- أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ অর্থ ঃ 'সিয়ামের রাতে আল্লাহ্ পাক স্ত্রীদের সাথে সঙ্গম হালাল করেছেন।'

মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী- فَلاَ رَفَثَ এ রাফাস হলো স্ত্রী সঙ্গম। ইবরাহীম (র.) হতেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

আমার মতে সঠিক বক্তব্য হলো, তিনি হজ্জের মাসসমূহে দাম্পত্যসুলভ আচরণ নিষেধ করেছেন। তাই ইরশাদ করেছেন, فمن فرض فيهن الحج فلا رفث অর্থ (তারপর যে কেউ এ মাস-সমূহে হজ্জ করা স্থির করে, তার জন্য হজ্জের সময়ে দাম্পত্যসুলভ আচরণ বৈধ নয়)। রাফাস হলো আরবদের ভাষায় অশ্লীল বাক্যালাপ, যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এরপর তা পরোক্ষভাবে দাম্পত্যসুলভ আচরণ হিসাবে ব্যবহার হয়। যদি তাই হয় এবং যদি তত্ত্বজ্ঞানিগণ রাফাস এর কোন কোন অর্থে অথবা সমস্ত অর্থে একাধিক মত পোষণ করে থাকেন। তা হলে আমাদের উপর সকল অর্থেই তা গ্রহণ করাই আপরিহার্য হবে।

সাধারণ নিয়ম অনুসারে নির্দিষ্ট অর্থ প্রসংগে কোন খবর উল্লিখিত না হলে রাফাসকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করা অপরিহার্য। কেননা, আয়াতের প্রকাশ্যে হুকুম অনুসারে পুরুষ স্ত্রীর সঙ্গে যাবতীয় অশালীন বাক্যালাপ ও সংশ্রব জায়েয নয়। এতে রাফাসের ব্যাপক ব্যাখ্যা প্রয়োগ করা হয়েছে। প্রকাশ্য ব্যাখ্যা বাদ দিয়ে অন্য ব্যাখ্যা গ্রহণের জন্য সুস্পষ্ট দলীল জরুরী।

যদি কেউ এ কথা বলে যে, আয়াতের হুকুমের প্রকাশ্য অর্থের স্থলে অপকাশ্য অর্থ গ্রহণই হলো ইজমায়ে উম্মতের সিদ্ধান্ত। তত্ত্বজ্ঞানিগণের মধ্যে এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। নারী ব্যতিরেকে অন্যদের সাথে মুহ্‌রিম অবস্থায় অশালীন কথোপকথন নিষেধ নয়। তাতে স্পষ্টরূপে অবহিত হওয়া গেল যে, আয়াতে রাফাস ব্যাপক না হয়ে সংক্ষিপ্ত অর্থে প্রয়োগ হয়েছে। তাও মেনে নেয়া অনস্বীকার্য যে, এমতাবস্থায় ইজমা মতে যা হারাম করা হয়েছে অথবা হারাম হবার ক্ষেত্রে ঐক্যমত পোষণ করা হয়েছে-তা ব্যতীত মুহ্‌রিম অবস্থায় রাফাস অর্থে প্রয়োগকৃত কিছুই হারাম নয়। বলা হয়েছে যে, আয়াতে যা নির্দিষ্ট হয়েছে, তা হলো হারাম থেকে অব্যাহতি দিয়ে মুবাহ্ করা হয়েছে। আয়াতে রাফাস অর্থ দ্বারা নির্দিষ্টভাবে তা প্রমাণিত হয়নি। যা দ্বারা নিষেধ, হুকুম ঐক্যমতে বাস্তবায়ন হতে পারে। কিন্তু তাতে কিছুই নির্ধারিত হয়নি। তাই রাফাসকে সাধারণ অর্থেই প্রয়োগ করতে হবে। যদি আমরা রাফাসকে নিষেধ হবার হুকুমে অত্যাবশ্যক করি। তাহলে তাতে দ্বিমত পোষণ জায়েয হবে না। তাই আয়াতের নিগূঢ় ও সামগ্রিক হুকুমেই যথাযথ হবে। আল্লাহ্ তা'আলা কোন কিছু নির্দিষ্ট না

করলেও বান্দাদের মধ্যে কেউ কেউ পরবর্তীতে এর হুকুম (রায়) অত্যাবশ্যকরূপে নির্দিষ্ট করেছেন। যেহেতু, আয়াতের প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করলে তা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, পটভূমির আলোকপাতে কোন উদাহরণ পরিবেশনায় বিশেষ কোন নির্ধারিত আদেশসূচক হয়নি। তাই রাফাসকে সাধারণ অর্থে প্রয়োগই অধিক সমীচীন।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী- وَلَا فُسُوْقَ এর ব্যাখ্যা ঃ তাফসীরকারগণ এর ব্যাখ্যা একাধিক মত পোষণ করেছেন। যা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন ফুসূক অর্থ পাপসমূহ।

এ মত যারা পোষণ করেন ঃ

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত–তিনি বলেন, ফুসুক অর্থ যাবতীয় পাপকর্ম।

আতা (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- وَلَا فُسُوْقَ এ ফুসূক হলো পাপরাশি। ইবনে জুরায়জ (র.) বলেন যে, আতা (র.) বলেছেন, ফুসূক হলো পাপরাশি। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- وَ اِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌ بِكُمْ অর্থ ঃ যদি তোমরা তা করো তবে তা হবে তোমাদের পাপকর্ম।

আতা (র.) হতেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

হাসান (রা.) হতে বর্ণিত। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী- وَلَا فُسُوْقَ প্রসংগে তিনি বলেন, ফুসূক হলো পাপরাশি। ইবনে তাউস (র.) তার পিতা হতে বর্ণনা করে বলেন যে, ফুসূক হলো পাপ।

মুজাহিদ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফুসূক হলো যাবতীয় পাপ। ইবনে তাউস (র.) তার পিতা হতে বর্ণনা করে যে, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী- وَلَا فُسُوْقَ এ ফুসূক হলো পাপরাশি।

মুহাম্মদ ইবনে কাব আল–কুরযী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী- وَلَا فُسُوْقَ এ ফুসূক হলো সামগ্রিকভাবে পাপরাশি।

কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, وَلَا فُسُوْقَ এ ফুসূক হলো পাপরাশি।

মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, وَلَا فُسُوْقَ অর্থ পাপরাশি।

মুজাহিদ (র.) হতে ও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। সাঈদ ইবনে জুবায়র (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফুসূক হলো পাপরাশি। মুজাহিদ (র.) হতেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফুসূক হলো পাপরাশি।

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী- وَلَا فُسُوْقَ এ ফুসুক হলো আল্লাহ্র নাফরমানী করা।

ইবরাহীম (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী- وَلَا فُسُوْقَ প্রসংগে বলেন, ফুসূক হলো পাপরাশি।

আতা ইবনে আবূ রিবাহ্ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফুসূক হলো পাপরাশি।

মুজাহিদ (র.) হতে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। ইবনে আব্বাস (রা.) হতে অন্যসূত্রে বর্ণিত, তিনি وَلَا فُسُوْقَ প্রসংগে বলেন, ফুসূক হলো পাপরাশি। তিনি আরো বলেন, আতা (র.) হতে আনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। রবী (র.)ও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইকরামা (রা.) হতে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। ইকরামা (র.) হতে অন্যসূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফুসূক হলো আল্লাহ্র নাফরমানী আর আল্লাহ্ পাকের নাফরমানী কোনটাই ক্ষুদ্র নয়।

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে অপরসূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, وَلَا فُسُوْقَ এ ফুসূক হলো আল্লাহ্র সকল প্রকার অবাধ্যতা।

মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফুসূক হলো পাপরাশি, তিনি আরো বলেন যে, যুহরী (র.) ও কাতাদা (র.) অনুরূপ বলেছেন।

অন্যান্য তাফসীরকারগণের মতে এ স্থানে ফুসূক হলো পশু-পাখী শিকার, চুল কাটা বা উত্তোলন করা, নখ কাটাসহ অনুরূপ কার্যাবলী যা ইহ্রাম অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা নিষেধ করেছেন। তা সম্পন্ন করাই হলো আল্লাহ্র অবাধ্যতা। এসব কাজ আল্লাহ্ তা'আলা মুহ্রিম-এর জন্যই তাঁর ইহ্রাম অবস্থায় নিষেধ করেছেন।

এ অভিমতের প্রবক্তাদের নাম তাঁরা উল্লেখ করেছেন।

আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলতেন, ফুসূক হলো মুহ্রিম অবস্থায় আল্লাহ্র অবাধ্য কাজ করা। ইবনে উমার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফুসূক হলো শিকার বা অন্যান্য কাজের মাধ্যমে যে আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্য কাজ করে। অন্যান্য তাফসীরকারগণের মতে, বরং এস্থানে ফুসূক হলো অশালীন কথোপকথন।

এ অভিমত যাঁরা পোষণ করেন ঃ

ইবনে উমার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফুসূক হলো গালী-গালাজ।

আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফুসূক হলো গালী-গালাজ।

সুয়াইরা (র.) বলেন, ফুসূক প্রসংগে ইবনে উমার (রা.)-কে বলতে শুনেছি যে, তা হলো গালী-গালাজ।

মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَلَا فُسُوْقَ প্রসংগে বলেন, ফুসূক হলো গালী-গালাজ।

সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত। আল্লাহ্ তা'আলার ইরশাদ وَلَا فُسُوْقَ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ফুসূক হলো গালী-গালাজ।

ইবরাহীম (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফুসূক হলো গালী-গালাজ।

মূসা ইবনে উকবা (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আতা ইবনে ইয়াসার (র.)-কে অনুরূপ বর্ণনা করতে শুনেছি।

হযরত ইবরাহীম (র.) হতে বর্ণিত। ফুসূক অর্থ গালী-গালাজ। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। ফুসূক অর্থ গালী-গালাজ। হযরত মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার বাণী- وَلَا فُسُوْقَ প্রসঙ্গে বলেন, ফুসূক অর্থ গালী-গালাজ। হযরত ইবরাহীম (র.) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। অন্যদের মতে, ফুসূক অর্থ মূর্তির উদ্দেশ্য বলি দেয়া। এ মতের সমর্থনে যারা বলেছেনঃ হযরত ইবনে যায়িদ (র.) ফুসূক প্রসংগে বলেন ঃ তার অর্থ- প্রতিমার উদ্দেশ্যে বলি দেয়া এবং তিনি পড়েছেন ঃ ...... اَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ অর্থ ঃ ফুসূক অর্থ আল্লাহ্ পাক ব্যতীত অন্যের উদ্দেশ্যে বলি দেয়া। এখানে (جدال) উহ্য রয়েছে, যেমনিভাবে প্রতিমার উদ্দেশ্যে বলি উহ্য রয়েছে। এ বর্ণনাকারী হযরত রাসূলে করীম (সা.)-এর সাথে হজ্জে গমন করেছিলেন। এ অবস্থায় অবলোকন করে তিনি উম্মতকে হজ্জের নিয়মাবলী বিশদভাবে শিক্ষা দিয়েছেন।

অন্যান্য তাফসীরকারগণের মতে ফুসূক অর্থ একে অপরকে মন্দ নামে ডাকা ।

হযরত হুসাইন ইবনে আকীল (র.) বলেন, হযরত দাহ্হাক ইবনে মুযাহিম (র.)-কে অনুরূপ বর্ণনা করতে শুনেছি। মহান আল্লাহ্র বাণী- وَلَا فُسُوْقَ এর ব্যাখ্যায় আমরা যেসব ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছি তারমধ্যে উত্তম হলো, যিনি তার ব্যাখ্যায় বলেছেন । ইহ্রাম অবস্থায় মুহরিমের জন্য শিকারসহ যে সকল কার্যাবলী নিষেধ করা হয়েছে, তাই ফুসূক, তথা আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্যতা। যেহেতু মহান সত্ত্বার অধিকারী আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন- فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَ لَا فُسُوْقَ ... الاية (যে কেউ নির্ধারিত মাসসমূহে হজ্জ আদায় করার মনস্থ করেছে, তার জন্য দাম্পত্যসুলভ আচরণ, অন্যায় আচরণ, বৈধ নয়)। এখানে রাফাস ও ফুসূক অর্থাৎ ইহ্রাম অবস্থায় মহান আল্লাহ্র ইবাদাত থেকে দূরবর্তী না হওয়া এবং তিনি যে সব কাজ করতে নিষেধ করেছেন তা না করা। নিশ্চিতরূপে আমরা অবহিত হলাম যে, মুহ্রিম বা অমুহ্রিম সকলের জন্যেই আল্লাহ্ তা'আলা পাপকার্য হারাম করেছেন। অনুরূপভাবে ইহ্রাম এবং অন্যান্য অবস্থায় একে অপরকে মন্দ নামে ডাকাও হারাম করেছেন। যা আল্লাহ্ তা'আলার বাণী- وَلَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَ لَا تَنَابَزُوْا بِالْاَ لْقَابِ (তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না)।

হজ্জ আদায়ের মনস্থকারী বা মনস্থকারী নয় এমন সকল মুসলিমের ওপর তার ভাইকে গালী-

গালাজ করা আল্লাহ্ পাক হারাম করেছেন। তাহলে নিঃসন্দেহে হজ্জ আদায়েব মনস্থকারীর জন্য আল্লাহ্ তা'আলা ফুসূক গালি–গালাজ বা পাপকার্য স্বীয় বান্দাদের ওপর ইহ্রাম অবস্থায় নিষেধ (বা হারাম) করেছেন। ইহ্রামহীন অবস্থায় ফুসূকে (গালী–গালাজ) এ নিষেধ অন্তর্ভুক্ত নহে। যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা রাফাস (দাম্পত্যসুলভ আচরণ) হজ্জ পালনকারীর ওপর সাবির্কভাবে নিষেধ করেছেন। যার অর্থ তা হতে পারে না যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের ওপর সকল অবস্থায় তা হারাম করেছেন। ইহ্রাম অবস্থায় যে সকল কাজ হারাম করেছেন, তা সবই অন্যান্য অবস্থায় হারাম নয়। কোন কোন বর্ণনায় ইহ্রাম অবস্থায় যা বিশেষভাবে নিষেধ, তাকে ইহ্রাম ও ইহ্রামহীন এ উভয় অবস্থায় সাধারণভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। বস্তুত যদি তাই হয়, তাহলে ইহ্রাম অবস্থায় মুহ্রিমের জন্য ফুসূক গালী–গালাজ করা বিশেষভাবে নিষেধ। যিনি হজ্জ করা স্থির করেছেন, তিনি তা করবেন না। তবে সার্বিক অর্থে হজ্জে মনস্থ করার পূর্বে তা সিদ্ধ। যা আমরা বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করলাম। ইহ্রাম অবস্থায় মুহ্রিমের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা অনুরূপ আরো বিশেষ কাজ করতে নিষেধ করেছেন। তাহলো সুগন্ধি ব্যবহার, সাধারণ পোশাক পরিধান, মাথা মুন্ডন, নখ কাটা, শিকার করা ইত্যাদি, যা আল্লাহ্ তা'আলা ইহ্রাম অবস্থায় মুহ্রিমের জন্য নিষেধ করেছেন। আয়াতের বিশ্লেষণে এটা স্পষ্ট হলো যে, যিনি নির্ধারিত মাসসমূহে হজ্জের মনস্থ করেছেন তার ইহ্রাম বাধার পর মহিলার সাথে যৌন আলোকপাত বা দাম্পত্যসুলভ আচরণ বৈধ নয়। তাদেরকে যৌন কর্মে অনুপ্রাণিত এবং তাদের দ্বারা অনুরণিত হওয়া কোনটাই বৈধ নয়। ইহ্রাম অবস্থায় মুহ্রিমের জন্যে শিকার করা, চুল কাটা বা উঠায়ে ফেলা, নখ কাটা প্রভৃতি আল্লাহ্ তা'আলা হারাম করেছেন। এসব নিষিদ্ধ কাজসমূহ ফুসূক যা আল্লাহ্পাক করতে নিষেধ করেছেন। মহান আল্লাহ্র বাণী– وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ (কলহ–বিবাদ হজ্জে বৈধ নয়) প্রসংগে ব্যাখ্যাকারগণ একাধিক মতের অবতারণা করেছেন। তাদের কেউ কেউ বলেন এর অর্থ, মুহ্রিম অন্যের সাথে কলহ–বিবাদ হতে বিরত থাকবে। এ অভিমতেও তাঁরা সবাই এক হতে পারেননি। তাদের কারো কারো মতে সঙ্গীগণ নারায হতে পারেন এরূপ কলহ্–বিবাদ থেকে বিরত থাকা।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

আবদুল্লাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত– وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ (হজ্জে কলহ–বিবাদ বৈধ নয়)। তিনি বলেন, তা হলো সঙ্গীর সাথে ঝগড়া করা যাতে সে রাগান্বিত হয়। হযরত তামীমী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)–কে 'জিদাল' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন, তা হলো ঃ সঙ্গীর সাথে ঝগড়া করা যাতে সে রাগান্বিত হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জিদাল, হলো পরস্পর ঝগড়া করা। যাতে একে অন্যের ওপর রাগান্বিত হয়। আতা (র.) থেকে বর্ণিত, জিদাল হলো ঃ কোন ব্যক্তি তার ভাইয়ের সাথে ঝগড়া করা, যাতে সে রাগান্বিত

হয়। সাঈদ ইবনে জুবায়র (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, হজ্জে কলহ–বিবাদ বৈধ নয়। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন, এখানে জিদাল এর অর্থ উত্যক্ত করা, যাতে সে রাগান্বিত। সালামা ইবনে কুহাইল (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুজাহিদ (রা.)–কে আল্লাহ্র বাণী– وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ (হজ্জে কলহ্–বিবাদ বিধেয় নহে) প্রসংগে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তাহলো সঙ্গীর সাথে ঝগড়া করা, যাতে সে রাগান্বিত হয়। আমর ইবনে দীনার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জিদাল হলো সঙ্গীর সাথে ঝগড়া –ফাসাদ করা, যাতে সে রাগান্বিত হয়। হাসান (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, জিদাল হলো ঝগড়া –ফাসাদ। ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জিদাল হলো সঙ্গীর সাথে কলহ করা যাতে সে রাগান্বিত হয়। সাঈদ ইবনে জুবায়র (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জিদাল হলো সঙ্গীকে রাগান্বিত করা। মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "হজ্জে কলহ–বিবাদ বৈধ নহে" এর অর্থ পরস্পর ঝগড়ায় লিপ্ত হওয়া। যাহ্হাক (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জিদাল হলো–সঙ্গীর সাথে ঝগড়া করা, যাতে সে রাগান্বিত হয়। আতা (র.) বর্ণিত। তিনি বলেন, জিদাল হলো সঙ্গীর সাথে ঝগড়া করা, যার ফলে সে রাগান্বিত হয়। রবী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জিদাল হলো কলহ ; স্বীয় সঙ্গীর সাথে ঝগড়া করা, যাতে সে রাগান্বিত হয়। ইবরাহীম (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, জিদাল হলো ঝগড়া–ফাসাদে। মূসা ইবনে আকাবা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আতা ইবনে ইয়াসার (র.)–কে অনুরূপ বর্ণনা করতে শুনেছি। মগীরা বলেন, ইবরাহীম অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আতা ইবনে আবূ রিবাহ্ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জিদাল হলো পরস্পর পরস্পরের সাথে ঝগড়া–ফাসাদ লিপ্ত হওয়া যাতে তারা সকলে ক্রোধান্বিত হয়ে পড়ে। ইকরামা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি وَلَا جِدَالَ প্রসংগে বলেন, জিদাল হলো ক্রুদ্ধ হওয়া। কোন মুসলমান তার ওপর ক্রুদ্ধ কিন্তু সে ক্রোধান্বিত ব্যক্তির ওপর কর্তৃত্ব প্রয়োগে অপারগ। এমতাবস্থায় সে সদাচরণে নসীহত করলে আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছায় তার ক্রোধ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। ইকরামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জিদাল হলো সঙ্গীর সাথে ঝগড়া করা, যার ফলে সে তোমার ওপর রাগান্বিত হয়, অথবা তুমি তার ওপর গোস্বা হও এবং যুহ্রী (র.) কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, জিদাল হলো মুহ্রিম অবস্থায় ঝগড়া ও গোলযোগ করা।

আতা (র.) বলেন, জিদাল হলো কলহ–বিবাদের দরুন সঙ্গী রাগান্বিত হওয়া।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি– وَ لَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ অর্থ ঃ ("হজ্জে কলহ–বিবাদ বৈধ নয়")। প্রসংগে বলেন, জিদাল অর্থ ঝগড়া ও অর্ন্তদ্বন্দ্ব, যাতে ভাই ও সঙ্গী গোস্বা হয়। আল্লাহ্ তা'আলা তা হতে বিরত থাকতে আদেশ করেছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, জিদাল অর্থ সঙ্গীর সাথে ঝগড়া করা, যাতে সে নারায হয়।

হযরত ইবরাহীম (র.) হতে বর্ণিত, জিদাল অর্থ 'কলহ–বিবাদ'।

হযরত ইমাম যুহ্‌রী (র.) ও হযরত কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত। জিদাল অর্থ মুহ্‌রিম অবস্থায় ঝগড়া ও গোলযোগ করা।

হযরত ইবরাহীম (র.) বর্ণনা করেন যে, "হজ্জে কলহ-বিবাদ বৈধ নয়।" তারা কলহ-বিবাদ অপসন্দ করতেন।

অন্যান্য মুফাস্‌সীরগণের মতে, এ স্থানে জিদাল অর্থ গালী-গালাজ করা।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা.) বলেন, হজ্জে জিদাল অর্থ গালী-গালাজ, কলহ-বিবাদ ও ঝগড়া।

হযরত ইবনে উমার (রা.) হতে বর্ণিত, 'জিদাল' অর্থ গালী-গালাজ ও ফিতনা-ফাসাদ।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, 'জিদাল' অর্থ গালী-গালাজ।

হযরত কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, 'জিদাল' অর্থ গালী-গালাজ।

কারো কারো মতে ঝগড়া ও ফাসাদ দ্বারা অন্যকোন বিশেষ অর্থ উদ্দেশ্য করা হয়েছে। তা হলো হাজীদের হজ্জে পরিপূর্ণতা লাভ করা।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

মুহাম্মদ ইবনে কা'ব আল-কুরযী (রা.) হতে বর্ণিত। জিদাল অর্থ কুরায়শগণ মিনা নামক স্থানে অবস্থান করে বলতেন, আমাদের হজ্জ তোমাদের হজ্জের অপেক্ষা পরিপূর্ণ। আমাদের হজ্জ তোমাদের হজ্জ অপেক্ষা পরিপূর্ণ। (দু' বার বলতেন)।

কারো কারো মতে, এ মতভেদ হজ্জের দিন-নির্ধারণে হাজীদের মধ্যে মতপার্থক্য, তা নিষেধ করা হয়েছে।

জিদাল অর্থ -এ ক্ষেত্রে হজ্জের দিন-তারিখ নিয়ে মত বিরোধ না করা।

এ মতের সমর্থকগণের বক্তব্য ঃ

হযরত কাসিম ইবনে মুহাম্মদ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,হজ্জে কলহ-বিবাদ অর্থ হাজীদের কেউ কেউ বলেন, 'আজ হজ্জ' অন্য হাজীদের মতে 'আগামী কাল'।

অন্যান্য মুফাস্‌সীরগণ বলেন, মতবিরোধ হলো, হজ্জের জায়গাসমূহ নির্ধারণে, সত্যিকারে মাকামে ইবরাহীমে অবস্থান করে কারা ভাগ্যবান।

যারা এ মতের অনুসারী ঃ

হযরত ইবনে যায়দ (র.) আল্লাহ্ তা'আলার বাণী– وَ لاَ جِدَالَ فِى الْحَجِّ (হজ্জে কলহ–বিবাদ বৈধ নয়) প্রসংগে বলেন, হাজীগণ বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান করে প্রত্যেকেই দাবী করেছেন যে, স্বীয় অবস্থান স্থল মাকামে ইবরাহীম। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের দাবী খন্ডনপূর্বক ঘোষণা দেন যে, হজ্জের কর্তব্যাদি (স্থান) সম্পর্কে নবী (সা.) সর্বাধিক জ্ঞাত।

মুফাস্সীরগণের কেউ কেউ মনে করেন, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী– وَ لاَ جِدَالَ فِى الْحَجِّ (হজ্জে কলহ–বিবাদ বৈধ নয়) প্রসংগে সংবাদ দিয়েছেন যে, শীঘ্র (সময়ের পূর্বে) বা বিলম্ব না করে হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে সঠিক সময়ে মীকাতে (নির্ধারিত স্থানে) সমবেত হওয়া। এ প্রসংগে প্রবক্তাদের বর্ণনাও তারা দিয়েছেন।

মুজাহিদ (র.) বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ পাকের ইরশাদ– وَ لاَ جِدَالَ فِى الْحَجِّ (হজ্জে কলহ–বিবাদ বৈধ নয়)–এর দ্বারা সঠিক সময়ে হজ্জের জন্য মীকাতে অবস্থান নেয়ার অর্থে বুঝানো হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত যে, হজ্জে কলহ–বিবাধ বৈধ নয়। এ প্রসংগে তিনি বলেন, হজ্জের সময় সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। আর এতে ভুল হবারও আশংকা নেই। এ সম্পর্কে মুহার্‌রম মাসকে প্রথমে উল্লেখ না করে বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। সফর ও রবিউল আউয়াল মাসদ্বয়কে 'সফরান' বলেছেন, রবি মাস বলেছেন–রবিউল আখির ও জমাদিউল উলা মাসদ্বয়কে রবী (র.) বলে উল্লেখ করেছেন। জমাদিউল আখিরা ও রজব মাসদ্বয়কে "জমাদিয়ান" বলেছেন। শাবান মাসকে "রজব" বলে উল্লেখ করেছেন। আর রমযান মাসকে বলেছেন 'শাবান'। আবার শাওয়াল মাসকে বলেছেন রামযান। আর যিলকাদ মাসকে বলেছেন, শাওয়াল। আবার যিলহাজ্জ মাসকে বলেছেন যিলকাদ এবং মুহার্‌রম মাসকে বলেছেন, যিলহাজ্জ। এরপর তারা মুহার্‌রম মাসে হজ্জ করতো। তারপর সতর্ক করেছেন যে, ভবিষ্যত গণনার সূত্র ধরে হিসাব রাখবে যাতে হজ্জের আরম্ভের সময় নির্ণয় করা সহজতর হয়। মুহার্‌রম, সফর, রবিউল আখির ও জমাদিউল উলা মাস প্রসংগে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন–মুহার্‌রম (পূর্ব ব্যাখ্যা অনুযায়ী যিলহাজ্জ) মাসে হজ্জ করবে। প্রতি বছর দু'বার হজ্জ (হজ্জ ও উমরা) পালন করবে। বর্জন করেছেন পরবর্তী মাসদ্বয় (জামাদিউল আখির ও রজব), প্রথমদিকের মাসগুলোকে গণনার মধ্যে সীমিত রেখেছেন। সফর, রবিউল আউয়াল, রবিউস সানী ও জামাদিউল উলা মাসগুলোকে প্রাথমিক পরিসংখ্যানে বর্জন করেছেন। (মাসের ক্রমধারা অনুসারে হজ্জ ও উমরা পালনের সংক্ষিপ্ত ফিরিস্তি উপরে বিব্রত হয়েছে।)

হযরত মুজাহিদ (র.) হতে অপর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, এ মাসগুলোর বর্ণনা ভুলকারী ব্যক্তি হলেন বনী কানানার আবূ সুমামা নামক ব্যক্তি।

হযরত মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি 'হজ্জে কলহ-বিবাদ বৈধ নয়' প্রসংগে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার দেয়া হজ্জের নিয়ম কানুন সম্বলিত আদেশে কোন সংশয়ের অবকাশ নেই।

হযরত সূদ্দী (র.) হতে বর্ণিত। 'হজ্জে কলহ-বিবাদ বৈধ নয়' প্রসংগে বলেন, হজ্জের বিধান সঠিকভাবে প্রণীত হয়েছে, তাতে ঝগড়া করো না।

হযরত মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি 'হজ্জে কলহ-বিবাদ বৈধ নয়' সম্পর্কে বলেন, হজ্জের মাস বর্ণনায় ভুল প্রদর্শিত হয়নি এবং হজ্জে সংশয়ের অবকাশ নেই, বরং তা স্পষ্টই বর্ণিত হয়েছে।

হযরত মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি "হজ্জে কলহ-বিবাদ বৈধ নয়" এ প্রসংগে বলেন, হজ্জের সময়-কাল জানিয়ে দেয়া হয়েছে, তাতে সংশয় ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবকাশ নেই।

হযরত মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি "হজ্জে কলহ-বিবাদ বৈধ নয়" সম্পর্কে বলেন, হজ্জে সংশয়ের অবকাশ নেই।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। 'হজ্জে কলহ-বিবাদ বৈধ নয়' প্রসংগে তিনি বলেন, তা হলো হজ্জে ঝগড়া করা।

হযরত মুজাহিদ (র.) বর্ণনা করেন যে, "হজ্জে কলহ-বিবাদ বৈধ নয়" হজ্জের বিধান পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, তারা জাহেলী যুগে দু'বছর যিলহাজ্জ মাসে, দু'বছর মুহার্‌রম মাসে, দু'বছর সফর মাসে হজ্জ পালন করতো। তারা পরপর দু'বছর একই মাসে হজ্জ পালন করতো।

হযরত আবূ বাকর সিদ্দীক (রা.) হযরত নবী করীম (সা.)-এর সাথে হজ্জ করার পূর্বে এ ধারানুসারে দু'বছর যিলকাদ মাসে হজ্জে অবস্থান করেছিলেন। তারপর হযরত নবী করীম (সা.) যিলহাজ্জ মাসে হজ্জ পালনের সময় বললেন। যে দিন আল্লাহ্ তা'আলা আসমানসমূহ ও যমীনসমূহ সৃষ্টি করেছেন, সে দিন থেকে কাল তার নিজস্ব গতিতে প্রবাহমান।

হযরত মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত। মহান আল্লাহ্র বাণী- وَ لَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ (হজ্জে কলহ-বিবাদ বৈধ নয়) প্রসংগে তিনি বলেন, হজ্জের আদেশাবলী ও এর নিদর্শনসমূহ আল্লাহ্ তা'আলা বিশদভাবে আলোচনা করেছেন, তাতে কোন বক্তব্য নেই।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী- وَ لاَ جِدَالَ فِى الْحَجِّ (হজ্জে কলহ-বিবাদ বৈধ নয়), এ প্রসংগে উত্তম অভিমত হলো ঃ যারা বলেছেন যে, হজ্জের সময় নির্ধারণে ঝগড়া বা কলহ-বিবাদ বাতিল করা। হজ্জের বিধান ও সময় সঠিকভাবে একই সময়ে নির্ধারিত হয়েছে। হজ্জের কর্তব্যাদিতে সকলে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। আর তা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা হজ্জের-সময় প্রসংগে নির্ধারিত মাসসমূহের সংবাদ পরিষ্কাররূপে উল্লেখ করেছেন। পরন্তু তিনি সময় নির্ধারণে মতভেদ করতে নিষেধ করেছেন, যে মতভেদ শির্ক নিমজ্জিত জাহেলী যুগে বিদ্যমান ছিল।

মতভেদগুলোর মধ্যে সঠিক ও উত্তম বিবেচনায় আমরা উপরোক্ত অভিমত গ্রহণ করলাম।

সূক্ষ্ম ও গভীর মনোনিবেশের সাথে আলোচিত হয়েছে যে, হজ্জে ফুসূক (গালী-গালাজ) জায়েয নেই। যা মুহ্‌রিম অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষভাবে নিষেধ করেছেন। অবশ্য তা সাধারণত ইহ্‌রাম বিহীন অবস্থায় মুবাহ্ বা অনুমোদন দিয়েছেন। স্পষ্টতই এখানে ইহ্‌রাম অবস্থাকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে যদি ইহ্‌রাম ও ইহ্‌রামহীন উভয় অবস্থা একই পর্যায়ভুক্ত হতো, তা হলে এক অবস্থা বর্জন করে অন্য অবস্থা গ্রহণ করা নিরর্থক হয়ে পড়ে, বরং তা সর্বাবস্থার জন্য সাধারণভাবেই প্রযোজ্য। এ ব্যাখ্যাকে উপমা হিসাবে গ্রহণ করলে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী- وَ لاَ جِدَالَ فِى الْحَجِّ (হজ্জে কলহ-বিবাদ বিধেয় নয়) এ অর্থ বিফল হয়ে পড়ে, যাতে উল্লেখ রয়েছে সঙ্গীর সাথে ঝগড়া করো না, যার ফলে সে গোস্বা হয়। অর্থাৎ বাতিল কর্মে সঙ্গীর সাথে ঝগড়া করা যাতে সে গোস্বা হয়। এ অর্থ প্রয়োগ হলে এ বাণী বর্ণনা অহেতুক হয়ে পড়ে, কেননা আল্লাহ্ তা'আলা মুহ্‌রিম কিংবা অমুহ্‌রিম উভয় অবস্থায়ই বাতিল বা অবৈধ কর্মে ঝগড়া নিষেধ করেছেন। সুতরাং ইহ্‌রাম অবস্থায় নিষেধের কোন বিশেষত্ব নেই। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা ইহ্‌রাম ও ইহ্‌লাল উভয় অবস্থায় সমভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। পক্ষান্তরে সত্যের মধ্যে ঝগড়া উদ্দেশ্য করা হলে তাও অহেতুক। কেননা, যদি কোন মুহ্‌রিম ব্যক্তি অশ্লীল কর্মে ঝগড়া করে তা হলে তার ওপর ঝগড়া প্রতিফল অপরিহার্য, অথবা সে তার অত্যাচারকে বিমুখ করে সত্যের নিমিত্তে অন্যদিকে ফিরাবে যে, ঝগড়া এবং কলহ-বিবাদের প্রেক্ষাপটে তার ওপর গোস্বা হয়েছে, সেতো তা থেকে রেহাই পেতে চায়। অত্যাচার কিংবা হক প্রতিষ্ঠা করা যে কোন কারণে মানুষের মাঝে কলহ-বিবাদ ও ঝগড়া সংঘটিত হয়। প্রথম প্রেক্ষাপটে সংঘঠিত হলে তা করা কোন ক্রমেই জায়েয নয়, এবং দ্বিতীয় প্রেক্ষাপটে সংঘঠিত হলেও জায়েয নয়। যেহেতু স্পষ্ট প্রতিভাত যে, ইহ্‌রাম অবস্থায় নিষেধ হবার কোন বিশেষত্ব নেই। জিদালকে গালী-গালাজ অর্থে প্রয়োগ একেবারে স্বতঃসিদ্ধ নয়, যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদেরকে পরস্পর গালী-গালাজ করতে নিষেধ করেছেন। যা মহানবী (সা.)-এর বাণীতে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তিনি বলেন, (সর্বাবস্থায়) মুসলিমকে গালী দেয়া ফুসূক (অবৈধ) এবং হত্যা করা কুফুরী। মুহ্‌রিম কিংবা অমুহ্‌রিম সকল অবস্থায় এক মুসলমান অপর মুসলমানকে

গালী দেয়া নিষেধ। যেহেতু তা বলা হয়নি যে, একমাত্র ইহ্‌রাম অবস্থাই গালী দেয়া যাবে না। বরং মহানবী (সা.)-এর বাণী থেকে সর্বাবস্থায় গালী না দেয়ার উল্লেখ রয়েছে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, যিনি এ ঘর (বায়তুল্লাহ্) -এর হজ্জ করবেন। স্ত্রী সঙ্গম ও অশালীন কথোপকথন করবেন না, তিনি যেন মাতৃগর্ভ থেকে জন্মলাভকারী নবজাত (নিষ্পাপ) শিশু।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, যিনি এ ঘরে হজ্জ করবেন তার জন্য স্ত্রী সঙ্গম ও অশালীন কথোপকথন বৈধ নয় ; সে যেন পাপরাশিমুক্ত মাতৃগর্ভ থেকে জন্মলাভকারী নবজাত শিশু।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে অন্যসূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) নবী (সা.) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। অন্যসূত্রে ইবনে মুসান্না (র.) ...আবূ হুরায়রা (রা.) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, যিনি এ ঘরের হজ্জ করবেন তার জন্য স্ত্রী সঙ্গম ও অশালীন কথোপকথন বৈধ নয়, সে যেন পাপরাশিমুক্ত মাতৃগর্ভ থেকে জন্মলাভকারী নবজাত শিশু।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) অনুরূপ ইরশাদ করেছেন, তবে তিনি নতুন শব্দ সংযোগে তা বলেছেন যে, সে (হাজী) যেন মাতৃগর্ভ থেকে জন্মলাভকারী নবজাত শিশু হয়ে প্রত্যাবর্তন করে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) অনুরূপ ইরশাদ করেছেন, তবে তিনি নতুন শব্দ সংযোগে বলেছেন যে, সে (হাজী) যেন মাতৃগর্ভ থেকে নবজাত শিশুর ন্যায় পরিবার পরিজনের নিকট প্রত্যাবর্তন করে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি এ ঘরের (কা'বা শরীফের) হজ্জ করবে সে স্ত্রী সঙ্গম ও অশালীন কথোপকথন করবে না। তবে সে যেন মাতৃগর্ভ থেকে জন্মগ্রহণকারী নবজাত শিশুর ন্যায় প্রত্যাবর্তন করে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হজ্জ করবে এবং দাম্পত্যসুলভ আচরণ ও অন্যায় আচরণ না করে, সে যেন মাতৃগর্ভ থেকে জন্মগ্রহণকারী নবজাত শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে ফিরে।

আল্লাহ পাকের বাণী- وَ لَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ (হজ্জে কলহ-বিবাদ বৈধ নয়)। এ আয়াতে এ কথার সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, হজ্জে কলহ-দ্বন্দ্ব নিষিদ্ধ। আর সাধারণভাবে মানুষের মাঝে কলহ-বিবাদ এবং হজ্জে কলহ-বিবাদ এক নয়। সাধারণত মানুষ কলহ-বিবাদ হতে সর্বদা বিরত থাকতে অপারগ,

অবশ্য কখনো কখনো বিরত থাকে সত্য। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এ প্রসংগে ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি হজ্জ করে সে দাম্পত্যসুলভ আচরণ এবং অন্যান্য কাজ থেকে বিরত থাকে, সে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে মর্যাদা লাভ করে। এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক হজ্জে কলহ-বিবাদ নিষেধ করেছেন, এর ব্যাখ্যা হলো, ঝগড়া ফাসাদ ও গালী-গালাজ বা এ ধরনের কার্যাবলী।

আল্লাহ্ তা'আলার ইরশাদ- وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ অর্থ ঃ 'তোমরা উত্তম কাজ যা কিছু কর আল্লাহ্ তা জানেন' অর্থাৎ ইহ্রাম অবস্থায় নির্ধারিত নিয়মাবলী সম্বলিত আল্লাহর নির্দেশিত হজ্জ সম্পাদনের মাধ্যমে অপরিমেয় সওয়াবের অধিকারী হও। তোমরা আমার নিকট সওয়াব ও আমার সন্তুষ্টি প্রার্থনা কর, সৎ কাজ ও অন্যান্য উত্তম কাজ সাধনের মাধ্যমে। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের এ সব কর্মের পুরস্কার ও প্রতিফল দেব। জেনে রেখো যে, তোমাদের অন্তরের গোপন ইচ্ছা যা কাজের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়, তা আমার কাছে গোপন নয়। পরন্তু তোমাদের অন্তরের ক্ষুদ্রতম (তিল সাদৃশ্য) ইবাদত এবং সকল গোপনীয়তা সম্পর্কে আমি অবহিত।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী-وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى অর্থ ঃ এবং তোমরা পাথেয় যোগাড় করো, তাক্ওয়াই সর্বোত্তম পাথেয়।

এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বর্ণিত হয়েছে, তখনকার দিনে কোন কোন দল (কওম) পাথেয় এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রী ছাড়া হজ্জ করতেন। তাদের কেউ কেউ ইহ্রাম গ্রহণের সাথে সাথে স্বীয় পাথেয় দূরে ফেলে দিতেন বা আবাস স্থলে রেখে যেতেন এবং অন্যদের পাথেয় গ্রাস করতেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের প্রসংগে আয়াতের এ অংশ নাযিল করেন যে, ভ্রমণের সময় যারা পাথেয় নেয়নি, তারা অবশ্যই পাথেয় নিবে, এবং তারা তাদের পাথেয় সাথে নিয়ে যাবে এবং নিজেদের পাথেয় অবশ্যই সংরক্ষণ করবে, তা কোন ক্রমেই ফেলে দেয়া যাবে না।

এ মতের সমর্থনে বর্ণনা ঃ

হযরত ইবনে উমার (রা.) হতে বর্ণিত। হাজীগণ যখন পাথেয়সহ ইহ্রাম গ্রহণ করতেন, তৎসঙ্গে আরো লুট করে তা দীর্ঘকাল যাবত গ্রাস করতো, এ অবস্থায় প্রেক্ষাপটে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন-وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى অর্থ ঃ এবং তোমরা পাথেয় সংগ্রহ করো, তাকওয়াই সর্বোত্তম পাথেয়।" তাদের পূর্ববর্তী কর্মকে নিষেধ করে সকলকে পথেয় সাথে নেয়ার আদেশজারী করলেন। উত্তম পাথেয় হলো কেক, পিঠা, রুটি ও ছাতু জাতীয় খাদ্য।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। পূর্বেকার হাজীগণ পাথেয় ছাড়া হজ্জ করতেন। এ অবস্থা বিলোপকল্পে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ "এবং তোমরা পাথেয় সাথে নিও। তাকওয়াই

সর্বোত্তম পাথেয়।" হযরত সাঈদ ইবনে জুরায়য (রা.) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহ্‌র বাণী- وَ تَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى অর্থ ঃ "এবং তোমরা পাথেয় ব্যবস্থা করে, আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়।" উত্তম পাথেয় হলো-পিঠা ও তৈল জাতীয় খাদ্য। হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়র (রা.) হতে বর্ণিত। পাথেয় হলো কেক-পিঠা ও আটা দ্বারা তৈরী রুটি।

হযরত ইকরামা (রা.) হতে বর্ণিত। সে যুগের অনেক লোকই পাথেয় ব্যতীত হজ্জে যেতেন। এর বিলোপকল্পে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ......وَ تَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى অর্থ ঃ এবং তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা করো, আর সংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়। অন্য রিওয়ায়েতে হযরত শাবী (র.) হতে বর্ণিত আল্লাহ্ তা'আলার বাণী- وَ تَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى অর্থ ঃ এবং তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা করো, আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়।

হান্‌যালা (রা.) বর্ণনা করেন, যে সালিম (রা.)-কে হাজীদের পাথেয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, তিনি বলেন-তাহলো রুটি, গোশ্‌ত ও খেজুর। অন্য বর্ণনায় আমর (র.) বলেন, আবূ আসিম (রা.)-কে কখনো কখনো বলতে শুনেছি যে, হান্‌যালা বর্ণনা করেন-সালিম (রা.)-কে হাজীর পাথেয় প্রসংগে জিজ্ঞেস করা হলে- তিনি বললেন, তাহলো রুটি ও খেজুর।

ইবরাহীম (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, পল্লী এলাকার কেউ কেউ পাথেয় ছাড়া হজ্জ করতে আসতেন এবং বলতেন আমরা আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা রাখি। তাদের এ অবস্থা নিরসনকল্পে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন-وَ تَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى এবং তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা করো, আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়।

মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, পাথেয় ব্যতিরেকে হাজীদের কেউ কেউ (তৎকালীন যুগে) হজ্জ করতেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন-وَ تَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى অর্থ ঃ এবং তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা করো, আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়।

মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, পাথেয় ব্যতিরেকে তারা ভ্রমণ (হজ্জ) করতেন। এ প্রসংগে নাযিল হয়েছে- وَ تَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى অর্থ ঃ এবং তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা করো, আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়। হাদীসের মূল বর্ণনা রূপান্তর করে-হাসান ইবনে ইয়াহ্ইয়া বলেন, তারা পাথেয় ব্যতিরেকে হজ্জ করতেন। মুজাহিদ (র.) হতে অন্যসূত্রে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। মুজাহিদ (র.) থেকে অপরসূত্রে অনুরূপ আরেকটি বর্ণনা রয়েছে। মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, দূরবর্তী অঞ্চলের লোকেরা হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হতেন। পাথেয় ছাড়া অন্যদের সাথে সমবেত হয়ে যাত্রা করতেন এবং বলতেন, আমরা আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীল। এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল

করেন-وَ تَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى অর্থ ঃ এবং তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা করো। আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়।

মুজাহিদ (র.) হতে অপরসূত্রে বর্ণিত। মহান আল্লাহ্ তা'আলার বাণী-وَ تَزَوَّدُوْا (এবং তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা করো, প্রসংগে তিনি বলেন যে, দূরবর্তী অঞ্চলের লোকেরা অন্যদের সাথে পাথেয় ছাড়া সমবেত হয়ে হজ্জের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতেন। আল্লাহ্ পাক তাদেরকে পাথেয়ের ব্যবস্থা করার আদেশ দিলেন। মুজাহিদ (র.) হতে অন্যসূত্রে বর্ণিত যে, এবং তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা করো, আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়। এ প্রসংগে তিনি বলেন, ইয়ামানবাসী মানুষের সাথে হজ্জে যাত্রা করতেন। তাদেরকে পাথেয় ব্যবস্থা করার আদেশ এবং অতিরিক্ত খরচ করতে নিষেধ করা হলো, ইরশাদ হলোঃ বস্তুত আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়।

মুজাহিদ (র.) হতে আরেক সূত্রে হতে বর্ণিত যে, তিনি আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, তারা পাথেয় ছাড়া হজ্জ করতে যেতেন, তাদেরকে পাথেয় নেয়ার আদেশ দেয়া হলো এবং এটাও জানিয়ে দেয়া হলো যে, আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়। কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহ্ পাকের বাণী- وَ تَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى অর্থ ঃ এবং তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা করো, আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়। হাসান (র.) বলতেন যে, ইয়ামান হতে কেউ কেউ পাথেয় ব্যতিরেকে হজ্জের উদ্দেশ্যে সফর শুরু করতেন। আল্লাহ্পাক তাদেরকে পথে ব্যয়ভারের জন্য পাথেয় নেয়ার আদেশ দিলেন, এবং তাদেরকে অবহিত করলেন যে, আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়।

সাঈদ ইবনে আবূ আরুযা হতে বর্ণিত যে, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী-وَ تَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى অর্থ ঃ এবং তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা করো, আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়। তিনি বলেন, কাতাদা (র.) বলেছেন যে, ইয়ামানবাসীদের কেউ কেউ পাথেয় ছাড়া হজ্জে আগমন করতেন। অন্যসূত্রে বাশার (র.) ইয়াযীদ (র.) হতে বর্ণিত হাদীসের ন্যায় বর্ণনা করেছেন। কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত যে, এবং তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা করো, আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়, প্রসংগে তিনি বলেন, ইয়ামানবাসী মক্কা মুকার্‌রামার উদ্দেশ্যে পাথেয় ব্যতিরেকে বের হতেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে পাথেয় নেয়ার আদেশ দিলেন এবং এও জ্ঞাত করিয়ে দিলেন যে, আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়।

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী-وَ تَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى অর্থ- এবং তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা করো, আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়। প্রসংগে তিনি বলেন, মানুষ পাথেয় না নিয়ে পরিবার পরিজন ছেড়ে হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হতেন ও বলতেন খাদ্য পরিহার করে

বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ করবো, মানুষ থেকে তোমাদের চেহারাকে বিমুখ রাখবে না, অর্থাৎ মানুষ ভক্ষণ করবে–আর তোমরা না খেয়ে মুখবন্ধ করে রাখবে, তা আল্লাহ্ নিষেধ করেছেন।

রবী (র.) হতে বর্ণিত, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী–وَ تَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى অর্থ ঃ এবং তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা করো, আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়। সে যুগে ইয়ামানবাসীরা ছাড়া হজ্জ করতেন, আল্লাহ্ তাদেরকে পাথেয় নেয়ার আদেশ দিলেন এবং এ সংবাদও দিলেন যে, আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়। সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা.) হতে বর্ণিত যে, তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা করো, তিনি বলেন তা হলো কেক, পিঠা, রুটি ও পণীর জাতীয় খাদ্য। সাঈদ ইবনে জুবায়র (রা.) হতে বর্ণিত যে, তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা করো, আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়। তিনি বলেন, তা হলো শুকানো ফল ও পণীর জাতীয় খাদ্য।

আবদুল মালিক ইব্‌ন আতা আল বাকালী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী–وَ تَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى অর্থ ঃ তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা করো, আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়। প্রসংগে শা'বী (র.)-কে বলতে শুনেছি যে, তা হলো খাদ্য সামগ্রী খাদ্য স্বল্পতার সময় তাকে জিজ্ঞেস করলাম এখন কি খাদ্য খাব ? তিনি বললেন, খেজুর ও পণীর জাতীয় খাদ্য।

দাহ্‌হাক (র.) হতে বর্ণিত। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী–وَ تَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى অর্থ ঃ এবং তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা করো। আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়। পার্থিব জগতে শ্রেষ্ঠ পাথেয় হলো পোশাক, খাদ্য সামগ্রীও পানাহার বস্তু। ইবরাহীম (র.) হতে বর্ণিত যে, وَ تَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى অর্থঃ এবং তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা করো, আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়। প্রসংগে বলেন–তৎকালে মানুষ আকাবা নামক স্থানে যাওয়া পর্যন্ত পাথেয় না নিয়েই আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করতো। সুফিয়ান (র.) আল্লাহ্‌র বাণী–وَ تَزَوَّدُوْا (তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা করো)। প্রসংগে বলেন, এখানে কেক, পিঠা ও পণীর জাতীয় খাদ্য সাথে নিয়ে যেতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আবদুর রায্‌যাক (র.) বলেন, আমার পিতা সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি ইকরামা (রা.)-কে–وَ تَزَوَّدُوْا এর ব্যাখ্যায় বলতে শুনেছেন, তাহলো রুটি ও পণীর জাতীয় খাদ্য।

ইবনে যায়দ (র.) আল্লাহ্ তা'আলার বাণী–وَ تَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّدِ التَّقْوٰى অর্থ ঃ এবং তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা করো, আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়, প্রসংগে বলেন, আরবের বিভিন্ন গোত্র হজ্জ ও 'উমরার উদ্দেশ্যে পাথেয় নিয়ে বের হওয়া হারাম মনে করত । তারা মেহমান হয়ে থাকতে চাই তো।

তাদেরকে লক্ষ্য করে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা দিলেন- وَ تَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى অর্থ ঃ এবং তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা করো, আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়।

ইকরামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, পাথেয় ছাড়া মানুষ মক্কা মুকাররামা আগমন করতো। এ অবস্থার বিলোপকল্পে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন-وَ تَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى অর্থ ঃ এবং তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা করো আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়।

আয়াতের বিশ্লেষণে তা স্পষ্ট প্রতিভাত হলো যে কেউ নির্দিষ্ট মাসসমূহে হজ্জ করতে ইচ্ছা করে, তাতে ইহ্রাম বাধবে। দাম্পত্যসুলভ আচরণ ও অশালীন কথোপকথন পরিহার করবে না। কেননা, হজ্জের বিধান আল্লাহ্ তা'আলা সুদৃঢ়ভাবে তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আর হজ্জের মীকাত ও সীমা তোমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ্ পাক হজ্জের ব্যাপারে তোমাদেরকে যে বিধি-নিষেধ দিয়েছেন, সে ব্যাপারে তোমরা আল্লাহ্ পাককে ভয় করো। তোমরা যা কিছু ভালো কাজ কর আল্লাহ্ পাকের আদেশানুযায়ী, সে সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল। হজ্জ আদায়ের জন্য যা কিছু তোমাদের কাছে রয়েছে, তা থেকেই তোমরা পাথেয় গ্রহণ করো। নিজের পাথেয় ত্যাগ করে অন্যের কাছে সাহায্য চাওয়া কোনো কল্যাণকর ব্যাপার নয়। নিজের শক্তিকে বিনষ্ট করার মধ্যেও কোন কল্যাণ নেই। একমাত্র কল্যাণ হলো আল্লাহ্ পাককে ভয় করার মধ্যে। তোমাদের হজ্জের সফরে নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে। যা তিনি আদেশ দিয়েছেন, তা করার মাধ্যমে। এই তাকওয়া পরহিযগারী উত্তম পাথেয়। অতএব,তা থেকেই পাথেয় সংগ্রহ করো।

হযরত দাহ্হাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি মহান আল্লাহ্র বাণী-وَ تَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى (তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা করো, আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়,) প্রসংগে বলেন, তাক্ওয়া হলো আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য করা, তাকওয়ার অর্থ বিশদভাবে পূর্বে আলোকপাত করা হয়েছে, তাই তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

আল্লাহ তা'আলার বাণী-وَ اتَّقُوْنِ يَا اُولِى الْاَلْبَابِ অর্থ ঃ "(হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! তোমরা আমাকে ভয় কর,") এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা ঃ হে বিবেক ও বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! হজ্জ পালনের নিয়ম-কানুন হিসাবে বিধান তোমাদের প্রতি অবশ্য কর্তব্য করে দেয়া হয়েছে, সে সব পালনে তোমরা আমাকে ভয় কর। আমি তোমাদের উপর যা হারাম করেছি, তা পরিহারের মাধ্যমে আমার শাস্তিকে ভয় কর। তাহলো তোমরা আমার যে শাস্তিকে ভীষণভাবে ভয় কর তা থেকে নাজাত পাবে

এবং তোমাদের কামনানুযায়ী স্বীয় কর্মে সফলতা অর্জনের মাধ্যমে আমার জান্নাত লাভ করবে। আল্লাহ্ তা'আলার এ বাণী, বোধসম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রতি সম্বোধন করা উল্লেখ করেছেন, যেহেতু তারা হক বাতিলের পার্থক্য অনুধাবন করতে পারে। যে কোন বস্তুর সত্যতা নিরূপণে সঠিক ও প্রজ্ঞাভিত্তিক গবেষণার অধিকারী,যা তারা লব্ধজ্ঞান দ্বারা অনুভব এবং প্রজ্ঞাদ্বারা অনুধাবন করতে সক্ষম। প্রকারান্তরে চতুষ্পদ প্রাণী সাদৃশ্য এবং গো-মহিষ জন্তুর প্রতিচ্ছবির অনুরূপ বা তার চেয়ে নিকৃষ্ট অজ্ঞ সমাজকে এ আদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। বরং বিজ্ঞ সমাজকে উদ্দেশ্য করেই আল্লাহ্ তা'আলা তা ইরশাদ করেছেন।

তৃতীয় খন্ড সমাপ্ত

ইফাবা. ১৯৯১-৯২/অঃসঃ (উ.) ৪৩৭৫-৫০০০